বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্রেণীর 'ইসলামী অর্থনীতি' বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত।

ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ

আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া
ভাইস-প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস
জামিয়া শারইয়্যাহ্, মালিবাগ, ঢাকা

সহ-সম্পাদক
বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড

পরিচালক
আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ

কওমী পাবলিকেশন্স
১৫৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ
আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া
প্রকাশনায় ঃ
কওমী পাবলিকেশন্স
১৫৪ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০
প্রথম প্রকাশ ঃ
১২ জুলাই, ২০০১ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
২২ শাবান, ১৪২৪ হিজরী
১৯ অক্টোবর, ২০০৩ ঈসায়ী
৪ কার্তিক, ১৪১০ বাংলা
কপি সংখ্যা ঃ ১০০০
স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
সালসাবিল কম্পিউটার
৪১/৪-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা
এ জেড্ কম্পিউটার
নয়াবাজার, ঢাকা
সিনটেক্স কম্পিউটার
মালিবাগ বাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ ঃ
কবীর মেসবাহ্
সালসাবিল কম্পিউটার, ৪১/৪-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

ISLAMI ARTHONITIR ADHUNIK RUPAYAN By Moulana Abul Fatah Muhammad Yahya. Published by Qowmy Publications, 154 Motijheel Commercial Area, Dhaka - 1000, Bangladesh.

Price : Taka. 200.00 Only

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের খিদমাতে যে কোনভাবে লেগে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। সালাত ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাঁর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যের কারণে পৃথিবীর তাবৎ তাগূতী ও শয়তানী চক্রের নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের শিকার আমরা। গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ ইয়াহুদী দুনিয়ার আগ্রাসী অর্থনীতির অক্টোপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থনীতির শিকল আজ এমনভাবে আমাদেরকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াহুদী দুনিয়ার গোলামী হয়ে পড়েছে আমাদের ভাগ্য লিখন। এই গোলামীর সুবাদে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সকল ষড়যন্ত্রে আমাদেরকেই বানানো হচ্ছে তাদের হাতের ক্রীড়নক। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাদের অঙ্গুলী হেলনে আমাদেরকে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে ভ্রাতৃঘাতি মরণ খেলায়। এ ভ্রাতৃঘাতি মরণ খেলায় কেউ অংশ নিতে না চাইলে তারই বিরুদ্ধে নেমে আসছে অর্থনৈতিক অবরোধ, শোষণ ও নির্যাতন। এ গোলামীর অবসান না হলে মুসলিম বিশ্ব ইয়াহুদী ষড়যন্ত্রের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমানদের নিজস্ব অর্থনৈতিক বলয় গড়ে তোলা ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং কুরআন-সুন্নাহর পথ নির্দেশের আলোকে সুদ ও শোষণ মুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম বিশ্বের জন্য পৃথক অর্থনীতির বলয় গড়ে তোলার জোর তৎপরতা।

সময়ের এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই অর্থনীতিকে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল ধারণা সম্বলিত কোন পুস্তক না থাকায় এ বিষয়ে পাঠ্য বইয়ের অভাব অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে। স্বনামধন্য লেখক ও গবেষক আলেমে দীন হযরত মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহইয়া সাহেব এই অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছেন এবং দীর্ঘ গবেষণা ও পরিশ্রমের পর তিনি ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ নামের এ পুস্তকটি তৈরী করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ পুস্তকটিকে ফযীলত জামাতের অর্থনীতি বিষয়ের জন্য পাঠ্য পুস্তক হিসাবে অনুমোদন দিয়েছে। এ বইটি প্রকাশের দায়িত্বভার আমাদের উপর অর্পণ করায় আমরা গর্বিত। ইতিপূর্বে এই লেখকের দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান নামের পুস্তকটি

প্রকাশের সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। সেটিও কওমী মাদ্রাসার ফযীলত জামাতে সিলেবাসভুক্ত রয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস এ বইটি ইসলামী অর্থনীতির উপর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ বইটি ইসলামী অর্থনীতির আধুনিকায়নে একটি নতুন দিগন্তের পথ নির্দেশ করবে। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা গর্বিত ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞ। আমাদের এই প্রচেষ্টা অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় সামান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ্‌র কাছেই উত্তম বিনিময় আশা করি।

গোলাম মোস্তফা

তাং ঃ ২০-৯-২০০১ ঈঃ

বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড—বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর মহাসচিব

হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের

অভিমত

মহান প্রতিপালকের অপার অনুগ্রহে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৮ সালে দেশের সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় **'বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড—বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ'**।

বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা কারিকুলামের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় অত্র শিক্ষাবোর্ডের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৮১ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের 'নেসাবে তা'লীম'কে মূল ভিত্তি হিসাবে সামনে রেখে সমকালীন সময়ের দ্বীনি ও সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেসাবকে সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং পুরাতন নেসাবের সাথে নতুন বিষয় সংযোজন করতঃ এ দেশের দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নতুনভাবে বিন্যস্ত করে পেশ করা হয়। সে নেসাবের ভিত্তিতেই বর্তমানে বেফাকভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

যুগের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই ১৯৮১ সালে প্রণীত সেই নেসাবে ইসলামী অর্থনীতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ফিকাহ্'র প্রাচীন গ্রন্থসমূহে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান থাকলেও অর্থনীতির আধুনিক বিন্যাসের আলোকে ক্লাসে পাঠ করার মত কোন পুস্তক বাংলা, উর্দূ কিংবা আরবী ভাষায় তখনো পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। কারণ, তখন পর্যন্ত যাঁরা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে লেখালেখি করেছিলেন তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক দিকসমূহ এবং অন্যান্য অর্থনীতির সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার মত কোন মুনাসিব গ্রন্থ আমাদের সংগ্রহে না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আলেম হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিহারবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উর্দূ ভাষায় প্রণীত 'ইসলামকা ইকতেসাদী নেযাম' নামক পুস্তকটির নির্বাচিত অংশকে সিলেবাসভুক্ত করে এ বিষয়ে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণের কাজ শুরু করা হয়। ২০০০ ঈসায়ী সন পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক বিষয়ে পাঠদান ও অর্থনীতির আধুনিক বিষয়াবলীর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং অর্থনীতির মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল ধারণা সম্বলিত একটি পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে ভিত্তিতে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া এরূপ একটি পাঠ্যপুস্তক তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিভাদীপ্ত গবেষক আলেম ও লেখক মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাঃ

www.eelm.weebly.com

ইয়াহ্ইয়া এরূপ একটি পাঠ্যপুস্তক তৈরী করে দেয়ার ব্যাপার সাগ্রহে সম্মতি প্রদান করলে বেফাকের পক্ষ থেকে তাঁকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়।

লেখক দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত ইসলামী অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতির বহু গ্রন্থাদি ঘাটাঘাটি করে ও ইসলামী ফিকায় বর্ণিত অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহকে সামনে রেখে আধুনিক অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করে এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ তৈরীর কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ বিষয়ে এটি একটি নতুন গবেষণা কর্ম হিসাবে মতামত যাচাইয়ের নিমিত্তে বইটির কম্পিউটারে মুদ্রিত কপি বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা গবেষক আলেমের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের পর বইটির মুদ্রণ অর্ডার দেওয়া হয়েছে। বিষয় বিবেচনায় বইটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসলামী অর্থনীতিক আধুনির রূপায়ণ'।

আমার ধারণা মতে বইটি এক্ষেত্রে আমাদের এক বিরাট শূন্যতাকে পূরণ করেছে। ছাত্ররা এ বইটি দ্বারা একই সাথে ইসলামী অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে। তদুপরি কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে অর্থনীতির আধুনিক বিষয়াবলী এবং শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া সাধারণ পাঠকরাও এ পুস্তকটি দ্বারা ইসলামের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে। বেফাকুল মাদারিসের পক্ষ থেকে ফযীলত জামাতের অর্থনীতির বিষয়ের জন্য এই গ্রন্থটিকে একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিতে গিয়ে বইটির কলেবর বেড়ে গেছে। তাই বইটি ভাগ করে দুই বছরে (১৩শ ও ১৪শ শ্রেণীতে) পড়ানো ভাল হবে, না বইটির নির্বাচিত অংশ পাঠ্যসূচীভুক্ত করে এক বছরে পাঠদান করা ভাল হবে— সিলেবাস কমিটি তা বিবেচনা করবে।

তবে এ বিষয়ের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক উপহার দেওয়ার জন্য আমি লেখককে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং দু'আ করি আল্লাহ্ তাঁর এই খিদমাতকে কবুলিয়ত দান করে পরকালীন নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন। এতদসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে, তিনি আমাদেরকে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার সামর্থ্য দিয়েছেন এবং একটি জাতীয় শূন্যতাকে পূরণ করার তাওফিক দান করেছেন। আমাদের সকল কাজকর্ম তাঁর সন্তুষ্টি ও পরকালীন নাজাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হোক, এই কামনা রেখে শেষ করছি।

আবদুল জব্বার
মহাসচিব
বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড

তাং ঃ ২৩-৯-২০০১ ঈঃ

www.eelm.weebly.com

লেখকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ইসলাম সর্বকালের মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত ও সার্বজনীন এক দিক নির্দেশনা। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সর্বকালের মানুষই ইসলামের মাঝে খুঁজে পাবে তাদের জীবন সমস্যার সঠিক সমাধান। মহান আল্লাহ্তা'য়ালা এভাবেই ঢেলে সাজিয়েছেন এর অবকাঠামোকে। মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আখলাক-চরিত্র, আচার-আচরণ, ইবাদাত-অর্চনা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক, প্রেম ও ভালবাসার বন্ধন, মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, দয়া ও অনুগ্রহ, সমমর্মিতা, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক, দেশের সাথে দেশের সম্পর্ক, জাতির সাথে জাতির সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জুলুম-শোষণ, অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অপরাধ প্রবণতা ও তার প্রতিকার,.শাস্তির বিধান, বস্তু জাগতিক বিষয়াসয়, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প জীবনের পরিণতি, স্রষ্টার কাছে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, কর্মের প্রতিদান, জাযা সাজা, পরকালের অনন্ত জীবন, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই বিধৃত হয়েছে এতে। জীবনের কোনদিক এ থেকে বাদ পড়েনি।

পৃথিবীর মানুষের রুচী, অভ্যাসে যেমন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হয় তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আহরণের ধারায়ও সূচিত হয় বিস্তর পরিবর্তন। আল-কুরআন যেকালে অবতীর্ণ হয়েছে সেকালে জ্ঞান সাধনা ও জীবন সম্পর্কীয় উপলব্ধিসমূহ সামগ্রিকতার পরিমণ্ডলে বিস্তৃত ছিল। তখন জীবনের কোন একদিককে অন্যদিকগুলো থেকে পৃথক করে উপলব্ধি করার বা আলোচনা করার চেতনা মানুষের মাঝে ছিল না। মানুষের তখন প্রয়োজন ছিল সামগ্রিকভাবে জীবনকে সুন্দর, পরিমার্জিত ও সুশীল করে গড়ে তোলার জন্য পরিমার্জিত একটি সামগ্রিক ও সার্বজনীন হিদায়াত ও জীবন বিধানের। মহান আল্লাহ্তায়ালা সে আঙ্গিকেই আল-কুরআনকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যে কারণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আল-কুরআনে নেই বটে, তবে জীবনের কোন দিকের আলোচনাই এ থেকে বাদ পড়েনি।

পরবর্তীকালে জীবনের বিস্তৃত অধ্যায়কে খন্ড খন্ড করে পৃথকভাবে অনুধাবন ও আলোচনার চেতনা সৃষ্টি হয়। সে কারণেই প্রাচীন ফেকাহ্বিদগণ পার্থিব জীবনের বিস্তৃত বিষয়গুলোকে তিনটি মৌলিক অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। যথা- ১. ইবাদাত, ২. মুআশরাত বা আচার-আচরণ, ৩. মু'আমালাত বা লেনদেন। ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে তাঁরা অসংখ্য উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি বিষয়কে উপস্থাপন করতে যেয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্

www.eelm.weebly.com

থেকে দলীল-প্রমাণ আহরণ করে প্রমাণ সমৃদ্ধ করে পেশ করেছেন। ফলে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এতদসংক্রান্ত দলীল প্রমাণগুলো অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ের আলোকে বিন্যস্ত হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে মু'আশাবাত বা আচার-আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়কেও তাঁরা অসংখ্য উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে কুরআন সুন্নাহ্‌র প্রমাণ সমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করেছেন। ঠিক একইভাবে তারা মু'আমালাত বা লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ ও অর্থ-সম্পদের লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াসয়গুলোকেও অসংখ্য উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে কুরআন সুন্নাহ্‌র দলীল প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষিকর্ম, চাষাবাদ, শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচা-কেনা, ভাড়া, বর্গা, ঋণ বন্ধকী, ব্যবসায়ী শুল্ক, কিফালা, হাওয়ালা, মুরাবাহা, তাওলিয়া, বাজার ব্যবস্থা, মূল্য নির্ধারণ, মুদ্রা বিনিময়, মুদ্রার আন্তর্জাতিক লেনদেন, রাজস্ব, উশর খারাজ, খনিজ সম্পদ, গনীমতের মাল, প্রোথিত সম্পদ, মালিকানাহীন সম্পদ, বিনাযুদ্ধে লব্ধ শত্রুর সম্পদ, দিয়্যাত, কাফ্‌ফারা, মহর, খুলা দান, হেবা, ওয়াকফ্‌, ওয়াসিয়ত, যাকাত, সাদাকাত ইত্যাদি অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে তারা মু'আমালাত অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করেছেন। ফলে অর্থনীতির শিরোনাম দিয়ে আলোচনা করা না হলেও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসয়গুলো সম্পর্কে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে পরবর্তীকালের ইসলামী ফিকাহ্‌বিদগণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ ও চুলচেরা বিশ্লেষণসহ আলোচনা করে গেছেন।

এমনকি শুধু অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই তৎকালে বহু গ্রন্থাদিও প্রণীত হয়েছিল। মুসলিম জাহানের ফিকাহ্‌বিদগণ অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যখন বিস্তর গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণে নিরত এবং গ্রন্থের পর গ্রন্থ তৈরী করে গ্রন্থাগারগুলো সমৃদ্ধ করে তুলছেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রয়োগ করে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোতে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছেন; ইউরোপ বলতে গেলে তখনও এ বিষয়ে ঘুমন্তই ছিল। তাদের অর্থব্যবস্থা তখনো কৃষি আর কৃষি পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে পুঁথিগত জ্ঞান তাদের ছিল না বললেই চলে। পরবর্তীকালে জীবনকে আরো খন্ড খন্ড অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনার প্রবণতা দেখা দেয় এবং জ্ঞান সাধনার বিষয়গুলো বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো পৃথক পৃথক বিষয়ের রূপ লাভ করে। ফলে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় সৃষ্টি হয়।

১৪০০-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে ইউরোপে শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধিও বিস্তৃত হয়। মানুষ আবিষ্কার করে গতিশীল আরেক নয়া পৃথিবীকে। ফলে অর্থনীতি সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োজন তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ ইসলামী ফিক্‌হের মু'আমালাত অধ্যায়কে মন্থন করে

www.eelm.weebly.com

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে পৃথক একটি সাবজেক্ট হিসেবে রূপ দানের চেষ্টা করেন। যেহেতু অর্থনীতি একটি পৃথক সাবজেক্ট হিসেবে ইউরোপীয়ান মনিষী ও ইয়াহুদী পন্ডিতদের মাধ্যমেই উদ্ভাবিত হয় এবং এর বিকাশ ও লালন তাদের হাতেই হয়, তাই এর বিন্যাস ও উপস্থাপন তারা তাদের মানসিকতার আলোকেই করে। ফলে অর্থনীতির মৌলিক অবকাঠামোতে অর্থসর্বস্ব মানসিকতা, সুদ ও শোষণের জঘন্য প্রবণতা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। বাহ্যিকভাবে শুভঙ্করের ফাঁকির ন্যায় লাভের প্রলোভন দিয়ে সারা পৃথিবীতে তারা এই অর্থ ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দেয়। মুসলিম মনিষীরা তখন এ ব্যাপারে তেমন একটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, একে তো ইসলামী ফিকায় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াসয়ের উপর বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত যে আলোচনা রয়েছে তার তুলনায় ইউরোপীয় অর্থনীতিকে তখন এ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞানের চেয়ে বেশী কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। তাছাড়া যেহেতু এর অবকাঠামোতে সুদ ও শোষণের জঘন্যতা বিদ্যমান তাই কোন মুসলমান তা গ্রহণ করবে তা হয়ত তারা মনেই করেননি।

কিন্তু দেখতে দেখতে ইউরোপীয় আধুনিক অর্থনীতি সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলে এবং তাদের দেওয়া স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে আধুনিক পৃথিবীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে অর্থ সংক্রান্ত ইসলামী বিধানাবলী রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োগের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এর চর্চাও তখন কমে আসে। ফলে মানুষ আধুনিক অর্থনীতির স্ট্রাকচার ও পরিভাষার সাথে পরিচিত হয়ে যায়। যেহেতু তাদের অর্থনীতি অর্থসর্বস্ব মানসিকতা হতে উৎসারিত ছিল এবং সুদ ও শোষণের প্রক্রিয়ায় ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের জঘন্য মানসিকতা থেকে এর জন্ম, ফলে এর পরিণতি যা হবার তাই হল।

পৃথিবীর মানুষ অর্থসর্বস্ব মানসিকতার শিকারে পরিণত হল। ফলে কার চেয়ে কে বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারে মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। ধোকা-প্রতারণার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হল। মানুষের মানবতা বোধ ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হতে থাকল। পৃথিবীর মানুষ ধনী-দরিদ্র এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক দল মানুষ অজস্র সম্পদ শোষণ করেও শোষণের নতুন কৌশল উদ্ভাবনের গবেষণায় লিপ্ত থাকল। আরেক দল তাদের আগ্রাসী থাবার শিকারে পরিণত হয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে অসহায় করুণ জীবন যাপন করতে বাধ্য হল।

এই নিগ্রহ থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, কার্লমার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ শোষিত হত ব্যক্তি দ্বারা, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সমাজের মানুষ পরিণত হল রাষ্ট্রের সেবাদাসে। মানুষ হারাল তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ব্যক্তি মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ হারিয়ে

www.eelm.weebly.com

ফেলল তার উৎপাদনী প্রেরণা। ফলে উৎপাদন ঘাটতির শিকার হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো হল অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার শিকার। দেশের নাগরিক হল চরম দারিদ্র্যের কারাগারে বন্দী।

অথচ ইসলাম মানুষের জন্য যে অর্থনৈতিক বিধানাবলী বর্ণনা করেছে তাতে রয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সজিব পয়গাম। পূঁজিবাদী শোষণ ও সমাজতান্ত্রিক দাসত্ব থেকে বিশ্বমানুষের মুক্তির কথা চিন্তা করেই ভারত উপমহাদেশে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ) সর্বপ্রথম ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানগুলিকে নতুন করে পুনঃবিন্যস্ত করে উপস্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই চিন্তার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালের মনীষীবৃন্দ কুরআন সুন্নাহ্ ও প্রাচীন ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহ থেকে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিধানাবলীকে পৃথক করে ইসলামী অর্থনীতির নামে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই চিন্তা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়। ফলে ইসলামী অর্থনীতি নিজস্ব অবকাঠামোতে বিন্যস্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ততদিনে আধুনিক অর্থনীতি সারা পৃথিবীতে জেঁকে বসে।

ফলে ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এ সময় আর কোন দেশে সম্ভব হয়নি। তবে ইসলামী অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতি পরস্পরে বিপরীতমুখী দু'টি ধারা হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। যেহেতু চেপে বসা এই অর্থব্যবস্থাকে হুট করেই বর্জন করা আন্তর্জাতিকভাবে সম্ভব নয় তাই প্রয়োজন ছিল গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি ও আধুনিক অর্থনীতির মাঝে সমন্বয়ের শরীয়ত সম্মত পন্থা উদ্ভাবন করা। আধুনিক অর্থনীতির যে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির সাথে কোন বৈপরিত্য নেই সেসকল ক্ষেত্রে ঐকমত্য ঘোষণা করা আর যে সকল ক্ষেত্রে বৈপরিত্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির বিধানাবলী উল্লেখ করে আধুনিক অর্থনীতির সাথে তার তুলনামূলক পর্যালোচনা পেশ করা। আর যে সকল আধুনিক বিষয়ে পূর্ববর্তী ফেকাহ্ গ্রন্থে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই সে সকল ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্ ও এতদসংক্রান্ত মূলনীতির আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আমরা ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ নামক এই গ্রন্থখানিতে সময়ের এই দাবীকে পূরণ করার চেষ্টা করেছি। যে কারণে আধুনিক অর্থনীতির বিন্যাস ও শিরোনামসমূহকে যথাসম্ভব বহাল রেখে সমন্বয়ের চিন্তাকে সামনে রেখে ইসলামী অর্থনীতিকে নতুন করে বিন্যাস করার প্রয়াস পেয়েছি। যেখানে বৈপরিত্য পাইনি সেখানে তাদের আলোচনাগুলোকে কুরআন ও হাদীসের দলীল প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করেছি। আর যেখানে তাদের আলোচনাগুলো ইসলামী মূলনীতির সাথে বিরোধপূর্ণ বলে মনে হয়েছে সেখানে ইসলামী বিধানসমূহকে উল্লেখ করে তাদের বক্তব্যের বিভ্রান্তিসমূহ উন্মোচন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর যেসব বিষয়ে

www.eelm.weebly.com

পূর্ববর্তী ফেকাহ্ গ্রন্থে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই সেসব ক্ষেত্রে আধুনিক কালের ফেকাহ্‌বিদদের মতামতের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত যা হওয়া উচিত তা উল্লেখ করে দিয়েছি।

আধুনিক অর্থনীতির বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠা অর্থনীতির অত্যাবশ্যাকীয় ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কিভাবে সুদ ও শোষণমুক্ত পদ্ধতিতে বৈধ পন্থায় আঞ্জাম দেয়া যায় ইসলামী ফিকাহ্‌র মূল নীতির আলোকে তার বিকল্প ব্যবস্থাসমূহও এ গ্রন্থে উল্লেখ করে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

যেহেতু বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর ফরমায়েশ অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুকূল করে বইটি তৈরী করার চিন্তাকে সামনে রেখে বইটি রচনা করতে হয়েছে। তাই বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পরিহার করতে হয়েছে। তবে অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো যাতে বাদ না পরে সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে অতি সংক্ষেপে সকল অধ্যায়ের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি পরবর্তী গবেষকরা এ গ্রন্থ থেকে গবেষণার পথ নির্দেশনা লাভ করবেন। আধুনিক অর্থনীতির সাথে সমন্বয় করতঃ পাঠ্যসূচীর অনুকূল করে ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ তৈরীর এ কাজটি একটি নতুন পদক্ষেপ। এ ধরনের কোন গ্রন্থ ইতিপূর্বে উপমহাদেশে তৈরী হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অবশ্য ইসলামী অর্থনীতির দর্শনের উপর অনেক গ্রন্থই ইতিপূর্বে তৈরী হয়েছে। তাঁদের গবেষণা না হলে আমার মত অধমের জন্য এ কাজ করা অবশ্যই দুরূহ ছিল। বিশেষ করে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আলেম হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিহারোবী ও আধুনিক জগতের মুহাক্কিক বিদগ্ধ গবেষক আলেম হযরত মাওলানা তকী উসমানী (মা. আ.)-এর অর্থনীতি সংক্রান্ত পুস্তকাদি থেকে আমি যথেষ্ট তথ্য ও উপাত্য আহরণ করেছি। বিশেষ করে দুর্লভ গ্রন্থসমূহের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমাকে তাঁদের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। তাদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত রেফারেন্সগুলোর নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নাতীত মনে করে সেগুলোকে উদ্ধৃত করে পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলাম। তার অনেকগুলো মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। সময়ের স্বল্পতা কিংবা গ্রন্থের দুঃষ্প্রাপ্যতার কারণে কোন কোনটি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থটি যেহেতু বলতে গেলে নতুন প্রয়াস তাই আমার কোন চিন্তা বিভ্রান্তির পাল্লাকে ভারী না করে সেজন্য প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপিটির কম্পিউটারে মুদ্রিত কপি বেশ কয়েকজন গবেষক আলেমকে (মতামত যাচায়ের জন্য) দেখিয়ে নিয়েছি। তাঁদের মাঝে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ্ (মুদ্দা), বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আলেম, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হযরত মাওলানা ইসমাঈল

www.eelm.weebly.com

(মুদ্দা), সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ বন্ধুবর মাওলানা ইসহাক ফরিদী, আমার এককালের ছাত্র বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত লেখক ও সাহিত্যিক গবেষক আলেম মাওলানা আবুল বাশার ও উদীয়মান লেখক ও গবেষক মাওলানা আঃ মতীন ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা পান্ডুলিপিটির প্রশংসা করেছেন। কোথাও কোথাও কিছু কিছু পরিমার্জনের পরামর্শও দিয়েছেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে বইটি ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছে। অবশ্য সকলের সব পরামর্শের সাথে আমি একমত হতে পারিনি বলে সেগুলো গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞ পাঠকের নজরে কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করতে অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়ার প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার রইল। সমূহ সমস্যা ও মুদ্রণ যন্ত্রণা পেরিয়ে বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি সে জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। মুদ্রণজনিত ত্রুটি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আশা করি সুহৃদ পাঠক তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বইটির পান্ডুলিপি তৈরী করতে বিভিন্ন জন আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে কৃতার্থ করেছেন। বিশেষ করে আমার জামাতা মাওলানা হাবীবুর রহমান ও আমার ছোট ভাই মাওলানা নজরুল ইসলাম পান্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ রিডিংয়ের কাজে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তাছাড়া জনাব ইঞ্জিনিয়ার সাইদুল ইসলাম ও এ, জেড কম্পিউটারের প্রোপ্রাইটার জনাব আবুল কালাম বানান সংশোধন ও শব্দ পরিমার্জন করে বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে সহযোগিতা করেছেন। সাল-সাবিল কম্পিউটারের তাজা প্রাণ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা আমাকে স্বীকার করতেই হয়। মাওলানা বশীর মেসবাহ বইটির প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছেন। দোয়া করি আল্লাহ্‌তাআলা সবাইকে জাগতিক ও পারলৌকিক সফলতা ও কামিয়াবী দান করুন। কওমী পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী গোলাম মোস্তফা ভাই বইটি প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বেফাকুল মাদারিস-এর মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেবের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর অবদানকে খাটো করতে চাই না। আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

বইটি দ্বারা অর্থনৈতিক বিভ্রান্তির শিকার মানবগোষ্ঠির কেউ যদি সামান্য উপকৃত হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কবুলিয়্যাত ও আখেরাতে নাজাতের প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি। -আমীন।

আবুল ফাতাহ

তাং- ৮-৭-২০০১ ঈঃ খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

www.eelm.weebly.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী আব্বা— যিনি শাসনের বেড়ি পরিয়ে আমাকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন, আজ তিনি বেঁচে থাকলে এ বই প্রথম তাঁর হাতেই তুলে দিতাম— তাঁর রফ্‌য়ে দারাজাতের উদ্দেশ্যে—

অধম লেখক

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায়
অর্থনীতির সংজ্ঞা

বিষয় — পৃষ্ঠা

✳ অর্থনীতির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ১
✳ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ৪
✳ অর্থনীতির উদ্দেশ্য ৬
✳ অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা / অর্থনীতির গুরুত্ব ৯
✳ যেসব মৌলিক সমস্যার কারণে মানুষের অর্থনীতি জানা প্রয়োজন ১১
✳ অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস ১৬
ক. ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ ১৭
খ. আধুনিক অর্থনীতির ক্রমবিকাশ ২২
✳ বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ ২৬
১. ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ ২৭
২. সমাজতন্ত্র ২৮
৩. মিশ্র অর্থনীতি ৩০
৪. ইসলামী অর্থনীতি ৩১
✳ মতবাদ সমূহের সার কথা ৩৮
✳ পুঁজিবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা ৪১
✳ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা ৪৬
✳ একটি সুষ্ঠু অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য বিষয় ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
সম্পদ ও তার প্রকারভেদ

✳ সম্পদের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ৫০
✳ সম্পদের বৈশিষ্ট্য ৫১
✳ সম্পদের প্রকারভেদ ৫২
ক. মূল্যমান বিচারে সম্পদের বিভাজন ৫২
খ. মৌলিকতার বিচারে সম্পদের বিভাজন ৫৩
গ. মালিকানার বিচারে সম্পদের বিভাজন ৫৩
ঘ. উৎপত্তিগত দিক বিচারে সম্পদের বিভাজন ৫৪
✳ প্রাকৃতিক সম্পদের বিভাজন ৫৫
১. কৃষি সম্পদ ৫৫
২. খনিজ সম্পদ ৫৮
৩. বনজ সম্পদ ৫৯
৪. প্রাণীজ সম্পদ ৬০
৫. পানি সম্পদ ৬৩
৬. শক্তি সম্পদ ৬৫
✳ সকল সম্পদই মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দান ৬৮

www.eelm.weebly.com

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

ধন-সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

১. অর্থ সম্পদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধিকরণ ৭১
ক. পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদের গুরুত্ব ও স্থান নির্ণয় ৭২
খ. সম্পদ প্রকৃতিতে সন্নিহিত আছে তবে শ্রম দিয়ে তা অর্জন করে নিতে হবে ...৭৪
গ. সম্পদ প্রয়োজনীয় তবে জীবনের পরম লক্ষ্য নয়....................৭৭
ঘ. বৈধভাবে প্রয়োজনমত সম্পদ আহরণ ও ব্যয় করা যাবে তবে তার ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা যাবে না....................৭৯
ঙ. সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দান ৮২
✳ উপরোল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের সুফল....................৮৬
২. জীবনোপকরণে সকল মানুষের সমতার নীতি ৮৮
ক. জীবনোপকরণে সমতা বলতে কি বুঝায় ৮৮
খ. জীবনোপকরণে সমতা ঃ সাম্যবাদ ও জাতীয়করণ নীতি....................৯২
৩. জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য ৯৯
ক. জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য ও তার প্রয়োজনীয়তা ৯৯
খ. জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্যের প্রয়োজন কেন? ১০২
গ. ইসলামে ধনী-গরীবের তারতম্য ও পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ১০৩
ঘ. সাম্যবাদ একটি আবেগময় শ্লোগান মাত্র....................১০৪
ঙ. ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধানের সীমা কি হবে? ১০৫
৪. সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমা মেনে চলা ১০৭
ক. জীবনোপকরণ উপার্জনের অনুপ্রেরণা....................১০৭
খ. উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি....................১০৮
১. যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে ১০৯
২. যা উপার্জন করা হবে তার উপার্জন পদ্ধতি বৈধ হতে হবে........১০৯
গ. ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি ১১৫
১. কার জন্য ব্যয় করবে....................১১৫
২. কোন খাতে ব্যয় করবে ১১৭
৩. কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে ১১৮
৫. অর্থ সম্পদ কুক্ষিগত করে না রাখার নীতি ১২২
ক. সম্পদ কুক্ষিগতকরণ বলতে কি বুঝায়....................১২২
খ. সম্পদ কুক্ষিগতকরণের অশুভ প্রভাব সমাজে ও দেশে ১২৩
গ. কুক্ষিগতকরণ প্রতিরোধে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ১২৪
৬. মূলধন ও শ্রমে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি ১২৬
শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১২৮
৭. ক্ষতিকর অর্থব্যবস্থার প্রতিরোধ....................১৩৪
ক. সমাজের মানুষের ক্ষতি করে অর্থ উপার্জন....................১৩৪
খ. সুদী লেন-দেনের প্রক্রিয়ায় উপার্জন ১৩৫
গ. ঘুষের মাধ্যমে অর্থোপার্জন ১৩৯

www.eelm.weebly.com

ঘ. ক্ষমতা ও পদের প্রভাব খাটিয়ে অর্থোপার্জন ১৪০
ঙ. প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জন....................১৪৩
চ. হারাম দ্রব্যের মূল্য ও অবৈধ কর্মের পারিশ্রামিক....................১৪৪
ছ. ওজনে কম দিয়ে অর্থোপার্জন ১৪৬
জ. চুরি, ডাকাতি ও জবর দখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন....................১৪৬
ঝ. আমানতের খিয়ানত করে সম্পদ উপার্জন....................১৪৮
ঞ. মওজুদদারী, কালবাজারী ও ভেজাল মিশ্রণ করে সম্পদ উপার্জন ...১৪৯
ট. বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন ১৫১
ঠ. জুয়া, হাউজী, লটারী, বাজি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন.....১৫৩
ড. মধ্যস্বত্ত্বভোগী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থোপার্জন....................১৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পদের মালিকানা ও তার প্রকারভেদ

* মালিকানা শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৫৯
* মালিকানার প্রকারভেদ....................১৬১
১. সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক মালিকানা ১৬২
২. রাষ্ট্রীয় মালিকানা....................১৬৬
ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রয়োজনীয়তা....................১৬৭
খ. রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রসমূহ ১৬৮
৩. ব্যক্তি মালিকানা....................১৭১
ক. ব্যক্তি মালিকানার প্রয়োজনীয়তা....................১৭১
খ. ব্যক্তি মালিকানা লাভের উপায়সমূহ....................১৭৫
১. উত্তরাধিকার....................১৭৫
২. ব্যবসা-বাণিজ্য....................১৭৭
৩. কৃষি কাজের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মালিকানা লাভ.......১৭৯
৪. অনাবাদী ভূমি আবাদ করার মাধ্যমে মালিকানা লাভ ১৮০
৫. ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমে মালিকানা লাভ ১৮১
৬. কারিগরি শিল্প ও আবিষ্কারের মাধ্যমে যে সম্পদ লাভ হয় ১৮২
৭. শ্রম বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ১৮৫
৮. পুরষ্কার হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ ১৮৬
৯. দান, হেবা, হাদিয়া-ওসিয়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ ১৮৭
১০. যাকাত ও সাদাকাহ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ ১৮৮
১১. মহর কিংবা খুলার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ ১৯০
১২. নফকাহ্ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ ১৯০
১৩. সরকারি ভূমি থেকে আহরিত সম্পদ ১৯০
১৪. রাষ্ট্রে প্রদত্ত জায়গীর ও অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ........১৯০
* ব্যক্তি মালিকানার উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও মালিকানা সীমিতকরণের অধিকার ১৯১
* ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ বা তার সীমিতকরণ কখন বৈধ হবে ১৯৪

www.eelm.weebly.com

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয় অর্থনৈতিক পরিভাষা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অভাব ঃ

✳ অভাব কাকে বলে..........২০৩
✳ অভাবের শ্রেণী বিভাগ..........২০৪
✳ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার..........২০৮

উপযোগ ঃ

✳ উপযোগ কাকে বলে..........২০৯
✳ মোট উপযোগ..........২১১
✳ প্রান্তিক উপযোগ..........২১১
✳ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য..........২১১
✳ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি..........২১২
✳ বিধিটির ব্যতিক্রম..........২১৩

ভোগ ঃ

✳ ভোগ..........২১৪

চাহিদা ঃ

✳ চাহিদা..........২১৪
✳ চাহিদা বিধি..........২১৫
✳ চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম..........২১৫
✳ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা..........২১৭

যোগান ঃ

✳ যোগান..........২১৭
✳ যোগান ও মওজুদের পার্থক্য..........২১৮
✳ যোগান বিধি..........২১৮
✳ যোগান বিধির ব্যতিক্রম..........২১৯
✳ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা..........২১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎপাদন

উৎপাদনের সংজ্ঞা..........২২১
উৎপাদনের প্রক্রিয়া..........২২২
উৎপাদনের প্রকারভেদ..........২২৩
কৃষিজাত উৎপাদন ঃ কৃষি ব্যবস্থা ও চাষাবাদ..........২২৪
✳ কৃষি কাকে বলে..........২২৪
✳ কৃষির গুরুত্ব..........২২৪

www.eelm.weebly.com

* একটি সন্দেহ ও তার নিরসন ২২৮
* কৃষকের প্রকারভেদ ২৩১
* কৃষিকাজের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান ২৩২
* বর্গাচাষ..২৩২
* বর্গাচাষ বৈধ কি না ২৩৩
* বর্গাচাষের একটি নতুন প্রক্রিয়া ২৩৯
* বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান ২৪০
* বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের বিবরণ ২৪০
* বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল ২৪৩
শিল্পজাত উৎপাদন ঃ ২৪৫
* শিল্পের প্রয়োজনীয়তা..২৪৭
* অবকাঠামোর বিচারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাজন..২৪৮
* ব্যবহারিক দিক বিচারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাজন ২৪৯
* কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ২৫০
* কৃষির উপর শিল্পের নির্ভরশীলতা..২৫০
* শিল্পের উপর কৃষির নির্ভরশীলতা..২৫১
* বাংলাদেশ ও শিল্পায়ন ২৫২
* বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদিত পণ্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান......২৫৩
* বাংলাদেশের কুটির শিল্প ২৫৭
* বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব ২৫৯
* ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থান..২৬১

সপ্তম অধ্যায়

উৎপাদনের উপকরণ

উৎপাদনের উপকরণ ২৬৩
উৎপাদনের মুনাফা বন্টন..২৬৫
* মুনাফা বন্টনের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যা ২৬৫
* মুনাফা বন্টনের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি..২৬৫
* মুনাফা বন্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ২৬৬
* একটি প্রশ্ন ও তার মিমাংসা..২৬৬
* মুনাফা বন্টনের এই নীতিগত পার্থক্যের প্রভাব ২৬৮
উৎপাদনের উপকরণ - ১ ঃ ভূমি
* ভূমির সংজ্ঞা ২৭১
* ভূমির বৈশিষ্ট্য..২৭১
* ভূমির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি..২৭২
* ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্ব ২৭৩
* ভূমির মালিকানা..২৭৪
* ভূমি ও ব্যক্তি মালিকানার ইসলামী দর্শন ২৭৪
* ভূমি মালিকানা ও মানব রচিত আইন..২৭৬

www.eelm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

✳ ভূমির স্বত্তাধিকারের ইসলামী পদ্ধতি....................................২৭৮
✳ ইসলামী রাষ্ট্রে ভূমির মালিকানা লাভের পন্থা..............................২৭৯
✳ মুসলিম নাগরিকদের ভূমি মালিকানা লাভের পন্থা........................২৭৯
✳ অমুসলিম নাগরিকদের ভূমি মালিকানা লাভের পন্থা ২৮২
✳ জমিদারী প্রথা ও ইসলাম ২৮৫
✳ ইসলামের ভূমি রাজস্ব বিধান ২৯৮
✳ উশ্‌রের বিধান ২৯৯
✳ খারাজের বিধান ৩০২
✳ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামের উদার ও সহনশীল নীতি ৩০৪
✳ বাংলাদেশের ভূমি উশরী না খারাজী ৩০৭

উৎপাদনের উপকরণ - ২ ঃ শ্রম

✳ শ্রমের সংজ্ঞা...৩০৮
✳ শ্রমের বৈশিষ্ট্য ৩০৮
✳ শ্রমের দক্ষতা ৩১০
✳ শ্রম বিভাজন ৩১১
✳ শ্রম বিভাজনের সুবিধাসমূহ ৩১২
✳ শ্রম বিভাজনের অসুবিধাসমূহ...৩১২
✳ শ্রমের ভিত্তিতে শ্রমিকের প্রকারভেদ ৩১৩
✳ শ্রমিকের মর্যাদা...৩১৩
✳ শ্রমিকের অধিকার...৩১৪
✳ শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য...৩১৮
✳ শ্রমিক–মালিক সংঘর্ষ ও তার প্রতিকার.................................৩২০
✳ শ্রমিক–মালিক যৌথ কারবার সংঘর্ষ এড়ানোর অন্যতম উপায় ৩২১

উৎপাদনের উপকরণ - ৩ ঃ মূলধন

✳ মূলধনের সংজ্ঞা ৩২৩
✳ সঞ্চয় ও তার সংজ্ঞা ৩২৩
✳ বিনিয়োগ...৩২৪
✳ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক...৩২৪
✳ মূলধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩২৫
✳ মূলধন গঠন...৩২৫
✳ মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া ৩২৬
✳ পুঁজি ও মূলধন সংগ্রহের বিকল্প ব্যবস্থা..................................৩২৮
✳ মূলধনের কার্যাবলী..৩৩১

উৎপাদনের উপকরণ - ৪ ঃ সংগঠন ও সংগঠক

✳ সংগঠন ও সংগঠক কাকে বলে? ৩৩২
✳ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংগঠন ও সংগঠকের ভূমিকা ৩৩২

অষ্টম অধ্যায়
বাজার

বাজার কাকে বলে?..৩৩৫
বাজারের শ্রেণী বিভাগ ৩৩৫

www.eelm.weebly.com

বিষয় **পৃষ্ঠা**

✳ পরিমণ্ডল ও পরিধির ভিত্তিতে বাজার ৩৩৬
  ১. স্থানীয় বাজার....................................৩৩৬
  ২. জাতীয় বাজার....................................৩৩৬
  ৩. আন্তর্জাতিক বাজার....................................৩৩৬
✳ স্থায়িত্ব কালের ভিত্তিতে বাজার....................................৩৩৬
  ১. অতি অল্পকালীন বাজার ৩৩৬
  ২. স্বল্পকালীন বাজার....................................৩৩৬
  ৩. দীর্ঘকালীন বাজার ৩৩৭
  ৪. অতিদীর্ঘকালীন বাজার ৩৩৭
✳ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ৩৩৭
  ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ৩৩৭
  ২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার....................................৩৩৭
  ৩. একচেটিয়া বাজার ৩৩৭
  ৪. একচেটিয়া ধরনের প্রতিযোগিতার বাজার ৩৩৮
✳ বিস্তৃত বাজার....................................৩৩৮
পণ্যের বাজার দর ৩৩৯

নবম অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য

✳ ব্যবসা-বাণিজ্য কাকে বলে?....................................৩৪১
✳ ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব....................................৩৪২
✳ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনার চুক্তি....................................৩৪৩
✳ ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি....................................৩৪৪
✳ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ....................................৩৪৬
✳ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ৩৪৬
  ১. এক মালিকানা কারবার ৩৪৭
  ২. দ্বি-পাক্ষিক কারবার বা মুযারাবাহ....................................৩৪৮
  ৩. অংশিদারী কারবার বা মুশারাকাহ ৩৫০
✳ অংশিদারী কারবারের শ্রেণীভেদ ৩৫০
  ক. সমঅংশিদারীত্বের ভিত্তিতে শরিকানা করবার....................................৩৫০
  খ. অসমঅংশিদারীত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার....................................৩৫০
  গ. পেশাজীবীদের শরিকানা কারবার ৩৫০
  ঘ. ব্যবসায়ী সুনামের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার....................................৩৫১
✳ অংশিদারী কারবারের সুবিধাসমূহ....................................৩৫১
✳ অংশিদারী কারবারের অসুবিধাসমূহ ৩৫১
৪. যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানী ৩৫২
  ✳ কোম্পানী ও শিরকাতের মাঝে পার্থক্য ৩৫৩
  ✳ শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানীর বৈধতা....................................৩৫৫

www.eelm.weebly.com

ক. কোম্পানীর আইনগত সত্তার বিষয় ৩৫৬
খ. দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয় ৩৫৭
✳ কোম্পানী গঠন পদ্ধতি ৩৬০
✳ কোম্পানীর পুঁজি গঠন ৩৬১
✳ কোম্পানীর প্রকার ভেদ ৩৬৪
✳ কোম্পানীর লিমিটেড হওয়ার অর্থ ৩৬৪
✳ কোম্পানীর ফাণ্ড সংগ্রহের আরো কতিপয় পদ্ধতি ৩৬৫
✳ কোম্পানী গঠন ও মূলধন সংগ্রহের বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৬৭
✳ শেয়ার বাজার ও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ৩৬৮
✳ শেয়ারের দাম হ্রাস-বৃদ্ধির রহস্য ৩৭০
✳ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি ৩৭১
✳ শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ৩৭৩
✳ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার শর্ত ৩৭৫
✳ কোম্পানীর লভ্যাংশ বিতরণ ৩৮৩
✳ শেয়ারের যাকাতের বিধান ৩৮৫
ব্যবসায়ী মুনাফা ও সুদ
✳ সুদের সংজ্ঞা ও মুনাফার সংজ্ঞা ৩৮৭
✳ সুদ ও মুনাফার পার্থক্য ৩৮৭

দশম অধ্যায়

মুদ্রা

✳ মুদ্রার সংজ্ঞা ৩৯৪
✳ মুদ্রা ও কারেন্সির পার্থক্য ৩৯৫
✳ মুদ্রার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ৩৯৫
✳ মুদ্রা বাজার ৩৯৯
✳ আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা ৪০১
১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (G,A,T,T) ৪০১
২. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (I,M,F) ৪০২
৩. বিশ্ব ব্যাংক (I,D,P,O) ৪০৩
✳ কাগজী মুদ্রা বিনিময়ের শরয়ী বিধান ৪০৬
✳ মূল্যসূচক ঃ মুদ্রা স্ফীতি ও মুদ্রামান হ্রাসের রহস্য ৪১৪
✳ মুদ্রার মূল্যসূচক ৪১৫
✳ মূল্যসূচক কতটা নির্ভরযোগ্য ৪১৬
✳ পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল্যসূচকের প্রয়োগ বৈধ কি না? ৪১৭
✳ হুন্ডি বা নগদ বাকীতে মুদ্রার লেনদেন ৪২৩
✳ হুন্ডি কাকে বলে? ৪২৩
✳ হুন্ডি ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ৪২৪

www.eelm.weebly.com

একাদশ অধ্যায়

ব্যাংক

বিষয় — **পৃষ্ঠা**

✳ ব্যাংকের সংজ্ঞা ৪৩৫
✳ ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ৪৩৫
✳ ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ......................................৪৩৬
✳ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা...৪৩৮
✳ ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ..৪৪২
✳ ব্যাংকের কার্যাবলী..৪৪৪
১. আমানত গ্রহণ ৪৪৪
২. [illegible] ....[illegible]
৩. আমদানি ও রফতানি খাতে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা ৪৪৯
৪. মুদ্রা বিনিময় ও বিলবাট্টাকরণ .:.......................................৪৫২
৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি ৪৫৩
✳ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তার দায় দায়িত্ব.....:.....................................৪৫৪
✳ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করে ৪৫৬
সুদ মুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার স্বরূপ
✳ সুদ মুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা বনাম ইসলামী অর্থনীতি ঃ
দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি সমস্যা ৪৫৮
✳ সুদী ব্যাংকের বিকল্প..৪৬০
১. আমানত গ্রহণ (ইসলামী পদ্ধতিতে) ৪৬০
২. বিনিয়োগ (ইসলামী পদ্ধতিতে)...৪৬৩
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা (ইসলামী পদ্ধতিতে) ৪৭২
৪. মুদ্রা বিনিময় ও বিল বাট্টাকরণ (ইসলামী পদ্ধতিতে) ৪৭৭
৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি (ইসলামী পদ্ধতিতে).................৪৭৭
✳ ঋণ নিয়ে যথা সময়ে আদায় না করলে ইসলামী ব্যাংকের করণীয়.........৪৭৭
✳ যথাসময়ের পূর্বে ঋণ আদায় করে দিলে বিশেষ রেয়ায়েতের সুবিধা.......৪৮০

দ্বাদশ অধ্যায়

বীমা

✳ বীমার সংজ্ঞা ৪৮১
✳ বীমার শ্রেণীভেদ ৪৮১
১. দ্রব্যসামগ্রীর বিপরীতে বীমা ৪৮১
২. দায়-দায়িত্বের বিপরীতে বীমা...৪৮২
৩. জীবন বীমা ৪৮২
✳ বীমা কোম্পানীর শ্রেণীভেদ ৪৮৩
১. কমার্শিয়াল বীমা কোম্পানী ৪৮৩
২. গ্রুপ ইন্সুরেন্স কোম্পানী...৪৮৩
৩. পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা কোম্পানী ৪৮৪
✳ বীমার সুফল ও কুফল..৪৮৪

www.eelm.weebly.com

বিষয় পৃষ্ঠা

১. বীমার সুফল ৪৮৪
২. বীমার কুফল ৪৮৫
এক ঃ দ্বীনি ক্ষতি ৪৮৬
দুই ঃ অর্থনৈতিক ক্ষতি ৪৮৭
তিন ঃ বীমার নৈতিক ক্ষতি ৪৮৮
চার ঃ বীমার সামাজিক ক্ষতি ৪৮৯
* শরীয়তের দৃষ্টিতে বীমা ৪৯০
* বীমার বিকল্প ৪৯৩
* শিল্প কারখানা ভিত্তিক সহযোগিতা সংস্থার রূপরেখা..৪৯৫
* ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সহযোগিতা বীমার রূপরেখা..৪৯৭
* কৃষি ভিত্তিক পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার রূপরেখা ৪৯৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

* রাষ্ট্র ও তার দায়-দায়িত্ব ৫০১
* রাষ্ট্রীর আয়ের খাতসমূহ ৫০৩
১. রাজস্ব..৫০৩
ক. ভূমি রাজস্ব ৫০৪
খ. অন্যান্য রাজস্ব (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত) ৫০৪
১. ব্যবসায়ী শুল্ক বা ৫০৪
২. বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ..৫০৬
* গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ..৫০৬
* খনিজ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ৫০৭
* রিকায বা গুপ্ত ধনের এক পঞ্চমাংশ ৫১০
* সামুদ্রিক সম্পদের এক পঞ্চমাংশ..৫১১
৩. জিযিয়া..৫১১
গ. অতিরিক্ত কর (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়) ৫১৩
২. রাষ্ট্রীয় সম্পদের আয় ৫১৫
৩. ফাই ৫১৬
৪. যাকাত..৫১৭
৫. সাদাকাত ৫১৯
৬. আনওয়ালে ফাযেলা..৫২০
৭. ওয়াক্‌ফ সম্পদের আয় ৫২০
৮. ঋণ গ্রহণ..৫২০
৯. বৈদেশিক সাহায্য..৫২০
* রাষ্ট্রীয় ব্যয়..৫২১
* রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকারভেদ..৫২১
* কোন খাতের আয় কোথায় ব্যয় করা হবে? ৫২১
* বায়তুল মাল বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৫২৩
* গ্রন্থ পঞ্জি..৫২৪

www.eelm.weebly.com

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতির সংজ্ঞা

আভিধানিক সংজ্ঞা ঃ অর্থনীতির আভিধানিক অর্থ হল অর্থ সংক্রান্ত বিধি-বিধান। অর্থনীতি আরবী النظام الاقتصادي -এর প্রতি শব্দ। قصد "কসদুন" মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। قصد (কস্‌দ) বা اقتصاد -এর আভিধানিক অর্থ হল রুচিসম্মত চালচলন, মধ্যমপন্থা বা মধ্যম পদ্ধতি। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় জীবন যাপণের পদ্ধতি ও পন্থা নির্দেশ করে, এজন্য একে النظام الاقتصادي বলে নামকরণ করা হয়েছে।

অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Economics (ইকোনোমিক্‌স)। মূলতঃ গ্রীক শব্দ Oikonomia (ঐকোনোমিয়া) থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ হল 'গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনা'। মনে করা হয় যে, প্রাচীন কালে গ্রীক দেশে অর্থনীতির প্রথম সূচনা হয় গৃহস্থলীন ব্যবস্থাপনার সীমিত পরিসর থেকে। তাই তখন একে Oikonomia বা Economics নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র যেহেতু সে কালের গৃহস্থলীন ব্যস্থাপনারই সম্প্রসারিত রূপ তাই অর্থশাস্ত্রকে Economics নামেই অভিহিত করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ অর্থনীতির পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। অর্থনীতির বিদগ্ধ গবেষক আল্লামা হিফজুর রহমান সিওহারভী (রাহ.) অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "অর্থনীতি এমন এক শাস্ত্র যা অধ্যয়ন করলে এমন সব নীতিমালা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যা সম্পদ আহরণ ও ব্যায়ের যথার্থ পন্থা ও সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, সম্পদ বিনষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালার শুদ্ধশুদ্ধি যাচাইয়ের প্রজ্ঞা দান করে।"

ডঃ আব্দুল্লাহ মুহ্‌সিন আত্‌তরিকী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন—

هوالعلم بالاحكام الشرعية العلمية عن ادلتهاالتفصيلية فيما ينظم كسب المال و انفاقه واوجه تنميته

অর্থাৎ যে বিদ্যা অর্জন করলে সম্পদ উপার্জন ও তা ব্যায় এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে শরীয়তের বিধি—বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে অর্থনীতি বলে।

www.eelm.weebly.com

প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ মাওঃ আব্দুর রহীম অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "মানুষের জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তা পূরণ করার উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে যে সমাজ বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় তার নাম অর্থনীতি"।

পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরাও অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল একে 'গৃহপরিচালনার বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ও সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের ধ্যান ধারণায় যথেষ্ট পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা ও মূল্যবোধেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এ কারণে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও ক্রম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেছেন এবং এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে"। এই সংজ্ঞার সার কথা হল সমাজে সম্পদ কি ভাবে উৎপন্ন হয় এবং কি ভাবে তা ব্যবহৃত হয় এর আলোচনার মাঝেই অর্থনীতি সীমাবদ্ধ।

পরবর্তী কালে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, "অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে"। এ সংজ্ঞার সার কথা এই যে, শুধুমাত্র সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়েই নয় বরং সম্পদকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে যে কার্যাবলী সম্পাদিত হয় সেগুলোও অর্থনীতির আওতাভুক্ত।

আধুনিক কালের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'লায়নেল রবিন্‌স' অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহার যোগ্য অপ্রতুল সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধনকারী মানুষের আচরণকে বিশ্লেষণ করে।"

তার এই সংজ্ঞার সার কথা এই যে, মানুষের জীবনে অভাব সীমাহীন। কিন্তু এই অভাব পুরণের জন্য মানুষ কর্তৃক আহরিত ব্যবহার যোগ্য সম্পদ সে তুলনায় অপ্রতুল ও সীমিত। সুতরাং এই সীমিত সম্পদকে কিভাবে ব্যবহার করে মানুষ তার সীমাহীন অভাবকে পুরণ করতে পারে এটিই অর্থনীতির মুল প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা সমূহকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, অভাব ও তৃপ্তি লাভের প্রয়োজনীয় উপকরণ

www.eelm.weebly.com

গুলোর স্বল্পতা থেকেই মানবজীবনে অর্থনৈতিক সংকটের উৎপত্তি ঘটেছে। মানুষের জীবনে প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। একটা প্রয়োজন পূর্ণ হলে আরেকটা প্রয়োজন এসে দেখা দেয়। এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই মানুষ ছুটে চলে অহর্নিশ। বস্তুতঃ এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদই পৃথিবীর চাকাকে সচল করে রেখেছে, জীবনকে করে রেখেছে সক্রিয় ও গতিশীল। পৃথিবীর অধিকাংশ কর্মকান্ডের মূলে কাজ করে এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদ। যদি অভাব পূরণের উপকরণ গুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প না হত, আর চাহিবা মাত্রই যদি সকল আকাংখা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করা সম্ভব হত এবং মানুষের সকল চাহিদার নিবৃত্তি ঘটত তাহলে মানব জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি হত না; আর অর্থ শাস্ত্রের উদ্ভবও ঘটত না। ইসলাম এই সত্যকে অস্বীকার করে না। তবে এই প্রয়োজন ও চাহিদাকে ইসলাম অপরিহার্যতার গন্ডিতে সীমিত করে দেয়। চাহিদাকে বল্গাহীন করে দিয়ে সীমিত সম্পদের মাধ্যমে তা পূরণের চেষ্টাকে ইসলাম ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বলে মনে করে। তাই নির্দিষ্ট কতিপয় বিধি-বিধানের আওতায় ইসলাম মানুষের জীবনের প্রয়োজনকে সীমিত করে দিয়েছে। আর সীমিত সম্পদ দিয়ে সেই সীমিত প্রয়োজনকে পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা হওয়া উচিত নিম্নরূপঃ

'জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন সমূহকে নিরূপণ এবং তা পূরণের জন্য খোদা প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহারের শরীয়ত সম্মত বৈধ পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ সহকারে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলে'।

উল্লেখিত সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ঃ

সংজ্ঞায় উল্লেখিত **'অপরিহার্য প্রয়োজন'** শব্দটি দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের জীবনে সাধারণত ঃ দুই ধরনের প্রয়োজন থাকে। যথাঃ

১. আত্মিক প্রয়োজন

২. জৈবিক প্রয়োজন

মূলতঃ উভয় প্রকার প্রয়োজন পূরণের জন্যই অর্থ সম্পদের প্রয়োজন হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। গুরুত্বের বিচারে মানব জীবনের প্রয়োজন সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. অপরিহার্য প্রয়োজন

২. আরাম-প্রিয়তা জনিত প্রয়োজন

৩. ভোগ-বিনোদন ও বিলাস জনিত প্রয়োজন।

ইসলামী অর্থনীতি মৌলিক ভাবে মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন সমূহকে পূরণ

www.eelm.weebly.com

করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আরাম-প্রিয়তা জনিত প্রয়োজন ও ভোগ বিনোদন মূলক প্রয়োজনকে এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কেননা এতে প্রয়োজনের পরিধি অতিবিস্তৃত হয়ে পড়ে। সীমিত সম্পদ দিয়ে যা পূরণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

'সম্পদের ব্যবহার' ঃ সম্পদের ব্যবহার বলতে সরাসরি সম্পদ ব্যবহার করে প্রয়োজন পূরণ করা কিংবা সম্পদের লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তা দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করা উভয় দিককেই বুঝানো হয়েছে।

'শরীয়ত সম্মত পন্থা' ঃ শরীয়ত সম্মত পন্থা বলতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালাকে বুঝানো হয়েছে। এতে সম্পদের হিফাজত ও সংরক্ষণের দিকটিও নিহিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদের অপচয় ও ধবংস সাধন বৈধ নয়।

'বৈধ পন্থা ও পদ্ধতি' ঃ বৈধ পন্থা ও পদ্ধতি বলতে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত পন্থা ও পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে। অতএব শরীয়ত যেসব পন্থা ও পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তা ইসলামী অর্থনীতির অর্ন্তভূক্ত নয়। যদিও সম্পদের সংরক্ষণ, হিফাজত ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রশ্নে অবৈধ পন্থা ও পদ্ধতির আলোচনা করা হয়ে থাকে; তবে সেটি ইসলামী অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত নয়।

অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়

সংক্ষেপে বলা যায় সমাজের মানুষের প্রয়োজন সমূহ বিশ্লেষণ করতঃ সেই প্রয়োজন পূরণের বৈধ পন্থা ও সুষ্ঠু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

অবশ্য অর্থনীতির বিষয়বস্তু ক্রমবর্ধমান। কেননা অর্থনীতির বিষয়টি কালে খুবই সীমিত ছিল। ক্রমে ক্রমে তা প্রসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, অর্থনীতির প্রথম চর্চা শুরু হয় গ্রীক দেশে। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল অর্থনীতিকে গৃহ পরিচালনার বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছিলেন। মনে হয় সে সময় অর্থনীতির বিষয়টি গৃহ পরিচালনার পরিসরে সীমিত ছিল। পরে তা বিকশিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এদিকে প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ সর্ব প্রথম এই শাস্ত্রকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে আখ্যায়িত করেন। তার মতে 'অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতি সমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে'। এ থেকে বুঝা যায় যে, সামাজে কিভাবে সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং কিভাবে তা ব্যবহৃত হয় তাই অর্থনীতির প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। তারও পরবর্তী কালে অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল

www.eelm.weebly.com

অর্থনীতির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, 'অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে'। এ থেকে বুঝা যায় যে, অর্থকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে যে সব কার্যাবলি সম্পাদিত হয় এর সবই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সুতারং বলা যায় যে অর্থনীতি ক্রম-প্রসারমান একটি বিষয় এবং এর বিষয় বস্তুও ক্রম-প্রসারমান।

বর্তমান পর্যন্ত অর্থনীতির পরিধি যতটুকু প্রসারিত হয়েছে সে নিরিখে অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক দিকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১. অর্থনীতি সমাজ বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যায় সংক্রান্ত যে সব কাজকর্ম করে সে গুলো অবশ্যই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। পিতা কর্তৃক সন্তানকে স্নেহ করা ও যত্ন নেওয়া যেহেতু অর্থ উপার্জনের জন্য নয় তাই তা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে হাসপাতালের নার্সের সেবা যত্নের পিছনে যেহেতু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যই কাজ করে সুতরাং তা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত বটে। এজন্যই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ানক্রস বলেছেন যে, মানুষের কার্যাবলির যে অংশ অর্থের সঙ্গে জড়িত মূলতঃ তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

২. মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য সম্পদের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। তাই সম্পদ উপার্জন ও তার ব্যবহারের নিয়মনীতি অর্থনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

৩. সম্পদ সীমিত অথচ মানুষের চাহিদা অসীম। তাই এই সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণের বস্তুনিষ্ট প্রক্রিয়া কি হবে এবং কিভাবে মানুষ সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে পারবে তা নিয়ে আলোচনা করা অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য বটে।

৪. মানুষের অভাব ও চাহিদা পূরণের সঙ্গে উৎপাদন, লেন-দেন, পণ্যের বিনিময়, সুষ্ঠু বন্টন ও ভোগের প্রশ্ন বিশেষ ভাবে জড়িত। আর এ লেনদেনের সাথে মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সরকারের বাণিজ্যনীতি ও আয়-ব্যায়ের প্রশ্ন ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত। এ কারণে অর্থনীতি এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

৫. অর্থনীতি মানব কল্যাণের বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। কেননা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজ সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করতে পারে এটিই অর্থনীতির লক্ষ্য। তাছাড়া মানুষের কাজের ভাল-মন্দের দিক নিয়েও অর্থনীতি আলোচনা করে।

৬. মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি চিহ্নিত করতঃ তা সমাধানের সঠিক দিক নির্দেশনাও প্রদান করে।

www.eelm.weebly.com

৭. সম্পদের সংরক্ষণ, হিফাজত ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কেও অর্থনীতি আলোচনা করে।

৮. সম্পদের ক্ষতির দিকগুলো নিয়েও অর্থনীতি আলোচনা করে যেমনঃ মাদক দ্রব্য, ক্ষতিকর ঔষধ, হারাম খাদ্য ইত্যাদি।

৯. সম্পদের জরিপ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে, সুতারং এটিও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত বটে।

উপসংহারে বলা যায় যে, মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য চেষ্টা-সাধণা, অর্থনৈতিক সম্পদের উৎপাদন এবং তার ব্যয়-বন্টনের সুষ্ঠু নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করাই অর্থনীতির উপজীব্য।

অর্থনীতির উদ্দেশ্য

সম্পদ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদানের মাধ্যমে একটি কল্যাণধর্মী ইনসাফপূর্ণ সুষম অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতঃ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সার্বজনীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনের প্রচেষ্টা করা।

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ঃ 'সুষ্ঠু ব্যবহার বিধি' আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ভূ-পৃষ্ঠের অফুরন্ত সম্পদরাজি মহান রাব্বুল আলামীনের অবারিত অফুরন্ত দান। পৃথিবীর মানুষের জীবন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মানসেই এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করবে, জীবন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে-যাতে জীবন হয়ে উঠে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের পথ হয় সহজগম্য; এটাই স্রষ্টার উদ্দেশ্য। ইরশাদ হয়েছে–

انا جعلنا ما على الارض زينةً لهالنبلوهم ايهم احسن عملاً

আমি ভূপৃষ্ঠে যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা এরই সৌন্দর্য বিধানের জন্য, যাতে আমি পরীক্ষা করতে পারি কে উত্তম আমল করে। - সূরা ঃ কাহাফ ঃ ৭

আরো ইরশাদ হয়েছে-

هو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما اتاكم–

তিনিই তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন এবং কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদাগত প্রাধান্য দিয়েছেন, যাতে তিনি যা কিছু দিয়েছেন তার ব্যপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। - সূরা ঃ আন্'আম ঃ ১৬৫

সুতরাং এই সম্পদের ব্যবহার-বিধি কি হবে তা অবশ্যই সম্পদদাতা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার-বিধি বলতে স্রষ্টা প্রদত্ত্ব ঐ বিধানকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা সম্পদদাতার ইচ্ছার বিপরীতে যে বিধান হবে তা অবশ্যই সুষ্ঠু বিধান হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

সুষম অর্থ ব্যবস্থা ঃ সুষম অর্থব্যবস্থা বলতে এমন অর্থব্যবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে যেখানে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান আকাশ-পাতালের ন্যায় হবে না। অন্যথায় সকলের সম্পদ সমান হবে এ কথা অবশ্যই নয়। কেননা সম্পদের পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক বিষয় এবং তা কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত। ইরশাদ হয়েছে-

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق

অর্থ্যাৎ আমি জীবনোপকরণে তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সূরা ঃ ১৬ঃ৭১

সমাজের কতিপয় সদস্য অবশ্যই সম্পদশালী থাকবে, তবে তাদের সম্পদ যেন অন্যের দারিদ্রের কারণ না হয় বরং অধিক উপার্জনকারী সদস্য হিসাবে তার উপর অধিক ব্যয়ের বিধান থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমষ্টি মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হতে হবে। অবশ্য সমাজতন্ত্র সম্পদের ক্ষেত্রে সকলের সমতার প্রবক্তা যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

'সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণ' ঃ সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের কথা বলে প্রত্যেকের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ও অভাব সমূহ পূরণের বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় মানুষের বল্গাহীন অসীম চাহিদা পূরণের মত পর্যাপ্ত সম্পদ পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব হবে না। কেননা মানুষের আহরিত সম্পদ সব সময় সীমিত। রাসুল (সা.) তাই বলেছেন- 'কবরের মাটি ছাড়া তার অভাব পূরণ হবে না'।

'সার্বজনীন কল্যাণ অর্জন' ঃ সার্বজনীন কল্যাণ অর্জনের অর্থ, এই অর্থব্যবস্থার মূল দৃষ্টিভঙ্গি অধিক লাভ কিংবা অধিক মুনাফা অর্জন নয় বরং সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং সার্বজনীন সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

'সামগ্রিক কল্যাণ লাভ' ঃ সামগ্রিক কল্যাণ লাভের অর্থ, এই অর্থব্যবস্থা শুধুমাত্র মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করবে না বরং মানুষের নৈতিক চরিত্র, আত্মিক উৎকর্ষ ও পারলৌকিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াস গ্রহণ করবে।

অবশ্য আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অনেকেই শুধুমাত্র জাগতিক কল্যাণকেই অর্থনীতির উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'জেমস স্টুয়ার্ড' অর্থনীতির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "এ শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য উপার্জন-উপায়ের সন্ধান করে"।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস প্রায় এরই কাছাকাছি উক্তি করেছেন। তারমতে- "সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাদিক প্রয়োজন অনুপাতে পণ্যের

উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যের সুবিচারপূর্ণ বন্টন, উৎপাদনের উপায় উপকরণ অনুসন্ধান এবং তার যথার্থ বন্টনের ন্যায়নীতি সম্পন্ন পন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করাই হচ্ছে অর্থনীতির কাজ"। অবশ্য কেয়ার্ন ক্রসের বক্তব্যে ন্যায়নীতি ও ইনাসাফের সুর অনুরণিত হয়েছে।

মার্শালও অর্থনীতির কেবল জাগতিক উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করেছে। তার ভাষায় – "অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র। মানুষ কিভাবে আয় উপার্জন করবে এবং উপার্জিত আয় কিভাবে ব্যায় করবে অর্থনীতি তারই নির্দেশ দেয়"।

অবশ্য অনেক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ মানব কল্যাণকেও অর্থনীতির উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন এল, এম, ফ্রলার বলেছেন – "অর্থনীতির পরিধি অতিশয় বিশাল ও বিস্তৃত। বস্তুতঃ মানবজীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের নামই অর্থনীতি এবং মানুষের কল্যাণ সাধন ব্যতীত এর অন্য কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না"।

আর, টি, ইলেও মানব কল্যাণকে অর্থনীতির উদ্দেশ্যর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তার মতে- "অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান যা মানবজীবনের অসীম বৈচিত্রময় দিক ও বিভাগ সমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এশাস্ত্র কেবল সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলিত চিন্তারই আবেদন জানায় না বরং মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে এবং বাস্তব জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে অসাধারণ ভাবে সম্প্রসারিত করতেও একান্ত সচেষ্ট"।

অবশ্য অনেকেই নৈতিক দিককে অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করেছেন। যেমন – হাউয়েরী বলেছেন যে, "অর্থনীতিকে চরিত্র নীতি থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলেই এ বিজ্ঞান উদ্দেশ্যের ব্যপারে কোন দিনই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। কেননা মানুষ মানুষ হিসাবে জীবনের উদ্দেশ্য ও তা সাধনের উপায় পদ্ধতির উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে"। অর্থাৎ সকলের উদ্দেশ্য এক নয়, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে এবং প্রত্যেকের বেলায় সে উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন থাকতে পারে।

সার কথা আধুনিক অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির উদ্দেশ্যকে জাগতিক সমৃদ্ধি, ন্যায়নীতি, মানব কল্যাণ ও নৈতিক চরিত্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত করলেও পারলৌকিক কল্যাণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন নি। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এসব কিছুর সঙ্গে পারলৌকিক কল্যাণের প্রশ্নকেও বড় করে দেখেছে। আর এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। কেননা আধুনিক অর্থনীতিবিদরা সুশৃংখল ভাবে জাগতিক সমৃদ্ধির প্রশ্নকেই বড় করে দেখেছেন। আর ইসলামী অর্থনীতি পরলৌকিক কল্যাণের প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য রেখে জাগতিক সমৃদ্ধি যতটা অর্জন করা সম্ভব শুধুমাত্র ততটুকু সমৃদ্ধিরই অনুমতি দিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা/অর্থনীতির গুরুত্ব

মানুষের জীবন ধারণের জন্য যেমন সম্পদ অপরিহার্য তেমনি সম্পদের লেন-দেনের জন্য অর্থনৈতিক জ্ঞান লাভও একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু সুখের কথা এই যে, মানুষ প্রাত্যহিক জীবন ধারণের জন্য যে লেন-দেনের মুখোমুখি হয়, তার জ্ঞান মানুষ কথা বলার অভ্যাসের ন্যায় আপনা আপনিই আয়ত্ব করে ফেলে। এজন্য পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। ব্যবহারিক অর্থনীতির জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে অর্থনীতির পণ্ডিত ব্যক্তিদের চেয়েও সাধারণ মানুষের বেশী থাকে। মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে বিবেক নামক যে সাধারণ জ্ঞানটুকু দান করেছেন, পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন সম্ভব না হলে তা দিয়েই মানুষ কোন মতে পৃথিবীর জীবন পাড়ি দিতে সক্ষম। তবে পুঁথিগত বিদ্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সুবিন্যস্ত প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য দান করে। এসব জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষ বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। আধুনিক কালে যেহেতু অর্থনীতি জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপৃত হতে চলেছে সুতরাং জীবন সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যই নয় বরং এই জ্ঞান আমাদের বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে থাকে। নিম্নে এধরণের কতিপয় ক্ষেত্রের উল্লেখ করা গেল।

১. দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ঃ দৈনন্দিন জীবনে অসীম অভাব ও চাহিদার মুখোমুখি হয় মানুষ। আহরিত সম্পদ সীমিত বিধায় এই অভাব ও চাহিদা গুলোর মাঝে সম্পদের অনুপাতে কোন্ কোন্ চাহিদা ও অভাবগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে; অর্থনীতি পাঠের দ্বারা এসম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়।

২. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঃ অর্থনীতি পাঠের দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। সীমিত সম্পদকে কি ভাবে ব্যবহার করলে অধিক উৎপাদন সম্ভব হবে, এবং অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে; অর্থনীতি পাঠের দ্বারা তাও জানা যায়।

৩. ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদরে ক্ষেত্রে ঃ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা, যোগান, মূল্য নির্ধারণ, ঝুঁকি গ্রহণ এবং বাজারজাত করণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। অনেক সময় এসব বিষয়ে জটিলতাও দেখা দেয়। অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে সেই সূত্র প্রয়োগ করে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এই সমস্যার সমাধান সহজে করতে পারেন এবং ব্যবসা কিংবা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

৪. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঃ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সুতরাং রাষ্ট্রের নির্বাহী দায়ীত্বশীলদের অবশ্যই রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়, কর ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সুতরাং বুঝাই যায় যে, অর্থনীতির জ্ঞান সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সহায়তা করে থাকে।

৫. সামাজিক কর্মকান্ডে ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ঃ যারা সমাজের সেবা করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই সমাজের সমস্যাগুলো নিরূপণ করতে হবে এবং তা সমাধানে ব্রতী হতে হবে। সমাজের বেশ কিছু জটিলতার মূলে কাজ করে অর্থনৈতিক সমস্যা। যেমন দারিদ্রজনিত কলহ, বেকারত্ব, অশিক্ষাজনিত জটিলতা, কর্মসংস্থান ও চিকিৎসার অভাবজনিত জটিলতা ইত্যাদি। এই জটিলতা সমূহের নিরসন করতে হলে অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঃ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এবং তা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহ, রাষ্ট্রের মওজুদ, বিনিয়োগযোগ্য মূলধন, সম্পদের পরিমাণ এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন সমস্যাটি আগে নিরসন করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। এগুলো জানতে হলে অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে।

৭. আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঃ আন্তর্জাতিক লেনদেন করতে হলে বিভিন্ন দেশের সম্পদের সঞ্চয়ের পরিমাণ, মুদ্রামান, আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা, পরিবহন সুবিধাদির বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। আর এজন্য অর্থনীতির জ্ঞান আবশ্যক।

৮. নাগরিক গুনাবলী অর্জনের জন্য ঃ সুনাগরিকের গুনাবলী অর্জনের জন্যও অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেননা অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককেই অপরের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন যাপণ করতে হবে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা থাকলেই এটা সম্ভব। তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার আদায়ের জন্যও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথা জানা থাকতে হবে।

সারকথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জ্ঞানের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি অর্থনীতি পাঠেরও প্রয়োজন রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করার আগেও পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আঞ্জাম পেয়েছে। জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ স্রষ্টা প্রদত্ত বিবেককে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে। অবশ্য আধুনিক কালে অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম বহুগুণে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সে জন্য এ বিষয়ে পুঁথিগত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে যে অর্থসর্বস্ব এক মানসিকতা গড়ে উঠছে; তা অতীতের কোন কালেই ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পৃথিবী ব্যাপী অর্থনীতিকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যেন অর্থ ব্যবস্থাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে অর্থ উপার্জন ও সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতা শনৈ শনৈ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে এমন এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা জন্ম দিচ্ছে যা মানুষকে পশুবৎ করে তুলছে। এর প্রভাবে ক্রমান্বয়ে মানুষের মধ্যকার মানবীয় গুনাবলী, নৈতিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি অর্জনের মানসিকতা হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় চলে আসছে। আর সম্পদ আহরণের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেহেতু পৃথিবীর সম্পদ সীমিত সুতরাং এই মানসিকতা অর্থনৈতিক সংকটকে ক্রমান্বয়ে আরো জটিলতর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। সম্পদ আহরণের জন্য শুরু হয়েছে এক দুর্দন্ড প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা মানুষকে পশুবৎ হিংস্র করে তুলছে। ধোঁকা ও প্রতারণার নতুন নতুন পন্থার উদ্ভব ঘটছে। এটি আগামী পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য এক বিরাট অশনি সংকেত। অথচ এই ধাপাধাপিতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন আরও ধ্বংসোন্মুখ হচ্ছে। আর সম্পদ চলে যাচ্ছে গুটি কতেক বুদ্ধিপিশাচ অর্থগৃধ্নুর হাতে। এটি পৃথিবীতে আরো একটি নতুন বিপর্যয় ডেকে আনবে। পৃথিবী ব্যাপী শুরু হবে আরেক ধরণের হাহাকার। যেখানে সম্পদ থাকবে কিন্তু অভাব বেড়ে যাবে বহু গুণ। রাসুল (সাঃ) কি সুন্দর বলেছেন - حب الدنيا رأس كل خطية দুনিয়া ও পার্থিব জীবনের আসক্তি সমস্ত অনাচারের মূল।

এ জন্যই ইসলাম অর্থসর্বস্ব এহেন মানসিকতা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত রাখতে চেয়েছে। পার্থিব জীবনের আসক্তি থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আর পৃথিবীর সম্পদ থেকে নিদেনপক্ষে যা প্রয়োজন তা নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। এই মনমানসিকতার আলোকে পৃথিবী গড়ে উঠলেই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণ করা ও মানুষকে তৃপ্ত করা সম্ভব। অপর পক্ষ্যে চাহিদার লাগামকে বল্গাহীন করে দিলে এবং সম্পদসর্বস্ব মানসিকতাকে উস্কানোর ইন্ধন যোগানো হলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নতুন ধরণের এক চরম হাহাকার। পৃথিবীর পরিবেশ হয়ে উঠবে বিষাক্ত ও আত্মঘাতি।

যেসব মৌলিক সমস্যার কারণে মানুষের অর্থনীতি জানা প্রয়োজন

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে যা নিরসনের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ-

www.eelm.weebly.com

১. সম্পদের স্বল্পতার সমস্যা ঃ মানুষের অবাধ চাহিদার তুলনায় সম্পদ সব সময় অপ্রতুল। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই এ অপ্রতুলতা বিদ্যমান। যদি মানুষের চাহিদাকে সীমিত করা যেত কিংবা সম্পদের এমন প্রাচুর্য ঘটানো সম্ভব হত যাতে মানুষের চাহিদা নিবৃত্ত হয়ে যায় কিংবা মন যা চায় যদি মানুষ তাই করতে পারত তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকট সৃষ্টিই হতনা। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, মানুষের বল্গাহীন চাহিদা ও সেই চাহিদার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতা থেকেই অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার উদ্ভব। যদি মানুষ নিজে থেকে চাহিদার পরিধিকে সম্প্রসারিত না করত তাহলে সম্পদের সংকট কখনই হত না। ইরশাদ হয়েছে- ظهر الفساد في البرو البحر بماكسبت ايدي الناس

জলে স্থলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মানুষের সহস্তের উপার্জন।সূরা ঃ রুম-৪১

২. অভাব নির্বাচনের সমস্যা ঃ যেহেতু চাহিদার তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল। এ কারণে একই সময়ে মানুষ তার সব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এ কারণেই চাহিদা গুলোর গুরুত্বের বিবেচনায় কোন্ গুলো আগে পূরণ করতে হবে সে ব্যপারে মানুষকে চিন্তা করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ অভাব ও চাহিদা গুলো নির্বাচন করে তা আগে পূরণ করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে অভাবের নির্বাচন বা বাছাই করা একটি মৌলিক সমস্যা রূপে দেখা দেয়। অবশ্য যদি কেবল মৌলিক চাহিদা গুলো পূরণ করেই মানুষ ক্ষান্ত হয়ে যেত, আর সম্পদের সুষ্ঠু ব্যাবহার করা হত, তাহলে মানুষের অর্থনৈতিক সংকট অনেকাংশেই কেটে যেত। মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার মত সম্পদের সমাহার এই ভূপৃষ্ঠে ঘটিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

انا كل شئى خلقناه بقد 'আমি সব কিছু যথার্থ পরিমাণ সৃষ্টি করেছি।' সুতরাং স্বভাবজাত চাহিদার বাইরে মানুষ নিজে থেকে যে সব চাহিদা সৃষ্টি করেছে এগুলোই মূলতঃ অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। তাই চাহিদাগুলোর মাঝে কোন গুলো মৌলিক তা নির্বাচন করেই মানুষকে অগ্রসর হতে হবে।

৩. সম্পদের সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ব্যবহারের সমস্য. ঃ যেহেতু মানুষের অবাদ চাহিদার তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল তাই প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার যাতে হয় এর প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যাতে সম্পদের অপচয় না হয় অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যায় না হয়, এবং অবৈধ হস্তক্ষেপ দ্বারা সম্পদের আবর্তনে জটিলতা সৃষ্টি করা না হয় এ বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। মহান প্রতিপালক এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করতেই ইরশাদ করেছেন- كلواواشربواولاتسرفوا ، পানাহার কর, তবে অপচয় করো না।

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين-

www.eelm.weebly.com

নিঃসন্দেহে অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। - সূরা ঃ বণী ইসরাঈল ঃ ২৭

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوابها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس-

তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য বিচারকের স্মরণাপন্ন হয়ো না।সূরা ঃ ২ ঃ১৮৮

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করেই আমাদেরকে এমন ভাবে তার ব্যবহার করতে হবে যাতে সমাজের সকল মানুষ তাদ্বারা সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করতে পারে। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এমন ভাবে সম্পদ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে স্বল্পতর ব্যয়ের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ পণ্য ও সেবা লাভ করা যায় এবং সম্পদগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এমন খাতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন যার জরুরত সর্বাধিক। যেমন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে একটি পার্ক তৈরী না করে আগে একটি রাস্তা তৈরী করা উচিৎ। সুতারং সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জন ও সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এই সুষ্ঠু ব্যবহারের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- انا جعلنا ما علي الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا.

অর্থাৎ আমি ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছি ভূ-পৃষ্টের সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য। আমি পরীক্ষা করতে চাই কে কর্ম সম্পাদনে উত্তম অর্থ্যাৎ এর সুষ্ঠু ব্যবহার করে।

সম্পদের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে নিয়ে অভাব সমূহ নির্বাচনের পর সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারকে নিশ্চিত করে যখন আমরা উৎপাদন করতে চাইব; তখন আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন জটিল ভাবে দেখা দিবে।

ক. কি উৎপাদন করতে হবে ?

খ. কিভাবে উৎপাদন করতে হবে ?

গ. কার জন্য উৎপাদন করতে হবে ?

ক. কি উৎপাদন করব ঃ যেহেতু সীমিত সম্পদ দ্বারা সমাজের সব চাহিদা ও প্রয়োজন মিটে এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে না; এ জন্য চাহিদা ও প্রয়োজনের গুরুত্বের পর্যায়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমাদেরকে কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে। দেশে খাদ্য সংকট প্রকট থাকা সত্ত্বেও কৃষি ভূমিতে ধান উৎপাদন না করে নীলের চাষ কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত হবে না। চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিমাণ সম্পর্কে জরিপ করে, কোণ দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভাব ও চাহিদা গুলোর তুলনা মূলক গুরুত্ব বিচার করতঃ ভূক্তাদের চাহিদার পরিমাণের

www.eelm.weebly.com

বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উৎপাদন করতে হবে। আর যে দ্রব্য উৎপাদন করা হবে তা মানুষের জন্য কল্যাণকর কি না তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, চাহিদা সমূহের তুলনা মূলক গুরুত্ব বিচার ও চাহিদার পরিমাণ নিরূপণও অর্থনীতির একটি মৌলিক সমস্যা।

খ. কি ভাবে উৎপাদন করতে হবে ঃ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত দ্রব্য সামগ্রী কিভাবে উৎপাদন করা হবে তার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করাও একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। কেননা একই দ্রব্য হয়ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের নির্ধারিত পরিমাণ কম মূলধন ও বেশী শ্রম নিয়োগ করেও উৎপাদন করা যেতে পারে, আবার বেশী মূলধন ও কম শ্রম নিয়োগ করেও হয়ত উৎপাদন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হবে এবং কোন্ পদ্ধতিটি বেশী লাভজনক হবে তা নির্ভর করে মূলধন ও শ্রমের যোগান, তাদের আপেক্ষিক দাম ও উৎপাদনের কলা-কৌশলের উপর। যেখানে শ্রমিক সংকট রয়েছে সেখানে অবশ্যই অধিক মূলধন ও কম শ্রমের প্রক্রিয়াটি সুবিধা জনক হবে। কিন্তু যেখানে মূলধনের সংকট রয়েছে কিন্তু সস্তায় শ্রমিক সহজ লভ্য, সেখানে অবশ্যই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি অধিক সুবিধাজনক হবে। অতএব উৎপাদনে কোন্ প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করা হবে তা নির্ধারণ করাও একটি মৌলিক সমস্যা।

গ. কার জন্য উৎপাদন করতে হবে ঃ উৎপাদন বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের একমাত্র পথ নয়। বরং কার জন্য এটি উৎপাদন করা হচ্ছে, সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ এই উৎপাদিত পণ্যের ভূক্তা হবে এবং তাদের চাহিদার পরিমাণ কি হবে তা নির্ধারণ করাও একটি অর্থনৈতিক সমস্যা বটে। উৎপাদিত পণ্য যাতে ভূক্তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং তাদের নাগালের আওতায় পৌঁছতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন ভাবে ডিষ্ট্রিভিউশান করতে হবে যাতে সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টিও একটি অর্থনৈতিক সমস্যা।

৪. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ ও দর-দাম নির্ধারণের সমস্যা ঃ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও বাজারজাত করণের সাথে দ্রব্যের দাম ব্যবস্থার একটি ওৎপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সরকারের কোন বিধি-নিষেধ থাকেনা। সুতরাং কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে তা উদ্যোক্তার স্বাধীন মতামতের উপর নির্ভর করে। অনুরূপ ভাবে পণ্যের ভোক্তারা কি পরিমাণ ভোগ করতে পারবেন এ ব্যপারেও সরকারের কোন রূপ নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। ভোক্তারাই তাদের রুচি অভ্যাস, সামর্থ ও পছন্দমত ভোগের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে উৎপাদন,

www.eelm.weebly.com

উৎপাদনের প্রক্রিয়া, যোগান ও সরবরাহের বিষয়টি একটি স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতির মূল বিষয় হল চাহিদা ও যোগান। বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের পরিমাণের ভিত্তিতেই দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদা বেশী থাকলে সে নিরিখে সরবরাহ না থাকলে দ্রব্য-মূল্য বেড়ে যায়। আবার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী থাকলে দ্রব্য-মূল্য কমে যায়। আবার চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ থাকলে দ্রব্য-মূল্য একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নির্ধারিত থাকে। এভাবে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা দরদাম নির্ধারিত হওয়াকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলে।

ধনতন্ত্রে উদ্যোক্তারা মুনাফার জন্যই উৎপাদন করেন। সুতারং দাম বেশী দেখলে তারা উৎপাদন বেশী করেন, দাম কম দেখলে উৎপাদন কম করেন। আবার ভোক্তাদের ভোগের পরিমাণও দাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ ক্রেতা যখন দাম কম পায় তখন বেশী ভোগের চিন্তা করেন, আবার দাম বেশী দেখলে ভোগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

অনুরূপ ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার বিষয়টিও এরই উপর নির্ভরশীল। কেননা যে প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করলে মুনাফা বেশী হয় উদ্যোক্তারা সে প্রক্রিয়াই অবলম্বন করেন। যদি শ্রম সস্তায় লভ্য হয় তাহলে মূলধন কম বিনিয়োগ করে অধিক হারে শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদন করেন। কিন্তু শ্রম দুঃর্মূল্য হলে অধিক মূলধন বিনিয়োগ যদি লাভ জনক হয় তাহলে তারা তাই করেন।

৫. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ** অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য পরিকল্পনা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। আমাদের প্রয়োজন কি কি রয়েছে; আর তা পূরণের সম্ভাব্য কি কি উপকরণ আমাদের হাতে রয়েছে, তার অবশ্যই একটা জরিপ থাকা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এই উপকরণ সমূহ কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে আমাদের চাহিদা কি পরিমাণ পূরণ হতে পারে; তার একটা জরিপ নিয়েই আমাদেরকে কাজের পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে। এই প্রয়োজন যেমন ব্যক্তির বেলায় রয়েছে, রাষ্ট্রের বেলায়ও এই প্রয়োজন তেমনি বিদ্যমান। নাগরিক চাহিদা, সম্পদের পরিমাণ, উৎপাদন চাহিদা, তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ ও বিতরণ ব্যবস্থা সব কিছুই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবেনা। অনুরূপ ভাবে অগ্রগতির জন্যও এই পরিকল্পনার অপরিহার্য্যতা সমান ভাবে বিদ্যমান। কেননা বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে, তাথেকে অধিক উৎপাদন করতে হলে কি ভাবে তা সম্ভব, পুঁজিবৃদ্ধি করে, না শ্রম বৃদ্ধি করে, তারও একটা সম্ভাব্য জরিপ থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজন সমূহকে সুষ্ঠভাবে পূরণের জন্য

www.eelm.weebly.com

এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার মত নয়। অবশ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরতের সম্ভাবনা সর্বাবস্থায়ই রয়েছে। সেই নুসরতের প্রতি দৃঢ় ইয়াকীন রেখে; বর্তমানে যা আছে তার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে কাজে নামা শরীয়তের দৃষ্টিতে দূষনীয় হবে না অবশ্যই বরং অপ্রয়োজনীয় খাতে সম্পদের অপচয় রোধ করার জন্য এটি করা একান্ত প্রয়োজন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি করা প্রশংসনীয় হবে নিঃসন্দেহ। আল্লাহ নিজেও সব কিছু পরিকল্পিত ভাবে সৃজন করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে- انا كل شئى خلقناه بقدر

নিশ্চয়ই আমি সব কিছুকে পরিমাণ মত সৃজন করেছি।

অর্থনীতির ক্রম বিকাশের ইতিহাস

মানুষ যখন থেকে জীবন যাপণ করতে শুরু করেছে তখন থেকেই তার সম্পদের প্রয়োজন হয়েছে নিঃসন্দেহে। সেই প্রচীন কালে মানুষ সম্পদ আহরণ ও লেনদেনের যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করত; তাই যে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে তা বলাই বাহুল্য। যদিও শাস্ত্রীয় অর্থনীতির জ্ঞান সে কালের মানুষের ছিল না কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে বিবেকোদ্ভূত জ্ঞানের আলোকেই তারা তাদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল একথা দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায়। তখনকার মানুষের মাঝেও জীবনকে সুন্দর ভাবে পরিচালনার প্রচেষ্টা যে ছিল, তা ব্যখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর প্রত্নতাত্বিক গবেষণালব্ধ নিদর্শন সমূহ থেকে এ কথা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবে অর্থনীতি কখন থেকে বিকশিত হয়েছে তা বোধ হয় বলা মুশকিল। তবে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টটল তাদের দর্শন বিশ্লেষণে বাণিজ্য, উৎপাদন ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আধুনিক অর্থনীতিতেও মৌলিক ভাবে উৎপাদন, বিনিয়োগ, দামব্যবস্থা, বাজার প্রক্রিয়া, মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, সরকারী আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচান করা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, বিষয়গত ভাবনা পূর্বেও যা ছিল বর্তমানেও প্রায় তাই রয়েছে। শুধু পক্রিয়া ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র।

যদিও শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে শাস্ত্রীয় অর্থনীতি তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি; কেননা তখন পৃথিবী ছিল কৃষি নির্ভর। বাণিজ্যের পরিধি সীমিত ছিল কৃষিপণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মাঝে। তখন উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাও ছিল খুব শ্লথ। কিন্তু ইসলাম সেই সময়ই পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিল একটি বেগবান, গতিশীল ও সুবিন্যস্ত অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

www.eelm.weebly.com

ইসলামী অর্থনীতির ক্রমবিকাশ

ইসলাম মানব জীবনের অন্যান্য দিকের উপর যে রূপ গুরুত্বারোপ করেছে ঠিক তদ্রুপ গুরুত্বারোপ করেছে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপরও বরং মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেনের সচ্ছতার বিষয়ে সমাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে কুরআনে কারীম অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে অর্থনীতিতে চিরন্তন, শ্বাশত ও সর্বকালে প্রযোজ্য যেসব মুলনীতিগত বিষয় রয়েছে, তার সবগুলোর প্রতিই মৌলিক ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে আল্-কুরআনে। যেমন অর্থ সম্পদ উপার্জনের অনুপ্রেরণা দান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- فاذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله

যখন নামায পড়া হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত্ব ফযল (রিযিক) অনুসন্ধান কর। -সূরা ঃ জুমআ ঃ ১০

বৈধ মালিকানার পন্থা তথা উত্তরাধিকার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

يوصيكم الله فى اولا دكم للذكر مثل حظ الانثيين

আল্লাহ-তোমাদের সন্তানদের ব্যপারে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষ সন্তানরা মেয়ে সন্তানের দ্বিগুন পাবে। -সূরাঃ ৪ঃ ১১

ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- احَلَّ الله البيع وحرم الربوا

আল্লাহ ব্যবসা বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

- সূরাঃ ২ ঃ ২৭৫

কৃষি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- ياايها الناس كلوا مما فى الرض حلالا طيبا

হে মানুষ! ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু হালাল ও উত্তম বস্তু বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে আহার কর। - সূরা ঃ ২ ঃ ১২৮

কারিগরি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس

এবং আমি লৌহকে সৃজন করেছি যাতে অজস্র শক্তি ও মানুষের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। - সূরা ঃ ৫৭ ঃ ২৫

পারষ্পরিক লেন-দেন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

ياايها الذين امنوا اذاتداينتم بدين الى اجل فاكتبوه

হে মুমিনগণ তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকীতে লেন-দেন করবে, তখন তা লিপবদ্ধ করে রেখো। - সূরাঃ ২ ঃ ২৮২

অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস না করা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

www.eelm.weebly.com

لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না। সূরাঃ ৪ ঃ২৯

অপচয় রোধ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- كلواوشربوا ولاتسرفوا

প্রয়োজন মত প্নানাহার কর তবে অপচয় করো না। - সূরা ঃ ঃ

এ ধরণের বহু মূলনীতি কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। যে মুলনীতিগুলো উল্লেখ করতে গেলে একটি পৃথক পুস্তক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নবী কারীম (সা.)-এর হাদীসেও অর্থনীতির বহু মৌলিক দিক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন সম্পর্কে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে বহু বিবরণ আল্লাহর রাসূলের বাণীতে বিধৃত হয়েছে।

এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, আজ থেকে নিয়ে ১৪শত বৎসর পূর্বে সূচনা কালেই ইসলাম তার মৌলিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো ঘোষণা করে রেখেছে বরং বলা যায় যে, চিরন্তন মূলনীতি ঘোষণার সাথে সাথে তদানিন্তন কাল পর্যন্ত বিকশিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের খুঁটি নাটি ব্যখ্যাও কুরআন সুন্নায় বিধৃত হয়েছে। আজকের অর্থনীতির যে বিকশিত রূপ; তা মূলতঃ সে কালে প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই সম্প্রসারিত কিংবা বিবর্তিত রূপ মাত্র। অতএব আধুনিক কালের যে কোন অর্থনৈতিক বিষয়েরই কোন না কোন প্রতিরূপ (নজির) সে কালের অর্থনীতিতে কম বেশী অবশ্যই পাওয়া যাবে। প্রয়োজন শুধু অনুসন্ধানের। (অবশ্য গুটিকতক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।) উল্লেখ নিস্প্রয়োজন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেই ইসলামী অর্থনীতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটি সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করেছিল। বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করতঃ যাকাত, সাদাকাহ্, উশর, আশুর ও খিরাজ, বিভিন্ন প্রকার দারাইব বা কর প্রবর্তন, জিযিয়াহ্, হিমইয়াহ ইত্যাদি আদায় এবং তার সুষম বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে হিজরী প্রথম শতকেই ইসলামী অর্থনীতি একটি সুবিন্যস্ত অবকাঠামো লাভ করেছিল। একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে পূর্বের তুলনায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা সম্প্রসারিত হয়, তখন সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান সুবিন্যস্ত করণ এবং নব উদ্ভূত সমস্যা সমূহের কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিলে তৎকালের আলেম-উলামা, ফিকাহ্‌বিদ ও মুজতাহিদগণ ফিকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। তখনই ইসলামী বিধি-বিধানগুলো অধ্যায়ের আলোকে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সময় পর্যন্ত যেহেতু অর্থনীতি ভিন্ন একটি বিষয়ের

www.eelm.weebly.com

মর্যাদা লাভ করেনি অতএব তারা অর্থনীতি শিরোনাম দিয়ে কোন অধ্যায় শুরু না করলেও বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসয়ের বিধানগুলো অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ সহ যুক্তি প্রমানের আলোকে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে গিয়েছেন। যেমন তারা যাকাত, কাফ্ফারাহ্, বেচাকেনা, লেনদেন, ভরন-পোষণ, মহর, উত্তরাধিকার, দিয়্যাত বা জরিমানা, ভূমি ভাড়া, ইজারা, উশর, খিরাজ, খনিজ সম্পদ, ব্যবসায়ী কর, যুদ্ধলব্ধ মাল, মালিকাধীন সম্পদ, প্রোথিত সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য, কিফালা, হাওয়ালা ইত্যাদি শিরোনামে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে লিখিত যে সব ফিকাহ্ গ্রন্থে অর্থনৈতিক বিষয় স্থান পেয়েছে এগুলোর মাঝে বাদায়ে-আবু হানিফা কৃত, মুদাওয়ানাতুল কুবরা- ইমাম মালিক কৃত, আল্ মাবসুত-সারাখসী কৃত, আল্ উম্ম- ইমাম শাফী কৃত, আল্ মুগ্নী-ইবনে কুদামাহ্ কৃত ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

তৎকালে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেও বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছিল। তন্মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ কৃত 'আল্-খারাজ', ইয়াহ্ইয়াহ ইবনে আদম আল্-কুরাশীকৃত 'আল-খারাজ', আবু উবায়েদ কৃত 'কিতাবুল আম্ওয়াল' মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী কৃত 'আল্ ইকতিসাব ফীর্ রিয্কিল মুসতাতাব', ইয়াহ্ইয়া ইবনে আমর কৃত 'আহকামুস সাওক', মুহাম্মদ আল-হুবাশী আল-ইয়ামানী কৃত 'আল্ বারাকাহ্ ফী ফয্লিস্ সা'য়ী ওয়াল হারাকাহ্', ইবনে তাইমিয়া কৃত 'আল হিস্বাহ' মাওয়ারদী রচিত 'আহ্কামুস্ সুলতানিয়্যাহ্' বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। পরবর্তীকালে রচিত ফিকাহ্ ও ফাত্ওয়ার গ্রন্থ সমূহেও অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহারণ হিসাবে হিদায়া, ফতহুল কাদীর, দুররে মুখতার, ফত্ওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ্, ফত্ওয়ায়ে রহিমিয়্যাহ, আহ্সানুল ফাত্ওয়া ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সে কালের বিন্যাস আধুনিক কালের বিন্যাসের চেয়ে ভিন্নতর ছিল এবং তাদের পরিভাষা ও আজকের পরিভাষায় বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এসকল ফাত্ওয়ার গ্রন্থে অর্থনীতির মৌলিক ও আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলোর উপর অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণসহ আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি খুঁটি নাটি বিষয়গুলোও তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি।

তাদের আলোচনার ধরণ থেকে মনে হয় তারা কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যকেই অর্থনীতি ও অর্থ উপার্জনের মূল বিষয় বলে ধরে নিয়েছিল। তাই তাদের অর্থনৈতিক আলোচনায় এই দু'টি শিরোনাম প্রাধান্য পেয়েছে। আল্লামা মাওয়ারদী

www.eelm.weebly.com

তো সুস্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছেন যে -

اصول المكاسب الزراعة والتجارة- ثم قال والارجح عندي الزراعة

'উৎপাদনের মৌলিক বিষয় হল দুটি; কৃষি ও ব্যবসা। পরে তিনি নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আমার নিকট এ দুটোর মাঝে উত্তম হল কৃষি।' অবশ্য সে কালে শিল্প বলতে হস্ত চালিত যেসব শিল্পকারখানা ছিল; সে গুলোর ব্যাপারেও তারা ফাঁকে ফাঁকে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা চলে যে, মূলনীতিগত দিক থেকে তাদের আলোচনা এতটাই বস্তুনিষ্ঠ ছিল যে, বর্তমানেও সেগুলো সমান ভাবেই প্রযোজ্য ও কার্যকর।

অবশ্য মধ্যযুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের ফলে ইসলামী অর্থনীতির উপর তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়নি। যা হয়েছে তা হল পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের অর্থনৈতিক অধ্যায় সমূহের ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ। কিন্তু ক্রমবিকাশমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর দিক নির্দেশনা মূলক কোন গবেষণা কর্ম ব্যাপক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সুযোগে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্ব বাজার দখল করে নেয়। ফলে আলেম-উলামাগণ ঘটমান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের কোন্‌টি বৈধ আর কোন্‌টি বৈধ নয় ব্যক্তিগত ভাবে এ ফাত্‌ওয়া দেওয়ার কাজেই ব্যাপৃত থেকেছেন। কিন্তু তারা উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য দিক নির্দেশনা মূলক কোন পথ নির্দেশ করেন নি। অবশ্য রাষ্ট্র ক্ষমতার ভিন্ন মেরুকরণও এই স্থবিরতার পিছনে অন্যতম কারণ হয়ে কাজ করেছে।

মধ্যযুগে অর্থনীতির প্রতি ইসলামী ফিকাহ্‌বিদদের এই অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতার ফলে নিম্নোক্ত সমস্যা সমূহ দেখা দেয়ঃ

* সূদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা পৃথিবীকে গ্রাস করে নেয়।
* সুদী লেনদেনের পদ্ধতি সমূহ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
* অবৈধ লেনদেন ও বেচা-কিনার প্রক্রিয়া সমূহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।
* মুসলমানদের মাঝে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের দেওয়া বিধান সমূহ লঙ্ঘনের প্রবনতা শুরু হয়। ফলে তারা এক্ষেত্রে নাফরমানী করে স্থায়ী ভাবে পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। এরই পরিণতিতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহ ও রাসূলের বিধান লঙ্ঘনের মানসিকতা গড়ে উঠে।
* মুসলিম সন্তানেরা ইসলামী বিধি-বিধান থেকে বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে উদাসীনতার শিকার হয় এবং এর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

www.eelm.weebly.com

ফলে অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠার কারণে এক্ষেত্রে অভাব দেখা দেয়।

* সঙ্গত কারণেই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যার মুকাবেলা করার মত সামর্থবান যোগ্যব্যক্তি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে; যে কারণে নবতর বিষয়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য চলমান পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এর পরিণতিতে গোটা বিশ্ব পাশ্চাত্য অর্থনীতির আগ্রাসনের শিকার হয় এবং ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণধর্মী ও সুবিন্যস্ত বিধান থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সার্বজনিন সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় পৃথিবীর মানুষ। অর্থনৈতিক জটিলতার আবর্তে আটকা পড়ে গিয়ে জীবন সমস্যায় হাবুডুবু খেতে থাকে সারা দুনিয়া। আর আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

অবশ্য আল্লামা ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দামায়', আল্লামা কাল-কাশান্দি 'সুবহুল আ'শা' নামক গ্রন্থে, ইবনে মাম্মাতী 'কাওয়ানীনুদ্ দাওয়াবীনে' অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রাঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' অর্থনীতির নতুন বিন্যাসের প্রতি খানিকটা আলোকপাত করে ছিলেন। বিংশ শতকের শুরুর দিকে সারা বিশ্বে ইসলামের নতুন জাগরণ শুরু হলে অর্থনৈতিক বিষয়ের গুরুত্ব নতুন করে অনুভূত হয়। তখন নতুন করে এই বিষয়ে উপর সেমিনার সেম্পোজিয়াম, প্রবন্ধ ও গবেষণা পত্র তৈরী হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফেকাহ সপ্তাহ্, ১৯৬১ সালে দামেস্কে অনুষ্ঠিত ফেকাহ্ সপ্তাহ, ১৯৬৮ সালে মিশরের কাহেরায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিকাহ্ সপ্তাহ এবং ১৩৯২ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। এ সময় অনেকেই ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বই পুস্তক ও কিতাবাদী রচনায় প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে মাওঃ হিফজুর রহমান (রহ.)-এর 'ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম', মাওঃ মুশাহেদ আলী (রহ.) রচিত 'ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন্ নাবিয়্যিল আমীন', ডঃ আব্দুল্লাহ্ আরবী রচিত الاقتصادالاسلامي والاقتصادالمعاصر মুহাঃ বাকের আস্-সদর রচিত اقتصادنا ডাঃ মুহাম্মদ শওকী রচিত المدخل في الاقتصادالاسلافي, সুবহী সলেহ রচিত 'আন্ নাজমূল ইসলামিয়্যাহ্' বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বর্তমানে অনেকেই এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে গবেষণা করছেন। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মাওঃ তকী উসমানী,,

www.eelm.weebly.com

মিঃ মওদুদী, মাওঃ আব্দুর রহীম বাংলাদেশীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। শায়েখ জাকারিয়্যাহ্ (রাহ.)-এর ফাজায়েলে সাদাকাত যদিও অর্থনীতি সংক্রান্ত পুস্তক নয়, তবে তিনি অর্থনীতির আয়াত ও হাদীসগুলো তার কিতাবে সংকলন করেছেন।

এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকে একথা দাবী করার যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে যে, পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরা মুসলিম অর্থনীতিবিদদের থেকে অর্থনীতির চিন্তা ভাবনা আহরণ করেছেন। অর্থনীতির অন্যতম দিক পাল এ্যাডাম স্মিথ-এর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ THE WEALTH OF NATION -এ অর্থনীতির ইসলামী চিন্তাধারার যথেষ্ঠ ছাপ ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক অর্থনীতির ক্রমবিকাশ

শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ইউরোপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘুমন্ত ছিল বলা চলে। মুসলিম বিশ্ব যখন তাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে সুসংহত ও সুবিন্নস্ত করে নিয়েছে তখনও ইউরোপে অর্থনীতির তেমন একটা চর্চাই শুরু হয় নি। তখন পর্যন্ত তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। চরম দারিদ্র ও অভাবের মাঝে কাটত তাদের দৈনন্দিন জীবন। এ কারণে তখন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যের পরিধি কৃষি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মাঝে সীমিত ছিল। সে সময় পৃথিবীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাও ছিল খুব শ্লথ। তাই মনে হয় শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত তারা অর্থব্যবস্থার জন্য শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণ ও দানের প্রয়োজন তেমন একটা অনুভব করেনি বরং প্রবৃত্তিজাত মেধার আলোকেই তারা অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে।

১৪০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। মানুষ আবিস্কার করে গতিশীল আরেক নয়া পৃথিবীকে। নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠে এবং মানুষ নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রয়োজন তীব্র ভাবে অনুভূত হয়।

প্রাচীন পৃথিবীতে রোম ও পারস্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কালে কিছু কিছু অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনার উৎকর্ষ সাধিত হলেও তা কোন দার্শনিক রূপ লাভ করতে পারেনি। ১৬০০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল; তাকে বলা হয় মার্কেন্টালিজম। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করতেন যে, অর্থনৈতিক সম্পদ হল মূল্যবান ধাতব পদার্থ সমূহ। সুতরাং স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা

www.eelm.weebly.com

ও মূল্যবান পাথর যে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কাছে বেশী থাকবে; সে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রই অধিক সম্পদশালী বলে পরিগণিত হবে। এ ধরণের রাষ্ট্রই বৃহৎ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীতে তারাই শক্তিধর জাতি হিসাবে গণ্য হবে। আর এই সম্পদ আহরণের জন্য রাষ্ট্র কর ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাগুলোর উপর নির্ভর করতে পারবে। এই চিন্তা ধারার বিকাশে যারা অধিক অবদান রেখেছিলেন তাদের মাঝে ইংরেজ বনিক টমাস মান (১৫৭১খ্রীঃ-১৬৪১খ্রীঃ) ও ফরাসী অর্থমন্ত্রী ফিলিপ্স (১৬৩৮খ্রীঃ-১৭১২খ্রীঃ) কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়।

১৭৬০-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে ফরাসী ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। ফিজিওক্র্যাটদের মতে সম্পদের উৎস হল ভূমি। ভূমির মালিকানা যে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের যতবেশী হবে সে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র ততই সম্পদশালী হবে। এই চিন্তা ধারার নেতৃপুরুষ ছিলেন ফ্রস্কুইজ (১৬৯৪-১৭৭৪ খ্রী.) ও টরগেট (১৭২৭-১৭৮১খ্রী.)।

মার্কেন্টালিজম ও ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারা থেকে পরবর্তীতে পৃথক একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে। সেটিকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা। এটিকেই আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। এই চিন্তাধারায় সম্পদকে ভূমি ও ধাতব পদার্থের মাঝে সীমাবদ্ধ না করে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যেমন- মূলধন ও শ্রম সহ সম্পদের প্রসারিত সংজ্ঞার উপর গুরুত্বরোপ করা হয়।

১৭৭৬ সালে এডাম স্মিথ **The Wealth of Nations** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে পুস্তকে তিনি মতামত পেশ করেন যে, একটি অদৃশ্য হাত সমাজের মানুষের পছন্দ ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাজার ও বাজারদর প্রক্রিয়া সেই অদৃশ্য হাতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৭৮৯ সালে টমাস মালথাস অর্থনীতিতে একটি নতুন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিক হারে অর্থাৎ- ১-২-৪-৮-১৬ এই হারে। আর খাদ্যের যোগান বাড়ে গাণিতিক হারে অর্থাৎ ১-২-৩-৪-৫-৬ এই হারে এবং তা বাড়ে ক্রম হ্রাসমান উৎপাদন বিধির আওতায়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না হলে আগামী পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও মৃত্যু হবে অবশ্যম্ভবী। তবে তার এই মতবাদ পরে উপেক্ষিত হয়।

অর্থনীতির অন্য আর একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ হলেন ডেভিড রিকার্ডো।

www.eelm.weebly.com

তিনি অর্থনীতিতে একটি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান যে, কী ভাবে সম্পদের স্বল্পতার সমস্যাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা কাটিয়ে উঠা সম্ভব। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে যে বাঁধা রয়েছে সে গুলোকে তিনি অলঙ্ঘনীয় মনে করতেন। ফলে তার আশাবাদ হতাশায় পরিণত হয়।

এসময় কার্লমার্ক্স অর্থনীতিতে একটি বিপ্লবাত্মক ধারার সূচনা করেন। তিনি একটি আবেগময় শ্লোগান শুনিয়ে পৃথিবীকে চিরন্তন ধারা ভেঙ্গে একটি নতূন ধারার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তার দেওয়া দর্শনের সার কথা ছিল পুঁজিপতিরা গরীব ও শ্রমিকদেরকে শোষণ করছে। অতএব পুঁজিপতিদের উৎখাত করে শ্রমিকদের রাজ কায়েম করতে হবে এবং ধনী-গরীবের ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একটি সাম্যের অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এজন্য পৃথিবী ব্যাপী শুরু করতে হবে শ্রেণী সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামই বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রলেতারিয়েতদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ **The capital**-এ উল্লেখ করেছেন যে, পুঁজিবাদ তার নিজস্ব গতিতেই ধ্বসে পড়বে।

১৯ শতকের শেষ ভাগে ইউরোপ যথেষ্ঠ ধনী হয়ে উঠে। ফলে মানুষ তার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী দ্রব্য ক্রয় করার প্রবনতার শিকার হয়। একারণে ভুক্তাদের চাহিদার প্রান্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেন বেশ ক'জন অর্থনীতিবিদ। ষ্টেনলি, জেভন্স, আলফ্রেড মার্শাল, কার্ল মেঞ্জার, লিও ওয়ালরাস ছিলেন তাদের মাঝে অন্যতম।

ওয়ালরাস বাজারদর সর্ম্পকে কিছু নতুন তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি প্রমান করে দেখান যে, একটি অর্থনীতি কিভাবে বহু বাজার সমন্বিত হতে পারে। প্রত্যেক বাজার যেমন অন্য বাজারকে প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যান্য বাজার দ্বারাও সে বাজারটি প্রভাবিত হতে পারে। মার্শালও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপলস্ অব ইকোনোমিকস'-এ চাহিদা, যোগান, উৎপাদন, ব্যয়, প্রতিযোগিতা মুলক বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছিলেন।

১৯৬৩ সালে কেইন্‌স তাঁর 'জেনারেল থিউরী' নামের গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তার দেওয়া থিউরীর উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিতে একটি আধুনিক যুগের সুচনা হয়। তাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিতে যে নতুন যুগের সুচনা হয় তাকে কেইন্‌সীয় অর্থনৈতিক বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কেইন্‌সের তত্ত্বের সফলতা সত্বেও ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিক ধারার বিকাশ

www.eelm.weebly.com

অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে। এই ক্লাসিক্যাল চিন্তা ধারাকে মুদ্রায় কেন্দ্রীভূত করে যে নতুন চিন্তাধারা জন্ম লাভ করে তা হল মনিটরিজম। এই চিন্তাধারায় মুদ্রাকেই অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি মনে করা হয় এবং মনে করা হয় যে, আর্থিক নীতির সাফল্যের উপরই অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে। মিলটন ফ্রিডমেন হলেন এর প্রবক্তা। ১৯৬০ এর দশকে ফ্রিডমেন ও কেইন্সের অনুসারীদের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

যাই হউক দৃষ্টি ভঙ্গির এই পার্থক্য সত্বেও অর্থনীতি আপন গতিতে এগিয়ে চলছে। কিন্তু মনিটরিজমের এই নতুন অর্থনৈতিক ধারার সূচনার ফলে বিশ্ব ব্যাপী অর্থনৈতিক প্রতারণা ও ঘাপলার নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। মনিটরিজমে মানুষকে প্রাতারিত করার এমন অভিনব ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে যে, মানুষ স্বেচ্ছায় প্রতারণার ফাঁদে পা দিবে এবং প্রতারিত হওয়ার পর সে দেখতে পাবে যে, সব কিছু হারিয়ে সে সর্বশান্ত হয়ে গেছে। মনিটরিজম মূলতঃ পুঁজিপতিদের শোষণের অভিনব এক কৌশল। মুদ্রামানে তারতম্য ঘটিয়ে মুদ্রার ব্যবসার মাধ্যমে মানুষকে শোষণ করার দ্বার উম্মোচন করা হয়েছে এই ব্যবস্থায়। এ কারণেই ইসলাম লেনদেন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাকে মূল হিসাবে গ্রহণ না করে পণ্যকে বিনিময়ের মূল হিসাবে গ্রহণ করেছে আর মুদ্রাকে গ্রহণ করেছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এবং মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রামানের সমতা রক্ষা ও নগদানগদি লেনদেনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সামান্য এদার উদার হলে তাকে সুদ বলে ঘোষণা করেছে। যাতে মূদ্রামানে ঘাপলা সৃষ্টি করে মানুষকে প্রতারিত করা সম্ভব না হয়।

বস্তুতঃ ইসলাম যে অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে তা সর্বকালের জন্যই আধুনিক। কারণ ইসলাম তার অর্থ ব্যবস্থাকে জীবন থেকে আলাদা করে ভাবতে চায়নি। কেননা এ রূপ ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থিউরীসর্বস্ব হয়ে যায়। বরং ইসলাম চেয়েছে মানুষের জীবন ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এমন কিছু মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে; যা সর্বকালে সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে এবং যার আলোকে সর্বকালের নব উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যার মুকাবেলা করা সম্ভব হবে। সেই নীতিমালার আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদরা ৬০০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝেই একটি সুবিন্যস্ত ও জোড়ালো অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরী করে নিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ সহ অন্যান্য ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ তাদের গ্রন্থ সমূহে অর্থব্যবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

www.eelm.weebly.com

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহ

বর্তমান পৃথিবীতে মোট ৪টি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। যথা ঃ

১. ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ

২. সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

বস্তুতঃ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ৪টি প্রশ্ন খুবই জটিল। সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেই মূলতঃ সেই ৪টি জটিল প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য সমাধানের থিউরী প্রত্যেক মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন। সেই ৪টি প্রশ্ন সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. অভাব নির্বাচনের প্রশ্ন ঃ মানুষের অসংখ্য চাহিদার মাঝে কোন গুলোকে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে তা নির্বাচন করাকে বলা হয় অভাবের নির্বাচন। তবে এই নির্বাচন কি ভাবে করা হবে, এবং কিসের ভিত্তিতে তা করা হবে সেটিই মূলতঃ এক্ষেত্রের মৌলিক সমস্যা। এ প্রশ্নটি যেমন ব্যক্তির বেলায় রয়েছে, তা রাষ্ট্রের বেলাও রয়েছে।

আর সেই অভাব পূরণের জন্য উৎপাদন-উপকরণ কোন ক্ষেত্রে কতটুকু কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে, কোন বিষয়ের উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এগুলোও এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার আওতাভূক্ত।

২. উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহার ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ প্রকৃতিলব্ধ কিংবা মানুষ্য সৃষ্ট উৎপাদন-উপকরণ সমূহ; যেমন- ভূমি, শ্রম ও পুঁজি কোথায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, কোন্ উৎপাদনশীল খাতে তা বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগের প্রক্রিয়া কি হবে এটিও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের একটি বড় প্রশ্ন।

৩. উৎপাদিত পণ্য ও লভ্যাংশ ভোগ বন্টনের প্রক্রিয়ার প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ অভাব নির্বাচনের পর উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তা সমাজের মানুষের কাছে কিভাবে বন্টন করা হবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে যে লভ্যাংশ অর্জিত হবে তা সমাজের মানুষের মাঝে কি ভাবে বন্টিত হবে, কে তা ভোগ করবে এবং কোন নীতির আওতায় তা ভোগ করবে, এটিও মানব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের অন্যতম জটিল সমস্যা ও প্রশ্ন বটে।

৪. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের প্রক্রিয়া জনিত প্রশ্ন ঃ অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে কোন প্রক্রিয়া

www.eelm.weebly.com

অবলম্বন করতে হবে? কোন্ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন শিল্প ও পণ্যের উৎপাদন করলে অধিক হারে লাভবান হওয়া যাবে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন। সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেই এ প্রশ্নগুলোর সমাধান করার নিমিত্ত প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১. ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ

পুজিঁবাদীরা বলেন অর্থ ব্যবস্থাকে সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত করতে হলে এবং উপরোক্ত সমস্যা সমূহের সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। তাহলে মানুষ অধিক মুনাফা ও প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যায় করতে অনুপ্রাণিত হবে। যদি এটা করা হয় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরোক্ত চারটি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং অর্থনীতিতে একটি সুশৃঙ্খল ও গতিশীল পরিস্থিতি ফিরে আসবে।

তাদের মতে ব্যক্তি মালিকানার অবাধ অধিকার দেওয়া হলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় সব কিছুই আপনা আপনি হতে থাকবে। রাষ্ট্রের কোন পরিকল্পনা বা উদ্যোগের প্রয়োজন হবে না। কেননা উদ্যোক্তারা বাজারে যে বস্তুর চাহিদা দেখাবে তাই তারা উৎপাদন করতে প্রয়াসী হবে। কারণ তাদের লাভ প্রয়োজন। সে জন্য উৎপাদনের যে উপকরণ যে পরিমাণ ব্যবহার করলে এবং যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে লাভ বেশী হবে তাই তারা ব্যবহার করবে। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা যেখানে বেশী হবে সেখানেই তারা সরবরাহ করবে। আর উৎপাদিত পণ্যের আধিক্য সৃষ্টি হলে আপনা আপনিই তার বাজারদর কমে আসবে। যে পণ্যের চাহিদা থাকবে না সে পণ্য কেউ উৎপাদন করতে প্রয়াসী হবে না। আর লাভ ও মুনাফা বন্টনের কাজটিও একই প্রক্রিয়ায় আঞ্জাম পাবে এবং একই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সমৃদ্ধিও অর্জিত হবে। কেননা উৎপাদনের উপকরণ তথা ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং উৎপাদিত পণ্য এগুলোর মূল্য বৃদ্ধির উপরই মূলতঃ সমৃদ্ধির বিষয়টি নির্ভরশীল। আর এগুলোর মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টিও চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভরশীল। প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে প্রত্যেকেই অধিক লাভের প্রত্যাশায় নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবে। এতে উৎপাদন-উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উপকরণের মালিক উচ্চ মূল্যে তার উপকরণ বিক্রি করতে পারবে। এতে উদ্যোক্তার টাকা চলে যাবে উপকরণের মালিকের হাতে। ফলে জোতদার, শ্রমিক, উৎপাদন উপকরণের মালিক সকলেই উচ্চ মূল্যে তাদের ভূমি, শ্রম ও উপকরণ বিক্রি করতে পারবে। আর মূলধনের মালিক উচ্চ লাভে বা উচ্চ সূদে তার মূলধন উদ্যোক্তার কাছে বিনিয়োগ করতে পারবে।

পুঁজিবাদীরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতিও চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কেননা প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অধিক দামে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

করা প্রয়োজন। আর প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হলে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রয়োজন। আবার নতুন নতুন পণ্য বাজারজাত করতে পারলেও অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

অতএব উদ্যোক্তারা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের গুণগতমান বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন উপকরণ ও মেশিনারী উৎপাদিত হবে। ফলে উৎপাদিত পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ক্রমে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

সার কথা, পুঁজিবাদীদের মূল বক্তব্য হল 'অবাধ ব্যক্তি মালিকানা' অর্থাৎ যদি ব্যক্তি উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ, উৎপাদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বাজারজাত করণ এবং লভ্যাংশ ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ মালিকানা লাভ করে এবং সে তার ইচ্ছামত সব কিছু করতে পারে আর রাষ্ট্র যদি এ সকল ক্ষেত্রে কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও সমাজের প্রয়োজন পূরণের সুশৃংখল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও তরান্বিত হবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়টিও এই চাহিদা ও যোগান বিধির আওতায় উদ্যোক্তার দায়িত্ব হয়ে যাবে। কেননা অধিক মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনেই উদ্যোক্তাকে সবকিছু সম্পর্কে সঠিক জরিপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২. সমাজতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কেননা এদুটি বিষয় মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন বুঝে সে নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাই রাখে না। বলতে গেলে মানুষের ভাল মন্দের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সে অন্ধ। সুতরাং চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা দ্বারা অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা খুবই দুরূহ ব্যপার হবে। আর হলেও তার জন্য বহু অর্থনৈতিক খেশারত দিতে হবে এবং বহু জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে। কারণ চাহিদা ও যোগান কোন বৈদ্যুতিক সুইচ তো নয় যে, টিপলেই চাহিদা সৃষ্টি হবে আর বন্ধ করলেই চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য পূর্ণ হয়ে উঠতে অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। ইত্যবসরে অনেক সম্পদের অপচয় হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। যেমনঃ এক জায়গায় কোন এক পণ্যের চাহিদা দেখে অনেকেই সে পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ

www.eelm.weebly.com

উৎপাদনের উপকরণ বিনিয়োগ করে উৎপাদনের কাজ শুরু করল। কিন্তু কতিপয় উদ্যোক্তা আগে পণ্য সরবরাহ করে বাজারের চাহিদা পূরণ করে ফেলল। ফলে অন্যান্য উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ার কারণে তা গুদামজাত করে রাখা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। অথচ এই পণ্য উৎপাদন করতে যেয়ে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হল তা দিয়ে অন্য একটি প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা যেত। কিন্তু যেহেতু উপকরণ এখানে আবদ্ধ হয়ে রইল; তাই তাদ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হল না।

সুতরাং সমাজের চাহিদা অনুপাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপাদনের উপকরণ কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বরং যাবতীয় উৎপাদনের উপকরণ রাখতে হবে রাষ্ট্রের দায়িত্বে। রাষ্ট্রই নাগরিকদের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করবে। সমাজের চাহিদাসমূহ গুরুত্বের বিবেচনায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করতঃ সে নিরিখে উৎপাদনের উপকরণ সমূহ থেকে (যা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে) কোথায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করবে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া কি হবে তা নির্ধারণ করে রাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মহল এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। অতঃপর যাবতীয় কাজ-কর্ম ও উৎপাদন সেই পরিকল্পনা মাফিক আঞ্জাম দেওয়া হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রই চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করবে, উপকরণ যোগান দিবে, শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা হবে, পণ্যের দাম রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে, এমন কি ভোক্তাদের ভোগের পরিমাণও রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিবে। আর যেহেতু উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে সুতরাং নাগরিকদের হাতে শ্রম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। রাষ্ট্র নাগরিকদের যোগ্যতা ও শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করবে। যেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন থাকছে না; অতএব এ ব্যবস্থায় উৎপাদন খরচের সমপরিমান মূল্যে দ্রব্য বাজারজাত করা সম্ভব হবে। যাবতীয় মূলধন যেহেতু রাষ্ট্রের হাতে থাকবে সুতরাং সুদের প্রশ্নও থাকবে না। ভূমিও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে বিধায় ভূমির কেরায়া বা ভাড়া দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে যদি কিছু লাভ দাড়ায়; তাহলে তা পারিশ্রমিকের পার্সেন্টিস-এর ভিত্তিতে বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক রূপে নাগরিকদের মাঝে বন্টিত হয়ে যাবে। এ ব্যবস্থায় দেশের সকল নাগরিক সমান হারে সম্পদ ভোগ করতে পারবে। এতে করে সকল মানুষ মানুষ হিসাবে যেমন সমান; তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমান হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ার কারণে অসহায় মানুষের যে দুর্বিসহ জীবন যাপণ করতে হয়, এ ব্যবস্থায় তা আর থাকবে না। খেলে সবাই খাবে, না খেলে কেউ নয়। তাছাড়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় পুঁজিবাদী অর্থ-

www.eelm.weebly.com

ব্যবস্থায় মানুষ যেমন বিভিন্নমূখী দুর্নীতি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে; তাও এ ব্যবস্থায় থাকবে না। কেননা এ ব্যবস্থায় শুধু মাত্র উৎপাদন খরচে দ্রব্য বাজারজাত করা হবে। তাই পুঁজীবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের ব্যয়ের সাথে অতিরিক্ত ব্যয় যেমন- ভূমির ভাড়া, ব্যাংকের সূদ, উদ্যোক্তার লাভ ইত্যাদি সংযোজন করে দ্রব্যের যে **Surplus Value** বা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে বাজারজাত করা হয় এই ব্যবস্থায় তারও প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া পণ্য ক্রয় করতে যেয়ে দরদাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে যে প্রতারণা ও হয়রানীর শিকার হতে হয়; এব্যবস্থায় তাও থাকবে না। কারণ উৎপাদন ব্যয়ের সমপরিমাণ মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে। আর যেহেতু এব্যবস্থায় পণ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকছে না; তাই তাদ্বারা কোন ধরণের ভেজাল, প্রতারণা, মাপে কম দেওয়া, দর-দামের ক্ষেত্রে অধিক মূল্য হাকার মত কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও থাকবে না। সুতরাং এব্যবস্থায় মানুষ নিঃশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে সুস্থ্য পরিবেশে সমতা রক্ষা করে জীবন যাপণ করতে পারবে।

৩. মিশ্র অর্থনীতি

মিশ্র অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, যেহেতু স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক বিষয় তাই এটিকে অকার্যকর করে দেওয়া যায় না। আবার অবাধ মালিকানা লাভ করলে ব্যবসায়ীরা এক চেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে ফেলে এবং ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করে আপসে শলাপরামর্শ করে দ্রব্যের মূল্য চড়িয়ে দেয়। এজন্য সকল ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। তা ছাড়া কিছু কিছু বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান- যা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে উদ্যোক্তাদেরকে পুঁজির বৃহদাংশ উচ্চ সুদে ঋণ করে যোগান দিতে হয় এ ধরণের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং জরুরী নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পের উৎপাদনের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী পণ্যে সংকট সৃষ্টি করেই ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের মুনাফা হাতিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তাই যদি বেসরকারী ভাবে উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার থাকে তাহলে মানুষ সর্বোচ্চ হারে তার মেধা ও শ্রমকে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যয় করতে উৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে। আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং বৃহৎ ও জরুরী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে জনগণকে প্রতারিত করার এবং যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে জনগণকে হয়রানী ও ক্ষতিগ্রস্থ করার সুযোগ থাকবে না। এদের সার কথা হল নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা প্রদান করা হবে তবে তা সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের নিরসন সহজ হবে।

www.eelm.weebly.com

৪. ইসলামী অর্থনীতি

ইসলামী অর্থনীতি মনে করে মানুষের উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ব্যাক্তি মালিকানাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা ব্যক্তি মালিকানা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার একটি। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ যা নিজের মনে করে তার প্রতি যত্নবান হয়, সংরক্ষণ করে এবং তাতে প্রবৃদ্ধির চেস্টা চালায়। তা ছাড়া যা নিজের মনে করে তার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করতে ও শ্রম দিতে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সম্মত হয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে মানুষ এমন শ্রম দেয় ও কষ্ট করে যা স্বাভাবিক অবস্থায় সাধ্যাতীত মনে হয়। কিন্তু যা সে নিজের মনে করে না, তার জন্য স্বাভাবিক পর্যায়ের শ্রম দিতে বা কষ্ট করতেও সম্মত হয় না। অতিরিক্ত শ্রম দেওয়া বা কষ্ট স্বীকার করার তো প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের মেধা ও শ্রমকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাবার স্বার্থেই ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কুরআনে কারীমে যদিও এ সম্পর্কে পারিভাষিক কোন শব্দ পাওয়া যায় না (কেননা পরিভাষা গুলো পরে তৈরী) কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ঃ ইরশাদ হয়েছে-

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا

আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবনোপকরণকে তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি এবং কতিপয়ের উপর কতিপয়কে প্রাধান্য দিয়েছি যাতে করে একজন আরেক জনকে কাজে লাগাতেপারে। - সূরা ঃ যুখরুফ ঃ ৩২

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

পুরুষরা যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অধিকার থাকবে আর রমনীরা যা উপার্জন করবে তাতে তাদের অধিকার থাকবে। - সূরাঃ ৪ ঃ ৩২

ومما رزقنا هم ينفقون আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যায় করে।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের ভাষ্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে এই ব্যক্তি মালিকানা যাতে অর্থনৈতিক আবর্তনে কোন জটিলতা সৃষ্টি না করে, সম্পদ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে যায় এবং ব্যক্তির সঞ্চয় যাতে সমষ্টি জীবনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে না পারে এ জন্য ইসলাম আয় উপার্জন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। সম্পদ গুদাম জাত করা নিষিদ্ধ হওয়া, সুদী কারবার ও লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়া, জুয়া, হাউজী, লটারী নিষিদ্ধ হওয়া, পণ্যহীন বেচাকেনা

www.eelm.weebly.com

অবৈধ হওয়া, এক কথায় সকল প্রকার ফাসিদ ও বাতিল বেচা-কেনাকে এজন্যই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায় প্রতারণা ও ধোঁকার যাবতীয় পন্থা ও প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এ সকল পন্থা অবলম্বন করেই পূঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে।

অর্থাৎ ইসলাম একদিকে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তিকে পূজি, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে- যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয়। আবার আইনগত বৈধতা ও অবৈধতার সাথে হালাল হারামের বিধানকে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে সেই অধিকারকে সীমিত করে দিয়েছে।

চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধানকেও ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন ও পরিকল্পনার আওতায় অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলাম বন্দি করতে চায় নি। কেননা এতে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের প্রশ্ন থাকেনা বিধায় ব্যক্তির মেধা ও শ্রম সেই পর্যায়ে কাজ করেনা; ব্যক্তি গত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে যে পর্যায়ে তা কাজ করে। এজন্য ইসলাম অর্থ ব্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করে। যেমন- ইরশাদ হয়েছে,

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জীবনোপকরণ বন্টনের বিষয়টি নিজ দায়িত্বে রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহর হাতে। তিনি হয়ত কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় তা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, সেই প্রাকৃতিক শক্তি বা নিয়ম হল চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি। একটি হাদীসে এ বিষয়টির সুক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন গ্রাম থেকে আগত পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে কোন শহুরে নাগরিক তা বিক্রি করে দিবে না। লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও (তারা ক্রয় বিক্রয় করুক)। আল্লাহ কতিপয়ের মাধ্যমে কতিপয়ের আহার্যের যোগান দিয়ে থাকেন। অন্য হাদীসে হযরত আলী (রা.) বলেন-

قيل يارسول الله قوم لناالسعر قال ان غلاء السعرورخصه بيدالله - اخرجه البزار

রাসূল (সাঃ)-কে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে তিনি বললেন, দ্রব্যমূল্য বাড়া-কমা আল্লাহর হাতে। -(বায্যার)

এই হাদীসেও দ্রব্য মূল্য বাড়া ও কমার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে দরদাম নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ করেন এর অর্থ আল্লাহ এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে দরদাম নির্ধারণ

www.eelm.weebly.com

করে। সেই বিধিটি চাহিদা ও যোগান বিধি হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং বুঝাই যায় যে ইসলাম অর্থনীতিতে বাজারদর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিটি মেনে নিয়েছে, এবং এটিকে খোদায়ী ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিতে হস্তক্ষেপ করাকে ইসলাম জুলুম বলে মনে করে অর্থ্যাৎ এ বিধিকে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে না দিলে তা অন্যায় হবে এবং এর পরিনতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। একারণেই রাসুল (সা.) কে যখন সাহাবীগণ দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা বললেন তখন তিনি তা করতে সম্মত হননি বরং তিনি এই জুলুমাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

ইমাম আবু দাউদ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ননা করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন -

قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو القابض الباسط الرازق وانى لا رجوا ان القى الله وليس احد منكم بطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال-

অর্থাৎ লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্য মূল্য খুব বেড়ে গেছে, অতএব আপনি দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহই বৃদ্ধি করনে ওয়ালা, কমানে ওয়ালা এবং রিযিক দেনে ওয়ালা। আমি আল্লাহর সাথে এভাবে মিলিত হতে চাই যাতে তোমাদের কেউ জান-মাল সংক্রান্ত কোন জুলুমের দাবী আমার কাছে জানাতে না পারে"। এই হাদীসটি তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারেমী, মুসনাদে আহমদ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। একই মর্মের হাদীস সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত জাবের থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে আল্লাহর বাজার দর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিযে চাহিদা ও যোগানের সয়ংক্রিয় বিধিই হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে। সেই হাদীসেরই শব্দ গুলো নিম্ন রূপ-

قال رسول الله (ص) لايبيع الحاضر لباد - دعوالناس يرزق الله بعضهم ببعض -
اخرجه مسلم - ترمذى

এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বাজার দরের উপর হস্তক্ষেপ করো না।) আল্লাহ তা'আলা কতিপয়ের দ্বারা কতিপয়ের জীবনোপকরনের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ ক্রেতা দ্বারা বিক্রেতা এবং বিক্রেতা দ্বারা ক্রেতার রিযকের ব্যবস্থা করেন। এটিই চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির সুস্পষ্ট আভাস। তবে সব কিছুকেই এই স্বাভাবিক

www.eelm.weebly.com

নিয়মের আওতায় পুঁজিপতিদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর এ ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না যে, তারা যা ইচ্ছা তাই করবেন। কেননা এই অবাধ স্বাধীনতা দ্বারাই মূলতঃ পুঁজিবাদ জন্ম নেয়। এবং সম্পদ গুটিকতক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার উপর এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু যদি তাদেরকে উৎপাদিত পণ্য স্বাধীন ভাবে বাজারজাত করার অধিকার না দেওয়া হয় তাহলে উৎপাদনে স্বতঃস্ফুর্ততা বিনস্ট হবে এবং শ্রম ও মেধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।

এ কারণে ইসলাম চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিটি মেনে নিয়ে উদ্যোক্তাদেরকে স্বাধীনভাবে পণ্য বাজারজাত করার অধিকার দিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের এই স্বাধীনতা যেন সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে না পারে এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে না পারে, সেজন্য তাদের কাজ-কর্মকে কতিপয় সুনির্ধারিত শর্ত ও বিধির আওতায় আবদ্ধ করে দিয়েছে। এই সব বিধি-বিধানের মাঝে সুদীলেনদেন, জুয়া, পণ্যবিহীন বেচাকেনা, অনুমানের ভিত্তিতে বেচাকিনা অবৈধ হওয়া অন্যতম। কেননা এই প্রক্রিয়া সমূহের মাধ্যমেই মূলতঃ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে গুটি কতক ধনীর হাতে। ইতিহাস সাক্ষী যে পুঁজিপতিদের সকল তৎপরতা এহেন কর্মকান্ডের উপরই নির্ভরশীল। এবং এ পন্থায়ই তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। তারা সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার উপর দখলদারিত্ব সৃষ্টি করে রাখে। এমন কি তারা চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকেও অচল করে দেয়।

এ কারণেই ইসলাম লেনদেন ও আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে বহু প্রকার লেনদেনকে ফাসেদ কিংবা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। ঐসব লেনদেনকে ফাসেদ বা বাতিল বলার কারণ এটিই যে এধরণের লেনদেন বাজারের স্বাভাবিক বিধিকে অকেজো করে দেয় এবং বাজার দরের উপর গুটি কতক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারিত্ব সৃষ্টি করে। যেমন- মালামাল গুদামজাত করে রাখা, শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই পণ্য আমদারী কারকদের থেকে পণ্য ক্রয় করে নেওয়া, গ্রামীন পণ্যের মালিকদের পক্ষ হয়ে শহুরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বিক্রি করে দেওয়ার প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা এতে বাজার দরের উপর এক ধরনের দখল দারিত্ব সৃষ্টি হয়।

একই কারণে ইসলাম ব্যবসায়ীদের সমিতি গঠন করাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। যেমন ঃ হিদায় গ্রন্থের كتاب الفئ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে- فقدصرح الفقهاء بانه لا يترك التجاريشتركون فيما بينهم-لتحكم الاسعار-

ফিকাহ্‌বিদরা সুস্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসায়ীদেরকে দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার দেওয়া যায় না। তাছাড়া ফিকাহ্‌বিদরা একথাও উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসায়ীদের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক ভাবে

www.eelm.weebly.com

বেড়ে গেলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ইসলামী সরকারের রয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার দাম ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

এ ছাড়াও সম্পদ যাতে ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে সে জন্য ইসলাম যাকাত, ফিৎরা, সাদাকাহ, কুরবানী, কাফ্ফারা, অধিনস্তদের ভরণ-পোষণ উত্তরাধিকার আইন সহ বিভিন্ন ধরনের বিধান জারী করেছে। এ সকল ব্যবস্থার মাঝেও সম্পদ আবর্তনের একটি বিষয় অতি সুক্ষ্ম ভাবে কাজ করে। কাজেই স্বাধীন ভাবে উপার্জন করলেও সম্পদ ব্যায় করে দিতেই হয়। ফলে সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার অবকাশ থাকেনা। তার পরও যদি কারো হাতে সম্পদ সঞ্চিত থাকে; তার উপর ইসলাম কতিপয় নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যেমন- দান-খয়রাতের প্রতি ধনীদেরকে সাংঘাতিক ভাবে অনুপ্রানিত করা হয়েছে বরং দান-খয়রাতকে তাক্ওয়া ওয়ালা মু'মিনের বৈশিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

ذالك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين - الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلواة ومما رزقناهم ينفقون -

এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে তারওয়ার অনুসন্ধিৎসুদের জন্য হেদায়াত রয়েছে-যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কয়েম করে এবং জীবনোপকরণ হিসাবে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করে।

দানের পারলৌকিক প্রতিদানের সুস্পষ্ট আভাস ঘোষণা করা হয়েছে -

وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا- واحسن كما احسن الله اليك-

আল্লাহ যা তোমাকে দান করেছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশের কথা ভুলে যেয়ো না। আর পরোপকার কর যে ভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি ইহ্সান করেছেন। - সূরাঃ কাসাস ঃ ৭৭

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء-

যারা তাদের মাল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে তাদের এ দানের উপমা হল একটি শষ্য দানার মত যা থেকে সাতটি শীষ গজায়, প্রতিটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আরো বহুগুণ বর্ধিত প্রদান করেন। - সূরা ঃ বাকারা ঃ ২৬১

আবার দান না করে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার ভয়াবহ পরিনতির কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে -

www.eelm.weebly.com

والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم-

আর যারা সোনা রূপা (অর্থ সম্পদ) জমিয়ে রাখে এবং সে গুলো আল্লাহর পথে ব্যায় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। - সূরাঃ ৯ ঃ ৩৪

হাদীসে নবী কারীম (সা.) কৃপণতার ভয়াবহ পরিনতির কথা উল্লেখ করতে যেয়ে ইরশাদ করেছেন- البخيل لايدخل الجنة। কৃপণ ব্যক্তি কখই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

পড়শী ও প্রতিবেশীর প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

إيما أهل عرصة ظل فيهم إمرؤ من المسلمين طويا (يعنى جائعا) فقد برئت ذمة الله منهم

যে জনপদে কোন মুসলমান অভূক্ত থাকে তাদের থেকে আল্লাহর দায়-দায়িত্ব উঠে যায়।

অন্য এক হাদীসে তিনি পড়শীকে অভূক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়াকে ইমানের পরিপন্থী কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ করেছেন -

ليس بمؤمن من شبع وجاره جائع সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে অথচ তার পড়শী আনাহারী থাকে।

সার কথা ইসলাম তার সমগ্র ব্যবস্থাপনায় এমন একটি প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করেছে, যাতে ব্যাক্তি তার স্বাধীন উদ্যোগে মেধা ও শ্রম ব্যায় করতেও যেন কার্পণ্য না করে, আবার অর্জিত সম্পদ বাজার জাত করণের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক অবস্থা বহাল থাকে, তার উপর কোন চাপ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু সম্পদ যাতে তার হাতে কুক্ষিগত না হতে পারে। যদি কিছু সঞ্চিত হয়ও তবু যেন সে এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিলিয়ে দেয় যাতে সম্পদ ধনীদের হাত থেকে গরীবদের হাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়। অশুভ পুঁজিতন্ত্রের জন্ম না হয়। এই সবকিছুর পিছনে অর্থনৈতিক বিচারে একটিই উদ্দেশ্য কাজ করছে, যার প্রতি কুরআন ইশারা করছে- كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে পড়ে। - সূরা ঃ ৫৯ ঃ ৭

সার কথা ইসলাম যথা সম্ভব ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ রাখতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সামষ্টিক স্বাধীনতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। আবার চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে কার্য্যকর রাখার চেষ্টা করেছে, যাতে বাজার দর স্বাভাবিক গতিতে অব্যাহত থাকে। কিন্তু সম্পদ উপার্জনের এমন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে; যাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ গুটি কতক ব্যক্তির হাতে চলে না যায় এবং চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক বিধিকে অথর্ব না করে দেয়। এজন্য ইসলামী বিধানে বহু ধরণের লেন-দেন কে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর যদি

www.eelm.weebly.com

এ ধরণের অবৈধ সঞ্চয়ের কোন প্রক্রিয়ার সূচনা হতে দেখা যায়; তাহলে রাষ্ট্রকে সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

বলা যায় যে, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর যাতে পুঁজিবাদের অশুভ অবস্থার সৃষ্টি না হয় সে জন্য তিন ধরণের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১. দ্বীনী প্রতিরোধ ঃ অর্থাৎ ব্যক্তি অবাধ মালিকানার অধিকার লাভ করার পরও তাকে শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকেই আয়-উপার্জন করতে হবে-এই ঘোষণা ইসলাম দিয়ে রেখেছে। ফলতঃ ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে ব্যক্তিকে সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা ও সকল প্রকার হারাম লেনদেন পরিহার করে চলতে হয়, অথচ ঐসব লেনদেনের মাধ্যমেই ব্যক্তি রাতারাতি পুঁজিপতি বনে যায়।

২. রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ ঃ ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার ব্যবস্থার উপর যদিও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয় না কিন্তু যদি কেউ বাজার ব্যবস্থার উপর দখলদারিত্ব সৃষ্টি করতে চায় কিংবা যদি স্বাভাবিক বাজার দরে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার ইসলাম রাষ্ট্রকে দিয়েছে।

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এর সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন-

من دخل فى شيئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقذفه فى معظم من النار ورأسه اسفله - احرجه الحاكم و بيهقى واحمد-

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বাজারদর চড়িয়ে দেওয়ার মানসে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করবে, তাকে মাথা নিচ দিকে দিয়ে কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করার অধিকার আল্লাহর রয়েছে।

একবার হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতা (রা.) স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে কম দামে কোন দ্রব্য বিক্রি করছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে বললেন-

اما ان تزيد فى السعر واما ان ترفع من سوقنا - اخرجه مالك وعبد ابن حميد والبيهقى

হয়ত তুমি তোমার দ্রব্যের দাম বাড়াবে, না হয় তুমি আমাদের বাজার থেকে উঠে যাবে।

এ হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে দাম ব্যবস্থায় কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে।

৩. নৈতিক প্রতিরোধ ঃ অর্থাৎ ইসলাম মানুষের মাঝে সহানুভূতি, সহমর্মীতা ও সদাচারের অনুভূতি সৃষ্টি করতে চেষ্ট করেছে এবং নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যের উপকার করার চেতনা সৃষ্টি করেছে। ইরশাদ হয়েছে -

يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

www.eelm.weebly.com

দানশীলতায় অগ্রগামী হওয়ার অনুপ্রেরনা দিয়েছে, দুনিয়ার লোভ লালসা ভোগ বিলাস থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছে, কৃপণতাকে জঘন্য মনোবৃত্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। সর্বোপরি ইসলাম মানুষকে এমন একটি চেতনার উপর গড়ে তুলতে চেয়েছে - যাতে সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে মানুষের জীবনের মৌলিক লক্ষ্য সমূহের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি, বরং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলে পরকালের সফলতা অর্জনকে জীবনের পরমলক্ষ্য হিসাবে স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

মতবাদ সমূহের সার কথা ঃ

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সার কথা ঃ

১. অবাধ ব্যক্তি মালিকানা।
২. বেসরকারী উদ্যোগের অবাধ সুযোগ এবং সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অবাধ অধিকার।
৩. স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা।
৪. ভোক্তার স্বাধীনতা।
৫. অবাধ প্রতিযোগিতা।
৬. মুনাফায় একচেটিয়া অধিকার এবং সে লক্ষ্যে সকল কাজ-কর্ম।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সার কথা ঃ

১. সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা।
২. উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন সুযোগ না রাখা।
৩. একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে চাহিদা ও উৎপাদনের অনুপাত নির্ধারণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিষদের নির্দেশে যাবতীয় কাজ-কর্মের আঞ্জাম।
৪. ভোক্তাদের স্বাধীনতাও এ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত থাকে। ইচ্ছা করলেই কেউ যথেচ্ছা পরিমাণ ভোগ করতে পারে না।

মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার সার কথা ঃ

১. এ ব্যবস্থায় সম্পদে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানা উভয়টিই বিদ্যমান থাকে।
২. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি কাজ করে। মূলতঃ এ ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।
৩. ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত সকল উৎপাদনশীল খাত ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে অর্থাৎ প্রয়োজন বোধে সরকার সর্বক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে।

www.eelm.weebly.com

৪. ধনতন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী বিধি-নিষেধ দ্বারা আংশিক নিয়ন্ত্রিত থাকে।

৫. ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী এব্যবস্থায় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়। ভোক্তারাও আপন ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করতে পারে। তবে বৃহত্তর স্বার্থে সরকার অনেক সময় বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. অবাধ মুনাফা অর্জনের অধিকার এব্যবস্থায় থাকে। তবে সরকার জনকল্যাণের স্বার্থে দাম ও মুনাফা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সার কথা ঃ

১. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض. তুমি কি জান না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর। (বাকার ঃ ১০৭)

فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شئ واليه ترجعون

অতএব পবিত্র তিনি, যার হাতে সবকিছুর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। - ইয়াসিন ঃ ৮৩

যেহেতু সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর, সুতরাং মানুষ কেবল তাদের বৈধ দখলদারিত্বের মাধ্যমে এই সম্পদ ভোগের অধিকার লাভ করতে পারবে।

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده

নিশ্চয়ই ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর উত্তরাধিকার দান করেন। - সূরাঃ আ'রাফ ঃ ১২৮

২. যেহেতু সবকিছুর চূড়ান্ত মালিকানা আল্লাহর, তাই আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবিকা অর্জন ও যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে হবে। তাঁর বিধান ডিঙ্গাবার অধিকার নেই কারো।

ولله ميراث السموت والارض والله بما تعملون خبير-

আসমান ও যমীনের আধিপত্য আল্লাহরই। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত আছেন। - সূরা ঃ আল্-ইমরান ঃ ১৮০

انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون-

আমিই ভূ-পৃষ্ঠের একমাত্র উত্তরাধিকারী, এবং যা কিছু তার উপর রয়েছে তারও। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। - সূরা ঃ মারইয়াম ঃ ৪০

www.eelm.weebly.com

৩. যেহেতু ইসলাম সমস্ত সম্পদের মূল মালিক আল্লাহকে মনে করে এবং ব্যক্তিকে সেই সম্পদে সাময়িক কালের জন্য আমানতদার মনে করে; এজন্যই একচ্ছত্র ব্যাক্তি মালিকানার বিশ্বাসের ফলে আমিত্ব ও অহংকারের ন্যায় দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলো ব্যক্তির মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনা এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবনতা জন্মে না।

৪. ইসলামী অর্থনীতিতে বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক উন্নতির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে নৈতিকতার সীমা ডিঙ্গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে অর্থ সম্পদ আহরণের বিষয়টিকে মোটেও অনুমোদন দেওয়া হয় না। ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, কালবাজারী, মওজুতদারী, ভেজাল মিশ্রণ, জুলুম, শোষণ ইত্যকার পন্থায় সম্পদ আহরণের অনুমোদন দেওয়া হয় না।

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين-

এই যমীন আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারিত্ব দান করেন। শুভ পরিমাণ তো মুত্তাকীদের জন্যই (অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এসব বর্জন করে তাদের জন্যই)।

৫. সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় যেহেতু সমাজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোষিত হয় তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় কোন রূপ সুদী লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয় না।

৬. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার কারো নেই। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ, যাকাত, সাদাকাহ ও সাধারণ জনকল্যাণের নিমিত্তে দান করে দিতে হয় অথবা উৎপাদনে নিয়োগ করার মাধ্যমে ব্যয় করে দিতে হয়। ফলে সম্পদের স্বাভাবিক আবর্তন অব্যাহত থাকে।

৭. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকে স্বাভাবিক ভাবে কার্যকর রাখা হয়। তবে এই চাহিদা ও যোগান বিধির আওতায় উৎপাদন ও ভাগ-বন্টনের যাবতীয় কার্যাবলী আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়।

৮. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য অধিক মুনাফা অর্জন নয়। বরং সমাজের মানুষের চাহিদা পূরণকল্পে হালাল ভোগ্যপন্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠির সেবা করা। লভ্যাংশ যা পাওয়া যাবে তাদ্বারাও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সেবা করা। এ দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন- نفقتك لنفسك صدقة ولاهلك صدقة

তুমি নিজের জন্য যা ব্যায় করবে তা সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে এবং পরিবার পরিজনের জন্য যা ব্যায় করবে তাও সাদাকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

৯. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকে নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট। খাদ্য গ্রহণের পর বর্তনে যা লেগে থাকে সেই পরিমাণ সম্পদও যাতে

www.eelm.weebly.com

অপচয় না হয় এজন্য রাসূল (সাঃ) বর্তন চেটে খাওয়াকে সুন্নত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যে খাদ্য মাটিতে পড়ে যায় তা কুড়িয়ে খাওয়াকেও সুন্নত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিলাস ও অপচয়ের কোন সমর্থন নেই।

১০. ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ইহকালীন সমৃদ্ধির সাথে সাথে পরকালীন সাফল্যের দিকটিকে সব সময় বড় করে দেখা হয় এবং পরকালীন সাফল্যকেই মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নত করা হয়। আর এই পরকালীন সাফল্য নির্ভর করে স্রষ্টার সন্তুষ্টির উপর। তাই সকল অর্থনৈতিক কর্ম-কান্ডে স্রষ্টার অভিপ্রায়কে সামনে রেখে তার নির্ধারিত বিধান মাফিক সব কিছু আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মানুষ নিজ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়। তাই আইন লঙ্ঘন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বনের প্রবণতা কখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে না। মানুষ নিজস্ব তাড়নায় আইনানুগ জীবন যাপণ করে। এমনকি সম্পদ মানুষের কল্যাণে সাদকাহ করে দিলে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ হয় ও তার ক্রোধ প্রশমিত হয় এই বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তি তার নিজের সম্পদ অকাতরে অন্যকে বিলিয়ে দেয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন- فان الصدقة تدفع غضب الرب-

সাদাকাহ প্রতিপালকের ক্রোধকে প্রশমিত করে। অন্য হাদীসে তিনি বলেন- সাদাকাহ জাহান্নামের আগুনকে নির্বাপিত করে। সারকথা মানুষ অকাতরে সম্পদ দান করে পরকালীন সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করে। আর এপথে সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করনের মানসিকতা হ্রাস পায়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এবং সকল বিধি-বিধান আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এজন্য কোন বাড়তি চাপের প্রয়োজন হয় না।

পুঁজিবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা

পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানার অবাধ অধিকার প্রদানের ফলে মানুষের মাঝকার ব্যাক্তিমালিকানার স্বভাবজাত চাহিদাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মানুষের মেধা ও শ্রমকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগানোর পথ উম্মুক্ত হয়েছে। আর বাজারদরের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকে কার্যকার রেখে আরেকটি স্বভাবজাত বিষয়কে অনুমোদন করা হয়েছে। অতএব এ ক্ষেত্রে তাদের কোন গলতি নেই। তবে গলতি দেখা দিয়েছে ব্যক্তি মালিকানা ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যিক্তিকে যে অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই খানে। ব্যক্তি মালিকানা ও মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে যেমন সমাজের বৃহত্ত্বর জনগোষ্ঠির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি; তেমনি, উৎপাদন, মুনাফা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হালাল-হারাম ও বৈধ অবৈধের কোন সীমা রেখা চিহ্নিত করা হয়নি এব্যবস্থায়।

www.eelm.weebly.com

ফলে অবাধ শোষণ ও জুলুমের দ্বার উম্মুক্ত হয় এই অর্থ ব্যবস্থার পরিণতিতে। এই অর্থ ব্যবস্থার শোষণের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল-

⁕ যেহেতু অধিক মুনাফা অর্জনই এ অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের পথে বৈধ-অবৈধের ও হালাল-হারামের কোন বাধা-বন্ধন নেই; অতএব অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন এবং যা কিছু উদ্যোক্তার পক্ষে করা সম্ভব তার সব কিছুই উদ্যোক্তারা করে থাকেন।

⁕ কাঁচামাল, উৎপাদনের উপকরণ সস্তায় ক্রয়ের জন্য যে সব হীন তৎপরতা গ্রহণ করা সম্ভব তাই তারা করে থাকে। উৎপাদকদেরকে কাঁচামাল কম মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করে। ফলে তারা বঞ্চিত ও শোষিত হয়। শ্রমিকদেরকে যত কম মূল্যে সম্ভব খাটাবার উদ্যোগ নেয় উদ্যোক্তারা। নামে মাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের থেকে সর্বোচ্চ শ্রম আদায় করে নেওয়া হয়। শ্রমিকরা সস্তায় শ্রম বিক্রয় করতে সম্মত না হলে উদ্যোক্তারা এমন এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে; যাতে কম মূল্যে শ্রম বিক্রয় করতে শ্রমিকরা বাধ্য হয়। শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধি ও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে চাইলে সে আন্দোলনকে কিভাবে স্তব্ধ করে দিতে হয়; সে কৌশল উদ্যোক্তাদের ভাল ভাবেই রপ্ত করা থাকে। লে-অফ্ ঘোষণা করে, যখন তখন শ্রমিক ছাটাই করে এবং নেতাদেরকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করে সে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে শ্রমিকরা অসহায় হয়ে সস্তায় শ্রম বিক্রয় করে এবং শোষিত হয়।

অথচ লভ্যাংশ উদ্যোক্তরা একাই ভোগ করেন এ যুক্তিতে যে, তিনিই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহন করছেন এবং মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। ফলে শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করলেও সে যৎসামান্য বেতনের বেশী আর কিছু পায় না।

⁕ এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিযোগিতা থাকে তাই উৎপাদন বেশী হয় ও উৎপাদন ত্বরান্বিত হয় এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয় একথা সত্য, কিন্তু একজন উদ্যোক্তা অন্যজনকে পরাস্ত করার জন্য যে জঘন্য পন্থাসমূহ অবলম্বান করে থাকেন তা বর্ণনাতীত। এমনকি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অমানবিক ও মানবতাবোধের পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও পিছপা হয় না। অনেক সময় এই বিরোধিতা রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করে। ফলে দেশের রাজনীতি চরম সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং জনগণ চরম দূর্ভোগের শিকার হয়। অনেক সময় উদ্যোক্তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। ফলে দেশের রাজনীতি তাদের হতে জিম্মি হয়ে পড়ে। পূঁজিপতিরা সংঘবদ্ধ হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়।

www.eelm.weebly.com

❋ মূল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্যোক্তারা অনেক সময় উৎপাদিত পণ্য গুদামজাত করে রেখে কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করে থাকে। অনেক সময় উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করে দিয়ে হলেও সংকট সৃষ্টি করে অধিক মুনাফা লোটার ফিকিরে থাকে। ফলে সম্পদের অপচয় হয়। এই অপচয়ের চাপ গিয়ে পড়ে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার উপর। উদ্যোক্তারা অর্থ সংকটে পড়লে তা কাটিয়ে উঠার জন্য অনেক সময় শেয়ার ছেড়ে থাকেন কিন্তু এ শিয়ারে লভ্যাংশের শতকরা কত টাকা বিনিয়োগকারীকে দেওয়া হবে তা পূর্বে ঘোষণা করা হয় না। ফলে বিনিয়োগকারীরা বৎসরান্তে নামছাম একটা কিছু লভ্যাংশ পেয়ে থাকে বটে তবে তা উদ্যোক্তার ইচ্ছা মাফিক।

❋ অনেক সময় পূঁজির সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য তারা সুদীব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। যদিও ব্যাংকে অর্থ বিনিয়োগকারীদেরকে একটা নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে কিন্তু তা তাদের উপার্জিত লভ্যাংশের তুলনায় খুবই নগণ্য। আবার এই অর্থ নিয়ে তারা ব্যবসায়ীদের নিকট লগ্নি করে থাকেন। ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে ব্যাংকের সুদের টাকা যোগ করে তবেই পণ্যের বাজারদর নির্ধারণ করে থাকেন। ফলে এই লভ্যাংশের দায়ভার যেয়ে পড়ে দেশের প্রতিটি নাগরিকের উপর। এমনকি যিনি ব্যাঙ্কে টাকা বিনিয়োগ করেছেন তাকেও এই লাভের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। বৎসরে বিভিন্ন পণ্যের উচ্চমূল্য পরিশোধ করে তিনি যত টাকা গচ্ছা দেন, ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া সুদের পরিমাণ সে তুলনায় খুবই নগণ্য। আর যারা ব্যাঙ্কে টাকা বিনিয়োগ করেন না; তাদেরকে লভ্যাংশে কোনরূপ অংশিদারিত্ব ছাড়াই পুঁজিপতিদের বিলাসের অর্থযোগান দেওয়ার জন্য উচ্চ মূল্যে সব সময় পণ্য ক্রয় করতে যেয়ে হাজার হাজার টাকা গচ্ছা দিতে হয়। এই ভাবে পুঁজিপতিরা সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলে। আর তাদের এই শোষণের নিগড়ে বন্ধি হয়ে সাধারণ মানুষ ক্রমে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অর্থ চলে যায় দেশের গুটি কতক রাগব বোয়ালের হাতে।

❋ এই অর্থ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়ের পথ খোলা থাকে। ফলে লটারী, হাউজী, বীমা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে চিত্তাকর্ষক কিছু প্রলোভন দিয়ে লাভের সোনার হরিণ প্রাপ্তির লোভনীয় ফাঁদে ফেলে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা পুঁজিপতিরা পকেটস্থ করে থাকে। সাধারণ মানুষ এই ফাঁদ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন থাকে না। ফলে দশ বিশ টাকা দিয়ে একটি লটারীর টিকেট ক্রয় করে ফেলে সোনার হরিণ প্রাপ্তির আশায়। অথচ এই ভাবেই যে জনগণের কোটি কোটি টাকা তারা দেদারছে শোষণ করে যাচ্ছে এ অংক অশিক্ষিত নাগরিকদের কয়জন মিলাতে পারে। এরূপভাবে পণ্যে ভেজাল দিয়ে কালবাজারীর আশ্রয় গ্রহণ করে, মাপে কম দিয়ে মানুষের অজ্ঞাতসারে তাদের থেকে কোটি কোটি টাকা শোষণ করা হয়।

সূদী অর্থব্যবস্থার অনুমোদনের ফলে এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট

www.eelm.weebly.com

হয় এবং ব্যাপক ভিত্তিতে শোষণের দার উন্মুক্ত হয় এবং সম্পদ গুটিকতক পুঁজিপতির হাতে চলে যায়।

কেননা কোন উদ্যোক্তা যদি সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা শুরু করেন, আর এমতাবস্থায় তিনি যদি তার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হন তবুও অর্থ লগ্নিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সুদের দাবী অবশ্যই প্রত্যাহার করে না, এমতাবস্থায় ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হলেও অর্থ লগ্নিকারী ব্যক্তির হাতে সুদের টাকা পুঁঞ্জিভূত হতে থাকে। এ ভাবেই পূঁজি চলে যায় অর্থ লগ্নি কারী ব্যক্তির হাতে।

আবার বড় ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসার জন্য উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে মোটা অংকের লোন সুদের ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংকে সঞ্চিত টাকা গুলো সাধারণ মানুষেরই রক্ত পানি করা টাকা।

অর্থনীতিতে একথা সাধারণ ভাবেই স্বীকৃত যে, পুঁজি যত বেশী বিনিয়োগ করা হবে লভ্যাংশের শতকরা হার তত বেশী বৃদ্ধিপাবে। যেমনঃ ১০০/= (একশত) টাকা পুঁজি নিয়ে যিনি ব্যবসায় নামেন তার লাভ যদি ৫% হয়, তাহলে যিনি ১০০০/= (এক হাজার) টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করবেন তার লাভ ১০% হবে। অনুরূপ ভাবে এক লক্ষ টাকার পুঁজি যিনি খাটাবেন তার লাভ ২০% হবে। এভাবে যত বৃহৎ অংকের পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে লভ্যাংশের শতকরা হার তত বৃদ্ধি পাবে।

অতএব ব্যাংক থেকে মোটা অংকের লোন নিয়ে যিনি বৃহৎ মানের শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করবেন, তার লাভের হার অনেক বেশী হবে। ধরে নেওয়া যাক, একজন উদ্যোক্তা ১০০ কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, যার ১০ কোটি টাকা তার নিজের, আর ৯০ কোটি টাকা তিনি ব্যাংক থেকে লোন গ্রহণ করেছেন। উক্ত উদ্যোক্তা যদি ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতেন; তাহলে যদি তার লাভের হার হতো শতকরা ২৫ টাকা তাহলে লোন সহ ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কারণে তার লভ্যাংশ আসবে শতকরা ৫০ টাকা বা তার চেয়ে বেশী। এই লভ্যাংশের মাঝে ব্যাংককে সুদ হিসাবে তিনি হয়তো পরিশোধ করবেন শতকরা ১৫ টাকা। ব্যাংক এই সুদের টাকা থেকে নিজের অংশ রেখে ব্যাংকে আমানতকারীদেরকে দিবে শতকরা সাত টাকা। আর আট টাকা ব্যাংক মধ্যস্বত্ত্বভোগী হিসাবে নিজে রেখে দেবে। যার মালিক হবে পুঁজিপতি ব্যাংকাররা প্রকৃত পক্ষে উক্ত উদ্যোক্তা যে শতকরা ৫০ টাকা লভ্যাংশ কামালেন, তা কিন্তু ব্যাংকে জমাকৃত জনগণের টাকার উপর ভিত্তি করেই। তা না হলে তার নিজের টাকায় এই মোটা লভ্যাংশ কখনই আসত না। অথচ যাদের টাকা দিয়ে তিনি এত মোটা অংকের টাকা কামালেন, তারা পেল মাত্র ৭ টাকা, আর ব্যাংক মধ্যসত্বভোগী হিসাবে পেল ৮ টাকা। আর উদ্যোক্তা

www.eelm.weebly.com

নিয়ে গেলেন ৩৫ টাকা। অথচ তার বিনিয়োগকৃত টাকা মাত্র ১০ কোটি, যা বিনিয়োগ করলে তিনি শতকরা ২৫ টাকার বেশী লাভ কিছুতেই করতে পারতেন না। এভাবেই সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জনগণের ট্যকার উপর ভিত্তি করে পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়। অথচ টাকার মালিক পায় লাভের একেবারেই নগণ্য অংশ।

এতেই বিড়ম্বনার শেষ হয়না বরং এই পুঁজিপতিরা ব্যাংককে সুদ হিসাবে যে টাকা দিয়ে থাকেন; তা তারা পণ্যের উৎপাদন ব্যায়ের সাথে সংযোজন করে দেন। অর্থাৎ ধরা যাক উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে লবন উৎপদান করছেন। এক্ষেত্রে যদি লবনের মণপ্রতি উৎপাদন খরচ দাড়ায় ১০০ টাকা; তাহলে তিনি তার নিজের লাভ শতকরা ২৫%টাকা ধরে ১২৫ টাকায় তা বাজারজাত করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু ব্যাংকের লোন ১৫% তাকে পরিশোধ করতে হবে, তাই এর সাথে ব্যাংকের সুদের টাকা সংযোজন করে ১০০+২৫+১৫=১৩৫টাকা দরে তিনি লবন বাজারজাত করবেন। ফলে ব্যাংককে দেয় সুদের টাকাটা তিনি জনগণের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন। এ লবন ক্রয় করছে দেশের সর্ব সাধারণ যাদের মাঝে ব্যাংকে আমানতকারীরাও রয়েছেন। যদি একজন আমানতকারী ব্যাংকে ১০০ টাকা জমা রেখে থাকেন; তাহলে তিনি বৎসরান্তে পাবেন ১০৭ টাকা। অথচ যদি তার পরিবারে বৎসরে ২মণ লবণ খরচ হয় তাহলে তিনি লবন বাবৎ অতিরিক্ত ব্যায় করেছেন ৩০ টাকা। অন্যান্য পণ্য ক্রয় করেও তাকে এই হারে টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে।

আবার যদি কোন ব্যবসায়ী ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে বীমা কোম্পানী তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। অথচ বীমা কোম্পপানীগুলোর হাতে জমাকৃত টাকাও জনগণেরই টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায় মূল পুঁজি যে জনগণ বিনিয়োগ করছে, আবার ক্ষতিপূরণ যে জনগণ যোগাচ্ছে, তারা পাচ্ছে লভ্যাংশের নূন্যতম অংশ। আর ব্যাংকার ও পুঁজিপতিরা পাচ্ছেন লভ্যাংশের সিংহ ভাগ। আবার যদি ব্যবসায়ী দেওলিয়া হয়ে পড়ার কারণে ব্যাংকের লোন পরিশোধ না করেন কিংবা যদি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে তার দায়ভারও আমানতকারীকেই বহন করতে হয়।

তাহলে সার কথা কি এই দাড়ায় না যে, যিনি পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন, যিনি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন, যিনি লোকশানের দায়ভার গ্রহণ করছেন, সেই বিনিয়োগকারী জনগণ পাচ্ছে লভ্যাংশের নুন্যতম অংশ। অথচ উদ্যোক্তা একাই হাতিয়ে নিচ্ছেন লভ্যাংশের বৃহদাংশ। এ ভাবেই সুদী অর্থ যোগান ব্যবস্থায় অর্থ চলে যায় গুটি কুতক উদ্যোক্তা পুঁজিপতির হাতে। এই শোষণের নিগঢ়ে বন্দি হয়ে পড়ে দেশের আপামর জনসাধারণ।

www.eelm.weebly.com

✳ যেহেতু এই অর্থ ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন ও আমদানীর ক্ষেত্রে হালাল হারামের কোন বিধি-নিষেধ থাকে না ফলে যে পণ্য উৎপাদন করলে বা আমদানী করলে লাভ বেশী হবে পুঁজিপতিরা তাই করে থাকেন । উৎপাদিত বা আমদানীকৃত পণ্য জনগণের নৈতিক জীবনের উপর কি প্রভাব ফেলছে, নাগরিক জীবনে কি জটিলতা সৃষ্টি করছে কিংবা গণ-স্বাস্থের উপর কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে এসব বিষয় নিয়ে তারা কখনই ভাবেন না। ফলে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ ও ক্ষতিকর পণ্যের উৎপাদন ও আমদানীর ফলে নাগরিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতা ও উশৃংখলতা সৃষ্টি করে। গণ-স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। জাতীয় জীবনে নৈতিক ধ্বস নেমে আসে। এক কথায় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব নব পন্থার উদ্ভাবন হয় একথা সত্বেও দেশের সাধারণ নাগরিক জীবনে অভাব কমে না। অর্থ গুটি কতক ব্যক্তির হাতে বন্দি হয়ে পড়ে। এই অর্থব্যবস্থায় অবাধ শোষণের ব্যবস্থা থাকে বাধাহীন। প্রতারণা, ধোঁকা, কালবাজারী, দ্রব্যে ভেজাল ইত্যাদি হু হু করে বৃদ্ধি পায়। জন জীবনে বিভিন্ন ধরণের অনৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি এ ব্যবস্থায় অর্থসর্বস্ব এক ধরণের মানসিকতা গজিয়ে উঠে। মানুষের চাহিদা লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলে। সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও মানুষের চাহিদা বেড়ে যায় তার চেয়ে কয়েক গুণ। সুতরাং অভাব আর শেষ হয় না। এই বাড়তি চাহিদাসৃষ্ট অভাবের তাড়নায় সমাজের সর্বত্র অবৈধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের তৎপরতা শুরু হয়। ফলে দূর্নীতিতে ছেয়ে যায় গোটা সমাজ। অফিস আদালত সর্বত্র ঘুষ দূর্নীতি শুরু হয়। ফলে মানুষের জীবন হয়ে উঠে দূর্বিসহ। এরই মাঝে গুটি কতক মানুষ অর্থের উপর গড়াগড়ি দিয়েও আরও অর্থ চাই বলে চিৎকার করতে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উপর পর্যালোচনা

সামাজ তান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মানুষের মাঝকার অর্থনৈতিক ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে সাম্য সৃষ্টির যে শ্লোগান শুনানো হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এক আল্লাহর বান্দা হয়ে এক আদমের সন্তান হয়ে কেউ থাকবে পাঁচ তলায় আর কেউ থাকবে গাছ তলায় আর কেউ মাথা গোজার ঠাঁইও পাবেনা এ নিশ্চয়ই অন্যায়। এই ভেদাভেদ অবশ্যই মেনে নেয়া যায় না। সুতরাং সামাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সাম্য সৃষ্টির এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে বিশ্ব মানুষের প্রতি এক দরদী প্রয়াস বটে।

কিন্তু সাম্য সৃষ্টির জন্য তারা যে ফরমূলা পেশ করেছে এবং এর জন্য তারা যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছে তার গোড়ায় গলত থেকে গেছে। পুঁজিবাদে অবাদ ব্যক্তি মালিকানা প্রদানের ফলে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

www.eelm.weebly.com

হয়েছে তা একেবারেই সুস্পষ্ট। এই অবাধ মালিকানার ফলে সম্পদ গুটি কতক পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে জুলুম ও শোষণের দ্বার উম্মুক্ত হয় এ কথাও চূড়ান্ত সত্য। কিন্তু তা রোধ করার জন্য সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানাকে যে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দেওয়া হয়েছে; এর পরিণতি কিন্তু আরও ভয়াবহ।

কেননা বিশ্ব মানুষের চাহিদা নুন্যতম পর্যায়ে পূরণ করতে হলেও জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান উর্ধগতির সাথে সঙ্গতি রেখে চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের ধার অব্যাহত রাখা অবশ্য অপরিহার্য্য। যদি কোন কারণে উৎপাদনের ধারা শ্লথ হয়ে পড়ে; তাহলে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সংকট সৃষ্টি হবে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য সর্বকালের মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ভূ-পৃষ্ঠে সন্নিহিত করে রেখেছেন। কুরআনে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই মহাবিশ্ব তিনি ৬ (ছয়) দিন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চার দিন শুধু ব্যয় হয়েছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ ভূ-পৃষ্ঠে সন্নিহিত করতে। সেই সন্নিহিত সম্পদ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমুখী উদ্যোগের এবং শ্রমের। প্রয়োজন নতুন চিন্তা নতুন পদ্ধতি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির। একমাত্র ব্যক্তিমালিকানাই এমন বিষয়, যা মানুষকে উৎপাদনে নতুন চিন্তা নতুন পদ্ধতি ও সীমাতীত শ্রম নিয়োগে উৎসাহিত করে; আমি কিছু করলে তার স্বত্তাধিকারী আমি হব না; এরূপ জানা থাকলে কেউই উৎপাদনের কঠিন ঝুঁকি নিতে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত বোধ করে না। উপরন্ত যদি জানা থাকে যে, আমি আমার মেধা ও শ্রমকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যবহার না করলেও আমার নিত্য দিনের প্রাপ্য তালিকায় কোন রূপ ভাটা পড়বে না তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই অলসতার শিকার হয়। এটা মানুষের চিরন্তন এক স্বভাব। আর এ ধরণের রুটিন করা জীবনে যেহেতু ভবিষ্যত কোন স্বপ্ন বা পরিকল্পনা থাকে না; তাই মানুষের চিন্তা-চেতনা নতুন উদ্ভাবনের পথে কোন তাকিদ বা প্রেরণা অনুভব করে না। এর পরিণতিতে সময়ের প্রয়োজনের সাথে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় না। ফলে ক্রমেই সংকট ঘনিভূত হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাত্র সত্তুর বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ সত্য চরম ভাবে সুপ্রমানিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক পন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সবকিছু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার আওতায় আঞ্জাম দেওয়ার যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে, এতে বহু ধরণের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

কেননা মানব জীবনে পদে পদে এমন বহু সমস্যা দেখা দেয়; যা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধান করা সম্ভব হয় না। জীবনে এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে ব্যক্তিগত পরিকল্পনাই অধিক ফলপ্রসু হয়। প্রকৃতি সেগুলোকে ব্যক্তির ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের উপরই রেখে দিয়েছে। যেমন স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের বিষয়টি। এধরণের বিষয়কে যদি পরিকল্পনার আওতায় আনা হয় তাহলে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ।

⁕ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা তৈরী করেন যারা তারাও মানুষ। তারা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ইচ্ছা-অভিপ্রায় থেকে মুক্ত নন। তাছাড়া তাদেরও ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে যদি এ ধরণের কোন কিছু ঘটে; তাহলে গোটা জাতির উপর তার প্রভাব পড়বে।

⁕ এই পরিকল্পনা অবশ্যই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের অনুকূল হবে না। অতএব তা কার্যকর করার জন্য একটি শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রী সরকারের প্রয়োজন হবে; যারা বল প্রয়োগ করে সকলকে তা মানতে বাধ্য করবে। যা মানুষের স্বাধীনতার উপর মারাত্মক হস্তক্ষেপ হবে।

⁕ ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন যেহেতু থাকবে না। অতএব মানুষের দৈনন্দিন কর্মের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। শ্রমদানের ক্ষেত্রে কারোই আন্তরিকতা থাকবে না। ফলে মেধা বিকাশ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চুড়ান্ত উদ্যোগ ব্যাহত হবে মারাত্মক ভাবে।

একটি সুষ্ঠু অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য বিষয়

একটি সুষ্ঠ অর্থনীতির জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একান্ত অপরিহার্য।

১. একটি সুষ্ঠ অর্থনীতিতে অর্থ সম্পদের ব্যাপরে এমন একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অবশ্যই অপরিহার্য, যাতে ভূ-পৃষ্ঠের সীমিত সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি সৃষ্টি না হয়। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব কোন মানসিকতা গড়ে না উঠে। এমন কোন মানসিকতা যাতে মাথা চাড়া না দিয়ে উঠে; যাতে অন্যের কল্যাণ চিন্তা বিবর্জিত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। সম্পদশালী ও বিত্তবানদের মাঝে আমিত্ব ও অহংবোধ যাতে মাথাচাড়া না দিয়ে উঠে। অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ হাসিলের মত কোন জঘন্য মনোবৃত্তি যাতে জন্ম না নেয়। বরং এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি সেই অর্থনীতিতে থাকতে হবে, যাতে নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের উদ্যোগের সাথে সাথে বিশ্ব মানুষের কল্যাণকামিতার মানসিকাতার আলোকে সকলের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সমূহ গৃহীত হবে-এমন মানসিকতা গড়ে উঠে।

২. সেই অর্থ ব্যবস্থাকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং এই অর্থ ব্যবস্থার আওতাধীন

www.eelm.weebly.com

কোন ব্যক্তিই যাতে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক অবকাঠামোতে অবশ্যই তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৩. সেই অর্থনীতিকে তার আওতাধীন সকল ব্যক্তির মালিকানাধীন (ন্যায় সঙ্গত ও বৈধ ভাবে উপার্জিত) সম্পদের সুরক্ষা ও হিফাজতের আইনগত নিশ্চয়তা দিতে হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দূর্নীতি ও পক্ষপাত মূলক আচরণ না করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৪. অর্থ ব্যবস্থার উপর ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের আধিপত্য গড়ে উঠার বা আগ্রাসন সৃষ্টি করার যাবতীয় পন্থা ও পথ রুদ্ধ থাকতে হবে। এমন সব পন্থা যা মানুষের মাঝে জুলুম ও অনাচারের পথ উন্মুক্ত করে এবং সুষম ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার বিনাশ সাধন করে বা করতে পারে সেই অর্থ ব্যবস্থায় এ ধরণের কোন সুযোগের অবকাশ না থাকতে হবে।

৫. সেই অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও জীবনোপকরণ যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে বা সম্পদের উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিশেষের আধিপত্য গড়ে না উঠে এবং সমগ্র মানব জাতির পরিবর্তে সম্পদ যাতে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের সুখ ভোগের উপকরণে পরিণত না হয়; এ দিকটি নিশ্চিত করণের জন্য আইনগত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.সেই অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রতারণার যাবতীয় পথ রুদ্ধ থাকতে হবে।

৭. সেই অর্থ ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের ভারসাম্য রক্ষার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে মালিক যাতে তাকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, অনুরূপভাবে মালিকের দুর্বলতার সুযোগে শ্রমিক যাতে তাকে প্রতারিত করতে না পারে কিংবা অবাঞ্ছিত চাপের মুখে ফেলে তার সম্পদে হস্তক্ষেপ না করতে পারে; এ বিষয়ের নিশ্চয়তা সেই অর্থ ব্যবস্থায় থাকতে হবে। এক কথায় শ্রমিক কিংবা মালিকের কেউ যেন অন্যের যথা প্রাপ্য অধিকারের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ না করতে পারে এবং একে অন্যের উপর নির্যাতন ও আগ্রাসন চালাতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আইগত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. সেই অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের নৈতিক ক্ষেত্রে কোনরূপ ধ্বস সৃষ্টি না হয় বরং মানুষের নৈতিক মান সুরক্ষিত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তারও নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৯. জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এইসব কিছু মেনে নেওয়ার জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত থাকে; অন্তত অধিকাংশ নাগরিক স্ব-আগ্রহে তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, এমন কোন অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি অবশ্যই সে অর্থ ব্যবস্থায় থাকতে হবে।

www.eelm.weebly.com

২য় অধ্যায়

সম্পদ ও তার প্রকারভেদ

সম্পদের আভিধানিক সংজ্ঞা ঃ সম্পদ শব্দটি আরবী মাল (مال) শব্দের সমার্থক। প্রচীন আরবী ভাষায় মাল বলতে অধিকার ভূক্ত যে কোন বস্তুকে বুঝানো হত। উপকার লাভ করার ও প্রয়োজন মিটাবার উপায় হওয়ার যোগ্য যে কোন বস্তুকেই মাল বলা যেতে পারে।

মাল শব্দটির আদি আভিধানিক অর্থ হল ঝুকে পড়া, বাঁকা হওয়া, কোন দিকে মোড় নেওয়া। যে সকল বস্তুর প্রতি মানব প্রকৃতি আকৃষ্ট হয় তাকেই মাল বলা হয়। স্থাবর-অস্থাবর উভয় প্রকার বস্তুই এর পরিধি ভূক্ত। লিসানুল আরবের ভাষ্য অনুসারে মালিকানাধীন যে কোন বস্তুকেই মাল বলা যাবে। ইসলামী আইন শাস্ত্রে অর্থ সম্পদ বিষয়ক অধ্যায়ে মাল বলতে মালিকানধীন সকল বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় মাল বলতে এমন বস্তুকে বুঝানো হয়ে থাকে; যা প্রয়োজনে সঞ্চয় করা যায় এবং যা দ্বারা শরীয়ত সম্মত উপকার লাভ করা যায়। কিন্তু 'জামেউর্ রুমূয' গ্রন্থে যা সঞ্চয় যোগ্য তাকেই মাল বলা হয়েছে। যে সব বস্তু হতে উপকার লাভ করা শরীয়ত সম্মত এবং যা থেকে উপকার লাভ করা শরীয়ত সম্মত নয় এই উভয় প্রকার বস্তুকেই মালের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সম্পদের পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায়- যে সব দ্রব সামগ্রী বাহ্যিক ভাবে পরিদৃষ্ট, হস্তান্তর যোগ্য, মানুষের প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে অথচ তার যোগান সীমাবদ্ধ এমন দ্রব্য সামগ্রীকে সম্পদ বলে। আধুনিক কালে অবস্তুগত কিছু কিছু বিষয় দ্বারাও মানুষ অর্থ উপার্জন করে থাকে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা সে গুলোকেও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন ব্যবসায়ের সুনাম, নার্সের সেবা ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তু থেকে পৃথক করা যায় না এমন বিষয়কে শরীয়ত মাল বলে স্বীকার করে না।

যদিও অনেকেই مايميل اليه الطبع অর্থৎ মানব প্রকৃতি যার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাকেই মাল বলেছেন। কিন্তু আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

خلق لكم مافى الارض جميعًا

'ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"। এ থেকে বুঝা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠের বিদ্যমান সব কিছুই মানুষের প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে,

www.eelm.weebly.com

অতএব ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। তবে সব বস্তু সব কালে মানুষের নিকট সমান প্রয়োজনীয় থাকে না। এক কালে মানুষ যা প্রয়োজনীয় মনে করে; যা আহরণে প্রবৃত্ত হয়, অন্য কালে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। আবার এক কালে যা প্রয়োজনীয় নয় বলে ফেলে দেওয়া হয়, অন্য কালে তাই হয়ত মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়। যেমন পশু পাখী ও মানুষের মল-মূত্র, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি। এক কালে এগুলোর কোনই মূল্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এগুলো থেকে বায়ূগ্যাস তৈরী হচ্ছে। ফলে এগুলো মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আবার এক দেশের মানুষের কাছে যা প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়, অন্য দেশের মনুষের নিকট তা হয়ত অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়। অতএব কোন বস্তু মানুষের নিকট প্রয়োজনীয় হওয়া না হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক।

সম্পদের বৈশিষ্ট ঃ অর্থনীতির ভাষায় কোন বস্তুর সম্পদ হিসাবে গণ্য হওয়া জন্য নিম্নের ৪টি বৈশিষ্ট পাওয়া যেতে হবে।

১. বাহ্যিক ভাবে পরিদৃষ্ট হওয়া ঃ যে বস্তু বাহ্যিক ভাবে পরিদৃষ্ট হবে না কিংবা যার বাহ্যিক কোন অস্তিত্ব থাকবে না; তা সম্পদ হওয়ার যোগ্য নয়। জামা, কাপড়, আসবাব-পত্র ইত্যাদি বাহ্যিক ভাবে পরিদৃষ্ট বলে সম্পদ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু মানবীয় গুনাবলী, প্রতিভা, দক্ষতা ইত্যাদি (ব্যক্তি থেকে যা পৃথক করা যায় না) সম্পদ হওয়ার যোগ্য নয়। বায়বীয় পদার্থ গুলোর অবস্থিতি খালি চোখে পরিদৃষ্ঠ না হলেও তার বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং এগুলোও সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে।

২. হস্তান্তর যোগ্য হওয়া ঃ অর্থাৎ বস্তুটি এমন হতে হবে যার মালিকানা হস্তান্তর সম্ভব। (কোন দ্রব্য) ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা সম্ভব না হলে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে না। জমির মালিকানা হস্তান্তর সম্ভব বলে তা সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু কারো ব্যক্তিগত প্রতিভা ও দক্ষতা হস্তান্তর করা যায় না বলে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না। এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখি, নদী ও সাগরের মাছ এগুলোও হস্তান্তর যোগ্য নয় বলে অর্থনীতির ভাষায় এগুলো মাল বা সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না।

৩. উপযোগ বা প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা থাকা ঃ কোন বস্তুর প্রয়োজন পূরণের যোগ্যতা ও অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য বস্তুর উপযোগ থাকা অপরিহার্য। কোননা যে বস্তুর কোন রূপ উপযোগ নেই তা অর্থের বিনিময়ে কেউ ক্রয় করতে চায় না। সুতরাং তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না। অবশ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোন বস্তু মানুষের নিকট প্রয়োজনীয় হওয়া না হওয়ার বিষয়টি স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে

www.eelm.weebly.com

আপেক্ষিক। তাই এক কালে কোন বস্তু সম্পদ বলে গণ্য না হলেও অন্যকালে তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

৪. যোগান সীমাবদ্ধ হওয়া ঃ আর্থাৎ কোন বস্তু মানুষের প্রয়োজনে যত গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকাই রাখুক, আর তার বাহ্যিকতা যতই সুস্পষ্ট হউক এবং যতই হস্তান্তর যোগ্য হউক; কিন্ত তার যোগান যদি চাহিদার তুলনায় সীমিত না হয়; বরং তার যোগান যদি এমন পর্যায়ে থাকে যে, মানুষ তা বিনা আয়েসেই অর্জন করতে পারে; তাহলে সে দ্রব্যও কেউ পয়সা দিয়ে কিনতে যায় না। অতএব তাও সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন- নদী-নালা, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগরের পানি, বাতাস ইত্যাদি। তবে কেউ যদি নদীর পানি বোতলজাত করে বিক্রি করে তখন অবশ্য তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা তখন তার মূল্যমান দাড়ায়। অনুরূপ ভাবে প্রকৃতি থেকে অক্সিজেন আহরণ করে কেউ যদি সিলিন্ডারে আবদ্ধ করে মুমূর্ষ রোগীর জন্য সরবরাহ করে, তখন তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সিলিন্ডারে ভরা অক্সিজেন ও বোতলজাতকরা বিশুদ্ধ পানির যোগান সিমাবদ্ধ। তাই এগুলোকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয়।

সম্পদের প্রকারভেদ

মূল্যমান বিচারে সম্পদের বিভাজন ঃ

প্রাচীন ইসলামী অর্থনীতিবিদরা মূল্যমান বিচারে মাল-সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

১. مال متقوم - এমন সম্পদ যার মূল্য রয়েছে।

২. مال غير متقوم - এমন সম্পদ যার মূল্য নেই।

জামা-কাপড়, খাদ্য দ্রব্য, আসবাব সামগ্রীর যেহেতু মূল্য রয়েছে অতএব এগুলো মূল্যমান বিশিস্ট সম্পদের অর্ন্তভূক্ত হবে। আর ড্রেনের ময়লা পানি, আবর্জনা, মৃত প্রাণী এ গুলো মূল্যহীন মালের অর্ন্তভূক্ত হবে।

অবশ্য কোন কোন দ্রব্য অতি সম্মানী বিধায় শরীয়ত সে গুলোকে মূল্য নির্ধারণের উর্ধে মনে করে। অতএব সে গুলোকেও অমূল্য সম্পদ বা মূল্যবিহীন সম্পদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। যেমন- মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

আবার কোন কোন দ্রব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি জঘন্য বিধায় ইসলামী বিধানে সে গুলোকেও মূল্যহীন সম্পদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- শুকর, মৃত প্রণী ইত্যাদি।

কোন কোন পদার্থ জীবন রক্ষাকারী ও মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়

www.eelm.weebly.com

বিধায় শরীয়ত তার মূল্য নির্ধারণ করতে স্থায়ীভাবে নিষেধ করেছে। যেমন- আগুন, পানি, বাতাস, লবন, প্রাকৃতিক লতা-পাতা ও ঘাস যা খেয়ে পশু জীবন ধারণ করে। এক হাদীসে আছে- المسلم شركاء فى ثلاثة الماء والكلاء والنار। সকল মুসলমান তিন বস্তুতে সমান ভাবে শরীক; যথা- আগুন, পানি ও ঘাস। কোন কোন বর্ণনায় লবনের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আহমদ, আবুদাউদ

মৌলিক দিক বিচারে সম্পদের বিভাজন ঃ

প্রাচীণ অর্থনীতিবিদরা মৌলিক দিক বিচারে সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. مال ناطق বা জৈব সম্পদ।

২. مال صامت বা জড় সম্পদ।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এইসব বিভাজন মূলতঃ আলোচনার সুবিধার্থে গবেষকদের উদ্ভাবিত বিভাজন। সুতরাং প্রসারমান অর্থনীতির আলোকে আলোচনার সুবিধার জন্য ভিন্ন কোন আঙ্গিকে বিভাজন করতে কোন অসুবিধা নেই।

মালিকানার বিচারে সম্পদের বিভাজন

মালিকানার বিচারে সম্পদকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. ব্যক্তিগত সম্পদ।

২. সমষ্টিগত সম্পদ।

৩. জাতীয় সম্পদ।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ।

১. ব্যক্তিগত সম্পদ ঃ ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন-ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত জমি-জিরাত, ঘর-বাড়ী, আসবাব-পত্র, যানবাহন, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পদের উপর সম্পদের মালিকেরই অধিকার থাকে, অন্য কারো অধিকার তাতে স্বাভাবিক ভাবে থাকে না।

২-ক. সমষ্টিগত সম্পদ ঃ সমাজের মানুষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য জনগণের উদ্যোগে বা সরকারী ব্যবস্থাপনায় যে সব সম্পদ গড়ে উঠে তাকে বল হয় সমষ্টিগত সম্পদ। যেমন ঃ রাস্তাঘাট, পুল-বাধ, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, হাসপাতাল, পার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। সমাজের সকল মানুষেরই এগুলো ব্যবহারের সমান অধিকার থাকে।

২-খ. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ঃ সম্পদের যে অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাকে

www.eelm.weebly.com

রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে। যেমন ঃ বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, রেল, বিমান, রাষ্ট্রীয় করণকৃত মিল, কারখানা ইত্যাদি। মূলতঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমূহও সমষ্টিগত সম্পদেরই অন্তর্ভূক্ত। কেননা এর সুযোগ সুবিধা ও লভ্যাংশ দেশের জনগণই ভোগ করে থাকে।

৩. জাতীয় সম্পদ ঃ একটি দেশের মোট সম্পদের সমষ্টিকে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। অতএব দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ এসব কিছুর সমষ্টিকে জাতীয় সম্পদ বলা হয়ে থাকে। এ কারণেই দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পদকে জাতীয় সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। আবার দেশের নাগরিক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিদেশে বিদ্যমান সম্পদকে জাতীয় সম্পদের হিসাবের সাথে যোগ করা হয়। সমগ্র জাতি সামষ্টিকভাবে এই সম্পদের মালিক।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ ঃ বিশ্বচরাচরে যে সব সম্পদ কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মালিকানাধীন নয়; বরং বিশ্বের সব দেশই সে সম্পদ সমান ভাবে ভোগ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে; তাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক সম্পদ। পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদ-নদী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ আন্তর্জাতিক সম্পদ বলে গণ্য হয়।

উৎপত্তিগত দিক বিচারে সম্পদের বিভাজন ঃ

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা উৎপত্তিগত দিক বিচারে সম্পদকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

১. প্রাকৃতিক সম্পদ।

২. মানুষ্য সৃষ্ট সম্পদ।

বস্তুতঃ বিশ্বচরাচরে বিদ্যমান সব কিছুই সম্পদ। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে - الم تروا انّ الله سخرلكم ما فى السماوات ومافى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের সব কিছুকে তোমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন এবং তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত সমূহকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? - সূরাঃ ৩১ ঃ ২০

কুরআনে সকল সম্পদের মৌলিক উপকরণ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতির যে সব বস্তু সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে কিংবা মানুষ তার প্রয়োজন পূরণের জন্য সরাসরি ব্যবহার করে থাকে; সেগুলোকে বলা হয় প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন- নদ-নদী, বনভূমি, খানিজ পদার্থ ইত্যাদি। আর প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মানুষ তার বুদ্ধিমত্ত্বা,

www.eelm.weebly.com

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করে; তাকে বলা হয় মানুষ্যসৃষ্ট সম্পদ। যেমন ঃ কৃষিপণ্য, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যানবাহন, পথঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি।

অবশ্য অনেকেই মানবিক সম্পদ নামে সম্পদের একটি ভিন্ন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং মানুষের মানবিক গুণাবলী যথা- স্বাস্থ্গত ফিট্নেস, প্রতিভা, দক্ষতা, উদ্যোগ, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদিকে এই শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছেন। কেননা এগুলোর দ্বারাও মানুষ আয় উপার্জন করে থাকে। কমপক্ষে এগুলোর দ্বারা তার অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হয়, বেতন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি থেকে পৃথক ভাবে এর কোন অস্তিত্ব নেই এবং এগুলো হস্তান্তর যোগ্য নয়, অতএব এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ বলে গণ্য হবে না।

প্রাকৃতিক সম্পদের বিভাজন

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়।

১. কৃষি সম্পদ ঃ

ভূমি উৎকর্ষণ, চাষাবাদ, বপণ, রোপণ করে যে সম্পদ আহরণ করা হয়; তাকে বলা হয় কৃষি সম্পদ। ভূমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদ-নদী ও উন্নত প্রযুক্তিকে কৃষি উৎপাদনের সহায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। আল্-কুরআনে এই কৃষি সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিস্তর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وفي الارض قطع متجورات وجنت من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغيرصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل- ان في ذالك لايت لقوم يعقلون

যমীনে বিভিন্ন শষ্যক্ষেত্র রয়েছে, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আছে আঙ্গুরের বাগান এবং রয়েছে শস্যাদি ও খেজুরবৃক্ষ; যার একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত, আবার কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্ট করে দেই। এসবের মাঝে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। - সূরা ঃ ১৩-রাদ ঃ ৪

ان الله فالك الحب والنواى-يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحي

আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে নির্গত করেন। - সূরা ঃ ৬ ঃ ৯৫

وهو الذى انزل من السماء ماء-فاخرجنابه نبات كل شئ-فاخرجنامنه خضراً

www.eelm.weebly.com

نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من اعناب-والزيتون والرمان مشتبهاو غيرمتشابهٍ - انظروا الى ثمره اذااثمر وينعه-ان في ذالك لايت لقوم يومنون.

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা আমি উদ্ভিদের চারা উদ্গম করি, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা জন্ম দেই, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের আটি হতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি, আর আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বও; যার কতিপয় একে অন্যের সদৃশ্য ও কতিপয় বৈসদৃশ্য। লক্ষকর তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান-হয় এবং লক্ষ্য কর তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। নিশ্চয়ই এসবে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। - সূরা ঃ ৬-আন্-আম- ঃ ৯৯

فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماءصبا- ثم شققناالارض شقا-فانبتنا فيهاحبا وعنبا وقضبا وزيتوناونخلا-وحداءق غلبا-وفاكهة وابا-متاعالكم ولانعامكم (سوره عبس)

মানুষ তার খাদ্য সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করুক (তার উৎপাদনের জন্য তো) আমিই পর্যাপ্ত বারি বর্ষণ করি, অতপর আমি ভূমিকে যথার্থ ভাবে বিদীর্ণ করি এবং তথায় আমিই শস্যাদি, আঙ্গুর, শাকশব্জি, যায়তুন, খেজুর এবং বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ উদ্যান, ফলমূল ও গবাদী পশুর আহার্য উৎপন্ন করি। এগুলো তোমাদের এবং তোমাদের গৃহ পালিত পশুর ভোগের জন্য। - সূরা ঃ আবাসাঃ ২৪ ঃ ৩২

وترى الارض هامدة-فاذاانزلنا عليها الماءاهتزت وربت، وانبتت من كل زوجٍ بهيج،

তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখ। অতঃপর আমি যখন তাতে বারি বর্ষণ করি তখন তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং তা উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। - সূরা ঃ হজ্ব ঃ ৫

كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوا على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

সাহাবীদের অনুপম আদর্শের উপমা দিতে যেয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- তাঁদের দৃষ্টান্ত একটি চারার ন্যায় যা প্রথমে কচি কিশলয় উদ্গত করে, অতপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় ও পরে কান্ডের উপর সুদৃঢ় হয়ে দাড়ায়, যা চাষীকে অবিভূত করে। এদ্বারা কাফেরদের অন্তর জ্বালা সৃষ্টিই উদ্দেশ্য। - সূরাঃ ৪৯ ঃ ২৯

افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

তোমরা কৃষি কাজের মাধ্যমে যা উৎপাদন কর তার প্রতি লক্ষ করেছ কি? তোমরা কি তা উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্ন করি ? - সূরা ঃ ওয়াকেয়াহ্ঃ ৬৩-৬৪

অনুরূপ ভাবে কুরআনের বহু আয়াতে কৃষি ক্ষেত, শাস্যাদি, বাগান, ফলমূল

www.eelm.weebly.com

ও গবাদী পশুর আহার্য এবং এগুলোর উৎপাদনের প্রক্রিয়া ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে গুলো দ্বারা মূলতঃ কৃষি সম্পদ যে মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া মহা-নিয়ামত, তারই কুদরতের মহা-নিদর্শন একথাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কৃষি সম্পদ আহরণের জন্য কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে অনুগত করে দিয়েছেন (অর্থ্যাৎ কর্ষণ দ্বারা বারবার তাকে উৎপীড়ন করা হলে ও সে কিছু বলে না, অবাধ্য হয় না) অতএব তোমরা যমীনের দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তাঁর দেওয়া রিয্ক আহার কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট। সুরাঃ মুলক ঃ ১৫

فاذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله

অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। সূরা ঃ জুম্'আ ঃ ১০

يا يها الناس كلوا مما فى الارض حللا طيبا

হে মানব জাতি ! ভূমি উৎপন্ন বৈধ ও হালাল বস্তু সমূহ আহার কর।

এই সব আয়াতে মূলতঃ কৃষির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের উৎসাহই প্রদান করা হয়েছে। কেননা মানব জাতির যাবতীয় আহার্য মৌলিক ভাবে ভূমি থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। পরে এগুলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রসেস করে বিভিন্ন ধরণের আহার্য তৈরী করা হয়। শিল্পকারখানা থেকে উৎপাদিত পণ্য মানুষের জীবনকে আয়েশ বহুল করে বটে, তবে বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও মানুষের খাদ্যসম্ভার ভূমি থেকে কৃষিকর্মের মাধ্যমেই উৎপাদন করা হয়। শুধু মানুষ কেন পশু পাখির খাদ্য চাহিদাও ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে পূর্ণ হয়।

এ কারণেই ইসলাম কৃষি উৎপাদনের প্রতি অনুপ্রেরণা দান করেছে। রাসুল (সা.) ও কৃষি কর্মকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বর্নিত এক হাদীসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন- ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة

কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা কোন কৃষি পণ্য উৎপাদন করে, আর তা থেকে যদি কোন পাখী, মানুষ কিংবা প্রাণী কিছু আহার করে; তাহলে তা তাঁর জন্য সাদাকাহ্ হিসাবে গণ্য হবে। - বুখারী ও মুসলীম

বাযযারে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সা.)

www.eelm.weebly.com

ইরশাদ করেছেন- ان قامت الساعة و فى يد احدكم فسيلة فاليغرسها

যদি কিয়ামত সংঘটিত হতেও শুরু করে; আর তোমাদের কারো হাতে একটি চারাও থাকে তাহলেও সে যেন তা রোপণ করে ফেলে।

এ সকল হাদীস থেকে কৃষি উৎপাদনের গুরুত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তা ছাড়া কৃষি কাজ যে একটি পবিত্র পেশা এবং উৎপাদনের নির্ভেজাল ও পবিত্রতম পন্থা তাও বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায়। বুখারী বর্ণিত এক হাদীসে নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন- ماكل احد طعاماقط خيراً من ان ياكل من عمل يده

স্বহস্তে-উৎপাদিত আহার্যের চেয়ে উত্তম আহার্য কেউ কখনও খায় নি। আল্লামা মাওয়ারদী তার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আহকামুস্ সুলতানিয়্যায়' উল্লেখ করেছেন যে, উৎপাদনের মৌলিক বিষয় হল দুটি; কৃষি ও ব্যবসা। তবে কৃষি আমার নিকট উত্তম।

আর কৃষি এ কারণেও উত্তম হবে যে, মানবজাতির জীবনের অস্তিত্ব এর উপর নির্ভরশীল। কৃষিপণ্যের অনেক কিছুই বর্তমানে কল কারখানায় কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের ৭৫% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের জাতীয় আয়ের ৪০% কৃষি থেকে আসে।

২. খনিজ সম্পদ ঃ

পরিভাষায় খনিজ সম্পদ বলা হয়-

ماودع الله في هذه الارض من مواد برية وبحريةظاهرة اوباطنة-لينتفع بها الناس-من حديد ونحاس وبترول وذهب وفضة وغير دالك

ভূমির অভ্যন্তরে এবং ভূমির বিভিন্ন স্তরে জলভাগ বা স্থল ভাগে মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদ সন্নিহিত করে রেখেছেন তাকে বলাহয় খনিজ সম্পদ। সোনা, রূপা, লোহা, তামাসহ বিভিন্ন ধাতব পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, তেল, পেট্রোল, কয়লা, লবন, গন্ধক, চুনা পাথর, চীনা মাটি, কঠিন শিলা, সিলিকন বালু বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি খনিজ শিল্পের অন্তর্ভূক্ত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই খনিজ সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন সূরায়ে যুলযালে ইরশাদ হয়েছে-

واخرجت الارض اثقالها - وقال الانسان مالها

এবং ভূমি যখন তার খনিজ পদার্থ সমূহ বের করে দিবে, তখন মানুষ বলবে এর কি হল?

আরো ইরশাদ হয়েছে -

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومماخرجنا لكم من الارض

হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেরা যা উৎপাদন কর এবং আমি তোমাদের

www.eelm.weebly.com

জন্য ভূমি থেকে যা নির্গত করি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহ দান কর।

- সূরা ঃ বাকারা- ২ ঃ ২৬৭

যদিও মুফাস্‌সিরগণ مما اخــرجنا لكم من الارض এর অর্থ 'ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য' বলেই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু اخرجنا শব্দটির ব্যপকতা দ্বারা খনিজ সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তদুপরি اخرجنا শব্দটি দ্বারা খনিজ সম্পদ উত্তোলনের একটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অন্যথায় مما زرانا শব্দও ব্যবহার করা যেত, তবে তাতে এই ব্যপকতা থাকত না।

এই সব খনিজ সম্পদ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে। মানুষের জৈব জীবনের জন্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থ মাটির সাথে মিশে আছে। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ মানুষের জৈব জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। খনিজ পদার্থ সমূহ মুদ্রা, গহনা, আসবাব সামগ্রী, আহার্য, জ্বালানী, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া খনিজ পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করা হয়। বলতে গেলে মানব সভ্যতার স্থিতি ও অগ্রগতির পথে খনিজ পদার্থের ভূমিকা বিস্ময়কর। এই সব পদার্থের অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করেই রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন- اطلبوا الرزق من خبايا الارض (طبرانى)

মাটির গভীর তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের পরতে পরতে জিবীকার অনুসন্ধান কর। লৌহ ও লৌহজাতীয় পদার্থ সমূহই আধুনিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিকাশের মেরুদন্ড, যা মূলতঃ খনিজ পদার্থ। লোহার গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করেই আল্‌-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে - وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس

আমি লৌহকে সৃজন করেছি, তাতে বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে এবং রয়েছে মানুষের প্রভূত কল্যাণ। - সূরা ঃ হাদীদ ঃ ২৫

খনিজ পদার্থের বিধি-বিধান সম্পর্কে ফিকাহ-এর গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তথায় দ্রষ্টব্য।

৩. বনজ সম্পদ ঃ

ভূ-পৃষ্ঠে মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বন জঙ্গল সৃষ্টি করে রেখেছেন। এই বন জঙ্গল গুলো নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে এই বনভূমি ও জঙ্গল গুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক বিজ্ঞানের জরিপ অনুসারে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের বাস উপযোগী ও স্বাভাবিক রাখার জন্য মোট ভূখন্ডের ২৫% ভাগ বনাঞ্চল থাকা একান্ত অপরিহার্য। এ ছাড়াও বন জঙ্গল থেকে মানুষ প্রভূত কল্যাণ লাভ করে থাকে। বন জঙ্গল থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ

www.eelm.weebly.com

করা যায়; যা ঘর-বাড়ী নির্মাণ, দরজা, জানালা, ফার্ণিচার, রেল লাইন, নৌকা, পুল নির্মাণ সহ অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠ মাটির নীচে চাপা পড়ে কালান্তরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়, যা জ্বালানী হিসাবে বহুবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া কাঠ সরাসরি জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহার হয়। বনাঞ্চল থেকে মানুষ ও গবাদি পশুর আহার্যও পাওয়া যায়। আল্-কুরআনে এই বনজ সম্পদের উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। ইরশাদ হয়েছে-

فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم-

অতঃপর আমি তথায় (ভূ-পৃষ্ঠে) শস্যাদি, আঙ্গুর, শাক-শব্জী, যয়তুন, খেজুর এবং বৃক্ষ লতায় পূর্ণ বন-উদ্যান, ফলমুল ও গবাদি পশুর আহার্য উৎপন্ন করি। এগুলো তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত গবাদি পশুর ভোগের জন্য।

সুরা ঃ ৮০-আবাসা ঃ ২৪-৩২

وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم- «طه-٥٤»

এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি। অতঃপর তদ্বারা আমি বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ বৃক্ষলতা ও শাকসব্জী উৎপন্ন করে থাকি। তোমরা তা থেকে আহার করো এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ার গুলোকে তাতে চারণ করো। - সুরা ঃ তাহা ঃ ৫৪

বনজঙ্গলে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কাষ্ঠ বিক্রি করে মানুষ মর্যাদাপুর্ণ জীবিকার যোগান দিতে পারে। এদিকে আলোকপাত করলেই রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, "আল্লাহর শপথ, রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা এবং নিজ কাঁধে বহন করে এনে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা, অপরের সম্মুখে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করা অপেক্ষা উত্তম"। - বুখারী

তাছাড়া বনজ প্রাণী বিক্রি করেও বহু অর্থ উপার্জন করা যায়।

৪. প্রাণীজ সম্পদ ঃ

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তা'আলা বহু প্রজাতির পশু-পাখি ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এগুলোও মানুষের কল্যাণেই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে সব প্রাণী বাহ্যত মানুষের জন্য ক্ষতিকর সে গুলোও অন্যভাবে মানুষেরই কল্যাণ করে যাচ্ছে। গভীর অরণ্যে যে বাঘ, ভাল্লুক ও বিষাক্ত সাপ বাস করে, সেগুলো না হলে মানুষ কবেই অরণ্য কেটে উজাড় করে ফেলত। অথচ অরণ্য ছাড়া পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেত না। তাই বাঘ, ভালুক আপন অস্তিত্ব দিয়ে অরণ্য সংরক্ষণ করছে। যে তেলাপোকা, ইঁদুর বাহ্যত আমাদের ক্ষতি ছাড়া উপকার করছে না তারাও অন্য

www.eelm.weebly.com

ভাবে আমাদেরই উপকার করে যাচ্ছে। এগুলো থেকে জটিল ব্যাধির প্রতিষেধক তৈরী করা হয়ে থাকে।

প্রাণী গৃহপালিতই হোক কিংবা বন্য প্রানীই হউক এগুলো দ্বারাও মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। যেমন পশুর মাংস আহার্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বরং উপাদেয় আহার্য হিসাবে পশু পাখির মাংসই অন্যতম। পশুর দুধ পান করা হয়ে থাকে, পাখির ডিম খাদ্য হিসাবে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য। পশুর চামড়া দিয়েও বিভিন্ন ধরণের পোষাক, জুতা, মোজা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করা হয়। তার পশম দিয়ে পশমী কাপড় তৈরী করে শীত থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। তাছাড়া পশু মালামাল বহন এবং চাষাবাদের কাজেও ব্যবহার করা হয়। আরোহণ করে দুর দুরান্তে গমনের কাজেও পশু ব্যবহার করা হয়। পশু লালন-পালন করে তা বিক্রি করে যথেষ্ট আয় উপার্জন করা যায়। তাই প্রাচীন কালে যাযাবর শ্রেণীর মানুষ পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে নিয়েছিল। আল্-কুরআনে পশু ও প্রাণীর বহুবিধ উপকারিতার প্রতি বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تئكلون-

এবং পশু-প্রাণী সমূহকে তিনি তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তাতে শীত নিবারণের উপকরণ এবং বহুবিধ উপকার নিহিত রয়েছে, এবং তা থেকে তোমরা আহার্যও পেয়ে থাক। - সূরা ঃ নহল ঃ ৫

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف الرحيم- والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما تعلمون-

আর তোমরা যখন গোধুলিলগ্নে চারণভূমি হতে সেগুলোকে গৃহে ফিরিয়ে আন, এবং প্রভাতে যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। আর সে গুলো তোমাদের বুঝা বহণ করে এমন দূর দূরান্তের দেশে নিয়ে যায়; যেখানে প্রানান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক একান্ত সদয় ও পরম দয়ালু। আর ঘোড়া, খচ্চর, গাঁধা এগুলো (তিনি সৃষ্টি করেছেন) তোমাদের আরোহণের জন্য এবং সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য। আরোও তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না। - সূরা ঃ ৬-৮

প্রাণীর বিবিধ উপকারের প্রতি আলোকপাত করার পর ভবিষ্যতে যে আরো নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে যদ্বারা এসকল কাজ আঞ্জাম পাবে, তার প্রতিও ইঙ্গিত দিয়ে দেওয়া হয়েছে - ويخلق مالاتعلمون বলে।

ومن الانعام حمولة وفرشا كلوامما رزقكم الله

গবাদি পশুর মাঝে কতক রয়েছে ভারবাহী, তার কতক খর্বাকৃতিরও রয়েছে, সূতরাং তোমরা আহার কর; যা আল্লাহ্ তোমদিগকে রিযিক রূপে দিয়েছেন।

সূরা ঃ ৬ ঃ ১৪২।

www.eelm.weebly.com

وإنّ لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين

অবশ্যই প্রাণী কূলের মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তার উদরাভ্যন্তরের রক্ত ও চার্বিত খাদ্যের মাঝ থেকে নির্গত দুধ আমি তোমাদেরকে পান করাই যা একান্তই নিখাদ ও সুপেয় (সহজে গলদ্ধ করণের যোগ্য)।

এমনকি মুক্তবনে উড়ে বেড়ায় যে সব বিহঙ্গ এবং যে ক্ষুদ্রাকার কীট-পতঙ্গ তিনি সৃষ্টি করেছেন; সেগুলোও মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য। এগুলোও মানুষের বহুবিধ প্রয়োজনে কাজে আসে। প্রাণী বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বালুকনা থেকে নিয়ে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু সব কিছুরই প্রয়োজন রয়েছে প্রকৃতিতে। আমাদের অজান্তে আল্লাহর সৃষ্ট এইসব মাখলুক আপন আপন ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন পূরণে বিরাট খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে চলছে। ছোট মৌমাছি মানুষের কি বিরাট সেবা দিয়ে যাচ্ছে তার প্রতি আলোকপাত করে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا- يخرج من بطونها شرابٌ مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فى ذالك لاية لقوم يتفكرون-

তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ইশারা করলেন যে, গৃহ নির্মান কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং তারা (মানুষ) যে গৃহ বা মাচান তৈরী করে তাতে। অতঃপর প্রত্যেক ধরণের ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর এবং তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন কর। (দেখ) তার উদর থেকে নির্গত হয় (সুস্বাদু) পানীয়, যার রং হয় বিভিন্ন, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগ মুক্তির উপকরণ। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। -সূরা ঃ ৬৮-৬৯

মধুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যখ্যা করার প্রয়োজন নেই। খাঁটি মধু উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। অধুনা মৌমাছির চাষ করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে।

এমনি ভাবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র প্রতিটি প্রাণীই মানুষের জন্য মহাসম্পদ হিসাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

তা ছাড়া সাগরে যে প্রাণীরা রয়েছে তা দ্বারাও যে মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন পূর্ণ হয় এর প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

هو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها-

তিনি সমুদ্রকে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা

www.eelm.weebly.com

মৎস আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে রত্নাবলী আহরণ করতে পার-যা তোমরা গহনা-ভূষণ রূপে ব্যবহার করে থাক। - সূরা ১৬- নাহ্‌ল ঃ ১৪

৫. পানি সম্পদ ঃ

পানি মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া এক অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। পানির অপর নাম জীবন। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য এক অপরিহার্য উপাদান। পূর্বে উল্লেখিত কৃষিজ, বনজ, ও প্রাণিজ সম্পদের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। পানি না হলে ভূ-পৃষ্ঠ কবেই উৎপাদনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলত। এই পৃথিবী পরিণত হত মৃত ভূমিতে- যা মনুষ্য বসবাসের জন্য কিছুতেই অনুকূল হত না। এই পানি সম্পদের গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করে ও আল্-কুরআনে বিস্তর আয়াত অবতীর্ণা হয়েছে।

وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون

এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর শরীক করোনা। — সূরা ঃ বাকারা ঃ ২২

ومن ايته يريكم البرق خوفا وطمعا- وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذالك لايت لقوم يعقلون- روم - ٢٤

এবং তাঁর নির্দশনাবলীর মাঝে এও যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, ভয় ও আশা সঞ্চারক রূপে এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, বোধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। - সূরা ঃ রূম ঃ ২৪

وهوالذى انزل من السماءً ماء فاخرجنا به نبات كل شئ فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان فى ذالكم لايت لقوم يؤمنون- الانعام-٩٩

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। তাদ্বারা আমি সর্ব প্রকার উদ্ভিদের অঙ্কুর উদ্‌গম করি, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে তাথেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং অঙ্গুরের উদ্যান গড়ে তুলি, আর যায়তুন ও দাড়িম্বও, যার কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ, আর কতিপয় বৈশাদৃশ্যপূর্ণও। লক্ষ্য কর তার ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয়, আর তার পরিপক্কতার প্রতিও (লক্ষ্য কর)। এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। -সূরা ৬- আন্-আমঃ ৯৯

www.eelm.weebly.com

ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايت لقوم يعقلون

নিশ্চয়ই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর আবর্তনে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ সাগরে ভাসমান নৌযান সমূহে, এবং আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেন যাদ্বারা ভূমি মৃতবৎ হয়ে যাওয়ার পর পূনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং তিনি যে এধরায় সকল প্রকার জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে, বায়ূ প্রবাহের দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে (ভাসমান) অনুগত মেঘমালার মাঝে জ্ঞানবান জাতি সমূহের জন্য নিদর্শন রয়েছে। - সূরা ঃ বাকারা ঃ ২ ঃ ১৬৪

الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقالكم- وسخرلكم الفلك لتجرئ فى البحر بامره وسخرلكم الانهار- وسخرلكم الشمس والقمر دائبين وسخرلكم الليل والنهار- واتكم من كل ما سالتموه- وان تعدنعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار-

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, এবং নৌযানগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন করে দিয়েছেন- যাতে ওগুলো তাঁরই বিধানানুসারে সমুদ্রে বিচরণ করে এবং তোমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন করে দিয়েছেন নদী সমূহকে, এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করে দিয়েছেন চন্দ্র ও সূর্যকে, যারা অবিরত আপন নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করে দিয়েছেন দিবস ও রজনীকে, আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা তাঁর নিকট কামনা করেছ তার সব কিছুই। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তার পরিসংখ্যান নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম ও অকৃতজ্ঞ। -সূরা ঃ ইব্রাহীম ঃ ৩২-৩৪

পৃথিবীর সকল প্রাণী ও জীবন্ত বস্তুর উৎপাদন ও সৃজনে যে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার প্রতি আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে-

وخلقنا من الماء كل شئ حى

এবং আমি পানি থেকেই সকল জীবন্ত বস্তুকে সৃজন করেছি।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে পানি সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে পানির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহেরও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে,

www.eelm.weebly.com

চন্দ্র-সূর্যের আবর্তনের সাথে পানির একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া পানির সাথে বিদ্যুতেরও যে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে; তারও ইঙ্গিত সূরায়ে রূমের ২৪নং আয়াতে করে দেওয়া হয়েছে। তার সাথে সাথে পানির উৎস সমূহের প্রতিও সুকৌশলে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। পানির উৎস মোট ৩ টি। যথা ঃ

১. বৃষ্টির পানি। ২. পুকুর, হাউড়, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগরের পানি। ৩. ভূগর্ভস্থ পানি।

পানির বহুবিধ ব্যবহার ও উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন রক্ষাকারী উপাদান হিসাবে এর অপরিহার্যতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পানি থেকে আমরা বিপুল মৎস্য সম্পদ লাভ করি, যার অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পানি দ্বারা অধুনা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে- যা আধুনিক সভ্যতার প্রাণশক্তি। সমুদ্রের পানিতে লবন দ্রবিভূত রয়েছে- যা আহরণ করে আমাদের লবনের চাহিদা পূরণ হয়। পানির উপর দিয়ে নৌযান চলাচলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমুদ্রে মৎস্য ছাড়াও শৈবাল, বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ, বিচিত্র ধরণের প্রাণী এবং মূল্যবান ধাতব ও খনিজ পদার্থের বিপুল সমাহার রয়েছে। অধিকতর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাঝ দিয়ে এগুলো মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যেতে পারে। কে জানে একদিন হয়ত ক্রমবর্ধমান জনসংখার খাদ্যাভাব পুরণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত এইসব সম্পদ গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে। পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার মাধ্যমে সভ্যতাকে এভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে; তাকি মানুষ আগে কল্পনা করত? সমুদ্রের এই সম্পদ সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

هو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها-
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون -

তিনি সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা থেকে মৎস-মাংস আহার করতে পার, আর যাতে তা থেকে তোমরা আহরণ করতে পার রত্নাবলী- যা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান কর, এবং নৌযান সমুহকে তোমরা তাতে চলাচলরত দেখতে পাও, এবং সমূদ্রকে তিনি অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। - সূরা ঃ নাহল ঃ ১৪

৬. শক্তি সম্পদ ঃ

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের পিছনে শক্তি সম্পদ হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত শক্তির মাধ্যমেই সচল করে

www.eelm.weebly.com

রাখা হয়েছে যান্ত্রিক সভ্যতার চাকা। বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তিই হল সব কিছুর চালিকা শক্তি। বিজ্ঞানের বদৌলতে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ অসাধ্যকে সাধন করছে। বিশ্বচরাচরে বি জমান বিভিন্ন উপাদানে এই শক্তিকে সন্নিহিত করে রেখেছেন মহান আল্লা তা'আলা। যে কারণেই পদার্থকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন শ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে মানুষের জন্য। তা ছাড়া প্রকৃতিতেও বিভিন্ন উপাদানকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, তা অহর্নিশ পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভাবে সেই শক্তি সরবরাহ না করা হলে সেই পরিমাণ শক্তি হয়ত মানুষের জন্য উৎপাদন করা সম্ভব হত না। যেমন- সূর্যের কথা বলা যায়। অবিরত সে তাপশক্তি সরবরাহ করছে- যা দ্বারা পৃথিবীর তাপের চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে। বায়ু প্রবাহও অনন্তর বায়বীয় শক্তি সরবরাহ করে যাচ্ছে। যে বায়ু প্রবাহকে মানুষ তার প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করছে। পাল খাঁটিয়ে বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে এক দেশ থেকে বাণিজ্য জাহাজ চলে যাচ্ছে আরেক দেশে। প্রাচীন কালে পাল খাটিয়ে চাকার গাড়ী ব্যবহারের কথাও ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান পর্যন্ত মানুষ বেশ কিছু শক্তির আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যেমন ঃ ক. তাপশক্তি, খ. বিদ্যুৎ শক্তি, গ. আনবিক শক্তি, ঘ. সৌর শক্তি, ঙ. চুম্বক শক্তি।

ক. তাপশক্তি ঃ তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার আহার্য্যকে গ্রহণোপযোগী করছে, শীতের নিদারুন যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করছে, বিভিন্ন ধরণের যানবাহন কল-কারখানা ইত্যাদি চালাচ্ছে। সূর্য থেকে প্রাকৃতিক ভাবে প্রতিনিয়ত যে তাপ সরবরাহ হচ্ছে, তদ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি-এর যোগান হচ্ছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এই তাপশক্তি সংগ্রহ করা হয়। যেমন- সূর্যের আলো থেকে, গাছ-পালা ও খড়-কুটা, জালিয়ে, কয়লা, তেল ও পেট্রোল পুড়িয়ে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়েও এই তাপশক্তি সংগ্রহ করা হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون – يس : ٨٠

তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন, অতঃপর তোমরা তদ্বারা প্রজ্জলিত কর। - সূর ঃ ইয়াছিন ঃ ৮০

افرأيتم النار التى تورون أانتم انشئتم شجرتها ام نحن المنشئون–

তোমরা যে আগুন প্রজ্জলিত কর তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখেছ কি? তোমরাই কি তার বৃক্ষ সমূহ সৃষ্টি কর, না আমি তা সৃষ্টি করি? (সূরাঃ ৫৬ ঃ ৭১-৭২)

والشمس وضحها والقمر اذا تلها–

www.eelm.weebly.com

শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।
- সূরাঃ ৯১ ঃ ১

খ. বিদ্যুৎ শক্তি ঃ মূলতঃ তাপশক্তির রূপান্তরিত রূপই বিদ্যুৎ শক্তি। মানুষের বহুবিধ ব্যবহারে এই বিদ্যুৎ শক্তিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে- যা তাপ শক্তি দ্বারা সম্ভব ছিল না। ফলে এর ব্যবহার ক্ষেত্র অতি সম্প্রসারিত। অন্ধকার গৃহের আলো জ্বালানো থেকে শুরু করে আধুনিক কম্পিউটার ও রোবট পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী দ্রব্য যেমনঃ গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পানির স্রোত থেকেও বিদুৎ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে-

ومن ايته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحى به الارض بعد موتها ان فى ذالك لايت لقوم يعقلون-

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসা সঞ্চারক রূপে, এবং তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা ভূমিকে মৃতবৎ হয়ে যাওয়ার পর পূনরুজ্জীবিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। -সূরা -৩০, রুম ঃ ২৪

গ. আনবিক শক্তি ঃ বিভিন্ন পদার্থকে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিভাজনের ফলে যে ক্ষুদ্র কণার অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাকে বলে অনু। অনুই সকল বস্তুর অস্তিত্বের পিছনে মূল শক্তি হয়ে কাজ করে। বস্তুকে ভেঙ্গে সেই ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করতে পারলে তা বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই শক্তিকে বলে আনবিক শক্তি। আনবিক শক্তির ব্যবহার বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে যেমন হয়ে থাকে, উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা যায়। আনবিক শক্তিকে প্রয়োগ করে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান তৈরী করা হয়। অধুনা কৃষি ক্ষেত্রেও আনবিক শক্তির ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

ঘ. সৌর শক্তি ঃ সূর্য থেকে আমরা যে আলো ও তাপ পাই সেটাই মূলতঃ সৌরশক্তি। তবে অধুনা এই সৌর শক্তিকে কল-কারখানা ও যান্ত্রিক ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এর চেষ্টা চলছে। উন্নত বিশ্বে সৌরশক্তি ব্যবহার করে রান্না-বান্নার কাজ আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে অবশ্য এর তেমন একটা ব্যবহার নেই। তবে কিছু কিছু ক্যালকুলেটর ও ঘড়ি আমাদের দেশে সৌরশক্তির দ্বারা চলে। দ্রষ্টব্য ঃ ৯১ ঃ ১

ঙ. চুম্বক শক্তি ঃ চুম্বক একটি পদার্থ যা লৌহজাত পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ও টানাটানি থেকে এক ধরণের শক্তির উৎপত্তি হয়। এশক্তিকে কাজে লাগিয়েও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

বর্তমান পর্যন্ত যে সব সম্পদ আবিস্কার হয়েছে এরপরও সম্পদের নতুন নতুন প্রকার আবিষ্কারের সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। খোদ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- ويخلق مالاتعلمون এবং তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা এখন তোমরা জান না।

সকল সম্পদই মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দান

আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণীভেদসহ বিশ্বচরাচরের সকল সম্পদই মহান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং তারই দেওয়া অফুরন্ত দান। তিনি ইরশাদ করেছেন- وهوالذي خلق لكم مافى الارض جميعاً তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। - সুরা ঃ বাকারা ঃ ২৯

আয়াতের ভাবার্থ থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যই তিনি পৃথিবীর সকল বস্তুরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টিকরা উপাদানসমূহ ব্যবহার করেই মানুষ যতসব নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাবন করছে। কিন্তু মানুষ কি কোন বস্তুকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারছে? বিজ্ঞানীরা আল্লাহ কর্তৃক প্রকৃতিতে সন্নিহিত এই সব সম্পদ ও শক্তিকে অনুসন্ধান করে বের করছেন মাত্র। আর অনুসন্ধানলব্ধ এই সব সম্পদ ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হয়ত রূপান্তরিত অন্য কিছু তৈরীও করছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার এই অফুরন্ত নেয়ামত ব্যবহার না করে বিজ্ঞানীদের করার কিছুই নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের সকল সফলতার মূলেও রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত্ব এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ। সূরায়ে ওয়াকেয়ায় এই সব সম্পদ যে মহান আল্লাহ তা'আলার দান তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

افرئيتم ما تحرثون -أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون» لونشاء لجعلنه حطاما فظلتم تفكهون» انالمغرمون بل نحن محرومون » افرايتم الماء الذيى تشربون » أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون » لونشاء جعاناه اجاجا فلولاتشكرون » افرايتم النار التى تورون » أأنتم انشئتم شجرتها ام نحن المنشئون » نحن جعلناهاتذكرتا ومتاعا للمقوين » فسبح بسم ربك العظيم »

তোমরা যে বীজ বপণ কর; সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমারা কি তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে ওগুলোকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি; তখন তোমারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে;(এবং বলবে) আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমরা হৃত-স্বর্বস্ব হয়ে পড়েছি। তোমারা যে পানি পান কর; তা সম্পর্কে তোমরা ভেবেছ কি? তোমরা কি তা মেঘমালা হতে নামিয়ে আন,

www.eelm.weebly.com

না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবনাক্ত করে দিতে পারি। তুবও যদি তোমারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে? তোমরা যে আগুন জ্বালাও তার প্রতি লক্ষ করেছ কি? তোমরা কি তার বৃক্ষ সমুহ সৃষ্টি কর ? না আমি সৃষ্টি করি ? আমি তাকে (জাহান্নামের) নিদর্শন বানিয়েছি এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করেছি। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরায়ে আর্-রাহমানে এ বিষয়টিকেই অন্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে ১ থেকে --২৫ নং আয়াতে। দয়াময় আল্লাহ , তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, তিনিই তাকে ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়া (বর্ণনাভঙ্গি) শিক্ষা দিয়েছেন, সূর্য্য-চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষ পথে, তৃনলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তারই বিধান। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মাপদন্ড, যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর। ওজনে ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিওনা। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। এতে রযেছে ফল-মূল ও খেজুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণমুক্ত এবং খোসা বিশিষ্ট খাদ্য দ্রব্য ও সুগন্ধিগুল্ম। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।

তিনিই প্রবাহিত করেছেন দুই দরিয়াকে- যারা পরস্পরে মিলিত। কিন্তু তাদের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল-যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে।

এভাবে বিশ্বচরাচরে সৃষ্ট অসংখ্য অগণিত সম্পদ যে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের দান; এ বিষয়টির প্রতি কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুর যে গুন ও বৈশিষ্ঠ তা মানুষের তৈরী নয়। কোন বস্তুর আদি উপাদানও মানুষ তৈরী করতে পারে না। আবার আল্লাহ প্রদত্ত উপাদানগুলো ব্যবহার করে মানুষ যা উৎপাদন করে সে ক্ষেত্রেও মানুষের ভূমিকা খুবই নগণ্য। মানুষ ভূমি উৎকর্ষণ করে তাতে বীজ বপণ করতে পারে, না হয় সে কৃত্তিম উপায়ে বীজ অংকুরিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশও তৈরী করল; কিন্তু বীজটিকে অংকুরিত করা তার সাধ্যের বাইরে। চারা গজালে তাতে সার ইত্যাদি প্রয়োগ করে সে তাকে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারলেও তাতে শীষ আসা না আসার ব্যপারে তার কোন হাত নেই। শীষ আসলে তার দানাগুলোতে শাস গড়ে উঠা না উঠার ব্যপারে তার কোন হাত নেই। সুতরাং বলতে হয় বিশ্বচরাচরের সকল সম্পদ তা প্রাকৃতিকই হউক কিংবা মানুষ্য সৃষ্টই হউক; সব কিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের দান। খোদাপ্রদত্ত এই অনুগ্রহ অফুরন্ত ও সংখ্যায় অসীম। ইরশাদ হয়েছে-

www.eelm.weebly.com

তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং নৌযানগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন- যাতে ওগুলো তারই বিধান অনুসারে সমুদ্রে বিচরণ করে এবং তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কবে দিয়েছেন নদ-নদী সমূহকে এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করে দিয়েছেন দিবস ও রজনীকে এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা তার নিকট প্রত্যাশা ও কামনা করেছ তার সব কিছুই। যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহকে গণনা করতে চাও ,তাহলে তার পরিসংখ্যান নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্য অতিমাত্রায় জালেম ও অকৃতজ্ঞ। -সূরা ঃ ইব্রাহীম ঃ ৩২-৩৪

www.eelm.weebly.com

তৃতীয় অধ্যায়

ধন-সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

১. অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধিকরণ

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আল্-কুরআন কেবলমাত্র অর্থনীতি সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থ নয়। তাই এতে অর্থনীতির যাবতীয় বিষয়ের পুংখানুপুংখ আলোচনা বিন্যস্ত আকারে পাওয়া যাবে না। কুরআনে কারীম হল সর্বকালের মানুষের সমগ্র জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রের এক পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনের সার্বিক দিকগুলোকে সামনে রেখে একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনা এতে বিধৃত হয়েছে। জীবন যেহেতু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় তথা শ্রম, উৎপাদন, আয়-ব্যয়, লেন-দেন, দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন, নীতি-নৈতিকতা এবং চরিত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিব্যাপ্ত এক ব্যাপক কর্মকান্ড বৈ-কিছুই নয়; তাই আল্-কুরআন জীবনের এসব বিষয়ের কোনটিকে কোনটি থেকে পৃথক করে ব্যাখ্যা করতে যায়নি; বরং একটিকে আরেকটির সাথে অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে আলোচনা করেছে। আর এ আলোচনার মধ্য দিয়েই মানুষের জন্য এমন এক অত্যুজ্জ্বল জীবন-চিত্র উপস্থাপন করেছে, যার অনুসরণ ও অনুকরণ মানব জীবনকে করবে মহিমান্বিত, গৌরবময়, কল্যাণধর্মী, সুশীল, পরিমার্জিত ও প্রশংসনীয়। যে জীবন-চিত্রের অনুসরণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানুষের জন্য ইহজীবনে বয়ে আনবে কল্যাণের সমূহ ফল্গুধারা এবং পরজীবনে অনাবিল মুক্তি ও জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চিত প্রত্যাশা। আর পরপারের মুক্তি ও জান্নাত লাভকে স্থির করেছে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে। এ কারণেই আল্-কুরআন সকল ক্ষেত্রে মানব জীবনের সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ পরপারের জীবনে মুক্তির বিষয়টিকে সামনে রেখে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছে। আর সেই মুক্তির জন্য যা অপরিহার্য অর্থাৎ, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, কিয়ামত, যাজা-সাজা এ বিষয়গুলোই আল্-কুরআনে আলোচনার মূল সুর হিসেবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তবে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করতে যেসব আয়াত আল্-কুরআনে বিধৃত হয়েছে; সেগুলোতে মানুষের জাগতিক বিষয়াসয়ের অনেক কিছুই উপমা কিংবা প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে। তাই কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের

www.eelm.weebly.com

বিষয়ভিত্তিক সুবিন্যস্ত আলোচনা আল্-কুরআনের নিদৃষ্ট একই জায়গায় পাওয়া যাবে না সত্য, কিন্তু মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের মৌলিক দিক-নির্দেশনা এই মহাগ্রন্থে অবশ্যই রয়েছে। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সেসব আয়াতের আলোকে প্রতি ক্ষেত্রের নীতিগত বিষয়গুলো কি কি, তা খুঁজে বের করতে পারবেন এবং সে আলোকে প্রতি বিষয়ের একটি সুবিন্যস্ত রূপ প্রয়োজনে দাঁড়ও করাতে পারবেন। আবার বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস না করেও কুরআনে জীবন-চিত্রের যে সামগ্রিক রূপ বর্ণিত হয়েছে তা অনুসরণ করে চললে মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে। সুতরাং অর্থনীতিবিদরা আল্-কুরআনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিন্যাস করতঃ তার অনুসরণ করে যেমন অর্থনৈতিক মুক্তির পথ পেয়ে যেতে পারেন, তদ্রূপ সাধারণ মানুষ সেই বিন্যস্ত রূপ অনুধাবন না করেও আল্-কুরআনে জীবন-চিত্রের যে সামগ্রিক রূপ বর্ণিত হয়েছে, তা অনুসরণ করে চললে একইভাবে মুক্তি পেয়ে যাবেন। এটাই আল্-কুরআনের অন্যতম মু'জিযা।

বস্তুতঃ কুরআন তার বর্ণনারীতির ধারায় অর্থনীতি সম্পর্কীয় কতিপয় মূলনীতির প্রতি আলোকপাত করে দিয়েছে, যেগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদী স্ট্রাকচার। যদি পার্থিব ধন-সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সেই বুনিয়াদের আলোকে গড়ে উঠত, আর সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অর্থ-সম্পদ ও ভোগ্যসম্ভারের ব্যবহার করা হত; তাহলে মানুষের ইহজীবন যেমন প্রাচুর্যপূর্ণ ও সুষমামন্ডিত হত তেমনি পরপারের মুক্তির পথও হত প্রশস্ত। অর্থ সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিশুদ্ধি করণের জন্য ইসলামে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যথা ঃ

ক. পার্থিব ধন-সম্পদের গুরুত্ব ও স্থান নির্ণয়

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম জীবন জগতকে উপেক্ষা করে রূহ্বানিয়্যাত ও বৈরাগ্যপনার জীবনকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে বরং জীবন জগতের সাথে জড়িত থেকেই এক নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জিত জীবনবোধের প্রতি মানুষকে আমন্ত্রণ জানায়। এ কারণেই ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও আয়-উৎপাদনের প্রচেষ্টাকে বৈধ, উত্তম এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় বলে ঘোষণা করেছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

كسب الحلال فريضة بعد الفرائض .

হালাল উপার্জনের অনুসন্ধান আল্লাহর ফরযসমূহ আদায়ের পর অন্যতম ফরয।

– কানযুল উম্মাল

মানব জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। এতদসত্ত্বেও ইসলাম অর্থনৈতিক সমস্যাকে মানবজীবনের একমাত্র মৌলিক সমস্যা বলে মনে করে না এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নতিকেই

www.eelm.weebly.com

জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলে স্থির করে না। সারকথা আল্-কুরআন অর্থনৈতিক বিষয়ের বৈধতা ও অত্যাবশ্যকীয়তার কথা মেনে নিলেও সম্পদ আহরণই মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য একথা স্বীকার করে না। কারণ কোন বস্তু অত্যাবশ্যকীয় হলেই তা একান্ত কাম্যও হয় না। যেমন ধরুন, মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রশ্রাব পায়খানা করা অত্যাবশ্যকীয় হলেও কেউ এ কাজকে জীবনের পরম লক্ষ্য বানায় না।

যেহেতু মানবমনে জন্মগতভাবেই সম্পদের প্রতি পরম আকর্ষণ বিদ্যমান রয়েছে, আল্-কুরআনের ভাষায় ঃ

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .

মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে রমণীর আসক্তি, সন্তানের ভালবাসা, রাশিরাশি সঞ্চিত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাধিপশু ও ক্ষেত খামার।[১]

– সূরা ঃ ৩ - আল্ ইমরান

সুতরাং মানুষের মধ্যে সম্পদের প্রতি দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু সম্পদের এই আকর্ষণ কখনো কখনো এত তীব্র ও প্রবল হয়ে যায় যে, এর মায়ায় জড়িয়ে মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায় তার জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম উদ্দেশের কথা। পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও ভোগ্যসম্ভার আহরণে সে এভাবেই বিমত্ত হয়ে পড়ে যে, কেবল দু'হাতে সম্পদ কামাতে থাকে। একের পর এক সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠে; তবুও তার এ তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। যত পায় ততই তার তৃষ্ণা বেড়ে যায়। এই অতৃপ্ত ক্ষুধা আর চাহিদা মানুষকে ক্রমে পশুবৎ করে তুলে। অন্যের কল্যাণ চিন্তা তখন তার থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। মানবরূপী পৃথিবীর অপরাপর বাসিন্দাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের চিন্তা তখন তার অন্তরে বিলকুল থাকে না। আরো চাই; আরো চাই; এরূপ এক অতৃপ্ত বুভূক্ষ মোহনীয় সুর তাকে পাগল করে তুলে। সে তখন মরিয়া হয়ে সে সুরের পিছনে ছুটতে থাকে। সম্পদ আহরণ তখন তার নেশায় পরিণত হয়। যে কোন উপায়ে হোক, যত জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেই হোক, সম্পদ উপার্জনে সে পিছপা হয় না।

এসব বুভূক্ষ মানুষের নগ্ন থাবার শিকার হয় পৃথিবীর বাসিন্দা অপরাপর মানুষ। এদের দ্বারাই শোষিত ও নির্যাতিত হয় নিরীহ সহজ সরল বনীআদম।

---

১. মূলতঃ ভোগ্যসম্ভার ও সম্পদের মৌলিক দিকগুলোই আয়াতে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। কেননা সোনা-রূপার কথা বলে গহণাগাটি ও মুদ্রার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, চিহ্নিত ঘোড়ার কথা বলে যানবাহনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, গবাদি পশুর কথা বলে পশু সম্পদের প্রতি এবং ক্ষেত খামারে কথা বলে কৃষি সম্পদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। স্ত্রী সন্তানের ভালবাসা উপভোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম।

www.eelm.weebly.com

এদের দ্বারা সংঘটিত পাপাচারে ভরে যায় পৃথিবী। এদের অন্যায় আচরণে মানুষ হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। সমূহ জটিলতার আবর্তে মানুষের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। মজলুম ও নির্যাতিত মানুষের আর্তকান্নায় বিষাক্ত হয়ে উঠে পৃথিবীর পরিবেশ। পৃথিবী সম্পদসর্বস্ব এক মানসিকতার দিকে তীব্র গতিতে ধেয়ে যায়। এক চরম বিভৎস ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় মানুষ। সম্পদের লিপ্সা মানুষের মধ্যকার মানবতাবোধকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে। হায়েনাবৎ এক জঘন্য মনোবৃত্তি জন্ম নেয় আশ্‌রাফুল মাখলুকাত বনীআদমের মাঝে। আর এসবের পিছনে মুল কারণ হিসেবে কাজ করে সম্পদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন মানসিকতা, অন্ধ আকর্ষণবোধ ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা।

বস্তুতঃ এই পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পদ ও ভোগ সম্ভার মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের সুখ ভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

خلق لكم ما فى الأرض جميعا ـ

এই পৃথিবীর সবকিছু তো তিনি তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الزرق

বলো! কে নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য-উপকরণ ও উত্তম আহার্য, যা তিনি তার বান্দাহ্‌দের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য; ধন-সম্পদ আহরণের জন্য নয়। তাই বৈরাগ্যও নয় আবার অর্থসর্বস্ব মানসিকতাও নয় বরং এ দুইয়ের মাঝেই হবে অর্থ সম্পদের স্থান।

খ. সম্পদ প্রকৃতিতে সন্নিহিত আছে তবে শ্রম দিয়ে তা অর্জন করে নিতে হবে

বিশ্ব জগতের সবকিছুকে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় উপাদান, উপায়-উপকরণ, বস্তু-সামগ্রী, তাপ ও শক্তিকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। মানুষের সর্বকালের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন হবে; তার সমুদয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিতে সন্নিহিত করে রেখেছেন। আর বিশ্ব প্রকৃতিকে তিনি মানুষের কল্যাণে তাদেরই আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ إن الله سخر لكم ما فى الأرض

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় কিছুকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন।' মহাকাশে বিদ্যমান গ্রহ, নক্ষত্রগুলোকেও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وسخر لكم ما فى السماوات

www.eelm.weebly.com

আকাশ মন্ডলে যা কিছু রয়েছে তৎসমূদয় তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। - সূরা ঃ ৪৫-জাছিয়াহ ঃ ১৩

নদী-নালা, সাগর-মহাসাগরকেও তিনি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

الله الذى خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار .

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন, যিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যেন সেগুলো তার বিধান মুতাবেক সাগরে বিচরণ করে, যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদী-নালাসমূহকে এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন দিবস ও রজনীকে। - সূরা ঃ ১৪ - ইব্রাহীম ঃ ৩২-৩৩

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বচরাচরের যাবতীয় উৎপাদন-উপকরণ ও উৎপাদনের সহায়ক শক্তিসমূহকে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন। সুতরাং মানুষ এগুলোকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। সবকিছু আয়ত্বাধীনে আনা মানুষের পক্ষে কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কেননা এগুলোকে মানুষের কল্যাণেই বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিয়োজিত করা হয়েছে, যাতে মানুষ এগুলো ভোগ-ব্যবহার করে জীবন-জীবিকার চাহিদা পূরণ করতে পারে; নিজেদের কল্যাণ সাধনে এগুলো ব্যবহার করতে পারে। এই যে তাঁর অবারিত অনুগ্রহ ও দান এর বিনিময়ে তিনি মানুষের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করেননি।

মানুষের বুদ্ধি-বিবেক, প্রতিভা ও দক্ষতা, প্রচেষ্টা ও শ্রম একাগ্রভাবে নিয়োজিত হলে বিশ্বচরাচরের ঐসব উপাদানসমূহকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে সক্ষম হবে এবং আয়ত্বাধীন করতে পারবে।

কিন্তু এসব কিছু মানুষের জন্য নিয়োজিত এবং এগুলোকে মানুষের আয়ত্বাধীন করে দেয়া হলেও মানুষ প্রয়োজনীয় চেষ্টা-সাধনা, শ্রম-মেহ্নত ব্যয় না করলে এবং ওগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার ও সুফল লাভ করার উদ্যোগ গ্রহণ না করলে; কিছুই লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। নৈসর্গিক ঐসকল উপাদান থেকে মানুষকে কিছু আহরণ করতে হলে, উপকৃত হতে হলে শ্রম ও মেহ্নত অবশ্যই ব্যয় করতে হবে। যারাই এর জন্য মেহ্নত করবে তারাই এর ফল ভোগ

www.eelm.weebly.com

করবে। আর যারা মেহ্‌নত করবে না; ভাগ্যের উপর নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে; তারা বিশ্বপ্রকৃতির এই অফুরন্ত ভান্ডার থেকে কিছুই আহরণ করতে পারবে না। কুরআন মাজিদে মানুষের কর্মশক্তিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কোনরূপ অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও গাফলতি প্রদর্শন না করার জন্য আকুল আহবান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم

এবং দিবসের নিদর্শনকে আমি আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করতে পার।

– সূরা ঃ ১৭ - বনী-ইসরাঈল ঃ ১২

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله

যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল (রিয্‌ক) অনুসন্ধান কর।

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور .

তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তার দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পর এবং তার দেয়া আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তারই নিকট।

– সূরা ঃ ৬৭ - মূলক ঃ ১৫

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে কতিপয় বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ঃ

من مشى فقد أكل ومن كان قادرا على المشى ولم يمشى كان جديرا أن لا يأكل .

অর্থাৎ যে ভূমিতে বিচরণ করে শ্রম দিবে সে-ই খাদ্য পাবে। আর সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যে শ্রম দিবে না, সে খাদ্য না পাওয়ারই যোগ্য।

আমরা বলতে চাই, শ্রমবিমূখ মানুষ খাদ্য পেলেও লাঞ্ছনার সাথে পাবে; সম্মানের সাথে পাবে না।

রাসূল (সা.) নিজেও শ্রম দিয়ে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শ্রমের কারণে একবার তার হাতে ফুসকা পড়ে গিয়েছিল। সেই ফুসকা পড়া হাত দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

هذه يد يحبه الله ورسوله

এই হাতকে আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালবাসেন। অন্য এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

الكاسب حبيب الله

শ্রমজীবীরা আল্লাহর বন্ধু। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

كسب الحلال فريضة بعد الفرائض

হালাল জীবিকার অনুসন্ধান আল্লাহর ফরয সমূহের পর অন্যতম ফরয।

www.eelm.weebly.com

শ্রম দিয়ে উপার্জন না করলেযে মানুষ অন্যের উপর বোঝা হয়ে পড়তে বাধ্য হবে; এক হাদীসে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لولا هذه البيوع لصرتم عالة على الناس

যদি ব্যবসা বাণিজ্য না থাকত তাহলে তোমরা অন্য মানুষের উপর বোঝা হয়ে পড়তে।

শ্রম দিলে যে সম্পদ উপার্জন করা সম্ভব হবে, আর শ্রম না দিলে যে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তা সূরায়ে হুদের এক আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় ঃ

من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم اعمالهم وهم فيها لا يبخسون

যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশে কাজ করে; আমি তাদেরকে তাদের কাজের ফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করব এবং এ ব্যাপারে তারা কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। — সূরা ঃ ১১ - হুদ ঃ ১৫

অবশ্য এই আয়াতের পূর্বে ঈমান আনার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং এর পরের আয়াতে ঈমান না এনে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত হলে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুনিয়া অর্জনের এই চেষ্টাকে পরকালের বিচারে নিস্ফল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু যদি ঈমানের সাথে তাদের এই প্রচেষ্টা হত; তাহলে অবশ্যই তাদের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হত। সে যাই হোক, দুনিয়ার সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভের জন্য তা অর্জনের ইচ্ছা ও শ্রমের যে প্রয়োজন রয়েছে তার একটা ইঙ্গিত উপরোক্ত আয়াত থেকে পাওয়া যায়।

গ. সম্পদ প্রয়োজনীয় তবে জীবনের পরম লক্ষ্য নয়

মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য সম্পদ যে প্রয়োজনীয় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আল্-কুরআন বৈরাগ্যবাদের বিপরীতে وابتغوا من فضل الله 'আল্লাহর ফয্ল (সৎ রুজি) তালাশ কর' বলে সম্পদ আহরণের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক নির্দেশ প্রদান করেছে। একই সাথে ব্যবসা বাণিজ্যকে فضل الله বা 'আল্লাহর অনুগ্রহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তদুপরি অর্থ সম্পদকে خير বা 'কল্যাণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমনঃ ইরশাদ হয়েছে- إنه لحب الخير لشديد 'অবশ্যই সে (কাফের) খায়রের বা সম্পদের ভালবাসায় অতিশয় নিমজ্জিত।' অনুরূপভাবে পোষাক-পরিচ্ছদকে زينة الله. 'আল্লাহ প্রদত্ত ভূষণ ও সৌন্দর্যের উপকরণ' এবং খাদ্য দ্রব্যাদিকে الطيبات বা 'উত্তম বস্তু' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق،

বল কে হারাম করেছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্যের উপকরণ ও উত্তম আহার্যকে যা তিনি তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

www.eelm.weebly.com

আবাস স্থলের ব্যাপারে مسكن বা প্রশান্তির ন্যায় উৎসাহব্যাঞ্জক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া সম্পদ যে জীবন সৌন্দর্যের উপকরণ তা সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ المال والبنون زينة الحياة الدنيا

কিন্তু তার পাশাপাশি সম্পদ সম্পর্কে মানুষকে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে এবং সম্পদকে প্রবঞ্চনার উপকরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

'এই পার্থিব জীবন (ও তার ধন-সম্পদ) তো প্রবঞ্চনার উপকরণ বৈ-কিছু নয়।'

তদুপরি এগুলোকে دنيا দুনিয়া (বা নিকৃষ্টতম আবাসভূমি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এমনকি মাল-সম্পদ যে ফিত্নার উপকরণ তা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ إنما أموالكم وأولادكم فتنة

'অবশ্যই সন্তান সন্ততি ও ধন সম্পদ ফিত্নার উপকরণ।'

বাহ্যত কুরআনের এই দ্বিবিধ বর্ণনারীতি দেখে কারো মনে স্ব-বিরোধিতার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, বৈপরিত্যের সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে এই সংশয় অবশ্যই কেটে যাবে। মূলতঃ কুরআনে কারীম ধন-সম্পদকে চিহ্নিত করেছে জীবন পথের পাথেয় হিসেবে। আর মানুষের জীবনের সফলতার শেষ মঞ্জিল নির্ধারণ করেছে সৎকর্মের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পরকালীন নাজাত ও কামিয়াবীকে। সেই কামিয়াবীর মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছতে হলে মানুষকে পার্থিব জীবনের কয়দিনের এ জিন্দেগী অবশ্যই পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। আখেরাতের সেই জীবনের সঞ্চয় ক্ষেত্র হল দুনিয়ার এ জীবন। দুনিয়ার এ জীবন পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে তার সমূহ প্রয়োজন পূরণের জন্যই মূলতঃ সৃষ্টি করা হয়েছে সম্পদরাজিকে। এগুলো তার জীবনপথের পাথেয়। এই পাথেয় সংগ্রহ করে করে আপন প্রয়োজন পূরণ করতে করতে তাকে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু কোন যাত্রী যদি পাথেয় সংগ্রহ করতে যেয়ে তার গন্তব্যের কথা ভূলে যায় এবং পাথেয় সংগ্রহকেই তার জীবনের চরম লক্ষ্য বলে ধরে নেয়, তাহলে এটা হবে তার চরম মূর্খতা। আর এহেন মূর্খতা ডেকে আনবে চরম সর্বনাশ। সুতরাং পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও ভোগ্যসামগ্রীসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কাছে পাথেয় হিসেবে গণ্য হবে এবং সে নিরিখেই তার জীবনের আয়-উৎপাদন ও ব্যয়-ভোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম আঞ্জাম পেতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্তই তা কল্যাণ, আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের উপকরণ ও প্রশান্তি বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখনই এগুলোকে মানব জীবনের প্রকৃত গন্তব্যের পথে অন্তরায় হিসেবে দাঁড় করানো হবে এবং এর অর্জনকেই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে; তখনই এগুলো প্রবঞ্চনার উপকরণ, ফিৎনার উপকরণ ও নিকৃষ্টতম আবাসে রূপান্তরিত

www.eelm.weebly.com

হবে। এগুলো হবে মহা ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কারণ। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ইরশাদ হয়েছে ঃ

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون .

হে মুমিনগণ! ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে ফেলে, যারা এহেন কর্মে লিপ্ত হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।

– সূরা ঃ ৬৩-মুনাফিকুন ঃ ৯

এক্ষেত্রে কি করতে হবে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولاتبغ الفساد في الأرض، ان الله لا يحب المفسدين .

আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া থেকে তোমার অংশকে ভুলো না (অর্থাৎ বৈধভাবে উপার্জন ও ন্যায় সঙ্গতভাবে ব্যয় কর)। পরোপকার কর; যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (এই নীতির অন্যথা করে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। – সূরা ঃ ২৮ কাসাস ঃ ৭৭

মূলতঃ এখানেই ইসলামী অর্থনীতি ও বস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতির মাঝে অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী মৌলিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুবাদী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থসমস্যাই মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়, আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনই জীবনের চরম প্রতিপাদ্য বিষয় বলে ধরে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে ইসলামের অর্থ ব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদের বিষয়টি অনাবশ্যক ও এড়িয়ে যাওয়ার মত না হলেও এটি মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও পরম কাম্য বিষয় নয়।

ঘ. বৈধভাবে প্রয়োজনমত সম্পদ আহরণ ও ব্যয় করা যাবে, কিন্তু সম্পদের ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা যাবে না ঃ

বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করার অধিকার যে মানুষের রয়েছে তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، فيحل عليكم غضبى .

তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে উত্তম অর্থাৎ বৈধগুলো আহার কর এবং এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না, তাহলে তোমাদের উপর আমার গযব আপতিত হবে। – সূরা ঃ ২০ - তাহা ঃ ৮১

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون.

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তন্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা আহার কর এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর, যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হও। – সূরা ঃ ১৬-নহ্‌ল ঃ ১৪

أحل الله البيع و حرم الربوا .

অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সমুদয় সম্পদ হালাল। তবে সুদ অবৈধ।

বৈধ সম্পদের ভোগ ইসলামের দৃষ্টিতে অনুমোদিত হলেও সম্পদের ভালবাসা অন্তরে পোষণ করাকে ইসলাম পছন্দ করে না। আল্-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সম্পদের ভালবাসাকে নিন্দা করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ألهكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. كلا، سوف تعلمون.

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা মোটেও সঙ্গত নয়, অচিরেই তোমরা (সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন থাকার পরিণতি সম্পর্কে) জানতে পারবে।

– সূরা ঃ ১০২-তাকাসুর ঃ ১-৩

إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد.

নিশ্চয় মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। অবশ্য বিষয়টি সম্পর্কে সে অবহিত বটে এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের ভালবাসায় অতিমত্ত।

– সূরা ঃ ১০০ - আদিয়াত ৬-৮

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا،

তোমরা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেল এবং মাল সম্পদকে তোমরা অতিশয় ভালবাস। এটা কক্ষণই সঙ্গত নয়।

বরং ভোগ বিলাসে বিমত্ত্বতাকে কুরআনে কাফেরদের বৈশিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরাশাদ হয়েছে ঃ

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوالهم،

আর যারা কুফরী করে তারা তো ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত (মাত্রাতিরিক্ত) আহার করে, জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।

–সূরা ঃ ৪৭-মুহাম্মদ ঃ ১২

কুরআন মানুষের সামনে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছে যে, ধন-সম্পদ মোটেই ভালবাসার বস্তু নয়। কেননা এগুলো খুবই ক্ষণস্থায়ী।

সুতরাং এর ভালবাসা বড়ই ঠুনকো ও ক্ষণস্থায়ী। অতএব এমন বস্তুকে অবশ্যই ভালবাসা উচিৎ নয়। দুনিয়ার এই সহায়-সম্পদ যে খুবই ক্ষণস্থায়ী; এ বিষয়টিকেও কুরআনে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.eelm.weebly.com

ما عند كم ينفد وما عند الله باق .

যা তোমাদের নিকট আছে তা শেষ হয়ে যাবে। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা স্থায়ী হয়ে থাকবে।

أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل .

তোমরা কি দুনিয়ার জীবন (ও তার ধন-সম্পদ) নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসম্ভার তো আখেরাতের তুলনায় বড়ই নগণ্য।

বিভিন্ন আয়াতে দুনিয়ার এই জীবনের অস্থায়িত্বের বিষয়টি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس

এই দুনিয়ার জীবনের উপমা তো এমন যে, আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি; যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি সুশোভিত হয় এবং নয়ন ভুলোনা রূপ ধারণ করে এবং তার স্বত্বাধিকারীরা মনে করে যে, এগুলো তাদের আয়ত্বাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার (ধ্বংসাত্মক) নির্দেশ এসে উপস্থিত হয়। আর আমি ওগুলোকে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেই; যেন ইতিপূর্বে এগুলোর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সূরা ঃ ১০-ইউনুস ঃ ২৪

বিভিন্ন হাদীসে ধন-সম্পদকে নিতান্ত মূল্যহীন ও কদর্যবস্তু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং যারা এর অর্জনে বিমত্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঃ الدنيا جيفة وطالبها كلاب

দুনিয়া হলো পুতিগন্ধময় বস্তু আর এর অনুসন্ধানকারীরা কুকুর তুল্য।

এছাড়া সূরায়ে কাহাফের ৪৫নং আয়াতে এবং সূরায়ে হাদীদের ২০নং আয়াতে দুনিয়ার জীবনের অস্থায়িত্বের উপমা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি এক আয়াতে যারা দুনিয়ার জীবনে বিমত্ত; তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وذر الذين اتخذو دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ বলে গণ্য করে এবং দুনিয়ার জীবন (ও তার অর্থ-সম্পদ) যাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছে, তাদের সংগ বর্জন কর। – সূরা ঃ ৬ ঃ ৭০

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا

www.eelm.weebly.com

আর যারা আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না; তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চল। – সূরা ঃ ৫৩-নাজম ঃ ২৯

মূলতঃ দুনিয়ার প্রতি অতিআসক্তিই সকল অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বিড়ম্বনার মূল কারণ। এই আসক্তিই অর্থনৈতিক দুরাচারের জন্মদাতা। রাসূল (সা.) এক হাদীসে এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন ঃ حب الدنيا رأس كل خطيئة

দুনিয়ার ভালবাসাই সকল অনাচারের মূল। অন্য হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ من أحب دنياه أضر آخرته ومن أحب آخرته أضر دنياه

যদি কেউ দুনিয়াকে ভালবাসে তাহলে তার আখেরাত ক্ষতিগ্রস্থ হবেই, আর যদি কেউ আখেরাতকে ভালবাসে তাহলে তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হবেই। – মুসনাদে আহমদ

ঙ. সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দান

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বচরাচরের সকল সম্পদই মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহ তা'আলার অবারিত ও অফুরন্ত দান। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব প্রকৃতির বুকে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। মানুষের এমন কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করা যাবে না; যা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হুবহু যথাযথভাবে কিংবা তার মূল উপাদান পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যা কিছু তোমরা তাঁর নিকট কামনা করেছ, যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহকে গণনা করতে চাও তাহলে তার পরিসংখ্যান করে শেষ করতে পারবে না। – সূরা ঃ ১৪ ইব্রাহীম ঃ ৩৪

কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে সন্নিহিত এসব সম্পদ থেকে নিজের মেধা ও শ্রম খরচ করে যখন নিজের জন্য কিছু আহরণ করে নেয় এবং তার উপর তার দখলদারিত্ব সৃষ্টি হয়, তখন এই সম্পদ কোথা থেকে কিভাবে কার অনুগ্রহে অস্তিত্ব লাভ করল এবং কিভাবে তার হাতে আসল; সেই তত্ত্ব ও রহস্যের প্রতি আর ফিরে তাকায় না। সে তখন আমিত্ব ও অহংবোধের মারাত্মক এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে তখন মনে করে, এই সম্পদ আমার, আমি নিজের বুদ্ধি ও শ্রম ব্যবহার করে তা উপার্জন করেছি, এগুলোর মালিক আমি। এহেন ভাবনা তার মাঝে আমিত্বে ভরা এক অহংবোধি সত্তার জন্ম দেয়। ফলে সে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। এই অর্থনৈতিক অহংকারও আত্মম্ভরিতার ফলে সে তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এরই ফলে সমাজে বহু ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সামাজিক প্রীতি-বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের অন্যায় ও উৎপীড়নের শিকার হয় সাধারণ নিরীহ মানুষ। জুলুম ও শোষণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এদের মাধ্যমে সমাজে বহু ধরনের পাপের

www.eelm.weebly.com

স্রোত প্রবাহিত হয়। টাকার জোরে তারা তখন যা ইচ্ছে তাই করতে চায়। তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে গেলে তারা ক্ষেপে যায়, মারমুখি হয়ে উঠে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এহেন মনোবৃত্তির কথা আল্-কুরআনে অতি সংক্ষেপে সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আ.) যখন তাদের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেন; তখন তারা বলে উঠল ঃ

يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبائنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.

হে শো'আয়ব! আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যার ইবাদত করত এবং আমরা আমাদের মাল-সম্পদ যথেচ্ছা ব্যবহার করি; তোমার নামায কি এগুলো বর্জন করতে তোমাকে নির্দেশ দেয়? সূরা ঃ ১১ - হূদ ঃ ১৮

যেহেতু তারা নিজেকেই স্ব-অর্জিত মাল-সম্পদের হর্তাকর্তা মনে করত সুতরাং তারা তখন কোন বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করতে চাইত না। একারণেই আল্-কুরআন এই আমিত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দিতে চেয়েছে। এইসব প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ; যা না হলে মানুষের কিছুই করা সম্ভব হত না এগুলোতে মানুষের মালিকানার দাবী যে একান্তই ঠুনকো ও ভিত্তিহীন; একথাটি বিশ্ব মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্-কুরআন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে।

কেননা মানুষ যে সম্পদ ভোগ করে; এর কোনটাই মানুষ সৃষ্টি করেনি। সকল কিছুর মৌল উপাদান মহান আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছে। এই সৃষ্টিতে মানুষের কোন হাত নেই। আমরা ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করি। এই ভাত যে ধান থেকে তৈরি হয়; সেই ধানের উৎপাদন চাষাবাদের মাধ্যমে আমরা করে থাকি। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট ধানগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে; আমরা নিজ থেকে একটি ধান সৃষ্টি করে তা থেকে নতুন করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারি কি? না, তা আমরা পারি না। আমরা যা পারি তা হল; আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ধানের উপর মেহ্নত করে, সার ইত্যাদি প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়াতে, কিংবা এক প্রজাতির ধানের রেণু অন্য প্রজাতির ধানের রেণুর সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে উন্নত প্রজাতির কোন ধান উৎপাদন করতে। সারকথা আল্লাহর সৃষ্ট উপকরণের উপর মেহ্নত করে আমরা তার অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে পারি এবং সেই উপাদানে আল্লাহ প্রদত্ত যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট রয়েছে তা খুঁজে খুঁজে বের করে, ক্ষেত্রভেদে তার ব্যবহার করতে পারি। তাহলে সৃষ্টি বলতে যা বুঝায় সে ক্ষমতা মানুষের নেই। এমনকি প্রত্যেক উপাদানের যে বৈশিষ্ট রয়েছে; তা সামান্যতম পরিবর্তন করার যোগ্যতাও মানুষের নেই। আগুনের দাহন ক্ষমতাকে লুপ্ত করে; তাকে আরামদায়ক শীতল বৈশিষ্ট দান করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের আছে আল্লাহ প্রদত্ত উপাদানগুলোকে তার গুণ ও বৈশিষ্ট বুঝে নব নব রূপে রূপান্তর করার এবং ক্ষেত্রভেদে তার বহুবিদ ব্যবহারের প্রক্রিয়া আবিস্কার করার ক্ষমতা। তাও আবার করা সম্ভব হয় প্রাকৃতিক

www.eelm.weebly.com

আনুকূল্যের কারণে যা মূলতঃ আল্লাহর সৃষ্টি।

সুতরাং সৃষ্টি সূত্রে মালিকানা লাভের যোগ্যতা মানুষের নেই। এই বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ স্রষ্টা যে আল্লাহ তা'আলাই একথাটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

أفرأيتم ما تحرثون أءنتم تزرعون أم نحن الزارعون ·

লক্ষ্য করেছ কি? তোমরা যে কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন কর, সেগুলো কি তোমরা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? – সূরা ঃ ৫৬ - ওয়াকিয়া ঃ ৬৩-৬৪

الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون .

(তিনিই আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে অগ্নি প্রজ্জলিত কর। – সূরা ঃ ৩৬ - ইয়াসীন ঃ ৮০

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم .

আর তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর সেই পানি দ্বারা আমি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। অতএব, তোমরা তা থেকে আহার কর এবং তোমাদের প্রাণীগুলোকে তাতে চারণ কর। – সূরা ঃ ২০- ত্বহা ঃ ৫৩

و لم يروا أنا خلقنالهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মাঝে তাদের জন চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেছি। পরে তারা তার মালিক বনে যায়।

– সূরা ঃ ৩৬ - ইয়াসীন ঃ ৭১

وخلق لكم ما فى الأرض جميعا তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন।

এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল কিছুর স্রষ্টা মূলতঃ আল্লাহ। সুতরাং সৃষ্টি সূত্রে মালিকানা সব কিছুতে তাঁরই; অন্য কারো নয় এবং এসব কিছুর গুণাগুণ সৃষ্টি, বৈশিষ্ট প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের মালিকও তিনি। সুতরাং সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণজনিত মালিকানা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর। মানুষকে তিনি দয়া পরবশ হয়ে এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ মেহনত করলে এসব কিছু থেকে উপকৃত হতে পারবে; এই যা মানুষের মালিকানা। আসলে এটাকে কোন মালিকানাও বলা চলে না। এটাকে হয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুদান ও অনুগ্রহ বলা চলে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

তিনি তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

www.eelm.weebly.com

কিংবা বলা যায় যে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এগুলোর উপর প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা লাভ করেছে এবং এ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। যেমন সূরায়ে হাদীদের ৭নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه

তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং যে ধন-সম্পদে তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তা হতে ব্যয় কর। - সূরা ঃ হাদীদ ঃ ৭

আল্লামা আলূসী বাগদাদী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন ঃ

أى جعلكم سبحانه خلفاء عنه عزوجل فى التصرف فيه من غير أن تملكون حقيقة .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ভোগ-ব্যয় করার জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছেন, যদিও তোমরা এর প্রকৃত মালিকানা লাভ করবে না।

– রুহুল মাআনী খন্ড- ২৮ পৃঃ ৬৯

এই ব্যাখ্যার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, সম্পদের প্রকৃত মালিকানা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার। মানুষকে ভোগ-ব্যয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা প্রদান করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং সম্পদের প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা অভিপ্রায়ের বিপরীতে এর অর্জন, ভোগ, ব্যয় কিছুই করার আইনগত অধিকার মানুষের নেই। কেবলমাত্র তার দেয়া আইন ও বিধানের মধ্যে থেকে আয়, ভোগ ও ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষ সম্পদের আমানতদার মাত্র। অতএব এর যথার্থ হিফাজতের দায়িত্ব মানুষের উপরই বর্তায়। অবশ্য বৈধ মালিকানা লাভের প্রক্রিয়ায় অথবা শ্রম সাপেক্ষে আল্লাহর সৃষ্ট সমুদয় সম্পদ থেকে প্রত্যেককে তার আমানতদারীর অংশ অর্জন করে নিতে হবে। আল্লাহর দেয়া যথার্থ বিধান অনুসারে যে যতটুকুর উপর আপন দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে; সেটুকুতেই তার ভোগ ব্যয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই অধিকারকেই আমাদের পরিভাষায় মালিকানা বলা হয়ে থাকে।

সারকথা এই যে, আল্-কুরআনের বর্ণিত মালিকানার দর্শন এই যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে এগুলোকে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত করে রেখেছেন।

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এই সম্পদে আল্লাহ প্রদত্ত্ব বিধানের আওতায় বৈধ দখলদারিত্বের শর্তে ভোগ-ব্যয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা লাভ করবে। সুতরাং সম্পদে মানুষের অবাধ মালিকানা থাকবে না, যার কথা পুঁজিবাদীরা বলেন। আবার একদম ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না এরূপও নয়, যার কথা সমাজতন্ত্রীরা বলে থাকেন। বরং আল্লাহ্র দেয়া বিধানের আওতায় সীমিত পর্যায়ের মালিকানা ব্যক্তির থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া বিধান মুতাবেক

www.eelm.weebly.com

আয়-ব্যয় ও ভোগের অধিকার ব্যক্তি লাভ করবে। মূলতঃ এটাই ইসলামের মালিকানা দর্শন।

উপরোল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের সুফল

উপরোল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত অপরাপর অর্থনৈতিক দর্শন থেকে ইসলামী অর্থনীতি একটি ভিন্ন গতি লাভ করেছে। যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিম্নোক্ত সুফল প্রতিফলিত হয়েছে।

(ক) 'সম্পদ মৌলিকভাবে আল্লাহর, আমি তার অনুগ্রহে এর মালিক হয়েছি' - এই দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তি যত সম্পদেরই মালিক হোক না কেন, তার মনে থাকবে যে, এখানে কৃতিত্ব আমার খুবই নগণ্য। মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও তাঁর অনুগ্রহের সামনে আমার কৃতিত্ব উল্লেখ করার যোগ্যই নয়। অতএব আল্লাহর কুদরতের সামনে তার অহংবোধ চুরমার হয়ে যাবে বরং আল্লাহ যে তার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন; এজন্য সে অধিক বিণীত হয়ে তার দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। ফলে সম্পদের মালিকানাজনিত অহংকার থেকে পৃথিবীতে যে অনাচার ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়; তা থেকে পৃথিবী বেঁচে যাবে।

(খ) এই দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তি সম্পদের আয়-ব্যয় ও ভোগের ক্ষেত্রে সর্বদাই আল্লাহর বিধান মেনে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কেননা এ সম্পদ যে মূলতঃ তারই অনুগ্রহের দান। এ দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পদ থেকে অন্যের কল্যাণে ব্যয় করতেও কার্পণ্য করবে না। কেননা আল্লাহ যে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তা সর্বদাই তার মানসপটে বিদ্যমান থাকবে। ফলে ব্যক্তির হাতে সম্পদ অবৈধভাবে পুঞ্জিভূত হয়ে যাওয়ার আশংকা কমে আসবে। কেননা এহেন বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করতে উৎসাহ বোধ করবে। তার মনে থাকবে যে, এই সম্পদের সবইতো তাঁর অনুগ্রহের দান।

(গ) এই দর্শনে বিশ্বাসীরা সম্পদ উপার্জনকে কখনই জীবনের পরম লক্ষ্য বানাতে যাবে না। ফলে সম্পদসর্বস্ব মানসিকতার কারণে অর্থ-সম্পদ আহরণের যে অর্থগৃধ্নু মানসিকতা মানুষের মধ্যে জন্ম লাভ করে; তা তাদের মাঝে গড়ে উঠবে না। ফলে তারা স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থসর্বস্ব মানসিকতার কারণে অর্থসম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে যে জঘন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, যেসব জুলুমাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং অভিনব প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়; যা দ্বারা হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হয় নির্যাতিত, শোষিত ও প্রতারিত তা থেকে সমাজ রক্ষা পেয়ে যাবে। কারণ এই দর্শনে বিশ্বাসীদের সামনে সফলতার চুড়ান্ত মঞ্জিল হবে আখেরাতের সফলতা। অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের মাধ্যমে যা কখনই অর্জন করা যায় না। তাই তারা সেই মঞ্জিলের সফলতার

www.eelm.weebly.com

বিষয়টিকে সামনে রেখেই অর্থ-সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত হবে। অতএব অন্যকে ধোকা দেয়া, শোষণ করা ও জুলুম করা তো দূরের কথা বরং অন্যের কল্যাণকামিতার এক পরম হিতৌষী গুণ তার মধ্যে বিকাশ লাভ করবে। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা তাদের জন্য সম্ভবই হবে না; বরং সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর মাখলুকের উপকার করে; কি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আপন লক্ষ্যে চরম সফলতা অর্জন করা যায়; সে চেষ্টায় হবে সে সদা তৎপর। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই বিশ্বাসের প্রতিফলনের ফলেই সাহাবীগণ আপন সম্পদের সর্বোত্তম অংশ জনকল্যাণে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে জান্নাত ক্রয় করার চেষ্টা করেছেন। আল্-কুরআনেও সর্বোত্তম মাল ব্যয় না করলে কল্যাণ লাভ হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون .

তোমরা কক্ষণই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন সম্পদ থেকে ব্যয় করছ যা তোমাদের নিকট অতি প্রিয়। - সূরা ঃ ৩ ঃ ৯২

(ঘ) সম্পদের অন্ধ ভালবাসার কারণে সম্পদ আহরণের জন্য মানুষ যে উন্মাদ প্রায় হয়ে যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ব্যক্তিস্বার্থের অন্ধটানে অন্যের রক্ত শোষণ করে থাকে - এ দর্শনে বিশ্বাসীদের মাঝে এ ধরনের প্রবৃত্তিও জন্ম লাভ করতে পারবে না। কেননা তার অন্তরের ভালবাসার বিন্দুটি তো আল্লাহ ও পরকালের মুক্তির জন্য নিবেদিত; সম্পদের জন্য নয়। সম্পদ তো তার সেই কাংখিত মঞ্জিল তথা আপন প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য পাথেয় মাত্র।

(ঙ) তবে যেহেতু ব্যক্তিমালিকানা সীমিত পর্যায়ে হলেও এ দর্শনে স্বীকৃত, অতএব এ দর্শনে বিশ্বাসীরা উৎপাদনে ফাঁকি দিয়ে অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে আল্লাহর মাখলুককে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিবে না। তাছাড়া সকল ক্ষেত্রেই সে তার প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চেতনায় দায়বদ্ধ। অতএব যদি উৎপাদনে অবহেলাজনিত বিষয়ে তিনি জিজ্ঞেস করে ফেলেন, তাহলে কি জবাব সে দিবে? এই চেতনায় তাড়িত হয়েই সে অধিক স্বত:স্ফূর্ততা নিয়ে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করবে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের ন্যায় ধ্বংসাত্মক পরিণতির কোন আশংকার প্রশ্নই উঠে না এ দর্শনে।

(চ) এ দর্শনে বিশ্বাসের ফলে সম্পদের মালিক 'আমি' এ ধারণা জন্মাবে না। আবার আল্লাহ্ দিবেন বলে হাতগুটিয়ে বসে থাকার মত বৈরাগ্য নীতি অবলম্বনেরও অবকাশ থাকবে না বরং সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন এই বিশ্বাস নিয়ে তা উপার্জনের জন্য মেহ্নত করতে মানুষ কার্পণ্য করবে না।

www.eelm.weebly.com

২. জীবনোপকরণে সকল মানুষের সমতার নীতি

(ক) জীবনোপকরণের সমতা বলতে কি বুঝায়?

ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকার করে নেয়া হলেও আল্-কুরআনে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, ধনী-দরিদ্রের স্বভাবজাত ব্যবধান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর একটি লোককেও তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। কেননা রিয্ক ও জীবিকার সংস্থানের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আর সকল মানুষ হল الخلق عيال الله বা আল্লাহর পরিবারের সদস্য। আর ব্যক্তির হাতে রক্ষিত সম্পদও মূলতঃ আল্লাহর। সে তার মালিকানা লাভ করেছে আমানতি দায়িত্ব হিসেবে। আল্লাহর সম্পদ অন্যের হাতে সঞ্চিত থাকবে আর তার পরিবারের সদস্যরা না খেয়ে থাকবে তা কি করে হয়? মহান আল্লাহ তা'আলা তো পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্ক সরবরাহের জিম্মাদারি নিজেই গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها.

পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর।

– সূরা ঃ হুদ ঃ ৬

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم .

দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরকেও রিয্ক দান করি এবং তাদেরকেও। – সূরা ঃ আন্আম ঃ ১৫১

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

নিঃসন্দেহে আল্লাহই রিয্ক দানকারী; যিনি অতিশয় ক্ষমতাবান।

– সূরা ঃ আয্যারিয়াত ঃ ৫৮

ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله .

আকাশ ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক দান করে? আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে কি? – সূরা ঃ ২৭ - নমল ঃ ৬৪

وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين .

আমি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে জীবনোপকরণ সন্নিহিত করে দিয়েছি এবং তাদের জন্যও যাদেরকে তোমরা জীবিকা প্রদান কর না। – সূরা ঃ হিজর ঃ ২০

এসব আয়াতের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রাণীর জীবিকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাদের প্রয়োজনমত জীবনোপকরণ এই ধারাপৃষ্ঠে সন্নিহিত করে দিয়েছেন। যদি কতিপয়

www.eelm.weebly.com

মানুষ তা থেকে অধিক হারে আহরণ না করত; তাহলে সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান পেত।

অতএব যারা অধিক হারে সঞ্চয় করে রেখেছে, তাদেরকে অবশ্যই বঞ্চিতদের নূন্যতম প্রয়োজন পরিমাণ জীবনোপকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে- وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم– তাদের (অর্থাৎ ধনীদের) সম্পদে একটি নির্ধারিত পরিমাণ হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।

এজন্যই হযরত আলী (রা.) বলতেন, বিত্তবানদের ধন-সম্পদের দ্বারা গরীবদের জীবিকার নূন্যতম চাহিদা পূরণ করা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন। যদি গরীবরা অন্নহীনতা, বস্ত্রহীনতা কিংবা অন্য কোন আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়, তাহলে সেটা শুধু এজন্য হবে যে, বিত্তবানরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তারা আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এর জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। – মুহাল্লা-৬ ঃ ১৫৮

ধনীদের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তা দিয়ে গরীবদের প্রয়োজন পূরণ করতঃ সকল মানুষ মিলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করুক; এটি মহান আল্লাহ তা'আলার কাম্য। যদিও তিনি কোন অজ্ঞাত হিকমাতে সম্পদের মালিকানায় ধনী গরীবের তারতম্য সৃষ্টি করেই মানুষকে প্রেরণ করেছেন বিশ্বচরাচরে। সূরায়ে নহলের ৭১ নং আয়াতে এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون .

আর আল্লাহ তা'আলা রিয্কের প্রশ্নে তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যাদেরকে বেশি দেয়া হয়েছে; তারা তাদের অধীনস্থদেরকে তা থেকে দিতে সম্মত হয় না; যাতে তারা তাদের সমপর্যায়ভূক্ত হতে পারে। তারা কি আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে চায়? – সূরা ঃ ১৬-নহল ঃ ৭১

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উদ্দেশেই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর এসব বাণীর সারকথা হচ্ছে, জীবিকা ও জীবনোপকরণ আল্লাহ তা'আলার অবারিত ভান্ডারের দান। তা থেকে প্রতিটি প্রাণীর জীবিকা আহরণের এবং উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার রয়েছে। এই সাম্যের নীতি আল্-কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام سواءً للسائلين .

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ তিনি এই ভূ-পৃষ্ঠের উপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত অবতীর্ণ করেছেন, এবং তাতে খাদ্য সম্ভার সন্নিহিত করেছেন চারদিনে যা অনুসন্ধানকারীদের জন্য সমভাবে প্রদত্ত। – সূরা ঃ ৪১ - হা-মীম ঃ ১০

মানগত পার্থক্য থাকলেও জীবনধারণ পরিমাণ রিযুক সবাইকে পেতে হবে। এটাই মূলতঃ জীবনোপকরণের সমতার অর্থ।

এ প্রসঙ্গে সূরায়ে বাকারার ২৯নং আয়াত ঃ

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا

তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন – এর অধীনে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) কর্তৃক উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে মনে হয় পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তিনি ভূ-পৃষ্ঠের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কোন জিনিসেই কারো মালিকানা নির্দিষ্ট নেই বরং সব বস্তুর উপর সকল মানুষের মালিকানা সত্ত্ব রয়েছে। অবশ্য মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ যাতে না হয় এবং সকলেই যাতে সম্পদের দ্বারা যথার্থভাবে উপকৃত হতে পারে, এজন্য দখল বা অধিকারকে মালিকানার প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর উপর কারো মালিকানা বলবৎ থাকবে; ততক্ষণ অন্য কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ মালিকের নৈতিক কর্তব্য হল নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুসমূহ অন্যকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়া। কারণ প্রকৃতপক্ষেই তাতে অন্যের অধিকার নিহিত রয়েছে। আর এজন্য যাকাত ইত্যাদি আদায় করার পরও প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জমা করে রাখা ঠিক নয়।

বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, নবী-রাসূলগণ এবং সালেহীনগণ এই নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এমনকি কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ীন তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করে রাখা হারাম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে যাই হোক, এরূপ করা যে অনুচিৎ এবং ইন্সাফ ও ন্যায়-নীতির পরিপন্থী; তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হলো, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূলতঃ কোন স্বার্থ জড়িত নেই। তাছাড়া অন্যদিক বিচারে তাতে অন্যের মালিকানাস্বত্ত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এ হিসেবে বলা চলে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যের সম্পদ আঁকড়ে ধরে আছে। বিষয়টিকে গনীমতের মালের সাথে তুলনা করা যায়। মূলতঃ গনীমতের মাল বন্টন না করা পর্যন্ত তাতে সকল যোদ্ধার মালিকানা বিদ্যমান থাকে। প্রয়োজন দেখা দিলে তা থেকে নূন্যতম পরিমাণ যে কোন সৈনিক ভোগ করতে পারে। তবে কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঁকড়ে রাখলে তার অবস্থা কি হবে তা কারো অজানা নয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মসাৎকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। – ইযাহুল অদিল্লাহ- ২৬৮

www.eelm.weebly.com

হযরত উমর (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এখন আমি যা অনুধাবন করছি; তা যদি আগে বুঝতে পারতাম, তাহলে কালবিলম্ব না করে বিত্তবানদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদ নিয়ে এসে গরীব মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দিতাম। – মুহাল্লা- ৬ ঃ পৃ ১৫৮

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হযম (রহ.)-এর মতামত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদি ধনীরা স্বত:স্ফূর্তভাবে এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসে তাহলে রাষ্ট্র প্রধান এ দায়িত্ব পালনের জন্য বিত্তবানদের বাধ্য করবেন।

তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে সকল সাহাবীর ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি কোন লোক অন্নহীন, বস্ত্রহীন কিংবা প্রয়োজনীয় বাসস্থান থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে বিত্তবানদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা তার ব্যবস্থা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। – মুহাল্লা খ. ৬ঃ পৃ ১৫৬

উপরোল্লিখিত মতামতের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই যে, সকল মানুষেরই নূন্যতম জীবনোপকরণের অধিকার ভূ-পৃষ্ঠের সম্পদে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব সকল মানুষের ন্যূনতম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আর এ দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। বায়তুল মালের সম্পদ দ্বারা যদি এর সংস্থান করা সম্ভব হয় তাহলে তাই করতে হবে। অন্যথায় সরকারকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য ধনবানদের প্রতি আহবান জানাতে হবে। বিত্তবানরা স্বত:স্ফূর্তভাবে এ দায়িত্ব পালন না করলে; বলপূর্বক তাদের সম্পদ দ্বারা বিত্তহীনদের ন্যূনতম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা 'কতিপয় মানুষকে ধনী আর কতিপয়কে গরীব করে সৃষ্টি করেছেন' – এ ঘোষণা নিজেই দিয়েছেন, অতএব কেউ প্রাচুর্য ভোগ করবে আর কেউ না খেয়ে কাটাবে এটা আল্লাহ তা'আলারই অভিপ্রায়। সুতরাং উপরোল্লিখিত এই ব্যাখ্যা কি করে মানা যায় যে, জীবিকার প্রশ্নে সকল মানুষ সমানাধিকার রাখে এবং কাউকেই জীবিকার ক্ষেত্রে বঞ্চিত রাখা চলবে না?

এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হল, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমাদের জন্য পালনীয় হল আল্লাহর নির্দেশ। সৃষ্টি দর্শনে তিনি কোন উদ্দেশে কি করেছেন তা তিনিই ভাল বুঝেন। আমাদেরকে তিনি যা পালন করতে বলেছেন, আমাদেরকে তাই পালন করতে হবে। উপরোল্লিখিত আল্-কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে সকল মানুষের জীবিকা লাভের অধিকার যে রয়েছে তা খুবই সুস্পষ্ট। আর তার ব্যবস্থাযে ধনীদের করা উচিৎ যাতে

www.eelm.weebly.com

গরীবরা তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে, তা সূরায়ে নহলের পূর্বোল্লেখিত আয়াতের আলোকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ধনী দরিদ্রের তারতম্যসহ সৃষ্টি করেছেন বলেই কি আমাদের কর্তব্য হবে এই ব্যবধানকে আরো দুস্তর করে তোলা এবং এমন একটি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যাতে সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ কোটি কোটি আল্লাহর বান্দাহ্ জীবিকার অভাবে ভূখাণাঙ্গা থেকে মৃত্যুবরণ করে? এটাই কি তবে আল্লাহর অভিপ্রায়? এটা কখনই হতে পারে না। অতএব উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে একথাই প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, সম্পদের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে একটা স্বভাবজাত তারতম্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জীবিকা লাভের ক্ষেত্রে সকল মানুষের অধিকার সমান থাকবে। বিত্তবানদের বিত্তসম্পদ অবশ্যই গরীব ও অসহায় মানুষের অসহায়ত্ব ও দুঃখ দুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য নয়। এহেন কর্ম অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হতে পারে না।

সারকথা এই যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের আলোকে গবেষণালব্ধ মতামতের আলোকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, জীবিকার অধিকারে সাম্যের এই মতবাদ আল্লাহর অভিপ্রায়ের বিরোধী নয় বরং এক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত অভিপ্রায়। আসলে সামন্তবাদী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পবিবেশে লালিত হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে ইসলামের মূল নির্দেশ সম্পর্কে আমরা বিস্মৃত হয়ে আছি কিংবা তা অনুধাবনের কোন চেষ্টাই হয়তবা আমরা করিনি। এটা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা যে, আমরা অনৈসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বলে ধারণা করে বসে আছি।

জীবনোপকরণের সমতা ঃ সাম্যবাদ ও জাতীয়করণ নীতি

পুঁজিবাদের দায়-দায়িত্বহীন অবাধ মালিকানার দর্শনের ফলে বিশ্বব্যাপী বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক পর্যায়ের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে - যার পরিণতিতে একই পৃথিবীর বাসিন্দা এবং একই আদমের সন্তান হয়েও কেউ টাকার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে আর কেউবা অর্থের অভাবে ধুকে ধুকে মরছে, কেউ ভূরিভোজন করে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে, আর কেউবা অনাহারে দিনের পর দিন গুজরান করে জঠর জ্বালায় আহাজারি করছে, কেউ পাঁচতলায় আর কেউ গাছ তলায় বাস করছে - এই বৈষম্য নিরসনের আবেগে তাড়িত হয়েই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছে সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র। যাদের মূল দর্শন হলো - ধনী-গরীবের এই ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে

www.eelm.weebly.com

সাম্যের নতুন পৃথিবী গড়ে তোলা। বস্তুতঃ এই বৈষম্যের জন্য তারা মৌলিকভাবে দায়ী মনে করেছে ব্যক্তি মালিকানাকে। ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে সকল সম্পদকে রাষ্ট্রীয়করণ করতে পারলেই সুখের স্বর্গ রচিত হবে, এই বিশ্বাসে তারা মালিকানার স্বভাবজাত পদ্ধতির মূলোৎপাটনের জন্য মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে লক্ষ লক্ষ বনী আদমকে অবলিলায় হত্যা করে তাদের কল্পিত সুখের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও করে ছেড়েছে। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা হরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা তারা বোধ হয় তখন মোটেও ভেবে দেখেনি। কার্লমার্কস ছিলেন এই সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার স্বপ্নদ্রষ্টা। তারই দুই ভাবশিষ্য লেলিন ও মাওসেতুং যথাক্রমে রাশিয়া ও চীনে কার্লমার্কসের চিন্তাধারা বাস্তবায়নের জন্য গুরুতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৯৯৭ সালে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ববস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবকে সংঘটিত করার জন্য সে সময় সরকারকে প্রায় ঊনিশ লক্ষ মানুষ হত্যা করতে হয়েছিল। তাছাড়া বিশ লক্ষাধিক মানুষকে সে সময় সরকারী জান্তার অমানুষিক ও বর্বরোচিত নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ভূমি মালিক ও জমিদারদের থেকে ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্য জমিদার ও ভূমি মালিকদেরকে যেরূপ পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়েছিল; তা দেখে রুশ সমর্থক কমিউনিস্টরাও হায় হায় করে উঠেছিল। এহেন যুলুম-নির্যাতন ও হত্যাকান্ড সংঘটনের পিছনে মূলতঃ উদ্দেশ্য (হয়ত) একটাই ছিল যে, মানুষের মধ্যকার ধনী-গরীবের তারতম্য ও ভেদাভেদ ঘুঁচিয়ে ফেলে একটি সাম্যধর্মী অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখনে থাকবে না বৈষম্য। জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা নিয়ে বসবাস করবে দেশের প্রতিটি নাগরিক। ভেদাভেদহীন প্রশান্তি ভরা জীবনের অমোঘ মূর্চ্ছনা গাইবে মানুষ শুধুই সাম্যের জয়গান।

তাদের এই অভিলাষ যে গোটা পৃথিবীর কাছেই আবেদনময়ী হয়ে উঠছিল এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অনেক মানুষই যে এহেন আদর্শের প্রবর্তনকারী ও উদ্যোক্তাদের জয়গান গাইতে শুরু করেছিল সে ইতিহাস সকলেরই জানা। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তখন সাম্যের ধর্ম ইসলামের ব্যক্তি মালিকানার দর্শনকে সাম্যের একটি ক্রুটিপূর্ণ দর্শন বলে অভিহিত করে বক্তৃতা-বিবৃতিও দিয়েছিলেন প্রচুর।

কিন্তু এ আদর্শের প্রবক্তারা কি আর মহান আল্লাহ তা'আলার মতো সর্বজান্তা ছিলেন? তারা কি করে জানবেন যে, ব্যক্তিমালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হবে সেই সাম্যে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভোগ ও দারিদ্র কেবল বৃদ্ধিই পাবে, হ্রাস পাবে না মোটেও।

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে পদ্ধতি

www.eelm.weebly.com

অবলম্বন করেছে, তাতে উৎপাদন হ্রাস না পেয়েও এবং কারো প্রতি জোরজবর না করেও এক পর্যায়ের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু কমিউনিজমের দর্শনের ভিত্তিতে যে সাম্য গড়ে উঠেছিল তার পর্যালোচনার জন্য আমাদেরকে দুটি পর্যায়ে জরিপ চালাতে হবে ঃ

১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার ফলে কোন্ পর্যায়ের সাম্য সৃষ্টি হয়েছিল?

২. রাষ্ট্রীয়করণ নীতি প্রবর্তনের ফলে আয় উৎপাদনের উপর কী প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল?

মূলতঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তনের ফলে ঐশীভাবে সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার ব্যবধান উঠিয়ে ফেলা কোন দেশে কোন কালেও সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই তারতম্য সৃষ্টি করেই সচল করে রেখেছেন পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রকে। তা না হলে সকলেই যদি সমান হয়ে যেত, তাহলে কারো প্রয়োজনে কেউ এগিয়ে আসত না। অথচ মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনগুলো সে একাই পূরণ করতে পারে না। অন্যের সহযোগিতা তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ করতেই হয়। যদি সবাই সমান হত তাহলে কেউই কারো প্রয়োজনে এগিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করত না। ফলে জীবন হয়ে পড়ত অচল, দুর্বিসহ। ধনী-গরীবের এই তারতম্য আছে বলেই আজ একজন অন্যজনকে অর্থের বিনিময়ে তার প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত করতে পারছে। ফলে পৃথিবী রয়েছে সচল ও গতিশীল; সভ্যতা ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। যদি এই তারতম্য না হত তাহলে কেউ কারো সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে সম্মত হত না। ফলে অগ্রসর হতো না সভ্যতার চাকা, পৃথিবী মুখ থুবড়ে পড়ত সহস্র বছর আগেই।

সারকথা হল ধনী-গরীবের এই তারতম্য ঐশীভাবেই সৃষ্ট। তাই একে ঘুঁচিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। এ উদ্যোগ ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাম্যের শ্লোগানের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু চেষ্টা-পরিশ্রম, আন্দোলন-সংগ্রাম, অগণিত গণ-মানুষকে হত্যা ও নির্যাতনের অন্ধ-প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপের পর যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পৃথিবীর যে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সাম্যের শ্লোগান কার্যতঃ সেখানে হেয়ালীতে পরিণত হয়েছে। সাম্য ও সমানাধিকার সেখানে মায়া মরিচিকায় পরিণত হয়েছে। সাম্যবাদ সোভিয়েত নাগরিকদের জীবনে সাম্য সৃষ্টি করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এসে সাম্যবাদীদেরকেও মানুষের মধ্যকার এই ভেদাভেদকে স্বীকার করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত ভেদাভেদকে তারা শ্রেণীগত ভেদাভেদের দুর্ভেদ্য দেয়ালে আবদ্ধ করে দিয়েছে। যে ভেদাভেদ ও বৈষম্যকে কাটিয়ে উঠার কোন পথ খোলা রয়নি। ফলে নিম্নশ্রেণীভূক্ত নাগরিকদেরকে উচ্চশ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসী

www.eelm.weebly.com

মনের খায়েশ মেটানোর জন্য আজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহ্নত করে যেতে হয়। তথায় তাদের কোন স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকৃতি লাভ করে না। আজীবন তাদেরকে চাকর হয়েই থাকতে হয়, চাকরিই তার ললাট লিখন, মৃত্যু পর্যন্ত এই ঘানি তাকে টেনেই যেতে হবে, স্বস্থির নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ এ ব্যবস্থায় নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক বৈষম্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় কোন অংশে কম নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশগুলো অপেক্ষাও অনেক বেশি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত লেখক জেমস্ ব্রুহান (JAMES BWRUHAN) মন্তব্য করেছেন যে, সোভিয়েতের জাতীয় আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভোগ করে শতকরা ১১/১২ জন উচ্চ পর্যায়ের আমলা। প্রখ্যাত ফরাসী কমিউনিস্ট লেখক কমরেড ইউভন (YOVN) রাশিয়ার শ্রেণীগত পার্থক্যের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

আহার বাসস্থান ব্যতীত খেত মজুরদের মাসিক বেতন ৫০-৬০ রুবল। সাধারণ মজুরদের মাসিক বেতন ১৩০-২৫০ রুবল। পক্ষান্তরে দায়িত্বশীল অফিসারদের মাসিক বেতন ১,৫০০-১০,০০০ রুবল। ডাইরেক্টর, শিল্পী, লেখক ও অভিনেতা পর্যায়ের লোকদের বেতন ২০,০০০-৩০,০০০ রুবল পর্যন্ত রয়েছে।

১৯৩৭ সালে রাশিয়ার কর্মচারীদের মাসিক বেতনের তালিকা ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাধারণ শ্রমিক	১০০.০০	থেকে	৪০০.০০ রুবল
মধ্যম মানের কেরাণী	৩০০.০০	থেকে	১,০০০.০০ রুবল
উচ্চমানের অফিসার	১,০০০.০০	থেকে	১০,০০০.০০ রুবল
প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২০,০০০.০০	থেকে	৩০,০০০.০০ রুবল

রুশ পত্রিকা (TRUD)-এর দেয়া তথ্যানুসারে একটি খনিতে মোট জনশক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল ১৫৩৫ জন। তার মধ্যে এক হজার শ্রমিকের বেতন ছিল মাসিক ১২৫ রুবল হারে, আর চারশত শ্রমিকের বেতন ছিল মাসিক ৫০০ রুবল থেকে ৮০০ রুবল হারে। অফিসার পর্যায়ের ৭৫ জনের বেতন ছিল ৮০০ রুবল থেকে ১,০০০ রুবল হারে। অবশিষ্ট ৬০ জনের বেতন ছিল মাসিক ১০,০০০-৩৫,০০০ রুবল হারে।

এ হিসাবের সারকথা হল, সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা রাষ্ট্রে একজন সাধারণ শ্রমিক বেতন পায় মাসিক ১২৫ রুবল, আর উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা পায় ৩৫,০০০ রুবল। সুতরাং ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য

www.eelm.weebly.com

দাঁড়ায় এই যে, একজন সাধারণ নাগরিক যা পায়, একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা পায় তার (৩৫,০০০ – ১২৫) = ২৮০ গুণ বেশি।

সামরিক বাহিনীর বেতনের তারতম্যও প্রায় একই ধরনের ছিল। ১৯৪৩ সালের এক জরিপে দেখানো হয় যে, একজন সাধারণ সৈনিকের বেতন মাসিক ১০ রুবল, একজন লেফটেন্যান্টের বেতন মাসিক ১,০০০ রুবল, আর একজন কর্ণেলের বেতন ২,৪০০ রুবল। সুতরাং কর্ণেল ও সাধারণ সৈনিকের বেতনের তারতম্য দাড়ায় ১ গুণ ও (২,৪০০ – ১০ =) ২৪০ গুণ অর্থাৎ একজন সাধারণ সৈনিক যা পায় একজন কর্ণেল পায় তার চেয়ে ২৪০ গুণ বেশি।

প্রখ্যাত লেখক ডিকোস্টা তার 'শয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি' নামক গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, রাশিয়ার মোট আয়ের অর্ধেক শতকরা ১১ বা ১২ জন উচ্চ পর্যায়ের লোকের পকেটস্থ হয়। আর অবশিষ্ট অর্ধেক শতকরা ৮৮ জনের মধ্যে ভাগ ভাটোয়ারা হয়।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্যের আলোকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সাম্যের স্বপ্নপুরী রাশিয়ার নাগরিক জীবনে সাম্য কোন্ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা 'ডগলাস, জে' তার বিখ্যাত গ্রন্থ SCOIALISM IN THE NEW SOVIET- এ উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমান রুশ সমাজে উপর ও নিচের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা বৃটেন ও স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলো অপেক্ষা অধিক। সম্ভবত আমেরিকায় বিদ্যমান পার্থক্যের সমান।

এই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রী অর্থব্যবস্থার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য গড়ে উঠেনি। উপরন্তু এ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে হরণ করা হয়েছে। সুযোগ সুবিধার কোন উন্নতি ছাড়াই মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অমানুষিক শ্রমদানে বাধ্য করা হয়। তদুপরি তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে হরণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের নামে শ্রমিকদেরকে দৈনিক ১২ ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হয়। অথচ শ্রমিক শ্রেণী সেখানেও চরম দারিদ্রের শিকার। ছেড়া-ফাটা কাপড় দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ পর্যন্ত করতে পারে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের খাদ্য রেশনিং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য এমন পর্যায়ে করা হয় যে, তাদেরকে লঙ্গরখানা থেকে খাদ্য সংগ্রহে বাধ্য করা হয়। ফলে একজন মানুষ তার রুচি ও চাহিদা মাফিক খাদ্য থেকেও বঞ্চিত হয়। মন চাচ্ছে তাই কিছু খাওয়ার যে স্বভাবজাত তাড়না, তা পূরণেও সেখানকার মানুষ ব্যর্থ হয়। একটি প্রাণীরও তো মুক্ত বনে বিচরণ করে ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণের স্বাধীনতা

www.eelm.weebly.com

থাকে। কিন্তু সাম্যবাদী সোভিয়েত মানুষ ইতর প্রাণীর চেয়েও অসহায় হয়ে পড়ে। এপ্রথা যেন প্রাচীনকালের দাস প্রথার চেয়েও আরো বর্বরোচিত ও মর্মান্তিক। মানুষের স্বভাবজাত ইচ্ছা অভিলাষকে এভাবে গলাটিপে হত্যা করার এহেন নজির পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে বর্বর জাতিগুলোর মধ্যেও মেলা দুস্কর। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। মানুষ উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে কলুর বলদের ন্যায় সমাতন্ত্রের ঘানি টেনে গেলেও উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং এক কালের সমৃদ্ধ সোভিয়েত মাত্র ৭০ বছরের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরিণতিতে পৃথিবীর দারিদ্র-পীড়িত জনপদে পরিণত হয়েছে। মানুষ হয়েছে চরম খাদ্য সংকটের শিকার। উৎপাদনী প্রযুক্তিতেও তারা সমকালীন পৃথিবীর তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তনের ফলে উৎপাদনে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আমরা নিম্নে পেশ করছি।

সমাজতন্ত্রের স্বর্গভূমি খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদের প্রবর্তিত নীতির ফলে চাষাবাদের উপর কি প্রভাব পড়েছিল তা সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৫০ সালের একটি রিপোর্ট থেকে অনুমান করা যায়।

THE NEW ECONOMIC UPSOWING OF THE, U. S. S. R নামক এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রীয়করণ করার কারণে শ্রমিকরা কাজে যথেষ্ট ফাঁকি দিয়ে থাকে এবং চুরিও করে। এ কারণে রাষ্ট্রকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। সেই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে (এ বছর) ১,৮২,০০০ রুবল মুল্যের দ্রব্য সামগ্রী চুরি হয়ে যায়।

উক্ত রিপোর্টের ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় যে, সমষ্টিগত দায়িত্বে উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ কারণে সেই রিপোর্টে ব্যক্তিগত দায়িত্বে এবং খন্ড প্রকল্পের অধীনে উৎপাদন প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়। (২১ দফার রূপায়ন ঃ অধ্যাপক আবুল কাশেম)।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কৃষি ব্যবস্থা সর্বাধিক বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ এবং সমধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার পরও সেখানকার ফসল উৎপাদন অত্যন্ত নিম্নমানের রয়ে গেছে। ১৯৬৩ সালের এক রিপোর্টে দেখানো হয় যে, শতকরা ৭০টি কৃষি ফার্মে সরকারকে বিরাট রকমের খেসারত দিতে হয়েছে। ১৯৬৫ সালের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কৃষি ফার্মে সরকারকে সামগ্রিকভাবে ৪০ কোটি পাউন্ড ভর্তুকি দিতে হয়।

সমাতান্ত্রিক চীনেও কৃষি উপকরণ জাতীয়করণের ফলে একই পরিণতি দেখা

www.eelm.weebly.com

দিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার মধ্যদিয়ে সে দেশের ভূমি ও কৃষি উপকরণ কৃষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। কিন্তু এর পরিণতিতে কৃষি উৎপাদন তীব্রভাবে হ্রাস পায় এবং দেশে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। কঠোর রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সে সংকটের মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া জমির মালিকানা হারিয়ে এবং রাজনৈতিকভাবে এর প্রতিবাদের কোন সুযোগ না পেয়ে, কৃষকরা কৃষি উপকরণ ও চাষাবাদে ব্যবহৃত জন্তু-জানোয়ারগুলো ধ্বংস করে এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। ফলে চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত জন্তু-জানোয়ার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ১৯৫৭ সালের ২০ এপ্রিল চীনা প্রত্রিকা JEN-MINJEN-POO-তে এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

বৃটেনের লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসে কয়লার খনিসমূহ জাতীয়করণ করেছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, বেসরকারি পরিচালনায় কয়লা উত্তোলন করে যেখানে টন প্রতি ২ শিলিং করে মুনাফা হত, সেখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণে কয়লা উত্তোলন করে টন প্রতি ১ শিলিং করে লোকসান হতে শুরু করল। তাছাড়া পূর্বের তুলনায় বছরে গড়ে ২ কোটি টন কয়লা কম উত্তোলিত হতে থাকল।

কানাডায় সরকার নিয়ন্ত্রিত 'কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়ে' নামে একটি কোম্পানী ছিল, অপরদিকে 'কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে' নামে অন্য একটি বেসরকারি কোম্পানীও ছিল। ১৯৩৬ সালে বেসরকারি কোম্পানী যখন মুনাফা করল ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, সেখানে সরকারি কোম্পানীটি লোকসান দিল ৯০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কিছু কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। এখানেও একই অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। ফলে সেগুলোকে আবার বেসরকারি মালিনাকায় ছেড়ে দেয়া হয়।

এসব উদ্ধৃতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পরও উৎপাদনে বিপুল হারে ঘাটতি দেখা দেয়। সরকারকে কেবল লোকসান গুণতে হয়। বাংলাদেশে এ অবস্থাদৃষ্টে আবার কোম্পানীগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো আবার লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠার এ দর্শন কেবল ভুলই নয় বরং এর ফলে উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয় এবং দেশ দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সত্যের মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানার এই দর্শন শুধু বর্জনই করেনি বরং অনন্যোপায় হয়ে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠার এই দর্শনকে নিজেরাই অবাস্তব বলে ঘোষণা দিয়ে আবার পুঁজিবাদের দিকে ফিরে গেছে।

www.eelm.weebly.com

এরই বিপরীতে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়ে উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। আবার অর্থ ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের মাধ্যমে এমন এক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে বিস্তর বৈষম্য গড়ে উঠে না। যদিও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পদের তারতম্য থাকে, কিন্তু তা কখনই ১-২৮০ পর্যায়ের নয়।

৩. জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য

জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য ও তার প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম যদিও জীবনোপকরণে সকলের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে; তবে এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক তারতম্য থাকতে পারবে না এবং একজনের আহার্য অন্যজনের চেয়ে উত্তম হতে পারবে না বরং ইসলামের এই ঘোষণার অর্থ হল ন্যূনতম জীবনোপকরণ সকলকেই লাভ করতে হবে এবং সবার জন্য ন্যূনতম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা অবশ্যই হতে হবে।

ধনী-গরীবের ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়ে সকল মানুষকে একশ্রেণীভুক্ত করে ফেলতে হবে, এ ঘোষণা অবশ্যই ইসলাম দেয়নি। কেননা এই পার্থক্য একটি সীমিত পর্যায় পর্যন্ত প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত। অন্যকথায় এই পার্থক্য ঐশী অভিপ্রায়েরই প্রতিফলন। মহান আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টি কৌশলের এক রহস্যময় কারণে এই পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। তবে তা যাতে সংযত পর্যায়ে থাকে এবং এই পার্থক্য যাতে অন্যের বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ না হয়ে দাড়ায়; এজন্য তিনি নির্ধারিত বিধানের আওতায় মানুষকে তার অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন অবস্থাতেই যাতে এই পার্থক্য এক শ্রেণীর মানুষকে অসহায়ত্বের পর্যায়ে ঠেলে না দেয়, এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণী শোষিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত না হয় এ ব্যাপারেও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। এক শ্রেণীর উন্নতি অন্য শ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্রের কারণ হয়ে দাড়াবে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে নিজেদের আয়-উন্নতির হাতিয়ারে পরিণত করবে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করবে, এক শ্রেণী মালিক হয়ে অন্য শ্রেণীকে তাদের সেবাদাসে পরিণত করবে, এক শ্রেণী সুখ আর ভোগেই মেতে থাকবে, আরেক শ্রেণী তাদের সুখ ভোগের জন্য দারিদ্রের যূপকাষ্ঠে বলি হবে, এক শ্রেণী পাঁচতলায় থাকবে আরেক শ্রেণী গাছতলায় থাকবে এই আকাশচুম্বী ব্যবধান ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না।

ব্যক্তি জীবনে অর্থনৈতিক পার্থক্য যে থাকবে, এটা যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে না এবং ধনী-গরীবের ব্যবধান উঠিয়ে দেয়া যে মহান আল্লাহ তা'আলার

www.eelm.weebly.com

অভিপ্রেত নয়, এটা কুরআনের বর্ণনা ধারায় একেবারেই সুস্পষ্ট। ইরশাদ হয়েছে ঃ

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنابعضهم فوق بعض درجات.

আমি পার্থিব জীবনে মানুষের রিয্ককে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি এবং এ ক্ষেত্রে কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদাগত প্রাধান্য দিয়েছি।

– সূরা ঃ ৪৩ - যুখরুফ ঃ ৩২

وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم.

তিনি তো তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন এবং কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদাগত প্রাধান্য দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে পরীক্ষা করার নিমিত্ত। – সূরা ঃ ৬ - আন্‌'আম ঃ ১৬৫

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.

আর আল্লাহ তা'আলা রিয্‌কের ক্ষেত্রে তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যে কতিপয়কে অধিক দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধিনস্থদেরকে তা তেকে দিতে সম্মত হয় না যাতে তারাও তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে। তাহলে কি তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে চায়।

– সূরা ঃ ৬ - নহল ঃ ৭১

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রিয্‌ক প্রশস্ত করে দেন; যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন।

– সূরা ঃ ১৩ - রা'দ ঃ ২৬

উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য থাকা - একজন ধনী হওয়া একজন গরীব হওয়া এটি ঐশী অভিপ্রায়েরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

তবে এই পার্থক্যের মধ্যেই মানুষের জন্য বিরাট পরিক্ষা নিহিত আছে। উপার্জিত সম্পদের ব্যাপারে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মগত প্রতিফলন কি হয়, এটাই তিনি দেখতে চান। মানুষ কি এ সম্পদ তার একান্ত নিজের বলে মনে করে, না আল্লাহ্‌র সম্পদের নিজেকে আমানতদার মনে করে, উপার্জিত সম্পদ সে নিজেই ভোগ করে, না আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব সম্পদ হিসেবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণে তা নিবেদন করে, ধনী হয়েছে বলে সে সম্পদ আগলে ধরে, না তার চেয়ে হীন, বঞ্চিত, অসহায় মানুষকে দিয়ে তাদের জীবন জীবিকাকে নিশ্চিত করে, এটাই মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরিক্ষা।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ চান যে, ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করুক এবং এ বিশ্বাস পোষণ করুক যে, এই সম্পদ মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের দান। আর এই বিশ্বাসের আলোকেই তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম আবর্তিত হোক, আল্লাহর বিধান ও অভিপ্রায় অনুসারে তা উপার্জন ও ব্যয় করুক এটাই আল্লাহ্ তা'আলার কাম্য।

তাই বিত্তবানদের মনে রাখতে হবে যে, তার উপার্জিত সম্পদে সমাজের আর দশজনেরও অধিকার রয়েছে। কারণ এ সম্পদ উপার্জনে তার চেষ্টাই যথেষ্ট ছিল না। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ ও সমাজের অপরাপর মানুষের শ্রমের পরিণতি এই সম্পদ - যা আজ তার নিয়ন্ত্রণে, তার মালিকানাধীন। বিত্তবানকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনোপকরণে তাকে যে প্রাধান্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন; তা অবশ্যই সমাজের আর দশজনকে জীবন উপকরণ থেকে বঞ্চিত করার জন্য নয়। নিজের সঞ্চয়ের ভান্ডারকে ভারি করার জন্য অন্যের উপর শোষণ, নির্যাতন কিংবা আগ্রাসন সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক লুটতরাজ করার কোন অধিকার তার নেই। সে নিজে উপার্জন করেছে বলে শুধু নিজেই ভোগ করবে, অন্যকে কিছুই দিবে না, এই কারূণী মানসিকতা আল্লাহ্ মোটেও কামনা করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও সমাজের অপরাপর মানুষের অবদানকে সে একেবারেই স্বীকার করবে না এটা কি করে হয়? হে বিত্তবান পুঁজিপতি! তোমার সঞ্চিত সম্পদ যে তুমি সৃষ্টি করতে পার না; এতো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পার। আর তোমার প্রমোদ ভিলা তৈরি করতে ইট, রড, সিমেন্ট, বালি, বাশ, খুটা, প্লান-নক্শা ইত্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহে কত মানুষের শ্রম ব্যয়ীত হয়েছে তা কি ভেবে দেখেছ?

অতএব তোমার সম্পদে তোমার শ্রম তো নিতান্ত নগণ্য। তারপরও তুমি একাই ভোগ করবে? অন্যকে কিছুই দিবে না? মূলতঃ যারা এরূপ করে তারা আল্লাহ্র নিয়ামতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

হে মানুষ! কি করবে তুমি এই ভূরিভূরি সম্পদ সঞ্চয় করে? সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মধ্যে কি লাভ? এ দ্বারা তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোই তো উদ্দেশ্য। অতএব তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে অবশিষ্টগুলো অন্যকে দিয়ে দাও না কেন? তারাও তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করুক। তারাও তো তোমার মতই মানুষ। জীবন জীবিকার চাহিদা তো তাদেরও আছে। তুমি তোমার মেধা খাটিয়ে অন্যের প্রকৃতি প্রদত্ত্ব অধিকার ছিনিয়ে এনেছ। অতএব দিয়ে দাও না তার অধিকার তাকে।

ধনবান মানুষ আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের পর কি আচরণ করে এটাই মূলতঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরিক্ষা।

www.eelm.weebly.com

তবে ধনী-গরীবের এ তারতম্যের মধ্যে গরীবের জন্য যে কোন পরিক্ষা নেই তা কিন্তু ঠিক নয়। এই তারতম্যে গরীবের জন্যও বিরাট পরিক্ষা রয়েছে।

গরীব ও বিত্তহীনরা সম্পদ ও প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন্ বিশ্বাসে উপনীত হয়, তাদের কাজ-কর্ম কিভাবে পরিচালিত হয়, এটা দেখতে চান মহান আল্লাহ্ তা'আলা।

বিত্তবানদের অর্থসম্পদ ও প্রাচুর্য দেখে তারা যেন আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী কিংবা বিরূপ মনোভাবাপন্ন না হয়ে পড়ে, অন্তরে যেন কোনরূপ দ্বিধা সংশয় বাসা না বাধে, ধনবানদের ধন-সম্পদ দেখে তারা যেন লোভাতুর না হয়ে পড়ে, অহেতুক ঈর্ষা কিংবা হিংসা-বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ না করে, ধনবানদের ধন-সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ না করে, বরং নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। নিজের ঝামেলাহীন ও কোলাহলমুক্ত জীবনের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত্বে কৃতজ্ঞ থাকে, আর আপন কর্মক্ষেত্রে স্রষ্টা প্রদত্ত্ব বৈধ সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে উন্নতির চেষ্টায় আত্মনিবেদন করে এবং তার উপর স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। বিত্তহীনদের থেকে স্রষ্টার এটাই কাম্য। এই পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই সে সফলকাম।

জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্যের প্রয়োজন কেন?

ক. পৃথিবীকে কর্মচঞ্চল করার জন্য এই পার্থক্য একান্তভাবে প্রয়োজন। কেননা এই পার্থক্য আছে বলেই প্রতিযোগিতা আছে। আর প্রতিযোগিতা আছে বলেই পৃথিবী রয়েছে কর্মচঞ্চল। অন্যথায় কেউই নিজের মাঝে শ্রমদানের উৎসাহ খুঁজে পেত না। তাছাড়া সবাই সমান থাকলে কেউ কারো প্রয়োজনে এগিয়ে আসত না। ফলে পরিকল্পনা থাকলেও মানুষের একার পক্ষে সব কাজ নিজে আঞ্জাম দিয়ে বৃহৎ কিছু করা সম্ভব হত না। সভ্যতা অগ্রসর হত না বরং পৃথিবী সেই আদিম অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত।

খ. যদিও সব কাজই কাজ, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কিছু কাজকে সম্মানজনক কাজ বলে মনে করা হয়। আর কিছু কাজকে নিম্নমানের কাজ ও নীচ কাজ বলে মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য সব ধরণের কাজই আঞ্জাম পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে ময়লা যত্রতত্র না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে, আবার জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে ডাস্টবিন পরিষ্কার করারও প্রয়োজন রয়েছে। যদি সকলের অবস্থা সমান হত; তাহলে কে যেত ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে? তারতম্য আছে বলেই একজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছে ডাস্টবিন পরিষ্কার করার কাজ নিতে। এভাবেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করিয়ে নিচ্ছেন

www.eelm.weebly.com

ধনী-গরীবের এই তারতম্যের মধ্যদিয়ে। আল্-কুরআনে এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .

আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবনোপকরণকে বন্টন করে দিয়েছি এবং কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদাগত প্রাধান্য দিয়েছি – যাতে তাদের কতিপয় কতিপয়কে কর্মে নিয়োগ করতে পারে। – সূরা ঃ ৪৩-যুখরুফ ঃ ৩২

ইসলামে ধনী-গরীবের তারতম্য ও পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

বস্তুতঃ উপরোল্লিখিত প্রয়োজনের কারণে জীবন উপকরণে মর্যাদাগত তারতম্য ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইসলাম পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে না। কেননা পুঁজিবাদে বাধাবন্ধনহীন অবাধ ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। সেখানে ব্যক্তি তার মেধাকে ব্যবহার করে যে সম্পদ কুক্ষিগত করে, তাতে তার একচ্ছত্র অধিকার থাকে এবং সম্পদ আহরণের জন্য অন্যকে শোষণ-পীড়ন, ধোঁকায় ফেলা কিংবা প্রতারিত করা কোন অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ফলে পুঁজিবাদীরা বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক শ্লোগান শুনিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে, বিভিন্নমুখী প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। পুঁজিবাদীদের ধোঁকা ও প্রতারণাগুলো এত ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং এত নিপুণ ও নিখুঁত হয়ে থাকে যে, যারা শোষিত হচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে, কিংবা ধোকা খাচ্ছে তারা তা সহজে বুঝেই উঠতে পারে না।

তাছাড়া ইসলামে সঞ্চিত সম্পদ থেকে যাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে বিত্তহীনদের সহযোগিতার যে বিধান রয়েছে এ ধরনের কোন বিধান পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় নেই। আল্লাহ্র ওয়াস্তে জনকল্যাণে দান খায়রাতের যে অনুপ্রেরণা ইসলামে রয়েছে তাও পুঁজিবাদে নেই। ইসলাম তো দানের অনুপ্রেরণাকে এতটুকু পর্যন্ত প্রসারিত করেছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব সম্পদই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়ার কথা আল্-কুরআনে বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকে দান খয়রাত করতে বললে তারা প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা কি পরিমাণ দান করব? তদুত্তরে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কি পরিমাণ তারা দান করবে? আপনি বলে দিন, প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু। – সূরা ঃ ২ - বাকারা

অন্যদিকে প্রয়োজনকে বল্গাহীন না করে সীমিত পর্যায়ে জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

www.eelm.weebly.com

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

দুনিয়াতে এভাবে সীমিত পর্যায়ে জীবন যাপন কর; যেন তুমি ভিনদেশ থেকে আগত কোন মুসাফির কিংবা পথিক। – বুখারী

ভিনদেশী মুসাফির বিদেশে ভ্রমনকালে কিংবা কোন পথিক পথ অতিক্রমকালে যেমন তার সরুসামানকে হালকা রাখতে চায়, তুমিও দুনিয়ার জীবনে বল্গাহীন চাহিদার পিছনে ছুটে জীবন সম্ভারে জীবনপথকে ভারী করে তোলনা। যথাসম্ভব হালকা থাকতে চেষ্টা কর। জীবন সম্ভারের যা না হলেই নয় কেবল তাই গ্রহণ কর, এর বেশি নয়।

পুঁজিবাদে এহেন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে সে আদর্শানুসারীরা সম্পদ সর্বস্ব এক মানসিকতার শিকার হয় এবং অর্থ গৃধ্নু সম্পদসর্বস্ব এক প্রবণতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অন্যকে শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। নিজে যা উপার্জন করে তা নিজেই ভোগ করতে ব্যস্ত থাকে। পরকালের বিশ্বাস যেহেতু এ দর্শনে অনুপস্থিত, তাই জান্নাত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সম্পদ ব্যয় করার কোন চেতনাও তাদের মধ্যে কাজ করে না। ফলে সম্পদ যতই হোক, কিন্তু সম্পদের চাহিদা কোন দিনই ফুরায় না। এক অতৃপ্ত বুভুক্ষতা তাদেরকে অহর্নিশ তাড়া করে ফিরে।

সাম্যবাদ একটি আবেগময় শ্লোগান মাত্র

সাম্যবাদীরা সাম্যের শ্লোগান দিলেও প্রকৃত অর্থে সাম্য সৃষ্টি করা তাদের দ্বারা পৃথিবীর কোথায়ও সম্ভব হয়নি। আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সাম্যবাদী সোভিয়েতের সাম্যের নমুনা তুলে ধরেছি। আসলে সাম্যের শ্লোগান শুনিয়ে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে শ্রেণীগত বৈষম্য। যে বৈষম্যের দুর্ভেদ্য দেয়াল ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে আসার কোন সুযোগ মানুষের থাকে না। অথচ ধনী-গরীবের বৈষম্য সেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। বস্তুতঃ বৈষম্যের যাতাকলে আবদ্ধ হয়ে সেথায় সাম্যের বাণী নিরবে কাঁদে। প্রকৃত অর্থে নাগরিক জীবনে সাম্য মায়া-মরীচিকা ও আবেগময় শ্লোগান হয়েই থেকেছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য স্বীকার করেও সামগ্রিকভাবে যে পর্যায়ের অর্থনৈতিক সাম্য গড়ে তুলেছিল এবং অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক বৈষম্য দূরীভূত করে যে সুষম অর্থব্যাবস্থা গড়ে তুলেছিল, তার চেয়ে উন্নততর সাম্যের কোন নজির অদ্যাবধি পৃথিবী পেশ করতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম শুধু শ্লোগানই দেয়নি বরং খলিফা ও সাধারণ নাগরিকদের জীবনমানে যথার্থ সাম্যের বাস্তব নমুনা কার্যকর করেও দেখিয়েছে। খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে দেশ শাসন করে খলিফা উমর (রা.) দেখিয়েছেন সাম্যের এক অভিনব উপমা। সাধারণ সাম্যের প্রকৃষ্ট নমুনা দেখিয়েছেন খুলাফায়ে রাশেদীন।

www.eelm.weebly.com

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সীমা কি হবে?

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশচুম্বী ব্যবধান ইসলামের কাম্য না হলেও ইসলাম ধনী ও দরিদ্রের কোন সীমারেখা চিহ্নিত করে দেয়নি। তবে ইসলাম তার অর্থনৈতিক স্ট্রাকচারকে এভাবে ঢেলে সাজিয়েছে যে, তাতে রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠে বিরাট বৈভবের মালিক হয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের বিন্যাস এভাবে করা হয়েছে, যাতে একজন মানুষ যথারীতি পরিশ্রম করলে তার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দে নিজের এবং তার পরিবারের ভরণ পোষণ চলতে পারে। তবে বিশাল বৈভবের মালিক বনে যাওয়া সহজে তার জন্য সম্ভব হবে না। এজন্য ইসলাম নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে।

১. আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমা চিহ্নিত করে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এমনকি সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবলম্বনকে ব্যক্তির জান্নাত প্রাপ্তির জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إن الذين لايرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون – أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.

অবশ্যই যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, আর পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে এবং এনিয়েই পরিতৃপ্তি বোধ করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহ (বিধানাবলী) সম্পর্কে গাফিল ও উদাসীন তাদের নিবাস হবে জাহান্নাম, তারা যা উপার্জন করেছে তারই পরিণতিরূপে।

– সূরা ঃ ১০ - ইউনুস ঃ ৭-৮

হালাল-হারামের এ বিধানকে অমান্য করে যারা দুনিয়া অর্জনে বিমত্ত হয়ে পড়ে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى.

আর যারা আবাদ্ধাচারিতা প্রদর্শন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকেই বেছে নিয়েছে জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা।

২. ধোঁকা, প্রতারণা ও জুলুমের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনের সকল সম্ভাব্য পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.

হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায় পন্থায় একে অন্যের মাল আত্মসাৎ করো না।

www.eelm.weebly.com

বরং অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎকে জাহান্নামের অগ্নিভক্ষণ বলে অভিহিত করেছে ঃ

ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

আর যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে তারা যেন তাদের উদরে জাহান্নামের আগুন পূর্তি করে, আর তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে ভূনা করা হবে। – সূরা ঃ ৪ - নিসা ঃ ১০

৩. অর্জিত সম্পদে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত, সাদাকাহ্ ইত্যাদি আদায়ের বিধান প্রবর্তণ করে দেয়া হয়েছে।

৪. কার্পণ্যকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৫. সম্পদ জমা করে রাখা জান্নাত প্রাপ্তির অন্তরায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. সম্পদে উত্তরাধিকারের বিধান প্রবর্তণ করে সম্পদকে কিছুদিন পরপর বিকেন্দ্রীকরণ করে দেয়া হয়েছে।

৭. পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদের প্রতি ঘৃণা ও অনাসক্তি সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে এবং মানুষের জীবনকে পরকালমুখী চেতনার অধিকারী করে দিতে চেষ্টা করা হয়েছে।

৮. নিজের প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে ব্যক্তির সম্পদে নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ ও দেশের মানুষের সাহায্য সহযোগিতাকে ব্যক্তির উপর নৈতিক কর্তব্য বলে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

৯. জান্নাত প্রাপ্তির জন্য এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ধন ব্যয়কে অত্যাবশ্যকীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম সম্পদকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের হাতে সঞ্চিত হওয়ার সকল পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে ইসলামী বিধি মুতাবেক জীবন যাপন করলে বিশাল বৈভবের মালিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা যদি বিত্তবান বিশাল বৈভবের মালিকদের জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে ঐসব বিধি-বিধানের অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন্ এক জায়গায় ফাঁক-ফূকর রয়েছে, যে পথেই সে বিশাল বৈভবের মালিক বনে গেছে।

তবে হ্যাঁ; বৈধ পন্থায় ধনী হওয়া যাবে না, এটা আমার বক্তব্য নয়। বরং বৈধ পন্থায় ধনাঢ্যতা অর্জিত হলেও সম্পদ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত থাকতে পারে না। এটাই ইসলামী অর্থনীতির মূল চেতনা।

www.eelm.weebly.com

৪. সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম ও বৈধতার সীমা মেনে চলা

জীবনোপকরণ উপার্জনের অনুপ্রেরণা ঃ ইসলাম যেমন জীবন নির্বাহের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনিভাবে সম্পদ উপার্জনের অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। বৈরাগ্যবাদীদের ন্যায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা অবশ্যই ইসলামী নীতি নয়। কর্মবিমুখ বৈরাগ্যপনার জীবনকে কোন জীবনই বলা যায় না। এহেন জীবন বরং মৃত্যুরই নামান্তর। এহেন জীবনধারাকে আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলের জীবনও বলা যায় না। কেননা আসবাব উপকরণ অবলম্বন না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের জীবন জীবিকার উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছেন। মানুষকে তা পরিশ্রম করে উপার্জন করে নিতে হবে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে জীবন জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদবীর করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এ কারণেই আল্-কুরআন মানব জাতিকে চেষ্টা, তদবীর, পরিশ্রম ও জীবনোপকরণ উপার্জনের উদ্যোগ গ্রহণের উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إن الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق

আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর, তারা তোমাদের জীবিকার মালিক নয়। অতএব তোমরা আল্লাহর নিকট জীবিকার অনুসন্ধান ও প্রার্থনা কর।

– সূরা ঃ ২৯ - আন্‌কাবুত ঃ ১৭

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله

যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল (রিযুক) অন্বেষণ কর। – সূরা ঃ ৬২ - জুমা'আ ঃ ১০

وآخرون يضربون في الآرض يبتغون من فضل الله

আর একদল ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং আল্লাহর ফযল (রিযুক) তালাশ করে।

– সূরা ঃ ৭৩ - মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে রিযুকের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ও তার অনুসন্ধানের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে বলা হয়েছে। নামায আদায় করার পরই রিযুকের অন্বেষায় ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ার অর্থাৎ অনুসন্ধান, উদ্যোগ ও শ্রম বিনিয়োগ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয আদায়ের পর পরই যে এর গুরুত্ব, একথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

রাসূল (সা.)ও হাদীসে এ বক্তব্যই পেশ করেছেন ঃ

كسب الحلال فريضة بعد الفرائض.

www.eelm.weebly.com

হালাল রিয্কের অনুসন্ধান আল্লাহ্ তা'আলার ফরয ইবাদতের পর অন্যতম ফরয।
– কানজুলউম্মাল ২য় খন্ড

অন্য হাদীসে তিনি কথাটাকে অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, রিয্কের অনুসন্ধানের ব্যাপারে কোনরূপ সুস্তি ও কুতাহীর অবকাশ নেই। তিনি বলেন, নামায আদায়ের পর জীবিকার জন্য চেষ্টা মেহ্নত না করে ঘুমের (বা বিশ্রামের) নামও নিও না। (প্রাগুক্ত)

জীবিকার জন্য মেহ্নতের গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য তিনি বলেছেন ঃ কোন কোন গুনাহ্ এমনও রয়েছে; যেগুলোর কাফ্ফারা জীবিকার অনুসন্ধান ও তার চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রমের দ্বারাই হয়ে যায়। – তাবরানী

আল্লামা মুরতাযা হাসান যুবায়দী 'ইত্তিহাফুস্ সা'আদাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জীবনোপকরণ উপার্জনের কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন, যাতে জীবিকার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।
– ইত্তিহাফ - ৫ম খন্ড ঃ ২১৭ পৃ.

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম জীবিকা উপার্জনের প্রতি বিপুলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। জীবিকার অনুসন্ধানের জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। কিন্তু জীবিকা ও জীবনোপকরণ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম কাউকে বল্গাহীন স্বাধীনতা প্রদান করেনি। সম্পদ উপার্জন ও তার ব্যয় ব্যবহারকেও কতিপয় মৌলিক নীতিমালার অধীনে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। যে বিধির অন্যথা হলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অস্থিরতা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। মানুষ যদি সেই বিধি ডিঙ্গিয়ে অর্থ উপার্জন কিংবা ব্যয় করতে শুরু করে; তাহলে অর্থনৈতিক ধ্বস ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে যদি সেই নীতিমালার অনুসরণ করে উপার্জন ও ব্যয় করা হয় তাহলে জীবন জীবিকায় নেমে আসবে ভারসাম্যপূর্ণ সুষম অবস্থা ও সামগ্রিক স্বচ্ছলতা। তৎসঙ্গে মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনেও সফলতা ও অগ্রগতি সাধিত হবে।

উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি হল দুটি। যথা ঃ

ক. যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে।

খ. যা উপার্জন করা হবে তা বৈধ পন্থায় অর্জন করতে হবে। অবৈধ পন্থায় না হতে হবে।

www.eelm.weebly.com

যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে ঃ

যা উপার্জন করা হবে; তা যে হালাল হতে হবে, তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে বুঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ كلوا من طيبات ما رزقناكم

আমি তোমাদেরকে জীবনোপকরণ হিসেবে যা দিয়েছি তা থেকে উত্তম ও হালালগুলো খাও; আর এ ব্যাপারে অবাধ্যচারিতা প্রদর্শন করো না।

– সূরা ঃ ২০ - তাঁহা ঃ ৮১

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

আর তিনি (নবী মুহাম্মদ সা.) তাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেছেন আর অপবিত্র বস্তু সমূহকে হারাম করেছেন। – সূরা ঃ ৭ - আ'রাফ ঃ ১৫৭

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا

আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবনোপকরণ হিসাবে যা দিয়েছেন তা থেকে যা হালাল ও তাইয়্যিব (উত্তম) সেগুলো খাও। – সূরা ঃ ৫ - মায়েদা ঃ ৮৮

ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين .

হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যিব যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

– সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ১৬৮

উপরোক্ত কোন কোন আয়াতে শুধু طيب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর কোন কোন আয়াতে حلالا و طيبا এই দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মূলতঃ যেখানে শুধুমাত্র طيبا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও হালাল হওয়ার শর্ত সন্নিহিত রয়েছে। কেননা طيبا বা উত্তম শব্দটি মূলগত উত্তম হওয়ার অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার গুণগত উত্তম হওয়ার অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার একই সঙ্গে মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে উত্তম হওয়ার অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তখন মূলগত উত্তম হওয়ার অর্থ হবে হালাল হওয়া আর গুণগত উত্তম হওয়ার অর্থ হবে স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া।

আর যেসব আয়াতে হালাল ও তাইয়্যিব এ দু'টি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে; সেখানে হালাল শব্দ দ্বারা মূলগত বৈধ হওয়ার অর্থই গ্রহণ করা হবে। আর তাইয়্যিব শব্দ দ্বারা স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হবে।

সারকথা এই যে উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জীবনোপকরণ অবশ্যই হালাল হতে হবে।

www.eelm.weebly.com

যা উপার্জন করা হবে তার উপার্জন পদ্ধতি বৈধ হতে হবে ঃ

আর যা উপার্জন করা হবে তা যে বৈধ পন্থায় উপার্জিত হতে হবে তাও আল্-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ياأيهاالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ... ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না, কিন্তু পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ .... যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে; তাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, আর এটা করা আল্লাহর পক্ষে সহজ। – সূরা ঃ ৪ - নিসা ঃ ২৯-৩০

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوابها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না। – সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ১৮

অবশ্য অনেক মুফাস্‌সিরই كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا এই আয়াতে حلالا শব্দ দ্বারা মূলগত বৈধতার এবং طيبا দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু'শব্দ দিয়ে দুটি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু মনে হয় এর প্রয়োজন করে না। কেননা উপার্জন পদ্ধতির বৈধতার যে প্রয়োজন রয়েছে তা উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তা যে আয়াত দ্বারাই প্রমান করা হোক না কেন, মূলতঃ উপার্জনের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ের প্রতি অব্যশই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা বস্তুমাত্রের মাঝেই কিছু কল্যাণ ও কিছু অকল্যাণের সমাহার রয়েছে। গুণাগুণের বিচারে যে বস্তুতে মানুষের জন্য কল্যাণকর উপাদানের পরিমাণ বেশি, অকল্যাণের পরিমাণ কম, মহান আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর যেসকল বস্তুতে কল্যাণ কম অথচ অকল্যাণের পরিমাণ বেশি, সেগুলোকে মানুষের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শরাব ও জুয়া নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে অবতীর্ণ নিম্নের আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يسئلونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

তারা আপনাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি বলে দিন এ দুটোতে বিরাট পাপ ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে, আবার মানুষের কিছু কল্যাণও এগুলোতে নিহিত রয়েছে। তবে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের পরিমাণ বেশি।

www.eelm.weebly.com

শরাব ও জুয়া নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য বর্ণনা করতে যেয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই বিধিটি সুস্পষ্টই উল্লেখ করে দিয়েছে।

তবে কল্যাণ অকল্যাণের দিকটি কেবল স্বাস্থ্যগত বিষয়ে বিচার্য নয় বরং দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও পরজাগতিক সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিচার্য হবে।

আয়াতে উল্লেখিত خمر বা শরাব মূলগতভাবেই হারাম। আর الميسر বা জুয়া যে টাকা পয়সার দিয়ে খেলা হয় তা মূলগতভাবে বৈধ হলেও পদ্ধতিগতভাবে তা হারাম।

অতএব আমাদেরকে খাওয়া-পরা, পোষাক-আষাক এবং বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রির ব্যবহার, এমনকি যাবতীয় আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেগুলো যেন হালাল ও উত্তম হয়। যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কিংবা ধ্বংসাত্মক অথবা এহেন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি অথবা যা মানুষের মানবতাবোধকে ধ্বংস করে, অথবা যা মানুষের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দেয় এবং তার সংযমী স্বভাবকে বিনষ্ট করে, কিংবা যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি কিংবা ব্যাধির কারণ হয়; এসকল বস্তু অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তাছাড়া যেবস্তু দম্ভ, অহংকার জন্ম দেয়, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে বিনষ্ট করে, নিষিদ্ধ ভোগ বিলাসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে, জুলুম, সেচ্ছাচারিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, দুশ্চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে, মুসলমানকে অবশ্যই এসব বস্তু বর্জন করতে হবে। আমাদের রুযি-রোযগার যখন এসব থেকে পূত-পবিত্র হবে তখনই তা হালাল ও সিদ্ধ হবে।

আমাদের আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জীবন জীবিকার তাকিদে আমরা যা উপার্জন করব তা পদ্ধতিগতভাবেও পুত-পবিত্র হতে হবে। সুতরাং যা উপার্জন করা হবে তার পদ্ধতি এমন হতে হবে যে, এর দ্বারা অন্যের অধিকার হনন না হয়, একের উপার্জন যাতে অন্যের অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশার কিংবা দুর্ভোগের কারণ না হয়। শোষণ, নির্যাতন, অর্থনৈতিক নিগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থসম্পদ লুটপাট ও ধোকা, জালিয়াতি, মজুদদারী কালোবাজারী, রাহাজানি, চুরি ও প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণ ও নীপিড়নের অন্ধ গহ্বরে নিক্ষেপ না করা হয়। উপার্জনের ক্ষেত্রে যদি এসব বিষয় পুরোপুরি মেনে চলা হয়, তাহলে আমাদের আয় উপার্জন উত্তম উপার্জন হিসেবে বিবেচিত হবে।

আল্লামা রশীদ রেজা মিশরী পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত حلالا طيبا এ দু'টি শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীর আল্-মানারে উল্লেখ করেছেন যে, কোন বস্তু طيب বা উত্তম হওয়ার অর্থ হল তাতে অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত না থাকা। কেননা পবিত্র কুরআনে যেসব বস্তুর ব্যাপারে হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো

www.eelm.weebly.com

মূলগতভাবেই হারাম বা নিষিদ্ধ। একমাত্র নিরূপায় অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থাতেই তার ব্যবহার বৈধ নয়। এছাড়াও এক ধরনের হারাম রয়েছে যা মূলগতভাবে হারাম নয় কিন্তু সংশ্লিষ্ট কোন কারণে তাকে হারাম বলা হয়েছে। মূলতঃ এ জাতীয় বস্তুর বিপরীতেই طيب বা উত্তম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং যেসব বস্তু অন্যায়ভাবে উপার্জন করা হয়েছে, ন্যায়ানুগ পন্থায় করা হয়নি, যেমন : সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধোঁকা প্রতারণা, আমানতের খিয়ানত ইত্যাদি পন্থায় করা হয়েছে এগুলো হারাম, তবে মূলগতভাবে নয় বরং পদ্ধতিগত কারণে হারাম। অর্থাৎ এগুলো তাইয়্যিব বা উত্তম নয়। সারকথা প্রতিটি অপবিত্র বস্তুই হারাম, তা মূলগত কারণেই হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণেই হোক। (আল্ মানার ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৭। ইবনে কাসীর ১ম খন্ড, পৃ : ২০৩)

পবিত্র কুরআনে হারাম বা অপবিত্র বস্তুর কিছু কিছু বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু নীতিগত দিক উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। সূরায়ে মায়েদায় হারাম বস্তুর উল্লেখ করতে যেয়ে ইরশাদ হয়েছে :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, যেসব জন্তুকে গলা টিপে কিংবা প্রস্তর অথবা লাঠির আঘাতে হত্যা করা হয়েছে, অথবা উপর থেকে নীচে পড়ে কিংবা অন্যপ্রাণীর শিংয়ের গুতোয় মারা গেছে, আর হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তীর বেদীমূলে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দিয়ে যার ভাগ নির্ণয় করা হয়। এসব পাপাচার। – সূরা : ৫ - মায়িদা : ৩

আরো ইরশাদ হয়েছে :

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

নিশ্চয় শরাব, জুয়া, প্রতিমা ও পাশা খেলা অপবিত্র ও শয়তানের কাজ; অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থেকো, তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।
– সূরা : ৫ - মায়িদা : ৯০

সূদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربوا أضعافا مضعفة.

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। – সূরা : ৩ - আল-ইমরান : ১৩০

www.eelm.weebly.com

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يا أيها الذين آمنوا لاتا كلوا اموالكم بينكم بالباطل ..

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

– সূরা ঃ ৪ - নিসা ঃ ২৯

ওয়ারিশের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما.كلا اذ .....

না বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং অভাব গ্রস্থদের খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না আর তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেল এবং ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাসা এটা সঙ্গত নয়।

– সূরা ঃ ৮৯ - ফজর ঃ ১৭-২১

মাপে কম দিয়ে সম্পদ উপার্জন হারাম হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فاوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشيائهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.

তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। – সূরা ঃ ৭ - আ'রাফ ঃ ৮৫

চুরির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانكالا من الله والله عزيز حكيم.

পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এটা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল, এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত আর্দশ দন্ড। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। – সূরা ঃ ৫ - মায়িদা ঃ ৩৮

আমানতের খিয়ানতের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতের মাল যথাযথ প্রাপকের নিকট প্রত্যাপর্ণ করতে।

ডাকাতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.

যারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বংসাত্মক কাজ

www.eelm.weebly.com

করে বেড়ায় (অর্থাৎ ছিনতাই, রাহাজানি ও ডাকাতির করে) তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। – সূরা ঃ ৫ - মায়িদা ঃ ৩৩

মজুতদারী ও কালবাজারী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .

যারা স্বর্ণ-রূপা (অর্থাৎ ধন-সম্পদ) পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। – সূরা ঃ ৯ - তওবা ঃ ৩৪

الذى جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن فى الحطمة.

আর যারা মাল জমিয়ে রাখে এবং তা বার বার গণনা করে; আর মনে করে যে, তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। কক্ষণও নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় (জাহান্নামে)। – সূরা ঃ ১০৪ - হুমাযা ঃ ২-৪

এ ধরনের আরো বহু বিষয় হারাম হওয়ার বর্ণনা আল্‌-কুরআনে বিবৃত হয়েছে। রাসূল (সা.)ও হাদীসে বহু বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন ঃ তিনি পুরুষদের জন্য রেশমী পোষাক, ফুলকাটা জরীদার রেশমী পোষাক, মোটা রেশমের পোষাক পরা এবং রেশমের তৈরি গদিতে বসা এবং কুসুম রংয়ের পোষাক পরাকে নিষেধ করেছেন। – বুখারী - কিতাবুল্‌ লিবাস

অন্য এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা মুসলমানরা সোনা-রূপার বর্তন ব্যবহার করবে না। – আত্‌ -তাজ -খ ঃ ২ পৃ ঃ ১৩২

অন্য এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকারের পোষাক পরিধান করবে; কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাকে লাঞ্ছনা ও যিল্‌লতীর পোষাক পরাবেন। – যররীন ও আবু দাউদ

এ ধরনের আরো বহু হাদীস রয়েছে, যাতে বিভিন্ন বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকার গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিষদ বিবরণ রয়েছে।

সে যাই হোক, জীবিকা ও জীবনোপকরণ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামে অনুসরণীয় বিধান হল দু'টি। উপার্জিত বস্তু মূলগতভাবে হালাল হতে হবে এবং উপার্জনের পদ্ধতি বৈধ হতে হবে; হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জিত না হতে হবে।

হারাম ও অবৈধ পন্থাসমূহের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। আর উপার্জনের বৈধ পন্থাসমূহ সম্পর্কে আমরা মালিকানা পরিচ্ছদে নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব। (সেথায় দ্রষ্টব্য)। যথা ঃ

www.eelm.weebly.com

১. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।
২. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ (অবশ্য ব্যবসার প্রক্রিয়াও পদ্ধতি বৈধ হতে হবে)।
৩. কৃষির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
৪. অনাবাদী ভূমি আবাদ করার মাধমে অর্জিত সম্পদ।
৫. ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ, নদী, অরণ্যভূমি থেকে আহরিত দ্রব্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
৬. আবিষ্কার ও কারিগরি শিল্পের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
৭. শ্রম বিক্রির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।
৮. পুরস্কারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।
৯. যাকাত ও সাদাকার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।
১০. দান, হেবা, হাদিয়া ও ওসিয়তের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।
১১. মহর কিংবা খুলার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ।
১২. নাফাকাহ্ বা খোর-পোস বাবৎ প্রাপ্ত সম্পদ।
১৩. রাষ্ট্র প্রদত্ত অনুদান ও জায়গীরের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ।

উপরোল্লিখিত উপায়ে উপার্জিত সম্পদ যদি মূলগতভাবে হারাম না হয়, তাহলে তা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে বৈধ ও উত্তম উপার্জন বলে গণ্য হয়।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি

মানুষ হালাল ও পবিত্র পন্থায় যা উপার্জন করে, মূলতঃ সেটুকুই তার জীবন নির্বাহের পুঁজি। জীবনের প্রয়োজন পূরণ, উন্নতি ও অগ্রগতি সাধণের জন্য এটুকুই সে ব্যয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি। যথাঃ ১. কার জন্য খরচ করবে? ২. কোন্ খাতে খরচ করবে? ৩. কি পরিমাণ খরচ করবে?

১. কার জন্য ব্যয় করবে? ঃ উপার্জিত বৈধ সম্পদ থেকে ব্যক্তি প্রথমে তার নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে এবং যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শরীয়ত কর্তৃক তার উপর আরোপিত হয়েছে; তাদের জন্য ব্যয় করবে। অতঃপর সমাজের অপরাপর মানুষের জন্য ব্যয় করবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. (المائدة : ٨٨)

আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে বৈধ ও উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা ভোগাহার কর।

كلوا واشربوا ولا تسرفوا. (الأعراف : ٣١)

নিজেরা পানাহার কর, তবে অপচয় করো না।

وآت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل. (بنى إسرئيل)

নিকট আত্মীয়দেরকে তাদের হক আদায় করে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও।

www.eelm.weebly.com

قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

(তারা কার জন্য খরচ করবে এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে) বলে দিন তোমরা ধনসম্পদের যা কিছু ব্যয় করবে; তা করবে পিতামাতা, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা কল্যাণকর যা কিছু করবে; আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত রয়েছেন।

– সূরা ঃ ২ - বাকারাহ্ ঃ ২১৫

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ব্যক্তি তার বৈধ উপার্জন থেকে সর্বপ্রথম নিজের ও পরিবার পরিজনের নূন্যতম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। এটা করা তার সর্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। এরপর তাকে সমাজের অসহায় বঞ্চিত মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে, অতঃপর জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করবে।

অসহায় বঞ্চিত ও মানুষের প্রয়োজনে কিংবা জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যক্তি যা ব্যয় করবে তা আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. বাধ্যতামূলক ব্যয়।
২. ঐচ্ছিক ব্যয়।

১. বাধ্যতামূলক ব্যয় ঃ বাধ্যতামূলক ব্যয় বলতে যাকাত ও সাদাকাতে ওয়াজিবাকে বুঝানো হয়েছে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (৫২.৫০ তোলা রূপার সমমূল্যের) সম্পদ সঞ্চিত থাকলে সমাজের অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (শতকরা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) ব্যয় করা ব্যক্তির জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ যাকাত, সাদাকায়ে ফিত্‌র ইত্যাদি। ব্যক্তির উপর যাকাত সাদাকাহ ইত্যাদি আদায় করা ওয়াজিব হলে, তাকে অবশ্যই প্রথমে তা আদায় করে দিতে হবে। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপরও এগুলো আদায়ের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অবশ্য এই বাধ্যতামূলক অনুদান আদায়ের পরও ব্যক্তির ধন-সম্পদে আরো কিছু সামাজিক অধিকার থেকে যায়; যা স্বাভাবিক অবস্থায় বাধ্যতামূলক না হলেও কখনও কখনও বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) তাই বলতেন, “ধন সম্পদে যাকাত ছাড়াও কিছু হক ও অধিকার রয়েছে”। যেমন ঃ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বায়তুল মালের মাল দিয়ে যদি তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব না হয়; তাহলে রাষ্ট্র প্রধান ধনবানদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে সংকট মুকাবেলা করার জন্য বাধ্য করতে পারেন।

www.eelm.weebly.com

২. **ঐচ্ছিক দান ঃ** ইসলাম তার অর্থনৈতিক জীবনে এ বিষয়টিকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে 'ইন্‌ফাক ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। একদিকে যেমন এর ফযীলত ও পরকালীন পুরস্কারের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে; অপরদিকে ইন্‌ফাকের ব্যাপারে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অনেক বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। বরং এই ইন্‌ফাককে উপেক্ষা করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ধনবানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এর পরিণাম যে জাহান্নামও হতে পারে তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঐচ্ছিক দান যেমন বঞ্চিত অসহায় মানুষের জন্য করা যাবে; তেমনি জনকল্যাণমূলক যে কোন খাতে ব্যয় করা যাবে। মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট, পুল-সেতু, মুসাফিরখানা-সরাইখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থায়ী ও অস্থায়ী জনকল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করা যাবে।

২. কোন্ খাতে ব্যয় করবে

উপার্জিত বৈধ সম্পদ অবশ্যই কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে বৈধ খাতে ব্যয় করতে হবে। যা করা হারাম ও নিষিদ্ধ; এমন কোন খাতে অবশ্যই ব্যয় করা যাবে না। এমন কোন খাতেও ব্যয় করা যাবে না যা আল্লাহর অবাধ্যচারিতা বলে গণ্য হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كلوا من طيبات مارزقناكم ولا تطغوا فيه.

আমি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ হিসেবে যা দিয়েছি তা থেকে খাও এবং তাতে অবাধ্যচারিতা প্রদর্শন কর না।

রুহুল মা'আনীর গ্রন্থকার আল্লামা আলুসী বাগদাদী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, **ولاتطغوا** এর অর্থ অবাধ্য হয়ো না অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হয়ো না, ধনসম্পদের অপব্যয় কর না, অহংকার কর না, আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ কর না এবং কর্তব্য পালনে অবহেলা কর না। – রুহুল মা'আনী খ ঃ ২১ পৃ ঃ ৫৯.

এই ব্যাখ্যার অর্থ হল **ولانطغوا فيه** এর মধ্যে উপরোল্লিখিত সবক'টি অর্থই নিহিত রয়েছে। আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولاتبذرا تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.

আর কিছুতেই তোমরা অপখাতে ব্যয় করো না। যারা অপখাতে ব্যায় করে তারা শয়তানের ভাই। – সূরা ঃ ১৭ - বণী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭

আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) এক্ষেত্রে বর্ণিত ইসরাফ (إسراف) ও তাবযীর (تبذير) এ দু'টি শব্দের পার্থক্য বর্ণনা করতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইসরাফ বলা হয় ব্যয়ের পরিমাণের ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকে। এতে কারো প্রতি ন্যাস্ত দায়িত্বের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার ইঙ্গিত রয়েছে। আর তাব্‌যীর

www.eelm.weebly.com

সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে। রুহুল মা'আনী খঃ ১৬ পৃ ঃ ৫৯

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) তাবযীর শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হল, বেহুদা ও পাপের কাজে খরচ করা কিংবা বৈধ ক্ষেত্রে এমন বল্গাহীন খরচ করা, যার কারণে পরবর্তীতে নিজের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তা নিষিদ্ধ পথে পা বাড়ানোর কারণ হয়ে দাড়ায়।

সারকথা তাবযীর না করার হুকুমের দ্বারা অন্যায় ও অবৈধ পথে সম্পদ ব্যয় না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে

এ সম্পর্কে আল্-কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহের আলোকে তিনটি সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে।

ক. অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।
খ. কার্পণ্য করা নিষিদ্ধ।
গ. মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

ক. অপব্যয় করা নিষিদ্ধ

অপব্যয় মানুষের চাহিদাকে বল্গাহীন করে দেয়। ফলে মানুষ চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। এমতাবস্থায় উপার্জনে অবৈধপন্থা অবলম্বন না করে তার কোন উপায় থাকে না। এজন্যই আল্-কুরআন অপব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে; যাতে উপার্জিত বৈধ সম্পদ দিয়ে প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ كلوا والشربوا ولا تسرفوا

প্রয়োজনীয় পানাহার কর; তবে অপব্যয় কর না। - সূরা ঃ ৭ - আ'রাফ ঃ ৩১

كلوامن طيبات ما رزقناكم ولاتطغوا فيه

আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তার মধ্যে উত্তমগুলো আহার কর, তবে সীমা লঙ্ঘন কর না।

আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই আয়াতের অর্থের মধ্যে অপব্যয়ের অর্থও নিহিত রয়েছে। ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين .

অপব্যয় কর না, নিশ্চিয়ই তিনি (আল্লাহ্) অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।

- সূরা ঃ ৬ - আনআম ঃ ১৪১

খ. কার্পণ্য করা নিষিদ্ধ

কার্পণ্য একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি। এটি আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতার পরিপন্থী একটি বিষয়। এ দ্বারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে শুধু জটিলতাই দেখা দেয় না বরং এ দ্বারা সম্পদ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে

www.eelm.weebly.com

যায়। এ ব্যাধি কারো মধ্যে দেখা দিলে; সে নিজের আত্মার সাথে প্রবঞ্চনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনের প্রবল তাড়নার শিকারে পরিণত হয়। এ কারণে ইসলাম কার্পণ্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وما يغنى عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم ناراتلظى .

আর কেউ কার্পণ্য করলেও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে; তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে। আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা। আমি তো মালিক ইহলোকের ও পরলোকের। আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে।

– সূরা ঃ ৯২ - লায়ল ঃ ৮-১৪

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

فمنكم من بخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء.

তোমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে, যারা কার্পণ্য করে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি; আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা হলে ফকীর।

– সূরা ঃ ৪৭ - মুহাম্মদ ঃ ৩৮

রাসূল (সা.)ও হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ البخيل لا يدخل الجنة কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

গ. মধ্যম পন্থায় ব্যয় করতে হবে ঃ

মূলতঃ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য। অনুরূপভাবে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করা স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুতেই উচিৎ নয়। কারণ এরূপ করা হলে অর্থনৈতিক অনটন কখনই শেষ হবে না। এমনকি প্রয়োজনের সময় অন্যের নিকট হাত পাততেও হতে পারে। সুতরাং নিজের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্তে ঘটনা দুর্ঘটনায় পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য যাতে কিছু সঞ্চয় হাতে থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই ব্যয় করতে হবে। আবার আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদে কার্পণ্য করে নিজের ও পরিবার পরিজনের জীবন-মানকে কষ্টকর পর্যায়ে ঠেলে দেয়াও উচিৎ নয়। কুরআনুল কারীমে আয়ের ক্ষেত্রে মু'মিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে যেয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.

আর তারা (মু'মিনরা) যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও

www.eelm.weebly.com

করেনা এবং এতদুভয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।

আল্লামা আলূসী তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত إذا أنفقوا শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, অর্থাৎ খরচ নিজের জন্য হোক বা অপরের জন্য হোক উভয় অবস্থায় তারা 'কাওয়াম' বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। ইমাম আহ্‌মদ ও তিবরানী হযরত আবু দারাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, জীবন জীবিকায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। – তাফসীরে কাবীর খ. ১৯ পৃ. ৪২।

আরো ইরাশাদ হয়েছে ঃ

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط.

তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করে দিও না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।

– সূরা ঃ ১৭ - বনী ইসরা ঃ ২৯

উপরোক্ত আয়াতে হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে ফেলা দ্বারা কৃপণতার প্রতি এবং হাত প্রসারিত করা দ্বারা অপব্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ উভয় কাজের পরিণতি হিসেবে নিন্দিত ও নিঃস্ব হওয়ার কথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নিন্দিত হওয়া কৃপণতার পরিণাম, আর নিঃস্ব হওয়া অপব্যয়ের পরিণাম।

তাছাড়া রাসূল (সা.)ও এই মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

عن ابن عمر رض قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد نصف المعيشة.

মধ্যপন্থা অবলম্বন জীবনোপকরণের অর্ধেক। – (কান্‌জুল উম্মাল)

অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলে জীবন জীবিকার অর্থেক চাহিদা কমে যায়। ফলে জীবন নির্বাহ সহজ হয়ে উঠে এবং অবাঞ্ছিত চাহিদার চাপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করা যায়।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) মৃত্যুর সময় তার সকল সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার জন্য নবী করীম (সা.)-এর অভিমত জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করেন, "তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবে যাতে তারা অন্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ফিরে; তার চেয়ে তাদেরকে সম্পদের মালিক করে রেখে যাওয়া উত্তম। এ কারণেই নিজ সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ওসিয়ত করার বিধান রয়েছে। – (বুখারী ওসীয়ত অধ্যায়)

www.eelm.weebly.com

হযরত কা'ব (রা.) তার ধন-সম্পদ সাদকাহ করে দিতে চাইলে আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার ধন-সম্পদ থেকে কিছু রেখে দাও, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। – বুখারী সাদাকাহ অধ্যায়

উপরে উল্লেখিত এই মধ্যমপন্থার বিধান হল স্বাভাবিক অবস্থায় জীবন নির্বাহের ব্যয়ের প্রশ্নে। তবে ইন্ফাক ফী সাবীলিল্লাহ-এর ক্ষেত্রে আল্-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি আরেকটু ভিন্নতর। সাহাবায়ে কিরামকে দান খয়রাত করতে বললে; তারা প্রশ্ন করেছিলেন যে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে। এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ يسئالونك ماذا ينفقون قل العفو

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, তারা কি পরিমাণ ব্যয় করবে, আপনি বলে দিন যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু। – সূরা ঃ ২ - বাকার ঃ ২১৯

এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ জবাব দান করেছেন। দানের পরিমাণ নির্ধারণ না করে দিয়ে বরং বলে দিয়েছেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু। বস্তুতঃ কে কতটুকুকে তার প্রয়োজন মনে করবে; তা নির্ভর করে তার তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পর্যায়ের উপর। যার আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা যত বাড়বে, তার প্রয়োজনের পরিধি ততই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যবস্থা করবেন; এই আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে আত্মিক প্রাচুর্য নিয়ে সে জীবন নির্বাহ করবে। তার প্রয়োজন আজকের, আগামী কালের বিষয় আল্লাহ্র উপর সমর্পিত। এ কারণে হযরত আবু বকর (রা.) তার সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাসূলের খিদমতে পেশ করে দিতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের পর্যায় ভেদে ব্যক্তির প্রয়োজনের পরিধি বিভিন্ন হবে। কেউ কেউ এক দিনের সঞ্চয়কে যথেষ্ট মনে করবে, কেউ বা এক সপ্তাহের, কেউ বা এক মাসের, কেউ বা এক ফসল থেকে অন্য ফসল পর্যন্ত, কেউ বা তার চেয়েও বেশি। ব্যক্তির ঈমান ও তাওয়াক্কুলের উৎকর্ষ সাধন ব্যতিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি তাকে ব্যয় করতে বলা হত; তাহলে সেটা তার জন্য মানসিক চাপের কারণ হত। এ কারণেই বিষয়টিকে উন্মুক্ত রেখে দেয়া হয়েছে। যাতে প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার তাওয়াক্কুলের পর্যায়ের নিরীখে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ করতে পারে। - ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আল্-কুরআনে বিস্তর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وابتغ فيما آتاك الله الدارالآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله اليك

আল্লাহ যা তোমাকে দান করেছেন তাদ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশের কথা ভুলে যেয়ো না। আর পরোপকার কর

www.eelm.weebly.com

যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি ইহ্সান করেছেন। — সূরা ঃ ২৮ - কাসাস ঃ ৭৭

مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضعف لمن يشاء .

যারা তাদের মাল–সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে তাদের এ দানের উপমা হল, একটি শষ্য দানার ন্যায় - যা থেকে সাতটি শীষ গজায়, প্রতিটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

— সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ২৬১

৫. অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে না রাখা

ক. সম্পদ কুক্ষিগতকরণ বলতে কি বুঝায়

সাধারণ অর্থে কুক্ষিগতকরণ বলতে বুঝায়, এমনভাবে এক হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়া; যাতে সম্পদের সাধারণ আবর্তন ব্যাহত হয় এবং দেশের নাগরিকরা দুর্ভোগের শিকার হয়।

কিন্তু ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় (احتكار) ইহ্তেকার বা সম্পদ কুক্ষিগতকরণ বলতে বুঝায়, "সম্পদকে এমনভাবে সঞ্চয় করা যে, যাকাতসহ শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব তা থেকে আদায় করা হয়নি।

বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এহেন সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও হারাম। কেননা এ ধরনের অবৈধ সঞ্চয়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠে পুঁজিপতিরা, এটাই মূলতঃ পুঁজিবাদের জন্মদাতা। মুসলিম সমাজ থেকে এহেন মানসিকতা অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। মজুদদারীর জন্য ইসলামী শরীয়তে যে শাস্তির বিধান রয়েছে; এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখা যে সঙ্গত নয়; এ সম্পর্কে আল্-কুরআনের বহু আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

আর যারা সোনা–রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

— সূরা ঃ ৯ - তাওবা ঃ ৩৪

الذى جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن فى الحطمة .

যারা মালকে পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং বার বার গণনা করে, আর মনে করে যে, তার মাল তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে। কক্ষণই নয়, অবশ্যই তাকে হুতামায় (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে। — সূরা ঃ ১০৪ - হুমাযা ঃ ২-৪

www.eelm.weebly.com

وأنفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة .

আর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং (মাল জমা করে রেখে) নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। – সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ১৯৫

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে মাল-সম্পদ জমা করে রাখার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ মাল-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নির্দেশ, তার অনুপ্রেরণা এবং ব্যয় না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী পবিত্র কুরআনের এক বিরাট অংশ জুরে রয়েছে। এসবের সারকথা হল, ধন-সম্পদ জমা করে রাখার জন্য নয়। বরং নিজের ও নিজের পারিবারিক প্রয়োজনে এবং সমাজের অপরাপর মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য। ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের পরিবর্তে নিজের ও সমাজের অপরাপর মানুষের প্রয়োজন পূরণার্থে এসব ব্যয় করে দিতে হবে। যদি কেউ তা না করে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখে, তাহলে দুনিয়ার জীবনে আইনগত শাস্তি তো তার জন্য রয়েছেই; উপরন্তু পরকালেও তার জন্য রাখা হয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তির আয়োজন।

খ. সম্পদ কুক্ষিগতকরণের অশুভ প্রভাভ সমাজে ও দেশে

বস্তুতঃ সম্পদ মহান আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন মানুষের প্রয়োজনে। যদিও সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডার আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, কিন্তু মানুষের আহরিত সম্পদ সর্বকালেই মানুষের অসীম চাহিদার তুলনায় ছিল সীমিত। সুতরাং এই সীমিত সম্পদ দিয়েই মানুষকে তার চাহিদা পূরণ করতে হবে। যদি আহরিত সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা হয়; তাহলে সব মানুষই এই সম্পদ দ্বারা তার অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলো পূরণ করে নিতে পারে। কিন্তু যদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে সম্পদের একটি বৃহত্তম অংশ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে; তাহলে সমাজের অপরাপর মানুষকে এর জের বহন করতে হবে। ফলে অন্যসব মানুষ অর্থনৈতিক দৈন্য ও নিগ্রহের শিকার হবে এবং নিজের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোও পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরো পরিষ্কার করা যায়। ধরা যাক, একটি দেশে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ১০০, সেই দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। সুতরাং যদি সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে মাথাপিছু সম্পদের গড় পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ টাকা। কিন্তু যদি সেদেশের ১০ জন লোক ৫০০ টাকা করে নিজের তহবিলে জমা করে ফেলেন; তাহলে এই দশ জনের হাতে মোট পুঞ্জিভূত টাকার পরিমাণ দাড়াবে ৫,০০০ টাকা। অবশিষ্ট ৯০ জন লোকের হাতে থাকবে অবশিষ্ট ৫,০০০ টাকা। ফলে তাদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৫.৫৫ টাকা মাত্র। মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ নেমে আসবে অর্ধেকের কাছাকাছি। এখন যদি উক্ত ১০ জন

www.eelm.weebly.com

তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করেই রাখেন; তাহলে দেশের অপরাপর জনগণ যথাপ্রাপ্যের অর্ধেক পরিমাণ সম্পদ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হবে। তাই যদি সম্পদের আবর্তন অব্যাহত না থাকে; তাহলে জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আর যদি সম্পদ কুক্ষিগত করে না রেখে এক হাত থেকে অন্য হাতে আবর্তনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ক্রমান্বয়ে সম্পদ এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত হতে থাকবে এবং জনগণ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু সম্পদের আবর্তন অব্যাহত না থাকলে; কেবল মানুষ যে নিজেদের নূন্যতম চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে তাই নয়, বরং শত চেষ্টার পরও সে ৫৫.৫৫ টাকার বেশি লাভ করতে পারবে না, যদি না সে অন্যের অধিকারে ভাগ বসিয়ে নিজে আরেক জন ক্ষুদ্র পর্যায়ের পুঁজিপতি বনার চেষ্টা না করে। এ কারণেই ইসলাম সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মানসিকতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। সম্পদ বিভাজন ও বিকেন্দ্রীকরণের বর্ণনা করার পর আল্‌-কুরআনে উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة الأغنياء منكم .

আল্লাহ তার রাসূলকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে (বিনাযুদ্ধে) যা দিয়েছেন; তা মূলতঃ আল্লাহর জন্যে, রাসূল ও তার আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য। (এভাবে সম্পদ বিভাজন করে দেয়ার বিধান এ জন্য) যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝেই পুঞ্জিভূত না হয়ে থাকে।

– সূরা ঃ ৫৯ হাশর ঃ ৭

বর্ণিত আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, ধন-সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের এই ব্যবস্থা এ জন্য রাখা হয়েছে, যাতে সম্পদ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তা'আলা কত প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

গ. কুক্ষিগতকরণ প্রতিরোধে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইসলাম তার অর্থব্যবস্থায় সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার এই ঘৃণ্য প্রবণতাকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে তার কতিপয় তুলে ধরা হল ঃ

১. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি কারো কাছে অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহলে যখনই তা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে একটু আগে বাড়তে শুরু করবে এবং ৫২.৫০ তোলা রূপার সমমূল্যে পৌঁছে যাবে; তখনই ইসলাম তার ৪০ ভাগের এক ভাগ অন্যকে দিয়ে

www.eelm.weebly.com

দিতে বাধ্য করেছে। এটাকে সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া বলা চলে। অনুরূপভাবে ব্যক্তির উপর সদাকায়ে ফিত্‌র ও কুরবানী আদায় ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় দানের বিধান কার্যকর করেছে। এতেও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে।

২. **উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন** ঃ সম্পদ ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হলেও যাতে তা বেশি দিন এক হাতে না থাকে বরং বিভিন্ন হাতে ভাগ হয়ে যায় এর জন্য উত্তরাধিকারের বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সঞ্চিত সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. **সামাজিক কর্তব্যের বিধান প্রবর্তন করে** ঃ ব্যক্তির উপর অত্যাবশ্যকীয় নির্ধারিত অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব ছাড়াও কিছু সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্যের বিধান আরোপ করা হয়েছে। যেমন- পাড়া-প্রতিবেশীর হক, নিকটাত্মীয় ও দূরবর্তী আত্মীয়ের হক, অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্বসাধারণের হক ইত্যাদি বহু হক ও দায়িত্ব ব্যক্তির উপর বর্তিয়ে দেয়া হয়েছে। এগুলো আদায় করার মাধ্যমেও তার সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে থাকে।

৪. **সাদাকার অনুপ্রেরণা ও ফাযাইল বর্ণনা করে** ঃ এমনি এমনি কেউ নিজের সম্পদ অন্যকে দিতে চায় না। তাই ইসলাম সাধারণ দান ও সাদাকার ফযীলতের কথা বহু আয়াত ও হাদীসে বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছে এবং এর পরকালীন লাভের দিকটিও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, যাতে একজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান খয়রাতে এগিয়ে আসে। এই অনুপ্রেরণার ফলে সকল মানুষই কমবেশি দান খয়রাত করে যাচ্ছে। এতেও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। তাছাড়া হেবা, হাদিয়া, ওসিয়্যত, ওয়াক্‌ফ ইত্যাদির মাধ্যমেও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে।

৫. মেহমানদারী ও অন্যকে খাবার দানের অনুপ্রেরণা ও এর ফাযাইল বর্ণনা করা হয়েছে। এতেও সম্পদ অল্প হলেও বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে।

৬. মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদির মাধ্যমেও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে।

৭. এছাড়া ধনীদের সম্পদে বিভিন্নভাবে গরীবের হক নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমেও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। যেমন ফসল কাটার দিন গরীবের হক আদায় করে দিতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وآتوا حقه يوم حصاده

৮. ইসলাম দুনিয়ার মাল সম্পদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করে সম্পদ কুক্ষিগতকরণের মানসিকতাকেই খতম করে দিতে চেষ্টা করেছে।

৯. আখেরাতমুখী জীবনধারা প্রবর্তন করে দুনিয়ার প্রতি অনেকটা নিরাশক্তির হাল সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এভাবে ইসলাম সম্পদ কুক্ষিগতকরণ রোধ ও তা বিকেন্দ্রীকরণের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সম্পদের আবর্তনকে অব্যাহত ও সচল করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সম্পদ কুক্ষিগতকরণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

৬. মূলধন ও শ্রমে ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি

বস্তুতঃ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উৎপাদনের অন্যতম দুই উপকরণের একটি হল মূলধন, অপরটি হল শ্রম। এ দু'টির কোনটির গুরুত্ব কোনটির চেয়ে কম নয়। পুঁজি না হলে যেমন উৎপাদনের আয়োজন করা যায় না, তেমনি শ্রম ছাড়া শুধু পুঁজি দ্বারা লাভবান হওয়া যায় না। এমনকি শ্রমিকের শ্রম না পাওয়া গেলে উৎপাদনের সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগকারীর যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি শ্রমদানকারী শ্রমিকের গুরুত্বও কম নয়। কিন্তু এ-এক নির্মম বাস্তব যে, পুঁজি বিনিয়োগকারী সর্বকালে, সকল দেশেই উচ্চ শ্রেণী বলে সম্মানিত হয়েছে, আর শ্রমিক নিম্নশ্রেণী বলে সর্বত্র উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেও শ্রমিকরা ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিমাণ পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত থেকেছে। অপরদিকে পুঁজি বিনিয়োগকারী একাই হাতিয়ে নিয়েছে লভ্যাংশের বিশাল অংকের টাকা। ফলে শ্রমিকরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে। আর পুঁজি বিনিয়োগকারীরা দিন দিন ফুলে ফেঁপে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে শ্রেণী বৈষম্য। জন্ম হয়েছে শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর। মালিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের অর্থনৈতিক দৈন্যের সুযোগে নিজেদের সেবাদাসে পরিণত করেছে। এই বৈষম্য কোথাও কোথাও এমন দুস্তর পর্যায়ে চলে গেছে যে, শ্রমিকদেরকে তথায় মানুষ বলেই মনে করা হয়নি, কিংবা মনে করা হলেও ভিন্ন এক শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে সমাজ জীবনে বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় জঘন্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিককে গণ্য করা হয়েছে অস্পৃশ্য শ্রেণী হিসেবে, আর মালিককে গণ্য করা হয়েছে উচ্চবর্ণ হিসেবে। এরই পরিণতিতে পৃথিবীতে কতশত অনাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার ইয়াত্তা নেই।

এককালে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষকে এতটাই নীচ মনে করত যে, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা তো দেয়াই হত না, এমনকি তাদের শ্রম নির্বাচনের স্বাধীনতাও হরণ করা হত। তাদের ইচ্ছা ও সামর্থের বাইরে অমানুষিক শ্রমদানে তাদেরকে বাধ্য করা হত। কিন্তু বিনিময়ে পরিশ্রমিক হিসেবে তাদেরকে যা দেয়া হত; তাদিয়ে তাদের জঠর জ্বালা নিবারণ করাই সম্ভব হত না।

শ্রমিক ও মজুররা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সভ্যতার প্রাসাদ রচনায় ইটের পর ইট গেঁথে চলে, শ্রমের নিঃশব্দ আঘাতে তাদের স্বাস্থ্যের

www.eelm.weebly.com

মেরুদন্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, বুকের রক্ত পানি করে ফেলে, কঠোর ও কঠিন শ্রম দিতে গিয়ে কেউ কেউ অঙ্গ হারিয়ে হয়ে যায় বিকলাঙ্গ, আর কেউ জীবন হারিয়ে পরিবার পরিজনকে অথৈ সাগরে ভাসিয়ে যায়। অথচ এর বিনিময়ে শ্রমিক কি পায়? পুঁজি বিনিয়োগকারী মালিকের মুখ খিচানো বিস্বাদ ভরা তেতো গাল-মন্দ, সামাজিক লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা, অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব ও দেউলিয়াত্ব ছাড়া আর কি?

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা শ্রম দিয়েও তাদের দু'বেলা পেটপুরে আহার করার কোন নিশ্চয়তা নেই, সকাল-সন্ধ্যায় হাত পা মেলে একটু বিশ্রাম করার মত বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই, রোদ বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার মত একটু নিশ্চিত আবাসের সুযোগ নেই, উন্মুক্ত বায়ূতে, সুস্থ পরিবেশে জীবন যাপনের কোন ব্যবস্থা নেই, শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত থাকে অনিশ্চিত, তাদের শিক্ষা দীক্ষারও কোন সুব্যবস্থা নেই। ফলে তারা স্বাধীন মানুষের মতো মাথা উঁচু করে কোন দিনই দাঁড়াতে পারে না। সভ্যতার বিনির্মাণে যাদের হাত সদা কর্মরত; সভ্য সমাজে, সভ্য মানুষ হিসেবে বাস করার তাদের কোন অধিকার নেই। হায়রে ভাগ্য বিড়ম্বিত শ্রমিক সমাজ! পৃথিবীর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন কি তোমাদের ভাগ্যের কোন উন্নয়ন করতে পেরেছে? পুঁজিবাদী সমাজে তোমরা যেমন লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, শোষিত ও নির্যাতিত ছিলে, সমাজতান্ত্রিক দেশে কি তেমোদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেছে? সেখানেও কি তোমরা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত, অবহেলিত ও লাঞ্ছিত থেকে যাওনি? সেখানেও কি তোমাদের প্রতি উঁচু শ্রেণীর মানুষ বক্র দৃষ্টিতে তাকায় না? তাহলে কোথায় তোমাদের মুক্তি?

হ্যাঁ, ইসলামই একমাত্র ধর্ম ও জীবনাদর্শ যাতে শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অধিকার এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ সমাধান পেশ করা হয়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা শ্রমিক মালিকের ভেদাভেদ ঘুঁচিয়ে সকলকে এনে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছে। শ্রমিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। শ্রমিক মালিক যৌথ কারবার প্রথার সূচনা করেছে। শ্রমিকের যথাপ্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে। শ্রমিক নির্যাতন ও শ্রমিক শোষণের সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। অস্বাভাবিক ও অমানুষিক পরিশ্রম করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না - এ মর্মে আইন ঘোষণা করেছে। এক কথায় শ্রমিক মালিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ উঠিয়ে ইসলাম শ্রমিক ও মালিকের মাঝে অনুপম ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে এবং পুঁজি ও শ্রমের মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টির অভিনব প্রয়াস চালিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম শ্রমকে কোনরূপ নীচতা বা হীনতা কিংবা মর্যাদা লাঘবকারী বিষয় হিসেবে চিহ্নিত না করে; শ্রমকে অতি উচ্চ মর্যাদায় মূল্যায়ন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম হল পবিত্রতম উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। হালাল পন্থায় হালাল কাজে শ্রমদান ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদাকর একটি বিষয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনে ঃ

ما أكل أحد طعاما قط خيرا أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود كانا يأكل من عمل يده (بخارى)

মানুষের স্বহস্তে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কিছুই হতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) স্বহস্তের উপার্জন দিয়ে আহার করতেন।

আল্লামা নববী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, সর্বোত্তম উপার্জন হল স্বহস্তের উপার্জন। অতঃপর তিনি বলেন, যদি সেটা কৃষি কাজ হয় তাহলে সেটি উপার্জনের উপায়সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হবে। কেননা এটি স্বহস্তের উপার্জন তো বটেই, তাছাড়া এতে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতাও বিদ্যমান রয়েছে। তদুপরি এতে মানুষ ও প্রাণী নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লামা ইবনে হজর (রহ.) উল্লেখ করেছেন, "তদুপরি যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে যে মাল কাফের মুশরিকদের থেকে অর্জন করা হয়; তাও স্বহস্তের উপার্জন বলে গণ্য হবে।" আর এটা নবী ও সাহাবীগণের উপার্জনের অন্যতম উপায় ছিল। যেহেতু এই যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; সুতরাং এটিও উত্তম উপার্জন হিসেবে গণ্য হবে।

এই ব্যাখ্যার আলোকে হাদীসে উল্লেখিত عمل اليد এর অর্থ যে ব্যাপক; শুধুমাত্র কৃষি কাজের মাঝে সীমিত নয়; তা সহজেই বুঝা যায়। বরং উপার্জনের যতগুলো উপায় রয়েছে সবই عمل اليد এর আওতাভুক্ত হবে। সুতরাং عمل اليد এর অর্থ হবে স্বহস্তের উপার্জন বা নিজের পরিশ্রমেরই কামাই। অতএব হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, নিজে শ্রম দিয়ে যা উপার্জন করা হয় (যে কোন শ্রমই হোক না কেন) তা হবে সর্বোত্তম উপার্জন। যে কোন শ্রম সাপেক্ষে উপার্জিত আয়কে সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করে ইসলাম শ্রমের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। কোন শ্রমকেই যেন কেউ ঘৃণা না করে; এজন্য আল্লাহ তার নবীগণের দ্বারা সমাজের দৃষ্টিতে নিম্নমানের শ্রমগুলো বাস্তবায়িত করে সমাজের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, হযরত যাকারিয়্যাহ (আ.) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন, হযরত দাউদ (আ.) কামারের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। খোদ সরকারে দু-জাহান হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)ও নিজে

www.eelm.weebly.com

ইয়াহুদীর বাড়িতে শ্রম দিয়ে, মক্কাবাসীদের রাখালী করে শ্রমের মর্যাদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এমনকি মানুষের কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে কাজ; অর্থাৎ জুতা সেলাই করা, তিনি নিজ হাতে তা করে এহেন শ্রমের বিষয়ে সমাজের অহেতুক ঘৃণাবোধকে সমূলে উৎখাত করে দিতে চেষ্টা করেছেন। এতে যে শুধু শ্রমের প্রতি ঘৃণাবোধ দূর করার প্রচেষ্টা হয়েছে তা নয় বরং এর দ্বারা শ্রমিকের প্রতি ঘৃণাবোধকে দূর করারও অভিনব প্রয়াস নিহিত রয়েছে। শুধু শ্রমিক নয়; একজন কৃতদাসের প্রতিও যাতে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি না হয় এজন্য তিনি বলেছেন ঃ

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس .

তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার কোন ভাইকে তার অধীন করে দেয়া হয়েছে; তাকে যেন সে তাই আহার করায় যা সে নিজে আহার করে এবং তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। – বুখারী ঃ কিতাবুল ঈমান

উল্লিখিত হাদীসে শ্রমিক ও মালিকের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা বলে, শ্রমিক যে কেবল মালিকের শ্রেণীভুক্ত মানুষ এটুকুই বলা হয়নি বরং বর্ণ হিসেবে শ্রমিকও মালিকের ভাইতুল্য; এর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দু'ভায়ের মাঝে যেমন বর্ণ বৈষম্যের কোন প্রশ্নই উঠে না, শ্রমিক ও মালিকের মাঝেও তেমনি কোনরূপ বৈষম্যের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

শেষাংশে খাওয়া পরার অধিকারের দিক থেকে তাকে যেন সমপর্যায়ে রাখা হয় এই হিদায়াতও করে দেয়া হয়েছে।

শ্রমিক তার পারিশ্রমিক যাতে ন্যায্যভাবে পায় সে জন্যও ইসলাম সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রমিক যাতে শ্রমদানের পর মজুরীর ক্ষেত্রে প্রতারিত না হয়; এ জন্য কাজে নিয়োগ করার পূর্বেই তার পরিশ্রমের ধরন ও পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিতে বলা হয়েছে। পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণ না করে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ

إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره

নবী করীম (সা.) শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে শ্রমে নিয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره (نسائى)

যখন কোন শ্রমিককে শ্রমে নিয়োগ করবে; তখনই তার পারিশ্রমিক কত হবে; তা তাকে জানিয়ে দাও।

www.eelm.weebly.com

শ্রমিক যাতে যথার্থ মজুরী পায়, সেজন্য রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ

ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله.

কিন্তু শ্রমিক যখন তার কাজ সমাপ্ত করবে তখন তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণভাবে প্রদান করতে হবে। - মুসনাদে আহমদ

এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর অনুসৃত নীতি হযরত আনাস (রা.) এক হাদীসে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে ঃ ولم يكن يظلم أحدا أجره

তিনি মজুর শ্রমিকের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কখনই জুলুম করতেন না।

قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وفيه رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.

আল্লাহ্ বলেন কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব। তাদের একজন হল ঐ ব্যক্তি, যে কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে; তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তাকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করে না। - বুখারী।

শ্রমিক যাতে তার পারিশ্রমিক লাভের ক্ষেত্রে কোনরূপ তালবাহানা ও অহেতুক বিলম্বের শিকার না হয় এজন্য রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

مطل الغنى ظلم،

পাওনা পরিশোধে সামর্থবানদের তালবাহানা জুলুম বলে গণ্য হয়।

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفعرقه .

শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও।

- বায়হাকী, ইবনে মাজাহ।

শ্রমিককে যাতে তার সাধ্যাতীত কোন কাজে নিয়োগ না করা হয়; এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لايكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.

আর যে কাজ তার (শ্রমিকের) সাধ্যাতীত তা করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, আর যদি সাধ্যাতীত কোন কাজে তাকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে সহযোগিত করা প্রয়োজন। - বুখারী ঃ কিতাবুল ঈমান

সাহায্য করার বিভিন্ন দিক হতে পারে। যেমন- নিয়োগকর্তা নিজে তাকে সহযোগিতা করবে। যদি কোন মালিক নিজেই শ্রমিকের সাথে কোন কাজে অংশগ্রহণ করে, তাহলে শ্রম যত কষ্টকরই হোক তা করতে যেয়ে শ্রমিক মানসিকভাবে আহত হয় না। সে কখনই এরূপ চিন্তা করে না যে, আমি গরীব বলেই এরূপ কষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছি বরং কাজটা করা প্রয়োজন এজন্যই করতে হচ্ছে। মালিক সঙ্গে আছেন এতে শ্রমিক উৎসাহ পায় ও তার সহযোগিতার কারণে শ্রমিকের জন্য কাজটি করা সহজ হয়ে পড়ে।

www.eelm.weebly.com

অথবা অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করে তাকে সহযোগিতা করার অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে, কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাব, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার মাধ্যমে সহযোগিতা করার অর্থও হতে পারে। আবার পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করে তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহযোগিতার অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রমিককে সাধ্যাতীত কাজে নিয়োগ না করার এই বিধির আওতায় দৈনিক কত ঘন্টা শ্রম দেয়া শ্রমিকের স্বাভাবিক সাধ্যের অতীত নয় এ বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। কেননা এটিও একটি মৌলিক সমস্যা বটে। তার সাথে শ্রমিকের কাজের গতি কি হবে সেটাও বোধ হয় নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন। কেননা কাজ অতিদ্রুত করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক চাপ পড়বে এবং বেশিদিন এভাবে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তার জীবনীশক্তি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যদি অতিধীরে কাজ করা হয় তাহলে নিয়োগকর্তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

الأناة من الله والعجلة من الشيطان

কোন কাজ মধ্যম গতিতে ধীরস্থিরতার সাথে আঞ্জাম দেয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

কাজের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজম তার প্রখ্যাত গ্রন্থ মুহাল্লায় উল্লেখ করেছেন যে, শ্রমিক যে পরিমাণ কাজ সহজে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে এবং যে পরিমাণ কাজ তার জন্য কোন কষ্টের কিংবা ক্ষতির কারণ হবে না, সে পরিমাণ কাজের জন্যই তাকে নিয়োগ করতে হবে।

বর্তমানে দৈনিক আট ঘন্টা পরিমাণ শ্রমদান, শ্রমের পরিমাণ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ইত্যাদির কথা বিবেচনা করেই এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব এটা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

শ্রম নির্বাচনের স্বাধীনতা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। কেননা সবসময় সব ধরনের কাজ সকলের রুচি ও চাহিদার অনুকূল হয় না। আর আপন রুচিবিরুদ্ধ কোন কাজ করে কেউ সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে না। সুতরাং নিজ জীবনের কর্মক্ষেত্রে সফলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই শ্রমিকের শ্রম নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম শ্রমিককে এই স্বাধীনতাও দিয়েছে। আল্-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন সূরা জুম'আয় ইরশাদ হয়েছে ঃ

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله .

যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে আপন অভিরুচি অনুসারে কর্মে আত্মনিয়োগ করে রিযুক অনুসন্ধান কর।

www.eelm.weebly.com

এক স্থানে শ্রমের যথার্থ মূল্য না পাওয়া গেলে; যেখানে শ্রমের যথার্থ মূল্য পাওয়া যায় সেখানে গমনের স্বাধীনতাও ইসলাম শ্রমিককে প্রদান করেছে।

শ্রমিক যাতে সারাজনম শ্রমিকই না থাকে সে জন্য ইসলাম শ্রমিককে মালিকের সাথে যৌথ কারবারেরও সুযোগ দিয়েছে। এজন্য মুদারাবা জাতীয় পন্থায় শ্রমিক ও মালিকের মাঝে এ মর্মে চুক্তি হতে পারে যে, মালিক পক্ষ মূলধন নিয়োগ করবে আর শ্রমিক পক্ষ শ্রম দিয়ে যাবে। লভ্যাংশ দু'জনের মাঝে হারাহারিভাবে বন্টিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা যেটি হবে সে হল এই যে, উৎপাদন হয়ে আসতে আসতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে, শ্রমিক ততদিন পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিয়ে যেতে পারবে কি? আর পারলেও এ ধরনের শ্রমিক কয়জন পাওয়া যাবে? কেননা সাধারণত শ্রমিকরা নিত্য অভাবি হয়ে থাকে। তারা দিন আনে দিন খায়। এমতাবস্থায় এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা কি করে সম্ভব হবে? এর একটি সহজ সমাধান এই যে, প্রস্তাবিত কোম্পানীর বাৎসরিক সম্ভাব্য লাভ যা ধরা হবে, সে হিসেবে শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশ যা দাঁড়াতে পারে, তাতে মাথাপিছু মাসিক সম্ভাব্য লাভের চেয়ে বেশি না হয় কিংবা কিছু কম হারে শ্রমিকদের টাকা মাসিক কিংবা পাক্ষিক (যেখানে যেভাবে সুবিধা হয়), পরিশোধ করে দেয়া হবে। বছরান্তে লভ্যাংশ হিসাবের পর শ্রমিকদের পাওনা থাকলে তাদেরকে তা পরিশোধ করা হবে। আর যদি মালিকের পাওনা হয়, তাহলে শ্রমিকরা তা পরিশোধ করবে। এককালীন অথবা পরবর্তী মাসে কিংবা কয়েক মাসে কিস্তিতে তা আবার শ্রমিকদের থেকে কেটে নেয়া হবে। এভাবে শ্রমিক-মালিক যৌথ কোম্পানী গড়ে তোলা যেতে পারে। অথবা মালিক প্রস্তাবিত মূলধনের একাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারে বিভাজন করে শ্রমিকদের মাঝে বিক্রয় করে দিতে পারেন। এভাবে শ্রমিক মালিকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা যেটি হবে; সেটি হল এই যে, বেচারা গরিব শ্রমিক যার নুন আনতে পান্তা ফুরায়, শেয়ার ক্রয়ের জন্য এত টাকা সে পাবে কোথেকে? সুতরাং নয় মণ তেলও হবে না রাধাও নাচবে না।

এ সমস্যার সমাধান দু'ভাবে করা যায় যে, মালিক ও শ্রমিকের মাঝে এ মর্মে চুক্তি হবে যে, তার প্রাপ্য মুজুরী থেকে শেয়ার ক্রয়ের নিমিত্ত প্রতি মাসে ১০০ টাকা কিংবা ২০০ টাকা করে কর্তন করে রাখা হবে। এভাবে যখন একটি শেয়ারের সমপরিমাণ টাকা তার খাতে জমা হবে তখন তাকে শেয়ার প্রদান করা হবে। কিংবা শ্রমিকের বোনাস অথবা বর্ধিত বেতন ঘোষণা করে শ্রমিকের সম্মতি নিয়ে তা শেয়ারের মূল্য বাবদ কর্তন করে তাকে শেয়ারের মালিকানা প্রদান করা যাবে। এটুকু সহানুভূতি প্রদান করতে যদি মালিক সম্মত না হয়, তাহলে মালিকের প্রদেয় যাকাতের পয়সার পরিবর্তে প্রতি বছর হিসাবমত যতজন শ্রমিককে একটি

www.eelm.weebly.com

করে শেয়ার প্রদান করা সম্ভব হয়, ততজনকে শেয়ার দেয়া যেতে পারে। অথবা যাকাতদাতারা তাদের যাকাতের পয়সার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে শেয়ার ক্রয় করে দিতে পারে। মোটকথা উপরোল্লিখিত যে কোন উপায়ে শ্রমিককে অংশীদারিত্ব প্রদান করা হলে শ্রমিক একদিন তার মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পথ করে নিতে পারবে। যেহেতু শ্রমিকের শ্রমের ফলেই মালিক লাভবান হচ্ছে, তাই শ্রমিকের জীবনের গতি পরিবর্তনের জন্য এতটুকু ব্যবস্থা করে তাকে লভ্যাংশে অংশীদারিত্ব প্রদান না করা হলে বড়ই অকৃতজ্ঞতা হবে। আর যদি শ্রমিকের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আপন কর্মে সহযোগী এক ভাইয়ের প্রতি আরেক ভাইয়ের যে ইনসাফ ও কর্তব্যবোধ থাকা প্রয়োজন ছিল তা কিঞ্চিৎ হলেও আদায় করা হবে। এতে একদিকে যেমন শ্রমিকের ভাগ্য উন্নয়নের সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত হবে; তেমনিভাবে মালিকও উৎপাদনের কাজে শ্রমিকদের শ্রমদানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। কেননা এসকল পন্থায় শ্রমিককে অংশীদারিত্ব প্রদান করলে শ্রমিক শ্রমদানের ক্ষেত্রে কখনই গাফলতি করবে না। কেননা তখন শ্রমে গাফলতির অর্থ হবে; তার নিজের উপার্জনে ঘাটতি দেখা দেয়া। সুতরাং সে নিজের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে সর্বোচ্চ হারে শ্রম দিয়ে যাবে।

ইসলাম শ্রমিক ও মালিকের মাঝে প্রভু ও দাসের সম্পর্কের পরিবর্তে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে। এজন্য একদিকে মালিককে বলা হয়েছে যে هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم তারা তোমাদেরই ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছে। সুতরাং খাওয়া পরায় যাতে তোমাদের মাঝে সাম্য রক্ষা পায় সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

আবার শ্রমিককে বলা হয়েছে যে, خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح শ্রমিক তোমার উপার্জনই সর্বোত্তম উপার্জন। যদি তুমি শ্রমদানের ক্ষেত্রে মালিকের কল্যাণকামী হও। আর উত্তম শ্রমিকের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে যেয়ে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ إن خير من استأجرت القوى الأمين

এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, সর্বোত্তম শ্রমিক হবে সেই, যে শক্তি-সামর্থ রাখে এবং সেই শক্তি ও সামর্থকে মালিকের কল্যাণে নিয়োজিত করে। তদুপরি তাকে বিশ্বস্ত ও আমানতদারও হতে হবে অর্থাৎ মালিকের জন্য শ্রমদানের ক্ষেত্রে সে নিষ্ঠার সাথে শ্রম দেয় এবং মালিকের সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বস্ততাও রক্ষা করে চলে। এভাবে ইসলাম শ্রমিককে উৎসাহিত করেছে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে মালিকের কল্যাণকামিতার মানসিকতা নিয়ে শ্রমদান করতে। আর মালিককে উৎসাহিত করেছে শ্রমিককে আপন বন্ধু ও ভাইয়ের ন্যায় গ্রহণ করতে, তার সুখে দুঃখে তার সাথে থাকতে। ফলে ইসলামী দীক্ষার বদৌলতে শ্রমিক ও

www.eelm.weebly.com

মালিক সংঘর্ষের পারিবর্তে শ্রমিক মালিক পরস্পরের সহযোগী বন্ধুরূপে কাজ-কর্ম করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রমের মালিক ও পুঁজির মালিকের মাঝে প্রভু ও দাসের সম্পর্কের পরিবর্তে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

৭. ক্ষতিকর অর্থ ব্যবস্থার প্রতিরোধ

ইসলাম তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষতিকর অর্থব্যবস্থার উদ্ভব কিংবা অনুপ্রবেশের পথকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এমনকি ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থা সহায়তা লাভ করতে পারে এমন কোন পথও খোলা রাখা হয়নি। এ ধরনের সমুদয় বিষয়কে নাজায়েয্ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ কারণেই ইসলাম অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়ার সকল প্রক্রিয়া, সূদী লেন-দেনের সকল কায়-কারবার, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জুয়া, সকল প্রকার মওজুদদারী, সকল প্রকার ক্ষতিকর চুক্তি ও অস্পষ্ট চুক্তি এবং পরিণামে ঝগড়া বিবাদের সম্ভাবনা আছে এ ধরনের সকল চুক্তিকে অবৈধ ও বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছে। ক্ষতিকর অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আমরা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ পর্যায়ক্রমে নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ক. সমাজের মানুষের ক্ষতি করে অর্থ উপার্জন

ইসলাম এ ধরনের সকল উপার্জন ও উৎপাদনের পন্থাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে যা দ্বারা ব্যক্তি লাভবান হলেও দেশ ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কেননা দেশ ও সমাজের স্বার্থ ব্যক্তি-স্বার্থের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'ব্যক্তি লাভবান হলে সমাজও লাভবনা হবে' এই শ্লোগান ইসলামের দৃষ্টিতে তখনই গ্রহণীয় হবে যখন ব্যক্তির লাভ সমাজের অন্যান্য মানুষের কোন ক্ষতির কারণ না হয়ে বৈধ পন্থায় হবে।

ব্যক্তি সবসময়ই নিজের লাভের জন্য পরিশ্রম করে থাকে। কখনো কখনো প্রবৃত্তি তাকে অন্যের ক্ষতি করে লাভবান হতে অনুপ্রাণিত করে। এ কারণেই ইসলাম মানুষকে প্রতারিত করে সম্পদ আহরণ করা, মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ পুঁঞ্জিভূত বা গুদামজাত করে রেখে মুনাফা আহরণ করা, মানুষের অভাবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অধিক মুনাফা আহরণ কিংবা কাউকে কোন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্থ করে সম্পদ আহরণ করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অন্যকে কষ্ট দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ রিওয়ায়াত করেছেন যে, জনৈক আনসারির বাগানে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দাব (রা.)-এর একটি খেজুর গাছ ছিল। হযরত সামুরা ও তার পরিবারের লোকেরা সেজন্য বার বার বাগানে যাতায়াত করত। বাগানের মালিকের জন্য তাদের গমনাগমনের বিষয়টি কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। ফলে সে

www.eelm.weebly.com

রাসূল (সা.)-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। রাসূল (সা.) সামুরা (রা.)-কে ডাকালেন এবং তাকে বললেন, বাগানের মালিকের নিকট গাছটি বিক্রি করে ফেল। তিনি তা করতে সম্মত হলেন না। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে ওটাকে কেটে ফেল। তিনি তাও করতে সম্মত হলেন না। তখন হুযুর (সা.) বললেন, তাহলে এটাকে হিবা করে দাও, এর সমপরিমাণ তুমি জান্নাতে পাবে। তিনি তাও করতে রাযী হলেন না। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তুমি তাহলে কষ্টই দিবে? অতঃপর তিনি আনসারীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি গিয়ে ওর গাছ কেটে ফেলে দাও। (আবু দাউদ– কিতাবুল কাযা)। যেহেতু গাছটি দ্বারা সামুরা (রা.)-র উপার্জন হত; তাই তিনি কোনভাবেই তা হাত ছাড়া করতে সম্মত হননি। কিন্তু যেহেতু তার এই উপার্জন অন্যের কষ্টের কারণ হয়; এজন্য রাসূল (সা.) তা কেটে ফেলতে বললেন। এ ঘটনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে উপার্জন করা নবী (সা.) অনুমোদন করেননি। এছাড়াও এক হাদীসে রাসূল (সা.) বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন- لا ضرر ولا ضرار কাউকে কষ্টও দেয়া যাবে না এবং কারো ক্ষতিও করা যাবে না। (মালিক, আহমদ, ইবনে মাজাহ)। অতএব যে উপার্জন ও উৎপাদনে অন্যের কষ্ট কিংবা ক্ষতি রয়েছে; সেই উপার্জন ও উৎপাদন ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বলে গণ্য হবে।

খ. সূদী লেনদেনের প্রক্রিয়ায় উপার্জন

ইসলামসহ সকল আসমানী দীনেই সুদকে অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদের বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে। যেমন ঃ

১. সুদী প্রক্রিয়ায় অবাধ শোষণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবচেতনভাবে অজ্ঞাতসারে শোষিত হয়। শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ফলে দেশের সর্বসাধারণ; এমনকি তৃণমূল পর্যায়ের মানুষও শোষিত হয়। অথচ এই ফকির মিস্‌কীনকে শোষণ করে কতিপয় মানুষ অর্থের বিশাল পাহাড় গড়ে তুলে। সম্পদ তাদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থা বড় বড় পুঁজিপতিদের জন্ম দেয়। দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গুটিকতক মানুষের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে।

২. সুদী অর্থব্যবস্থার ফলে একশ্রেণীর মানুষ চরম অলসতার শিকার হয়। কেননা তারা কোনরূপ শ্রম না দিয়ে সুদের ভিত্তিতে অর্থলগ্নি করে ঘরে বসে বসেই অজস্র অর্থ-সম্পদ ও গাড়ি বাড়ির মালিক হয়ে যেতে পারে। ফলে দেশ উল্লেখযোগ্য মানুষের শ্রম ও মেধা থেকে বঞ্চিত হয়। তদুপরি তাদের এই অর্থ যেহেতু শ্রম দিয়ে উপার্জিত নয়; তাই কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে, অন্যায় ও অবৈধ

www.eelm.weebly.com

পথে এবং অপ্রয়োজনীয় খাতে তা খরচ করতে তারা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না। ফলে সমাজে অন্যায় ও পাপাচার বৃদ্ধি পায়।

৩. সমাজের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তি খতম হয়ে যায়। উপরন্তু মানুষের মাঝে অর্থ গৃধ্নু এক হায়েনা জন্মগ্রহণ করে। ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

৪. সমাজ পুঁজিপতি ও সর্বহারা এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৫. অর্থের স্বাভাবিক আবর্তন ব্যাহত হয়।

৬. মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও শত্রুতা জন্ম নেয়।

উপরোক্ত নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির কারণেই ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ أحل الله البيع وحرم الربوا আল্লাহ বেচাকিনাকে বৈধ করেছেন, তবে সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা বাকারাহ-২৭৫)। ইসলাম সুদের সকল প্রকার লেনদেন; এমনকি সুদের সন্দেহ রয়েছে এমন ধরনের লেনদেনকেও হারাম ঘোষণা করেছে।

সুদ সাধারণত দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. ربا الفضل -(রিবাল্ ফয্ল) অতিরিক্ত প্রদানজনিত সুদ।

২. ربا النسيئة -(বিরান্ নাসিয়্যাহ) সময়ের ব্যবধানজনিত সুদ।

১. **রিবাল্ ফযল ঃ** রিবাল ফয্ল বলা হয়- একই জাতীয় দ্রব্যের লেদেনের ক্ষেত্রে শর্তের ভিত্তিতে এক পক্ষকে কিছু অতিরিক্ত প্রদান করা; যার বিনিময়ে অপর পক্ষকে কিছু দেয়া হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে ১০০ টাকার নোট ভাংতির জন্য প্রদান করল। আর অপর ব্যক্তি বলল যে, ভাংতি নিলে তাকে ৯৫ টাকা ফেরৎ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে মুদ্রা গুণগত ও মানগত দিক থেকে একই জাতীয় হওয়ার কারণে ৯৫ টাকা ৯৫ টাকার সমপরিমাণ বলে গণ্য হবে। অতিরিক্ত ৫ টাকা কোন বিনিময় ছাড়াই সে সংগ্রহ করল। সুতরাং এ ৫ টাকা সুদ বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি এক হাজার গ্রাম পুরাতন স্বর্ণের বিনিময়ে নব উত্তোলিত ৯০০ গ্রাম স্বর্ণ ক্রয় করে; তাহলে এ ক্ষেত্রেও স্বর্ণ একই জাতীয় হওয়ার কারণে ৯০০ গ্রাম ৯০০ গ্রামের সমান বলে গণ্য হবে। অতিরিক্ত ১০০ গ্রাম সুদ বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যা মেপে কিংবা ওজন করে লেনদেন করা হয়; সেসব দ্রব্য অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ বলে গণ্য হবে। যেমন ঃ এক মণ আমন ধানের বিনিময়ে কেউ যদি দেড় মণ ইরি ধান ক্রয় করে তাহলেও সেটা সুদ বলে গণ্য হবে। কেননা সকল ধানই এক শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য হয়।

২. **রিবান নাসিয়্যাহ (ربا النسيئة) ঃ** একই জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে শর্তের ভিত্তিতে সময়ের ব্যবধানজনিত কারণে অতিরিক্ত যাকিছু প্রদান করা

www.eelm.weebly.com

হয় তাকে রিবান নাসিয়্যাহ বলে। যেমন কেউ যদি ১০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার এই শর্তে বিক্রি করে যে, আমি এখন তোমাকে ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার দিয়ে দিচ্ছি ৬ মাস পর আমাকে ১০০ গ্রাম স্বর্ণের নতুন মডেলের অলংকার প্রদান করতে হবে। তাহলে এটা সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে। কেননা রূপা ও স্বর্ণকে মুদ্রামূল ধরা হয়ে থাকে। আর মুদ্রা কারো হাতে কিছুদিন থাকলে সে তা দিয়ে উপকৃত হতে পারে। এমনকি বড় বড় ব্যবসায়িরা এক দুই ঘন্টার ব্যবধানে বহু টাকা লাভ করে ফেলে। অতএব এক পক্ষ নগদ গ্রহণের ফলে এই সুযোগ সে পেয়েছে। এটি তার অতিরিক্ত পাওনা যা অন্য পক্ষ পায়নি। তাই এ ধরনের লেনদেন সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ কাউকে ১০০ টাকা এই শর্তে প্রদান করল যে, যদি ১ মাস পরে পরিশোধ করা হয় তাহলে ১১০ টাকা দিতে হবে, অথবা প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে দিয়ে যেতে হবে; তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ টাকার কোন বিনিময় নেই। অনুরূপ কেউ যদি কাউকে ১০০ টাকা এই শর্তে প্রদান করে যে, তুমি এ টাকা তোমার টাকার সাথে মিলিয়ে ব্যবসা করবে। তবে লাভ লোকসান আমি বুঝি না। আমাকে প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে লাভ দিতে হবে; তাহলে এটাও সুদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে। কেননা প্রদত্ত ১০ টাকা মূলতঃ লভ্যাংশ নয়, এটা বরং শর্তের কারণে পরিশোধকৃত টাকা। কেননা সে ক্ষতির ঝুঁকিও নিচ্ছে না, লাভ কম হলে তাও গ্রহণ করছে না। কাজেই এ টাকাকে লভ্যাংশ বলে গণ্য করা যাচ্ছে না। সুতরাং এটি সুদ বলেই গণ্য হবে। তবে যদি কেউ এ শর্তে টাকা প্রদান করে যে, প্রতি মাসে আমাকে ১০ টাকা প্রদান করতে হবে। তবে বছর শেষে হিসাব করে যা লভ্যাংশ দাঁড়াবে, তাতে আমার পাওনা থাকলে আমাকে পরিশোধ করবে; আর তোমার পাওনা হলে তোমাকে পরিশোধ করা হবে। তাহলে অবশ্য তা বৈধ হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সে লাভ লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। অতএব তার প্রাপ্য অংশ লভ্যাংশ বলেই গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যেসব দ্রব্য সামগ্রী মেপে কিংবা ওজন করে লেনদেন করা হয়, সেগুলো যদি এক জাতীয় হয়, তাহলে তার লেনদেনের ক্ষেত্রেও পরিমাণগত সমতা রক্ষার সাথে সাথে সময়ের সুযোগের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ এহেন সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের ক্ষেত্রেও নগদ-বাকী বেচাকেনা সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে। কিন্তু যেসব দ্রব্য মেপে বা ওজন করে বিক্রি করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের বেলায় পরিমাণজনিত ব্যবধান সুদ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সময়ের ব্যবধানজনিত তারতম্য সুদ বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ যদি এক মণ ধান দুই মণ আলুর বিনিময়ে নগদানগদি ক্রয় করে তাহলে তা বৈধ হবে। কিন্তু কেউ যদি এক মণ ধান দুই মণ আলুর

www.eelm.weebly.com

পরিবর্তে এই শর্তে ক্রয় করে যে, ধান এখন দিতে হবে, কিন্তু আলু ৩ মাস পরে পরিশোধ করা হবে, তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

ইমাম মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীসে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زادأو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدابيد. (مسلم)

অর্থাৎ স্বর্ণ সমপরিমাণ সমপরিমাণের বিনিময়ে, রূপা সমপরিমাণ সমপরিমাণের বিনিময়ে, খেজুর সমপরিমাণ সমপরিমাণের বিনিময়ে, লবণ সমপরিমাণ সমপরিমাণের বিনিময়ে, যব সমপরিমাণ সমপরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি ও লেনদেন বৈধ। যে ব্যক্তি বেশি দিবে অথবা বেশি দাবি করবে সে সুদী লেনদেনকারী বলে গণ্য হবে। স্বর্ণকে রূপার বিনিময়ে যত পরিমাণের বিনিময়ে যত পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি কর; তবে নগদানগদী, গমকে খেজুরের বিনিময়ে যত পরিমাণের পরিবর্তে যত পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি কর, তবে নগদানগদী। যবকে খেজুরের বিনিময়ে যত পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি কর, তবে নগদানগদী। – মুসলিম।

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এক জাতীয় দ্রব্য হলে সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ লেনদেন করা যাবে; ভালমন্দ যাই হোক। এক পক্ষের পরিমাণ বর্ধিত হলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। আবার মেপে বা ওজন করে যেসব বস্তু লেনদেন করা হয় সেগুলো সমজাতীয় না হলে বরং এক জাতীয় দ্রব্য অন্য জাতীয় দ্রব্যের সাথে লেনদেনকালে পরিমাণগত তারতম্যের সাথে বিক্রি করা যাবে। তবে নগদানগদী হতে হবে। কেননা বাকী ও নগদের মাঝেও অতিরিক্ত সুবিধা থাকা না থাকার তারতম্য হয়ে থাকে। যিনি নগদ গ্রহণ করেন তিনি এই সুবিধা লাভ করেন, আর যিনি পরে গ্রহণ করবেন তিনি এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। অতএব এটিও সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে।

তবে একথা সত্য যে, একই জাতীয় উত্তম ও নিম্নমানের বস্তুর মাঝে দামের যথেষ্ট তারতম্য হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যদি মন্দের বিনিময়ে ভালটি ক্রয় করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করতে হবে; এ সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের আমেল (বা কর্মকর্তা) নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে রাসূল (সা.)-এর জন্য উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সকল খেজুরই কি এরূপ? তিনি

www.eelm.weebly.com

বললেন, জ্বী না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাধারণ খেজুরের দুই চুয়া (মাপের একটি একক)-এর বিনিময়ে এর এক চুয়া সংগ্রহ করে থাকি। কিংবা এর দুই চুয়া; সাধারণ খেজুরের তিন চুয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকি। এ শুনে তিনি বললেন, এরূপ করো না। বরং দিরহামেরে অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে ঐ সাধারণ বা মিশ্রিত খেজুরগুলো বিক্রি করে দিও। অতঃপর ঐ দিরহামের দ্বারা উত্তম জাতীয় খেজুর ক্রয় করে নিও। – বুখারী ও মুসলিম।

এ হাদীস দ্বারা এক জাতীয় দ্রব্য বিনিময়কালে এক পক্ষকে বর্ধিত পরিমাণ প্রদান করলে যে সুদ হবে তা যেমন বুঝা যায়, অনুরূপভাবে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে; তারও একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সারকথা এই যে, সুদী অর্থব্যবস্থা একটি ক্ষতিকর অর্থব্যবস্থা। এতে লাভবান হয় গুটিকতক মানুষ, আর গুটিকতক পুঁজিপতি গজিয়ে উঠে। পক্ষান্তরে সুদী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ চরমভাবে শোষিত হয়। আর আধুনিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকের সাথে কোনরূপ লেনদেন নেই যেসব মানুষের, তারাও দেদারসে শোষিত হয়। অথচ এই শোষণের প্রক্রিয়া এত নিপুণ যে, মানুষ প্রতি ক্ষেত্রে তিলে তিলে শোষিত হয়, পরিমাণে অল্প অল্প অথচ সকল ক্ষেত্রে। যা সমন্বিত করলে বিরাট অংক হয়। অথচ না জেনেই অবচেতনভাবে প্রতিদিন দেশের নিরিহ সর্বসাধারণকে গুণতে হয় বিলাসী ব্যাংকারদের প্রমোদের খরচ। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসহায়ের মত সেই টাকা তুলে দিতে হয় পুঁজিপতিদের পকেটে। এই নিদারুণ শোষণ ও জুলুম ইসলামের ন্যায় ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় কিছুতেই গ্রহণীয় হতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম সুদী লেনদেনকে সমূলে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

গ. ঘুষের মাধ্যমে অর্থোপার্জন ঃ

কোন বিচারক কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিজের পক্ষে বিচার করার জন্য কিংবা উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে নিজেকে অন্যায়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য যে মাল-সম্পদ কিংবা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়; শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই রিশওয়াত (رشوة) বা ঘুষ বলা হয়।

ঘুষ এমন এক জঘন্য প্রবণতা; যে সমাজে তা চালু হয়, সে সমাজে প্রশাসনের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে; ন্যায় অন্যায়ের কোন পার্থক্য থাকে না, নিয়ম-নীতির কোন বালাই থাকে না, দুর্নীতি হুঁ হুঁ করে বাড়তে থাকে, মানুষের জান মালের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও জুলুমের প্রতিকার করার প্রবণতা সেই সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে লোপ পায়। অপরাধী বুক ফুলিয়ে চলে, আর নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ চরম অসহায়ত্বের মাঝে ধুকে ধুকে মৃত্যুর

www.eelm.weebly.com

প্রহর গুণে। নির্যাতিত মানুষ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ইনসাফ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা বোধ করে না। বিচারের বাণী হেথায় নিরবে কাঁদে। এ কারণেই ইসলাম এহেন জঘন্য পন্থায় মাল উপার্জনকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। যাতে সমাজ এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে, অন্যায় বিচারের জুলুম থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং যাতে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে আল্‌-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. (سورة البقرة : ٨٨)

উপরোক্ত আয়াতে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ঘুষের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ অন্যায় আত্মসাতের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া বটে। সুতরাং এটি নিষিদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে। রাসূল (সা.)ও হাদীসে এহেন প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। বর্ণিত আছে যে ঃ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى .

রাসূল (সা.) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই লা'নত করেছেন।

– বায্‌যার, আবু ইয়া'লা।

এছাড়াও ঘুষ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। ঘুষের যাবতীয় পন্থাই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ; সেটা হাদীয়া নামেই দেয়া হোক কিংবা করজ আকারেই প্রদান করা হোক, কিংবা কোন উপকার করা হউক কিংবা কোন খিদমাত করা হোক অথবা সে ব্যক্তির নামে কোন মিল ফ্যাক্টরী বা ইন্ডাস্ট্রি করে দেয়া হোক – যার লাভ তিনি ভোগ করবেন, কিংবা তার নামে কোন কোম্পানী অথবা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে দেয়া হোক; সর্বাবস্থায় তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেউ তা গ্রহণ করেছে তা জানতে পারা গেলে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া গেলে; তার কাছ থেকে সেই সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং বায়তুল মালে তা জমা করে দেয়া হবে।

ঘ. ক্ষমতা ও পদের প্রভাব খাটিয়ে অর্থোপার্জন

ইসলাম তার রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য শুধুমাত্র ঘুষ নিষিদ্ধ করেছে তাই নয়; বরং পদের প্রভাব খাটিয়ে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা কিছু উপার্জন করলে কিংবা কোন কর্মকর্তার পদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা কোন অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা আদায় করলে সেটাকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা এ ধরনের পথ খোলা থাকলে এটা সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে বাধা সৃষ্টি করে।

www.eelm.weebly.com

কারণ যার কাছ থেকে এহেন সুযোগ গ্রহণ করা হবে, তার অন্যায় আচরণের প্রতিকার করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। কেননা বড় প্রভাবশালী কর্মকর্তাকে খুশি রাখতে কিংবা তার কাছ থেকে অন্যায় ও অবৈধ কোন সুযোগ সুবিধা উদ্ধার করার জন্য তাঁকে কিংবা তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। ফলে এ দ্বারা সাধারণ জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। এসকল তদবীরবাজদের দৌরাত্মের শিকার হয়ে আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অসহায় মানুষ। এ কারণেই ইসলাম এ ধরনের আয়-উপার্জন ও সুযোগ সুবিধা গ্রহণকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হযরত আবু হুমায়দ আস্-সায়েদী (রা.) বর্ণিত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, ইবনে লুতাবিয়্যাহ নামক বনী আসাদের জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল (সা.) সাদাকাহ আদায়ের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। সে তার দায়িত্ব পালন করে এসে বলল, 'এগুলো আপনাদের সাদাকার মাল, আর এগুলো আমাকে হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে'। একথা শুনে রাসূল (সা.) মিম্বারে উঠে বসলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আমেলদের (সাদাকাহ আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের) কি হল যে, আমি তাদেরকে প্রেরণ করি, অতঃপর ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমার। সে তার বাবা মায়ের ঘরে বসে থাকল না কেন? তাহলে দেখা যেত যে, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কি না? যার হাতে আমার প্রাণ; সেই সত্তার শপথ করে বলছি, এ ধরনের যা কিছু সে গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তার সমুদয় আপন স্কন্ধে বহন করে নিয়ে আসবে, উট হলে তা উচ্চস্বরে গর্জন করতে থাকবে, গরু হলে তা হাম্বা করতে থাকবে, বকরী হলে ম্যা, ম্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত এমনভাবে উর্ধ্বে উত্তোলন করলেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম এবং বললেন, শুনে রেখো, "আমি কি পৌঁছিয়েছি" একথা তিনি তিন বার বললেন। – বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, পদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কোন কিছুই উপার্জন করা যাবে না এবং কোন সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য পদের প্রভাবকে কিছুতেই কাজে লাগানো যাবে না।

এ হাদীসে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নবী (সা.) ইবনে লুতাবিয়্যাহকে হাদীয়ার মাল তার দাতাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেননি। আবার তিনি বিষয়টির উপর যেভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন; তাতে এ মালগুলোকে যে তিনি তার জন্য হাদিয়া হিসেবে স্বীকার করে নেননি তাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং এগুলো মালিকানাহীন সম্পদ হিসেবে বায়তুলমালের সম্পদ বলে গণ্য হবে।

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলের একটি ঘটনা ইমাম বায়হাকী (রহ.)

www.eelm.weebly.com

তার সুনানে উল্লেখ করেছেন যে, "হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ ইরাকের দিকে প্রেরিত এক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তথায় গমন করেছিলেন। যখন তারা ফিরছিলেন, তখন বসরায় নিযুক্ত আমীর হযরত আবু মূসা (রা.)-এর সাথে দেখা করলেন। তিনি তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং বিনয় প্রকাশ করলেন, আর বললেন, যদি আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই করতাম। তারপর তিনি বললেন, তবে এখানে কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ রয়েছে, আমি সেগুলো আমীরুল মু'মেনীনের নিকট প্রেরণ করতে চাই, আর চাই যে তোমরাও মাঝখান থেকে কিছুটা লাভবান হয়ে যাও। (আর সেটা এভাবে যে, এখান থেকে এই মাল এখানকার বাজারদর হিসেবে তোমরা কিনে নিয়ে যাবে এবং সেখানকার বাজারদর অনুযায়ী তা বিক্রি করে দিবে। তাতে যা লাভ হয় তা রেখে; এখানকার বাজারদর হিসেবে যা মূল্য দাড়ায় তা আমীরুল মু'মেনীনকে পরিশোধ করে দিবে।)

তারা দু'জন বললেন, আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত। তিনি তাই করলেন এবং আমীরুল মু'মেনীনকে তাদের থেকে মাল বুঝে নেয়ার জন্য একটি চিঠি লিখে দিলেন। তারা যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন সে মাল বিক্রি করে বেশ লাভ করলেন। কিন্তু যখন তা হযরত উমর (রা.)কে প্রদান করলেন, তখন তিনি বললেন, সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকেই কি তোমাদের মত এই সুযোগ দেয়া হয়েছে? তারা বললেন, জ্বী না। একথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, তোমরা আমীরুল মু'মেনীনের ছেলে বলে তোমাদেরকে এই সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাই না? মূল মাল ও লভ্যাংশ দু'টোই বায়তুলমালে জমা করে দাও। এ হুকুম শুনে আব্দুল্লাহ চুপ করে রইলেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! এরূপ নির্দেশ দেয়া আপনার জন্য উচিত হয় না। কেননা যদি মাল ক্ষতিগ্রস্থ হত কিংবা স্বমূলে ধ্বংস হয়ে যেত; তাহলে তো আমরা তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকতাম। হযরত উমর বললেন, আমি বলছি জমা করে দাও। এতে উবায়দুল্লাহও চুপ হয়ে গেল। তখন হযরত উমর (রা.)-এর সভাসদদের একজন বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনিতো এটাকে করজ হিসেবেও গণ্য করতে পারেন (অর্থাৎ বায়তুল মালের বসরার খাযানা থেকে এই টাকা তারা কর্জ নিয়ে মদীনায় এসে তা পরিশোধ করে দিচ্ছে; এভাবেও চিন্তা করতে পারেন, তাহলে লভ্যাংশ তাদের প্রাপ্য হয়)। তখন উমর (রা.) মূল মাল ও লভ্যাংশের অর্ধেক বায়তুলমালের জন্য নিয়ে নিলেন। আর আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ তারা দু'জন লভ্যাংশের বাকী অর্ধেক নিলেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, আমীরুল মু'মেনীনের ছেলে হিসেবে বায়তুল মালের সম্পদ দ্বারা এভাবে লাভবান হওয়া (অন্যান্য সৈনিকরা যে সুযোগ পাচ্ছে না)

www.eelm.weebly.com

হযরত উমর (রা.) এটা পছন্দ করেননি। অর্থাৎ কোন বিশেষ পদাধিকারীর আত্মীয়তার সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে উপার্জনকে তিনি বৈধ মনে করেননি।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতে কুবরায় উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) যখন কাউকে আমেলে (কর্মকর্তা) নিয়োগ করতেন; তখন তার ব্যক্তিগত মালামালের পরিমাণ হিসাব করে রাখতেন। এটি করার পিছনে হযরত উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কর্মকর্তারা যাতে তাদের পদের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ উপার্জন করতে না পারে। – আল-ইকতিসাদুল ইসালামী-৯১

৬. প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জন ঃ

ধোঁকা ও প্রতারণা ইসলাম কোন ক্ষেত্রেই বৈধ রাখেনি। বিশেষভাবে অর্থ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়াকে ইসলাম মোটেও অনুমোদন করে না। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ من غشنا فليس منا যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বেচা-কেনার ক্ষেত্রে দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রতারিত করে থাকে। এজন্য এটাকে প্রতারণামূলক বেচা-কেনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া যে বেচা কেনায় অন্যের প্রতি জুলুম জবরদস্তি করা হয়ে থাকে তাতে ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতি থাকলেও এ সম্মতি লেনদেনকে বৈধ করার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না। প্রতারণামূলক লেন দেনের কতিপয় নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. প্রাণীর গর্ভের বাচ্চা গর্ভে থাকা অবস্থায় ক্রয় বিক্রয় করা।

২. কোন একটি নির্ধারিত মূল্যে কয়েকটি বিভিন্ন দামের দ্রব্যের যেটিতেই হাত লাগাবে তা ক্রয় করার জন্য বাধ্য থাকার প্রথা। যেমন আমাদের দেশের পট খেলায় হয়ে থাকে।

৩. বিভিন্ন মূল্য মানের কয়েকটি দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে এ মর্মে শর্ত করা যে, এর যে কোনটি তোমার দিকে নিক্ষেপ করা হোক; তুমি তা ঐ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার জন্য বাধ্য থাকবে।

৪. বেশ কয়েকটি বিভিন্ন মূল্যের দ্রব্য বা প্রাণীর মাঝে অনির্ধারিতভাবে যে কোন একটিকে কোন নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা।

৫. কিংবা বেচা-কেনায় দ্রব্য বা মুদ্রার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকা। যেমন কেউ বলল, আমার পকেটে যাই আছে তাই দিয়ে দিব যদি এই জামাটি দেয়া হয়। অথবা তোমার ব্যাগে যাই আছে তা আমি ১০০ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। এ ধরনের বেচাকেনায় মৌলিকভাবে অজ্ঞতাজনিত প্রতারণা বিদ্যমান রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ না হওয়ার প্রমাণ হল হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন যে ঃ

نهى رسول الله عن بيع الغرر. (مسلم)

রাসূল (সা.) প্রতারণামূলক লেনদেনকে নিষেধ করেছেন। – মুসলিম

ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে ঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائض يعنى القانص.

রাসূল (সা.) প্রাণীর গর্ভে যা রয়েছে, তা প্রসবের পূর্বে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, দুধাল প্রাণীর স্তনে যা আছে তা দোহনের পূর্বেই না মেপে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, পলাতক গোলামকে ফিরে আসার আগে, গনীমতের মাল বন্টন করার আগে এবং সাদাকার মাল সদকা গ্রহণকারীর হস্তগত হওয়ার আগে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর একবার জাল মেরে যা মাছ পাওয়া যাবে তা (না দেখে) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। – ইবনে মাজাহ

মাপে কম দিয়ে এবং ভেজাল মিশ্রিত করেও প্রতারণা করা হয়ে থাকে। অতএব এও নিষিদ্ধ হবে। সারকথা প্রতারণামূলক পন্থায় লেনদেন ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। ফিকাহ্-এর গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

চ. হারাম দ্রব্যের মূল্য এবং অবৈধ কর্মের পারিশ্রমিক

ইসলামী শরীয়ত যেসব দ্রব্য হারাম বলে ঘোষণা করেছে, তার ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনকেও হারাম করে দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন যে ঃ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন; তখন তার বিক্রয়লব্ধ উপার্জনকেও হারাম করে দেন। – আহমদ, আবু দাউদ

যেমন ঃ মৃত প্রাণী, রক্ত, শরাব, আফিম, গাজা, হিরোইনসহ যাবতীয় মাদকদ্রব্য, শুকর, পূজার মূর্তি ইত্যাদির বেচা কেনাও এজন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (সা.)কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) শরাব, মৃত প্রাণী, শুকর ও মূর্তিসমূহের ক্রয় বিক্রয়কে হারাম করে দিয়েছেন। – বুখারী ও মুসলিম

www.eelm.weebly.com

অনুরূপভাবে যেসব দ্রব্য বা প্রাণীতে কোন উপকার নেই; সেগুলো বিক্রি করে অর্থোপার্জন করাকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। যেমন ঃ পোকা-মাকড়, হিংস্র প্রাণী এবং এমন পাখি যার গোশ্ত বা ডিম খাওয়া বৈধ নয় ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে অর্থোপার্জন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব ঃ ১. যে ব্যক্তি আমার নামে কিছু দান করার পর তা পুনঃপ্রত্যাহার করে নেয়, ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যাক্তকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করে নেয়, ৩. যে ব্যক্তি কোন লোককে শ্রমে নিয়োগ করে তার কাছ থেকে যথার্থ শ্রম আদায় করে নেয় অথচ তার পারিশ্রমিক প্রদান করে না। – বুখারী ও মুসলিম

তাছাড়া যেসব উপকরণ কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কিংবা সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়ায়; এ ধরনের সমুদয় বস্তুর ক্রয় বিক্রয়কে ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যেমন ঃ সিনেমার অশ্লীল ফিল্ম, পর্নো বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন ছবি সম্বলিত প্রচারপত্র ও পোস্টার, যা দ্বারা নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটে, অবৈধ গানের ক্যাসেট ইত্যাদি পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা কালামেপাকে এ মর্মে ইরশাদ করেছেন ঃ

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة .

আর যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারকে ভাল মনে করে; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে। – সূরা ঃ ২৪ - নূর ঃ ১৯

আয়াতে অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের কামনা করা যে নিষিদ্ধ ও হারাম তা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব যেসব উপকরণ এ কাজের জন্য সহায়ক হবে, তা যে নিষিদ্ধ হবে তা ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

অনুরূপভাবে এমন কোন কাজ করে অর্থোপার্জন করা নিষিদ্ধ ও হারাম যা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। যেমন ঃ অবৈধ যৌনকর্মের বিনিময়ে অর্থোপার্জন, গান-বাজনা করে অর্থোপার্জন, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি কিংবা দু'আ করে অর্থোপার্জন, কিংবা এমন ব্যক্তির নিকট বাড়ি ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন - যে বাড়িকে বেশ্যালয়ে পরিণত করবে, কিংবা শরাব তৈরির কারখানা বানাবে, কিংবা শরাবের দোকান হিসেবে ব্যবহার করবে অথবা অবৈধ পণ্যের গোডাউন বানাবে বা কারো কোষ্ঠী দেখে ভাগ্য গণনা করে অর্থোপার্জন করবে। এ ধরনের

www.eelm.weebly.com

অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বর্ণনা করেন যে ঃ

نهى رسول الله ص عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن. (رواه الجماعة)

রাসূল (সা.) কুকুর বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ, ভাগ্য গণনা করে পাওয়া পারিশ্রমিক ইত্যাদি সব কিছুকেই নিষেধ করেছেন।

ছ. ওজনে কম দিয়ে অর্থোপার্জন ঃ

ওজনে কম দেয়া মূলতঃ প্রতারণারই আরেক কৌশল। এর মাধ্যমেও ক্রেতা সাধারণকে ঠকানো হয়ে থাকে। এতে ক্রেতা তার অজ্ঞাতসারে ঠকে থাকেন। অথচ তিনি মনে করেন যে, তিনি যথা পরিমাণই গ্রহণ করেছেন। এই অপরাধ কোন সমাজে দেখা দিলে সেই সমাজের লেনদেনে স্থিতিশীলতা হারাতে বাধ্য। এক চরম উৎকণ্ঠার মধ্যদিয়ে তখন মানুষকে লেনদেন করতে হয়। ফলে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং এক বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এজন্যই এ পন্থাকে আল্-কুরআনে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان

ওজনে ন্যায্যমাপ প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিও না।

– সূরা ঃ ৫৫ - আর্ রাহমান ঃ ৯

أوفو الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشيائهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها، ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين.

তোমরা মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে দিও, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম হবে; যদি তোমরা মু'মিন হও।

– সূরা ঃ ৭ - আরাফ ঃ ৮৫, সূরা ঃ ২৬ – আশ্-শুআরা ঃ ১৮১-১৮৩

জ. চুরি, ডাকাতি ও জবরদখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন

কারো সংরক্ষিত মাল তার অজ্ঞাতে চুপিসারে নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। আর অন্যায়ভাবে কারো সম্পদের উপর জবর দখল বা আধিপত্য কায়েম করাকে বলা হয় ডাকাতি। এই উভয় পন্থায় মাল-সম্পদ উপার্জনের প্রক্রিয়াকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অন্যের মাল অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না।

www.eelm.weebly.com

এ আয়াতের অর্থের ব্যাপকতার মাঝে চুরি ডাকাতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদও অন্তর্ভুক্ত। কেননা এসকল পন্থায়ও অন্যের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও চুরি ও ডাকাতি প্রতিরোধে ইসলাম যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে; তা থেকেও বুঝা যায় যে, এ পন্থায় সম্পদ উপার্জন কিছুতেই বৈধ হবে না। কেননা বৈধ হলে এমন কঠিন শাস্তির বিধান কখনই দেয়া হত না। চুরির শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

চোর ও চোরণীর হাত কর্তন করে দাও। – সূরা ঃ ৫ - মায়িদাহ ঃ ৩৮

ডাকাতির শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় (ছিনতাই, রাহাজানী, ডাকাতি করে); তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কর্তন করে দেয়া হবে, কিংবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেয়া হবে। – সূরা ঃ ৫ - মায়েদাহ ঃ ৩৩

চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি পন্থায় অন্যের মাল আত্মসাৎ করা যে বৈধ নয় এ সম্পর্কে হাদীসেও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল সম্পদ তার স্বতঃস্ফূর্ত সন্তুষ্টি ছাড়া কারো জন্য বৈধ হবে না।

– ইবনে হিব্বান, আবু ইসহাক।

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

دمائكم وأموالكم عليكم حرام

তোমাদের পরস্পরের জান ও মাল অপরের জন্য হারাম। – বুখারী ও আহমদ

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে ঃ من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين

যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ ভূমি অন্যায়ভাবে দখল করবে; সাত স্তবক ভূমির সেই পরিমাণ তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে। – বুখারী, মুসলিম।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে চুরি, ডাকাতি ও জবর দখলের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ যে অবৈধ হবে; তা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায়।

তাছাড়া এসকল পন্থায় উপার্জন পৃথিবীর কোন ধর্ম দর্শনেই বৈধ রাখা হয়নি। কেননা এতে এক দিকে যেমন ... ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়,

www.eelm.weebly.com

অপরদিকে মানুষের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। একজন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সম্পদ উপার্জন করে, আরেকজন বসে বসে তা ভোগ করে। এসব পন্থায় উপার্জনের পথ উন্মুক্ত থাকলে সমাজের উৎপাদন স্পৃহা হ্রাস পায়। কেননা যে উৎপাদন করে; সে সম্পদ ভোগ করতে পারে না - এহেন অবস্থা দেখে মানুষ উৎপাদনের প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। আর শ্রম না দিয়েই অর্থের ব্যবস্থা করা যায় এ বিশ্বাসের কারণে চোর ডাকাতরা শ্রমদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর এর অশুভ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। অনেক সময় চোর ডাকাতদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে অনেকের উৎপাদন পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

ঝ. আমানতের খিয়ানত করে সম্পদ উপার্জন

বস্তুতঃ আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। যে সমাজের মানুষের মাঝে এ গুণটি অনুপস্থিত, সে সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। কেননা নানা প্রয়োজনে একজনের সম্পদ অন্যজনের কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়। আবার অনেক সময় নানা কারণে একজনের সম্পদ অন্যজনের হাতে চলে যায়। যেমন পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হিসেবে বোনদের প্রাপ্য সম্পদ স্বাভাবিক কারণেই ভাইদের হাতে গচ্ছিত থাকে। কিন্তু কারো কাছে গচ্ছিত সম্পদ যদি যথাসময়ে যথাযথভাবে ফেরৎ না পাওয়া যায় কিংবা যদি তা আদৌ না পাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে আমানতকারীর পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ কারণে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমানতকে তার যথা প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমানতকে তার যথা প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমানতের খিয়ানত করার ইয়াহুদী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما.

তাদের মাঝে কেউ কেউ এমন রয়েছে যে, যদি তুমি তার নিকট এক স্তূপ সম্পদও গচ্ছিত রাখ তাহলে সে তা ফিরিয়ে দিবে। আবার তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যার নিকট তুমি এক দিনার আমানত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দিবে না যদিনা তুমি সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক।

অতএব কারো প্রাপ্য হক আদায় না করে কেউ যদি সম্পদ সঞ্চয় করে তাহলে তা অবশ্যই বৈধ হবে না।

www.eelm.weebly.com

ঞ. মজুদদারী, কালোবাজারী ও ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন

অধিক লাভের প্রত্যাশায় পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে গুদামজাত করে রেখে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করাকে বলে মজুদদারী। মজুদকৃত পণ্য সংকটকালে অধিক লাভে পশ্চাৎদ্বারে বিক্রি করাকে বলে কালোবাজারী। আর অধিক মুনাফার লোভে উন্নত পণ্যের সাথে নিম্নমানের কোন পণ্য কিংবা মূল্যহীন কোন দ্রব্য মিশ্রিত করে উত্তম পণ্যের দরে বিক্রি করাকে বলে ভেজাল দেয়া।

ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে এসকল পন্থা সচরাচর অবলম্বন করে থাকে। অথচ সুলভ মূল্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে গুদামজাত করে রাখলে সর্বসাধারণ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করতে হয়। অধিক মাত্রায় পণ্য মজুদ করার কারণে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। মূল্য বৃদ্ধির কারণে দ্রব্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে চলে যায়। আর ভেজাল দেয়ার কারণে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এসবের পরিণতিতে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ ধরনের সমুদয় পন্থাকেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে। ইমাম মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

من احتكر فهو خاطئ যারা (অধিক মুনাফার প্রত্যাশায়) পণ্য সামগ্রী মজুদ করে রাখে তারা পাপী। বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী মজুদ করে সর্বসাধারণকে ক্ষুধা কিংবা ভয়াবহ মৃত্যুর দিকে যাতে ঠেলে দেয়া না হয় এ বিষয়ের প্রতি তিনি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। ইমাম বায়হাকী তার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে ঃ

نهى رسول الله ص أن يحتكر الطعام

খাদ্যদ্রব্য মজুদ করতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে ঃ

من احتكر طعامًا أربعين ليلة برئ من الله وبرئ منه

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে, সে আল্লাহর দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ও তার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান।

– আহমদ, হাকেম

من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة.

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে; পরে যদি সে তা সাদকাও করে দেয়, তবুও তার গুনাহের কাফ্ফারা হবে না। – রযীন

মজুদদাররা কী জঘন্য মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করতে যেয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

www.eelm.weebly.com

بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح .

মজুদদার কী জঘন্য ব্যক্তি যে, যদি আল্লাহ তা'আলা দাম কমিয়ে দেন (যা দ্বারা সর্বসাধারণের জীবন রক্ষা পায়) তাহলে সে বিষণ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যায়, আর যদি দাম বৃদ্ধি করে দেন (যা দ্বারা মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে) তাহলে সে খুশি হয়।
– মুসলিম

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, যেসকল পন্থায় অবাধ ক্রয় বিক্রয় ও ধন বিনিময় ব্যাহত হয়; ইসলামী অর্থনীতি সেসকল পন্থাকে অনুমোদন দেয় না। যদি ব্যবসায়ীরা পণ্য মজুদ করে রেখে অধিক মুনাফা লুটার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়; তাহলে রাষ্ট্র এহেন প্রবণতা রোধের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে এবং মজুদকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত করে; ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। – তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- ৫ম খন্ড পৃ ঃ ২৮২

উল্লেখ্য যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের জমির ফসল থেকে নিজের ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফসল সঞ্চয় করে রাখে, তাহলে এটা মজুদদারীর পর্যায়ে পড়বে না। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে ঃ

فى هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وإن هذا لا يقدح فى التوكل وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبى ص.

উক্ত হাদীসের আলোকে সাম্বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখা এবং পরিবার পরিজনের জন্য জমা করে রাখা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। আর এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয়। ফিকাহ্বিদগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ব্যক্তি যদি তার নিজস্ব গ্রাম ও অঞ্চল থেকে (তার প্রয়োজন পরিমাণ) মজুদ করে, তাহলে তা অবশ্যই বৈধ হবে। কেননা নবী (সা.)-এর বেলায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। – নববী-শরহে মুসলিম

তবে বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে পরিবার পরিজনের সাম্বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য খাদ্য মজুদ করতে চাইলে বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ যদি সে সময় দেশে খাদ্য সংকটের অবস্থা বিরাজিত থাকে; তাহলে তা বৈধ হবে না। এহেন মুহূর্তে কেউ অল্প ক'দিন বা এক মাসের জন্য খাদ্য মজুদ করতে চাইলে, তাদ্বারা যদি অন্যান জনগণের খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশংকা না থাকে; তাহলে তা বৈধ হবে। তবে সাধারণ অবস্থা বিরাজকালে এক বছর বা তার অধিক কালের জন্য খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করতে কোন দোষ নেই। – তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খন্ড পৃ. ২৮২

www.eelm.weebly.com

বস্তুতঃ ব্যবসায়ীদের কুটিল কারসাজির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাষ্ট্র দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিবে; এ অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। অতএব স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য উঠানামা করলে; সে ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়ার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের নেই। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

ত. বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করলেও এরূপ বল্গাহীন অধিকার কখনই প্রদান করে না, যাতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয় কিংবা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়।

অর্থনৈতিক সংকট ও বিপর্যয়ের একটি অন্যতম কারণ হল বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য ও আধিক্য। কেননা যে জাতিতে বিলাসদ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে, সে জাতি অর্থনৈতিকভাবে ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত ও পঙ্গু হয়ে পড়বে। তদুপরি বিলাসী জীবন যাপন করতে যেয়ে মানুষের উপার্জনের সাথে চাহিদার অসঙ্গতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে দুর্নীতি সেই সমাজে হুঁ হুঁ করে বৃদ্ধি পাবে। মহিলাদের অপ্রয়োজনীয় অলংকার, সাজসজ্জার উপকরণ, রংবেরংয়ের পোষাক, ফ্যাশনসামগ্রী, লৌকিকতা প্রদর্শনের নিমিত্তে অহেতুক আসবাবপত্র সংগ্রহের প্রবণতা, চিত্তবিনোদনমূলক সামগ্রী ক্রয় করে অপব্যয়ের নেশা সে সমাজে এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, সেই বাড়তি চাপ কাটিয়ে উঠার জন্য মানুষ অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনে প্রবৃত্ত হবে।

তাছাড়া এ ধরনের প্রবণতার ফলে মানুষের সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পরিবর্তে; বিলাস ও প্রসাধনী সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। মানুষের মেধা ও শ্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এগুলোর পিছনে ব্যয় হবে। শিল্পী ও কৌশলীদের দৃষ্টি এগুলোর পিছনেই নিবদ্ধ হয়ে পড়বে। ব্যবসা বাণিজ্যেও এসব সামগ্রী প্রাধান্য পাবে।

ফলে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। কৃষি ও জনকল্যাণমূলক শিল্প কারখানার উৎপাদনে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হবে। প্রয়োজনীয় খাতে মানুষের মেধা ও শ্রম তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় হবে। তদুপরি এসকল প্রয়োজনীয় খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে নীচ ও হীন জ্ঞান করা হবে। ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর খাতগুলো মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের শিকার হবে। এতে সাধারণ আয়ের মানুষ মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

www.eelm.weebly.com

সাধারণতঃ এসব বিলাস সামগ্রী ও প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার তারাই করে থাকে, যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এবং বাড়তি আয় উপার্জন করে থাকেন। এ ধরনের লোকের সংখ্যা সবসময়ই সীমিত হয়ে থাকে। আর এই সীমিত সংখ্যক লোকের বিলাসী আকাংখার বলি হয় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। তদুপরি এই বিলাসীদের দেখাদেখি স্বল্প আয়ের মানুষও বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করণের প্রবণাতায় লিপ্ত হয়। অথচ এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সচ্ছলতা তাদের থাকে না। ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়েই অবৈধ পথের সন্ধান করতে হয়। এর পরিণতিতে ব্যাপক আর্থিক ও নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রখ্যাত দার্শনিক শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণসমূহের মধ্যে বিলাস সামগ্রীর প্রতি অধিক ঝোঁক প্রবণতা হল অন্যতম। সম্মান ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের বাতিল পথগুলোর মধ্যে এটি হলো সবচেয়ে বড়।

তিনি লিখেছেন যে, সমাজের ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল এই যে, বিত্তবানরা অলংকারাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-ঘর ও পানাহারের বিলাসী উপকরণ ও নারী সৌন্দর্য চর্চার ন্যায় অতি সুক্ষানুভূতির বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে এবং অতিমাত্রায় বিলাসী জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হবে। এর পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, মানুষ কঠিন ও জটিল বিপদে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। বিশেষ করে যারা কৃষি, ব্যবসায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্প ও কারিগরি খাতের উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত থাকবে; তারাই বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। পরিণামে এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিপর্যয় অন্য অঞ্চলে, এক দেশের বিপর্যয় অন্য দেশে সংক্রামিত হবে। এক পর্যায়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ এ বিপর্যয়ের দায়ভারে ধ্বংসের শিকারে পরিণত হবে।

– হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২য় খন্ড

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এক সময় এ ব্যাধি গোটা আজমে (অনারবে) ছড়িয়ে পড়েছিল, এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা.)-এর অন্তরে একথা উদ্রেক করলেন যে, এ ব্যাধির এমন চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন; যাতে এই ভ্রান্ত সভ্যতার ভিত চিরদিনের জন্য নির্মূল হয়ে যায়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই লৌকিক সভ্যতার ভিত্তি হল পুরুষদের পোষাকী বাহার তথা রেশমী বস্ত্রের কোমল পরশের অহংবোধী অনুভূতি; নৃত্য-সঙ্গীত তথা গায়িকাদের প্রতি আসক্তি এবং অলংকার ও জাঁক-জমকের মোহ, আর সোনা-রূপার অসম লেনদেনের উপর। এ কারণেই রাসূল (সা.) উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং এজাতীয় অন্যান্য বিষয় নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তিনি এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, নিত্যনতুন উদ্ভাবিত এসকল ধ্বংসাত্মক বিলাস প্রিয়তার অবসান ঘটাতে হবে এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতে হবে। (–হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা)। নবী করীম (সা.)-এক হাদীসে বড় সুন্দর করে এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ঃ

www.eelm.weebly.com

كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل،

দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস কর যে, যেন তুমি বিদেশ থেকে আগত কিংবা পথিক।

আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.

মোটেই অপব্যয় করো না, অবশ্যই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

অনেক সময় এ ধরনের বিলাস সামগ্রী আমদানি করতে যেয়ে দেশের বিপুল পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করা হয়। অথচ এই মুদ্রা দিয়ে মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় কোন পণ্য বা মেশিনারী আমদানি করা সম্ভব হতো। তা না করে এসব বিলাসী পণ্য আমদানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করা হয় – যে বিলাসী পণ্যগুলো না হলেও মানুষের জীবন নির্বাহে কোন সমস্যা দেখা দেয় না।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, যদি এ ধরনের বিলাসী পণ্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হয়; তাহলে এ দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যায় এবং দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দারিদ্র নির্মূল করা সম্ভব হয়।

কিন্তু এসব বিলাসী উপকরণ; উৎপাদনকারী দেশের জন্য লাভ বহন করে আনলেও ভোক্তাদের ক্ষতিকে অপরিহার্য করে তুলে। এ কারণে বিশ্ব মানবতার ধর্ম ইসলাম এটাকে অনুমোদন করেনি। তদুপরি বিলাসীদের বিলাস বাসনা পূর্ণ করতে যেয়ে অগণিত মানুষের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বিলাসিতা বর্জন করে সকল মানুষের প্রয়োজন মিটানোর বিষয়টিকে ইসলাম সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং বিলাসী জীবনকে নিরুৎসাহিত করেছে। এমনকি কিছু কিছু বিলাসী উপকরণকে নিষিদ্ধও ঘোষণা করেছে। উপরন্তু যেসব বিলাসী উপকরণ মানুষের নৈতিক দিককে ধ্বংস করে, সে সমুদয় বিষয়কে ইসলাম হারাম ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।

থ. জুয়া, হাউজী, লটারী, বাজি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন

জুয়া হল অর্থ-সম্পদ লেনদেনের এমন শর্তযুক্ত চুক্তি যা হার-জিতের উপর নির্ভরশীল, যা দ্বারা দু'পক্ষের একপক্ষ সমূলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আর অপরপক্ষ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই প্রথম পক্ষের অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। আর এক পক্ষের লাভ অন্য পক্ষের ক্ষতির উপর নির্ভরশীল। ফলে একপক্ষ জিতলে লাভবান হয় আর অপরপক্ষ পরাজতি হয়ে বা হেরে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে কেবল ক্ষতিগ্রস্থই হয়।

ইসলাম এ ধরনের খেলা বা ব্যসায়ী লেনদেনের সমুদয় চুক্তিকে বাতিল বলে

www.eelm.weebly.com

ঘোষণা করেছে। লেন-দেনের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে জুয়াকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ

ক. জুয়া খেলা ঃ আমাদের দেশে জুয়ারুরা টাকা-পয়সা দিয়ে যে জুয়া খেলে থাকে, তারও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন ঃ তাস খেলায় যে জিতবে সে ১০০ টাকা পাবে, এ টাকা পরিশোধ করবে তার সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণকারী পরাজিত অন্যান্য সঙ্গীরা। পাশা খেলাও এক ধরনের জুয়া খেলাই বটে। তাছাড়া পটের খেলা বা আধুনিক হাউজী খেলাও জুয়া খেলারই আধুনিক পদ্ধতি।

খ. আধুনিক হাউজী ও লটারী ঃ জুয়ার যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তাতে আধুনিক কালের লটারীর টিকেট বিক্রি করে; টিকেট ক্রয়কারীদের জন্য লটারীর মাধ্যেমে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তাও জুয়ারই এক প্রকার নতুন সংস্কারণ। কেননা যারা পুরস্কার পায় না, তারা যে ১০ টাকা কিংবা ২০ টাকা দিয়ে টিকেট ক্রয় করে থাকে; সে টাকার বিনিময়ে তারা কিছুই পায় না। অর্থাৎ এ দশ টাকা তার গচ্ছা যায়। এ টাকা হাতিয়ে নেয় উদ্যোক্তারা, যার অংশ বিশেষ তারা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে বন্টন করে থাকে। ফলে উদ্যোক্তারা প্রতি টিকেটের বিনিময়ে ১০ টাকা করে সংগ্রহ করে লাখো-কোটি টাকার নিশ্চিত মালিক বনে যায়। আর টিকেট ক্রয়কারীরা লটারী না পেলে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ফলে এক পক্ষ টাকার কুমির বনে যায় অন্য পক্ষের ভরাডুবির মাধ্যমে।

লটারী মূলতঃ লাভবান হওয়ার লোভ দেখিয়ে স্বল্পমাত্রায় ব্যাপক ভিত্তিতে শোষণের এক অভিনব প্রক্রিয়ামাত্র। কেননা উদ্যোক্তারা রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে ১০ টাকা বা ২০ টাকা করে যে পরিমাণ টিকেট বিক্রি করেন, তার আয় থেকে তারা পুরস্কারের টাকা পরিশাধ করেও লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে থাকেন। বিনা পুঁজিতে, কোনরূপ ঝামেলা না পোহিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা কামানোর এটি একটি অভিনব কৌশল। কেননা যারা ১০ টাকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে যাওয়ার আশায় টিকেট সংগ্রহ করে থাকে, তারা কিন্তু শোষণের পরিমাণটা কোনদিনই অংকে কষে দেখে না। তাদের সামনে থাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির স্বপ্ন। অথচ এই পথে উদ্যোক্তারা রাতারাতি পুঁজিপতি হয়ে যায়। আর লোভের বশবর্তী হয়ে শোষিত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু পরিমাণে অল্প বলে কেউ গায়ে লাগায় না। অথচ বাস্তবে এতে দেশের জনগণ বিপুল অংকের টাকা গচ্ছা দিয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

গ. ব্যবসায়ী জুয়া ঃ ব্যবসায়ী জুয়া বলতে এমন ধরনের ব্যবসায়ী চুক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে, যে চুক্তিতে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ, আর অপর পক্ষের

www.eelm.weebly.com

নিশ্চিত ক্ষতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষতি মেনে নেয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি চুক্তির শর্তানুসারে বাধ্য হয়ে পড়ে। এ ধরনের কিছু কিছু চুক্তির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যথা ঃ মুলামাসা, মুনাবাযাহ, বাইবিল হাসাত ইত্যাদি।

মুলামাসা ঃ মুলামাসার অর্থ স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়। যেমন ১০০ টাকা ২০০ টাকা ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা মূল্যের চারটি পণ্য পাশাপাশি রেখে এ মর্মে ক্রেতার প্রতি শর্তারোপ করা হত যে, তুমি চক্ষু বন্ধ করে এসে প্রথম যেটিই স্পর্শ করবে সেটিই তুমি ৫০০ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। যদি ঘটনাক্রমে ১০০ টাকার পণ্যে হাত লেগে যেত; তাহলে বিক্রেতা লাভবান হত। আর যদি ১০০০ টাকার পণ্যে হাত লেগে যেত তাহলে ক্রেতা লাভবান হত।

মুনাবাযাহ ঃ মুনাবাযার অর্থ নিক্ষেপণের মাধ্যমে বেচা-কেনা। উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মূল্যের কয়েকটি দব্য একত্রে রেখে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে এই মর্মে চুক্তি হত যে, একজনের চোখ বেঁধে দেয়া হবে, সে এসে এই পণ্যগুলোর যে কোন একটি হাতে উঠিয়ে ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করবে; সে যেটিই উঠিয়ে নিক্ষেপ করুক, সেটিই ৫০০ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করার জন্য ক্রেতা বাধ্য থাকবে।

বাইবিল হাসাত ঃ বাইবিল হাসাত এর অর্থ হল প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে বেচা-কেনা করা। উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মূল্যের পণ্য সাজিয়ে রেখে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে এ মর্মে চুক্তি হত যে, ক্রেতা একটি বির্ধারিত দূরত্ব থেকে (যেমন-১০০ গজ) পণ্যগুলো লক্ষ্য করে একটি পাথর বা এ জাতীয় কিছু নিক্ষেপ করবে। পাথরটি যে পণ্যের গায়ে লাগবে; সেটি তিনি ৫০০ বা ৩০০ টাকার বিনিময়ে নেয়ার জন্য বাধ্য থাকেবেন।

উপরোল্লিখিত সকল পদ্ধতিতেই ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা যদি ক্রেতা ১০০ বা দুইশত টাকার পণ্য পেয়ে যায় তাহলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়; বিক্রেতা লাভবান হয়। কিন্তু যদি ক্রেতা ১০০০ টাকার দ্রব্য পেয়ে যায় তাহলে সে লাভবান হয়; বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যাই হোক প্রক্রিয়াগুলোতে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ ও অন্য পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বিধায় ইসলাম এ ধরনের সকল বেচা-কেনার প্রক্রিয়াকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আধুকি লটারীকে সেসব পদ্ধতির আধুনিকায়ণ বলা চলে। তাই এটিও নিষিদ্ধ নিঃসন্দেহে।

তাছাড়া তীরের সাহায্যে ভাগ বন্টনের একটি প্রথা সেযুগে প্রচলিত ছিল। যেমন ৭ জনে সমান হারে টাকা দিয়ে ১টি গরু ক্রয় করতঃ তা জবাই করে সাতটি অসম ভাগে বন্টন করা হত। যেমন ঃ ধরা যাক গরুর গোস্ত হল ৮০

www.eelm.weebly.com

কেজি। তা ভাগ করা হত এভাবে যে, এক ভাগে ২৫ কেজি, আরেক ভাগে ২০ কেজি, আরেক ভাগে ১৫ কেজি, আরেক ভাগে ১০ কেজি, আরেক ভাগে ৫ কেজি, আরেক ভাগে ৩ কেজি এবং আরেক ভাগে ২ কেজি।

অতঃপর একজন লোকের চোখ বেঁধে দিয়ে তার হাতে ৭টি তীর দেয়া হত। সে ঐ ভাগগুলোর দিকে এক একজন শেয়ারের নাম নিয়ে একটি করে তীর নিক্ষেপ করত। যার নামের তীর যে ভাগে গিয়ে পড়ত; সে সেই ভাগ নেয়ার জন্য বাধ্য থাকত।

যেহেতু এই সমুদয় পদ্ধতিতেই জুয়ার প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে; এ কারণে ইসলাম এই সমুদয় প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা ইসলাম নীতিগতভাবেই এসব প্রক্রিয়াকে ব্যবসার জন্য ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর মনে করে। তাছাড়া এসব প্রক্রিয়া বৃহৎ মানে কার্যকর হলে এরই পরিণতিতে গড়ে উঠে পুঁজিপতি শ্রেণী। সকল প্রকার জুয়াই সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের জন্য মারাত্মক ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনে। জুয়া দ্বারা যেসব সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি দেখা দেয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. জুয়ার দানে হারতে হারতে অনেক বিত্তবান ব্যক্তি সর্বস্ব হারিয়ে পথের ফকীর হয়ে যায়। সুসজ্জিত পরিবার সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়।

২. জুয়াড়ী সর্বস্ব হারানোর পর কূল-কিনারা না পেয়ে চুরি-ডাকাতির ন্যায় জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করে সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে। অন্যথায় পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

৩. পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ, আত্মকলহ, মারামারি ও হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়।

৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি, সংবেদনশীলতা, ভদ্রতা ও ন্যায়-পরায়ণতাকে ধ্বংস করে। জুয়াড়ীর অন্তর থেকে মনুষ্যত্ববোধ, অন্যের কল্যাণকামিতার মনোবৃত্তি খতম হয়ে যায়।

৫. জুয়াড়ীর অন্তরে অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়ার মনোবৃত্তি জন্মগ্রহণ করে।

৬. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি মানসিক টেনশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়। যেমন ঃ প্রেসার, ডায়বেটিকস্ ইত্যাদি যা বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়ে থাকে।

৭. ভাগ্যক্রমে সম্পদ পেয়ে যাওয়ার আশায় আশায় জুয়াড়ী শ্রম ও মেহ্নতবিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যে কারণে শ্রম দিয়ে কষ্ট করে

www.eelm.weebly.com

উপার্জনের মানসিকতা তাথেকে লোপ পায় এবং সে তার মেধাকেও উপার্জনের কাজে ব্যয় করে না। ফলে এদের শ্রম ও মেধা থেকে জাতি বঞ্চিত হয়।

৮. জুয়া মানুষকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায থেকে বিরত রাখে।

৯. জুয়া খেলতে যেয়ে অজস্র সময়ের অপচয় হয়, যা ব্যয় করলে অনায়াসেই স্বাভাবিক জীবন নির্বাহের জন্য উপার্জন করা সম্ভব হত।

জুয়ার উপরোল্লিখিত ক্ষতির দিকগুলো চিন্তা করেই ইসলাম জুয়ার যাবতীয় প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্‌-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.

(হে মুহাম্মদ!) তারা আপনাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন এ দু'টোর মাঝে বিরাট পাপ নিহিত রয়েছে, আর মানুষের কিছু উপকারও এতে রয়েছে। তবে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.

নিশ্চয়ই শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। সুতরাং তোমরা কি এগুলো থেকে বিরত থাকবে? – সূরা ঃ ৫ - মায়েদা ঃ ৯০

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

নিঃসন্দেহে শরাব, জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্য নির্ণায়ক শর, অপবিত্র এবং শয়তানের কর্ম, অতএব তোমরা তা থেকে বিরত থাক।

বাজী রাখার দ্বারা অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়াও মূলতঃ এক ধরনের জুয়া। কেননা এখানেও দুই পক্ষ এই মর্মে শর্ত করে থাকে যে, যদি তুমি জয়ী হও তাহলে আমি তোমাকে ১০০ টাকা দেব আর যদি পরাজিত হও তাহলে তুমি আমাকে ১০০ টাকা দিবে। কিংবা দুই পক্ষের এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, তুমি জয়ী হলে ১০০ টাকা পাবে, আর পরাজিত হলে ১০০ টাকা আমাকে দিবে। এ ধরনের বাজীতেও এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ ও অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। সুতরাং এটিও নিষিদ্ধ।

কিন্তু যদি এক পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করা হয় যে, যদি তুমি জয়ী হও তাহলে ১০০ টাকা পাবে। আর জয়ী হতে না পারলে কিছুই পাবে না। তাহলে এটিকে পুরস্কার বলে গণ্য করা হবে এবং তা বৈধ হবে।

www.eelm.weebly.com

দ. মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থোপার্জন

ব্যবসা বাণিজ্যে মধ্যসত্ত্বভোগী বলে একটা কথা রয়েছে। এর অর্থ হল মূল বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে মধ্যস্থতা (দালালী, মিডেলম্যান, রিসেইলার) করে এক শ্রেণীর লোক অর্থ উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এই মধ্যসত্ত্বভোগীদের কারণে পণ্যের প্রকৃত মূল্য ও মার্কেট প্রাইজ বা ভোক্তাদের ক্রয় মূল্যের মাঝে বিস্তর তফাৎ সৃষ্টি হয়। ফলে মধ্যসত্ত্বভোগীরা না থাকলে ভোক্তারা যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারতেন; তার চেয়ে অনেক বেশি চড়াদামে তাদেরকে পণ্য ক্রয় করতে হয়। এতে সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমনঃ কেউ একটি পণ্য চীন থেকে বাংলাদেশে আমদানি করেছে। ধরা যাক, পণ্যটি হল কাঠপেন্সিল। আমদানিকারক প্রতিটি কাঠপেন্সিল ১.০০ টাকায় ক্রয় করেছে। তার পরিবহণ খরচ যদি প্রতি পেন্সিলে .১০ পয়সা পড়ে থাকে; তাহলে এই পেন্সিল সে ১.২০ টাকা দরে বাজারজাত করতে পারে। কিন্তু পণ্য এসে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই যদি আমদানির কাগজপত্রগুলো সে অন্য ব্যবসায়ীর কাছে ১.২০ টাকা দরে বিক্রি করে ফেলে; তাহলে উক্ত ব্যবসায়ী পণ্য বন্দরে এসে পৌঁছার পর সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট বাজারজাত করতে যেয়ে আরো কিছু লাভ করতে চাইবে। ধরা যাক সেই লাভ যদি শতকরা ১০ টাকা হয়; তাহলে উক্ত ব্যবসায়ী একটি পেন্সিল কমপক্ষে ১.৩০ টাকা দরে সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট বাজারজাত করবে। সাধারণ ব্যবসায়ীরা ভোক্তাদের নিকট তা অবশ্যই ১.৪০ টাকা দরে বিক্রি করবে।

যদি আমদানিকারক নিজেই পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্যটি বিক্রি করত তাহলে ১.২০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারত। আর সাধারণ (পাইকারী) ব্যবসায়ীরা ১.৩০ টাকা দরে ভোক্তাদের নিকট তা বিক্রি করতে পারত। কিন্তু অন্য একজন ব্যবসায়ী (মিডেল ম্যান বা রিসেইলার) মাঝখানে আসার কারণে ভোক্তাদেরকে পেন্সিল প্রতি .১০ পয়সা বেশি দিয়ে তা ক্রয় করতে হল।

এ ধরনের মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্মের কারণে ভোক্তাদেরকে বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্ছা দিতে হয়। এ কারণে ইসলাম এহেন প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। একই কারণে দালালী ও আড়ৎদারী ব্যবসাকেও ইসলামী অর্থনীতিতে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে (হিদায়া দ্রষ্টব্য)। তবে আড়ৎদার যদি তার দোকানে পণ্য রাখার জন্য ভাড়া দাবী করে তাহলে ভাড়া দেয়া ও নেয়া বৈধ হয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পদের মালিকানা ও তার প্রকারভেদ

মালিকানা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা ঃ মালিকানা শব্দটি সাধারণ অর্থে ক্ষমতা বা অধিকার লাভের অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মিলকিয়্যাতুন্ (ملكية)- মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অতএব কোন বস্তুর উপর মিলকিয়্যাত লাভের অর্থ হল, সে বস্তুতে অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়া। আর কোন রাষ্ট্রের মিলকিয়্যাত লাভের অর্থ হল, সে রাষ্ট্রের জনগণের উপর আইন-কানুন ও আদেশ-নিষেধ জারি করার অধিকার সৃষ্টি হওয়া। বর্তমানে মিলকিয়্যাত শব্দটি মালিকানার অর্থে ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করা হয় – তা সেই মালিকানা যে কোন ক্ষেত্রে, যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করা হয় না। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে মালিকানা বলতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকেই বুঝায়। অতএব তাদের কাছে মালিকানার অর্থ হল সম্পদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার।

মালিকানা সম্পর্কে পশ্চিমা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করেন; সেটাই মূলতঃ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল উৎস। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন আস্টিন (JOHN AUSTIN) মালিকানার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'মালিকানা মূল অর্থের দিক থেকে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর প্রদত্ত এক ধরনের অধিকার যা ভোগ ব্যবহারের দিক থেকে অসীম এবং ব্যয় ও হস্তান্তরের ব্যাপারে বাধাহীন ও শর্তহীন'। - LECTURES ON JURIS PRUDUACE VOL-II, P.790.

পুঁজিবাদের মনস্তাত্ত্বিক পট–ভূমিকা যেহেতু কাল্পনিক অথবা কার্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক তাই এ দর্শনের কাছে মানুষ নিজ উপার্জিত সম্পদের উপর সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেভাবে ইচ্ছা সে মাল-সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখতে পারে, ভোগ-ব্যয় করতে পারে। কিন্তু এরূপ স্বেচ্ছাচারী অধিকার যে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে; তা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই কুরআনে কারীমে এরূপ অবাধ, স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। হযরত শো'আয়ব (আ.) যখন তার সম্প্রদায়কে মাল-সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানালেন; তখন তারা বলেছিল ঃ

قالوا يشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل فى أموالنا ما نشاء

www.eelm.weebly.com

তারা বলল, হে শো'আয়ব! আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে পুঁজো দিয়ে আসা দেবদেবীদেরকে বর্জন করতে, আর স্ব-উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতেই কি তোমার সালাত তোমাকে নির্দেশ দেয়।

– সূরা ঃ ১১ - হুদ ঃ ৮৭

তারা নিজেদের অধিকারভুক্ত ধন-সম্পদকে প্রকৃতপক্ষেই নিজেদের বলে মনে করত, তাই সেগুলোর যথেচ্ছা ব্যবহারের দাবী এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে তাদের থেকে উত্থিত হয়েছিল। আর আধুনিক পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সারকথাও এই, অর্থাৎ সম্পদ যেহেতু আমার তাই আমি যথেচ্ছা তা ব্যবহার করব। এ দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যই কুরআনে কারীমের সূরায়ে নূরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وآتوهم من مال الله الذى آتاكم

তাদেরকে আল্লাহর ঐ সম্পদ থেকে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন।

– সূরা ঃ ২৪ - নূর ঃ ৩৩

বর্ণিত আয়াতে 'তোমাদের সম্পদ থেকে' না বলে (من مال الله) 'আল্লাহর সম্পদ' বলে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার মূলে আঘাত করা হয়েছে। একই সঙ্গে الذى آتاكم 'যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন' এ বলে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মূল কেটে দেয়া হয়েছে – যাতে ব্যক্তি মালিকানাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। আর এ দুই প্রান্তিকতার মধ্যেই আসল সত্য, তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থা – যেখানে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করা হয়েছে, তবে তা অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। বরং তাতে সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের (তথা আয়-ভোগ-ব্যয়ের) শর্তরোপ করা হয়েছে। যাতে কোন অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে।

এ কারণেই ইসলাম তার সকল পরিভাষায় এমন শব্দ প্রয়োগ করেছে যাতে ঐ নিরঙ্কুশ মালিকানার কোনরূপ আভাস ইঙ্গিত বা গন্ধ পর্যন্ত না থাকে। তাই ইসলামী ফিকাহ্‌বিদরা মালিকানার সংজ্ঞা নিম্নোক্ত শব্দে দিয়েছেন ঃ

الملك فى اصطلاح الفقهاء أنه حكم شرعى مقدر فى العين أو فى المنفعة يقتضى تمكين من يضاف إليه من الإنتفاء بالمملوك والعرض عنه من حيث هو كذلك .

অর্থাৎ মালিকানা হল বস্তু কিংবা তার মুনাফায় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এক ধরনের অধিকার, যিনি তা লাভ করবেন, তিনি তার মালিকানাধীন বস্তু কিংবা তার মুনাফা ভোগ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে তা হস্তান্তর করতে পারবেন।[১]

---

১. مادة الملك من مفردات فى غريب القران

www.eelm.weebly.com

আল্লামা ইবনে নুজায়ম তার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আশবাহ্ ওয়ান্ নাযায়ের' এ মালিকানার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

الملك قدره يثبتها الشارع ابتداء على التصرف إلا لمانع .

মালিকানা হল এক ধরনের অধিকার যা স্বাভাবিক অবস্থায় শরীয়তের বিধানদাতা কর্তৃক ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার সূচিত করার জন্য প্রদত্ত হয়।[২]

মালিকানার প্রকারভেদ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা - ১. ব্যক্তিগত সম্পদ, ২. সামষ্টিক সম্পদ, ৩. জাতীয় সম্পদ, ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ।

ইসলামী অর্থনীতিতে এই চার ধরনের মালিকানার ধারণা অনুপস্থিত। বরং ইসলামে তিন ধরনের মালিকানার কথাই পরিচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা জাতীয় মালিকানার কোন ধারণা ইসলামী অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না। এ কারণে যে, মালিকানার জন্য অবশ্যই ক্ষেত্র (বা مملوك) থাকতে হবে। কিন্তু জাতীয় মালিকানার জন্য পৃথক কোন ক্ষেত্র (বা মামূলূক) নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানাকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ ১. ব্যক্তিগত মালিকানা, ২. সামষ্টিক মালিকানা।

সামষ্টিক মালিকানাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ ১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ২. সার্বজনিন মালিকানা বা আন্তর্জাতিক মালিকানা।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যাবতীয় সম্পদ মূলতঃ রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণেই নিবেদিত। তাছাড়াও জনগণ কর্তৃক যে সম্পদ সর্বসাধারণের কল্যাণে নিবেদিত হয়; তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'আওকাফ' বলা হয়। এগুলোও মূলতঃ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অতএব এগুলোও রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত বলেই গণ্য হয়। জাতীয় মালিকানার আইনগত কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও আন্তর্জাতিক মালিকানার জন্য পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্ধারিত রয়েছে অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে সার্বজনীন মালিকানা রয়েছে; সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানা নেই। আবার যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা রয়েছে; সেসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানা নেই। আবার যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা রয়েছে; সেখানে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক মালিকানা নেই অর্থাৎ মালিকানার এই তিনটি পর্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক ক্ষেত্র (مملوك) রয়েছে। তবে জাতীয় মালিকানা বলতে আধুনিক

---

২. الاشباه والنظائر صـ ٢٩٤

www.eelm.weebly.com

অর্থনীতিতে যা বুঝানো হয়েছে, তার জন্য পৃথক কোন ক্ষেত্র (অর্থাৎ ملوك) নেই। কেননা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমষ্টিই মূলতঃ জাতীয় মালিকানার ক্ষেত্র বা ملوك । অতএব এটি ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাইরে কিছু নয়। সুতরাং জাতীয় মালিকানা বলে পৃথক একটি মালিকানার খাত সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের আওতায় যে সম্পদ থাকে (তা ব্যক্তি মালিকানাভুক্তই হোক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্তই হোক) তার উপর রাষ্ট্রের সকল মানুষেরই এক ধরনের অধিকার থাকে – এ অর্থে যে, এটি এদেশেরই সম্পদ; অন্য দেশের নয়। অতএব দেশীয় সম্পদ হিসেবে এর যথার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণের এক ধরনের প্রচ্ছন্ন অধিকার সকল নাগরিকেরই থাকে। জাতীয় মালিকানা বলতে ঐ প্রচ্ছন্ন অধিকারগত মালিকানা ছাড়া অন্য কোন অর্থ দাঁড়ায় না। তাই এটির আইনগত কোন ভিত্তি নেই।

সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক মালিকানা

১, প্রকৃতিতে বিদ্যমান এমন কিছু কিছু উপাদান রয়েছে; যার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এসকল উপাদানের উপর বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দেশ বা জাতির একচেটিয়া মালিকানা বা কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়াকে ইসলাম যুক্তিসঙ্গত মনে করেনি বরং এসকল উপাদানকেই ইসলাম সার্বজনীন কল্যাণার্থে উন্মুক্ত রেখে দিয়েছে, যাতে সকল মানুষই নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অবাধে গ্রহণ করতে পারে। আর এগুলো আহরণের জন্য তাকে কোনরূপ মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। আধুনিক পরিভাষায় একে সার্বজনীন মালিকানা বা আন্তর্জাতিক মালিকানাও বলা হয়। যেমনঃ আলো, বাতাস, নদী-নালা ও সাগরের পানি, পানিস্থ অন্যান্য সম্পদ যথাঃ মনি-মুক্তা, প্রবাল, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী, পানিতে মিশ্রিত লবণ, গভীর অরণ্য, অরণ্যের জন্মানো পশুপাখি ও প্রাণী, বিশালায়তন মরুভূমি ও তথাকার প্রাণী, স্বাভাবিকভাবে জন্মানো গুল্মলতা ও তার ফল-মূল, ঘাস ও তৃণলতা, ভূমির উপরিভাগস্থ খনিজ পদার্থ যথাঃ লবণ, সুরমা, ডানবির ইত্যাদি।

এ ধরনের যাবতীয় জিনিস সার্বজনীন মালিকানাধীন। সকলের জন্যই এগুলো উন্মুক্ত থাকবে, সকলেই এগুলো থেকে যথাপ্রয়োজন পরিমাণ আহরণের অধিকার রাখবে।[৩]

---

৩. তবে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ কোন ব্যক্তি আহরণ করার পর আহরিত অংশে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং আহরণজনিত শ্রম তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সে বিক্রি করতে পারবে। যেমনঃ নদীর পানি কেউ মশকে করে নিয়ে যদি বাজারে বিক্রি করতে চায় তাহলে সে তা পারবে।

www.eelm.weebly.com

রাসূলে করীম (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস থেকে এসকল সম্পদের সার্বজনীনতার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلاء والنار وفى رواية الملح بدل النار - كتاب الأموال، أبو داود، كتاب الخراج

সকল মানুষই তিন বস্তুতে সমান অংশীদার যথাঃ পানি, তৃণলতা ও আগুন। অন্য বর্ণনায় ملح বা লবণ শব্দটি বর্ধিত আছে।

হাদীসে উল্লিখিত পানি বলতে প্রাকৃতিকভাবে পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল ও সাগর-মহাসাগরে যে পানি বিদ্যমান থাকে; তা থেকে ব্যবহার করার জন্য সংগৃহীত পানিকে যেমন বুঝানো হবে তেমনি আন্তর্জাতিক নদী, সাগর ও মহাসাগরের পানি এবং সেই পানিতে নৌযান চলাচলের অধিকার ও পানিস্থ অন্যান্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের বিষয়টিকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

তবে আধুনিককালে পানি সম্পদের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করেছে। ফলে পুকুর ও খাল-বিল ও নদী-নালার পানিতে মালিকানার সার্বজনীনতা মানুষ ও প্রাণীর পানীয়ের চাহিদা পূরণ ও নিত্যদিনের ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের সীমা পর্যন্ত অবশ্যই স্বীকৃত থাকবে। এক্ষেত্রে পুকুর, খাল-বিল ও নদী-নালা যে ভূমির উপর বিদ্যমান; তার মালিকানা কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের হাতে ন্যাস্ত থাকলেও উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণ করার অধিকার যে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের লোকের রয়েছে। এ ব্যাপারে ভূমি-মালিকগণ অবশ্যই বাধা দিতে পারবে না এবং এহেন প্রয়োজন পূরণের বিনিময়ে কোনরূপ অর্থও দাবী করতে পারবে না। তবে এসকল ক্ষেত্রের পানি সংরক্ষণ, এই পানিকে চাষাবাদের প্রয়োজনে ব্যবহার, এসকল জলাশয় থেকে মৎস ইত্যাদির আহরণ ও মৎস চাষের অধিকার এবং নৌযান চলাচলের পথ হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অনুকূলে অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। কেননা হাদীসে পানির উপর সার্বজনীন মালিকানার যেকথা বলা হয়েছে; তা অবশ্যই ব্যক্তিগত ব্যবহারের পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বটে। এই অর্থে কুয়ার পানি বা নলকূপের পানিতেও সার্বজনীন অধিকার ব্যাপৃত হতে পারে। যেহেতু হাদীসে الماء শব্দটি (عام) বা ব্যাপক অর্থবোধক, অতএব এর পরিধি কূপ ও নলকূপের পানি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু যেসকল জলভূমিতে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের মালিকানা নেই সেগুলোর সর্ববিদ ব্যবহারের প্রশ্নে সকল দেশ ও রাষ্ট্রেরই সমান অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ এসকল জলাশয়ের উপর নৌযান চলাচল, এগুলো থেকে সম্পদ আহরণ ও পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং পানি থেকে লবণ ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে সকল দেশ ও রাষ্ট্রেরই অধিকার রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

যে সকল নদী আপন উৎস থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে তার পানির বিধান এই হবে যে, নৌযান চলাচলের অধিকার রাষ্ট্রসীমার মধ্যে রাষ্ট্রের অনুকূলে সংরক্ষিত থাকবে। তবে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজন পরিমাণ পানি সংরক্ষণের অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অবশ্যই থাকবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রেখে অন্য রাষ্ট্রের অসুবিধা সৃষ্টির কোন অধিকার থাকবে না। হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে জনৈক আনসারির পানি নিয়ে জটিলতার ঘটনাটি এর জন্য দলিল হতে পারে। ইমাম ইবনে মাজাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক আনসারি ও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পানি সংক্রান্ত একটি বিবাদ রাসূল (সা.)-এর দরবারে পেশ করা হলে, রাসূল (সা.) এ মর্মে ফায়সালা করেন যে, 'হে যুবায়ের! তোমার জমি পানিতে সিক্ত হয়ে গেলে তুমি পানি ছেড়ে দিও।' একথা শুনে আনসারি বলল, 'আপনার চাচাত ভাই বলেই কি এরূপ ফায়সালা করলেন?' এতে রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে যুবায়ের! তোমার বাগানের দেয়ালের গোড়া* পর্যন্ত পানি না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি পানি ছাড়বে না। এথেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও রাষ্ট্র তার প্রয়োজন পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করতে পারবে। তাছাড়া এক হাদীসে সুস্পষ্টই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

ঘাস থেকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি থেকে বাধা দান করা যাবেনা। এ হাদীসের ভাব থেকে বুঝা যায় যে, অন্যের জমির উৎপাদন ব্যাহত করার মানসে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখা যাবে না। —মুয়াত্তা মালিক

পূর্বোক্ত হাদীসে ব্যবহৃত الكلأ। শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে, ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত ভূমিতে; ব্যক্তির কোনরূপ উদ্যোগ ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মে যে তৃণলতা ও ঘাস জন্মে তা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিতে বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমিতে জন্মানো তৃণলতা, বনজঙ্গল ও উদ্ভিদ এবং মরুঅরণ্য ইত্যাদি সবকিছুই এর পরিধিভুক্ত হতে পারে এবং কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত নয় এমন ঘনঅরণ্য ভূমিও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর ব্যবহার বিধিও পানির ব্যবহার বিধির মত হবে।

অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত ভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো তৃণলতা ও ঘাস কারো প্রাণীকে আহার করালে তাতে বাধা দেয়ার অধিকার মালিকের থাকবে না। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমিতে জন্মানো তৃণলতা ও ঘাস ইত্যাদি কোন ব্যক্তির প্রাণী আহার করলে (সে ব্যক্তি এ রাষ্ট্রের নাগরিক হোক বা অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হোক) তাতেও বাধা দেয়া যাবে না। এতদসংক্রান্ত এক হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন যে ঃ

إن الكلاء والراعى لايمنع من السارحة، ليس لأحد أن يستأثره دون سائر الناس.

টীকা ঃ আমাদের দেশে এর অর্থ আইল হবে।

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ঘাস ও নির্ধারিত তৃণভূমিতে আহার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন পশুকে বাধা দেয়া যাবে না। আর এ ধরনের তৃণ-ভূমিতে অপরাপর মানুষকে বঞ্চিত করে কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা লাভের কোন অধিকার নেই।

– মু'আলিমুস্ সুনান - ৩য় খন্ড - পৃ ঃ ৪৩

এক হাদীসে রাসুল (সা.) বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ لاحمى إلا لله ورسوله সকল চারণভূমি ও অরণ্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অধিকারভুক্ত। অর্থাৎ এতে কারো ব্যক্তিগত কোন অধিকার স্বীকৃত হবে না। বরং এগুলো সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উন্মুক্ত থাকবে। তবে সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চারণভূমিতে অন্য রাষ্ট্রের জনগণের প্রবেশাধিকার রহিত করার অধিকার অবশ্যই রাষ্ট্রের পক্ষে সংরক্ষিত থাকবে।

কিন্তু কোন রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত নয় এমন চারণভূমি ও অরণ্যে সকল দেশের নাগরিকদেরই ভোগ-ব্যবহারের সমান অধিকার থাকবে।

অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত হাদীসে ব্যবহৃত الملح শব্দটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে খনিজ লবণ ও সামুদ্রিক লবণ এ দু'টোই এর আওতায় পরে। এমনকি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও যদি কেউ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ লবণ নিয়ে নেয়; তাহলে তাতেও বাধা দেয়া ঠিক হবে না। আর খনি (যদি তা রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হয়) কিংবা সমুদ্র থেকে লবণ আহরণ করার অধিকার রাষ্ট্রের সকল জনগণেরই থাকবে। তবে খনি যদি ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত জমিনে থাকে, তাহলে তার বিস্তারিত বিধান সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

আর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যেসব খনি থাকবে; তা আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে। ১. যে খনি থেকে খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য পর্যাপ্ত শ্রম ব্যয় করতে হয়, ২. যে খনি থেকে সম্পদ আহরণের জন্য কোনরূপ শ্রম ব্যয় করতে হয় না।

শেষোক্ত ধরনের খনিজ সম্পদে সকল মানুষেরই অধিকার থাকবে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় উল্লেখ করেছেন ঃ

ولاشك أن المعدن الظاهر الذى لايحتاج إلى كثير عمل، إقطاعه لواحد من المسلمين، أضرابهم، وتضيق عليهم.

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেসব খনি ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে বিদ্যমান, যা থেকে সম্পদ আহরণে তেমন কোন শ্রমের প্রয়োজন হয় না, তা যদি ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় প্রদান করা হয়; তাহলে এটা অন্যান্য মানুষের জন্য কষ্টকর ও জটিলতার কারণ হবে। – হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ - ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৪।

এর অর্থ হল এটা কারো মালিকানায় প্রদান করা ঠিক নয়। বরং এ ধরনের খনিজ সম্পদে সার্বজনীন অধিকার থাকাই বিধিসম্মত। অর্থাৎ যে কোন লোক তা

www.eelm.weebly.com

থেকে সম্পদ আহরণ করতে পারবে। তবে রাষ্ট্র অবশ্যই তার ভূখন্ডে প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রবেশাধিকার রহিত করার অধিকার রাখবে। কিন্তু যদি রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে তার ভূখন্ডে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহলে সে ব্যক্তিও এসকল খনিজ সম্পদ আহরণের অধিকার প্রদত্ত হবে।

এছাড়াও যেসব জিনিষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষেই অতীব প্রয়োজনীয়, যা কোন ব্যক্তি বা সংস্থার ভোগাধিকারে বা ব্যবস্থাধীনে ছেড়ে দিলে; সর্বসাধরণের সমূহ অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হবে কিংবা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকবে; সেগুলো সার্বজনীন সামগ্রী হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে নীতিনির্ধারণীমূলক বক্তব্য পেশ করেছেন আল্লামা ইবনূল্ কুদামাহ্। তিনি তার প্রখ্যাত গ্রন্থ المغنى তে লিখেছেন ঃ

ملك أحد بالإحتجاج ملك منعة، فضاق على الناس فإن أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن المواضع الذى وضعه الله من تعميم ذوى الحوائج من غير كلفة .

অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রের মালিকানা কোন ব্যক্তিকে নির্ধারিত করে দিয়ে দিলে তা তার অধিকাভুক্ত হয়ে যায়, যার ফলে সেক্ষেত্রে অন্যকে বারণ করার ও বাধা দেয়ার অধিকার তার সৃষ্টি হয়। সুতরাং (এসকল ক্ষেত্রে) এ ধরনের ব্যক্তি মালিকানা প্রদান করলে সাধারণ মানুষের জন্য সংকট সৃষ্টি হবে এবং এগুলো ব্যবহারের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করলে এগুলো দুর্মূল্য হয়ে পড়বে। সুতরাং ব্যক্তি মীলকানা এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে না; যেসকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বিনাকষ্টে ও বিনাব্যয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন পূরণের ব্যাপক অধিকার দিয়ে রেখেছেন।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল, ঐশী প্রতিনিধিত্বমূলক এমন এক প্রতিষ্ঠান; যা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে জনগণকে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জনগণের অধিকারকে নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা ও জনগণের সামগ্রিক উন্নতির মানসে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা, মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত ইবাদত ও বিধি-বিধান সমূহকে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করা রাষ্ট্রের অন্যমত দায়িত্ব।

রাষ্ট্রকে তার দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য এবং সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম এই স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধিকার প্রদান করেছে।

www.eelm.weebly.com

আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললে এভাবে বলা যায় যে, ইসলামে সকলকিছুর মৌলিক মালিকানা আল্লাহ্‌র। রাষ্ট্র হল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। অতএব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সম্পদের প্রাথমিক মালিকানা রা[illegible] লাভ করে। অতপর الخلق عيال الله। 'সমস্ত মাখলুক আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য হিসেবে যথার্থ বিধানের আওতায় তারা এই সম্পদে দ্বিতীয় পর্যায়ের মালিকানা লাভ করে। তবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্র তার নিজের দায়িত্বে রাখতে পারবে। যদিও রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত এসব সম্পদের মালিকানা জনগণের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে - এই অর্থে যে এসব সম্পদের সুফল মূলতঃ জনগণই লাভ করবে এবং জনগণের কল্যাণেই এগুলো ব্যয় হবে।

ইসলামে সমাজতন্ত্রের ন্যায় রাষ্ট্রের যাবতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রাণাধিকার রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়নি। আবার পুঁজিবাদের মত সমস্ত সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা জনগণের হাতেও ন্যাস্ত করা হয়নি। বরং সকল সম্পদের প্রাথমিক মালিকানা রাষ্ট্রের বিধায় ব্যক্তির মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকবে। আবার যাতে ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে কোনরূপ সংঘাত সৃষ্টি না হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানার জন্য পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কোথাও যদি ব্যক্তি মালিকানা ও সমষ্টি মালিকানার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলাম সমষ্টি মালিকানাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। দ্রষ্টব্য ঃ (الاقتصاد الإسلامى)

এভাবে ইসলাম পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে মালিকানার একটি ভিন্ন দর্শন উপস্থিত করেছে। যাতে ব্যক্তির মালিকানার স্বভাবজাত চাহিদারও মূল্যায়ন হয়, আবার স্বেচ্ছাচারিতার পরিবেশও গড়ে না উঠে। অপরদিকে রাষ্ট্রও যাতে তার প্রয়োজন পূরণের চাহিদা অনুপাতে সম্পদ লাভে বাধাগ্রস্থ না হয়। যাতে পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে দেশের সাধারণ মানুষ রক্ষা পায়। আবার সমাজতন্ত্রের ঘানিতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ সম্পদ আহরণ ও ব্যক্তি মালিকানার স্বভাবজাত চাহিদা পূরণে ব্যর্থ ও বঞ্চিত না হয়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রয়োজনীয়তা

যেহেতু রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে কাজ করে যায়, অতএব জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্ট্রকে তা করতেই হবে। এজন্যই সম্পদে রাষ্ট্রীয় মলিকানার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় রাষ্ট্র তার দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে না। এ ধরনের কিছু প্রয়োজনের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

www.eelm.weebly.com

১. যেসকল ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সেগুলোর সংরক্ষণ, উন্নতি বিধান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এগুলো করার জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে সংরক্ষিত থাকতে হবে। তাছাড়া এসকল ক্ষেত্রের মালিকানা ব্যক্তি বিশেষের হাতে অর্পণ করলে জনগণকে হয়ারনি ও দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

২. রাষ্ট্রের অধীন সকল নাগরিকের জীবিকার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। অসহায়, দুর্বল, নিঃস্ব, ফকীর-মিসকীন ও আর্ত-পীড়িত মানুষের জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান, তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণের জন্য রাষ্ট্রের অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহের অধিকার রাষ্ট্রের থাকতে হবে।

৩. রাষ্ট্রের হিফাযতের জন্য সীমান্ত প্রহরী ও সৈনিক নিয়োগ, বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী গঠন, অস্ত্র-শস্ত্রের যোগান দান, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী গঠন, নাগরিকদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অফিস আদালত ও মন্ত্রণালয় স্থাপন এবং এসকল কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ ইত্যাদির জন্যও রাষ্ট্রের অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।

৪. রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও সুসম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। তাই বিভিন্ন দেশে দূতাবাস স্থাপন, এতদসংক্রান্ত মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এগুলোও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এর জন্যও অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।

৫. রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যেসকল উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো এমনও রয়েছে যা ব্যক্তি মালিকানায় করা সম্ভব নয়। অথচ সেই উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এ ধরনের কাজগুলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আঞ্জাম দিতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্রের পক্ষে সংরক্ষিত থাকবে।

৬. জনকল্যাণে নাগরিকদের পক্ষ থেকে যে সম্পদ ওয়াক্ফ করা হবে তা সংরক্ষণ করে তা থেকে উৎপাদিত আয় প্রকৃত প্রাপকের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অতএব এগুলোর মালিকানাও রাষ্ট্রের পক্ষে সংরক্ষিত থাকবে।

— আল-ইক্তিসাদুল ইসলামী ৫৩-৫৯

রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্রসমূহ

ক. রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এমনসব সম্পদে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে যা ব্যক্তি বা

www.eelm.weebly.com

গোষ্ঠী বিশেষের মালিকানায় প্রদান করলে জনগণের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, এ ধরনের সম্পদ সবসময় সরকারি মালিকানায় রাখতে হবে। যথা ঃ

* সরকারি চারণভূমি, বনভূমি, উদ্যান ও সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা খামারসমূহ।

* সরকারি ভূমিতে বিদ্যমান খনিসমূহ।

* **পানির উৎসসমূহ ঃ** বৃহদায়তন জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র, হ্রদ ইত্যাদি।

* **যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ** সড়ক ও জনপথ, নৌ-পথ, আকাশপথ, রেললাইন এবং সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা যানবাহনসমূহ ইত্যাদি।

* **জনকল্যাণে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ** যথা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাক বিভাগ, চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ, গবেষণা ইন্সটিটিউটসমূহ, ট্রেনিং সেন্টার ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোসমূহ, ওয়াসা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন ইত্যাদি।

খ. জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদসমূহ যথা ঃ

* মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ।
* সরাইখানা, মুসাফিরখানা।
* হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়।

গ. সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা মিল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ঘ. মালিকানা বিহীন সম্পদসমূহ।

এছাড়াও সরকারের আয়ের বিভিন্ন খাত রয়েছে। বায়তুল মালের আয়ের উৎসসমূহের আলোচনায় এগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এসকল সামগ্রী রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হওয়ার পক্ষে যে দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

১. উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে এগুলোকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ছেড়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন ছেড়ে দিলে জনসাধারণ দুর্ভোগের শিকার হবে এবং দেশের সকল নাগরিক কার্যতঃ ঐসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে। আল্লামা আবু উবায়দ তাঁর 'কিতাবুল আমওয়ালে' উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) রবযার ভূমিকে চারণভূমি হিসেবে ঘোষণা করার পর বলেছিলেন 'যদি আল্লাহর পথে ভার বহনকারী এসব উটগুলো না হত তাহলে আমি লোকদের নগরসীমার অন্তর্ভুক্ত ভূমি থেকে সামান্য অংশও চারণভূমির জন্য অধিগ্রহণ করতাম না'। এথেকে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের

www.eelm.weebly.com

প্রয়োজনে কোন সম্পদকে রাষ্ট্রীয়করণ করার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে।
الإقتصاد الإسلامى-

২. চারণভূমিসমূহ কারো ব্যক্তিমালিকানায় প্রদান না করার ব্যাপারে উলামায়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে। এ কারণেই জাহেলিয়্যাতের যুগে চারণভূমির উপর কুলায়ব ইবনে ওয়ায়েল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের যে আধিপত্য ছিল তা খতম করে চারণ ভূমিসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ لاحمى إلا لله ولرسوله (بخارى) অর্থাৎ সকল চারণভূমিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আধিপত্য থাকবে, (যা থেকে সর্বসাধারণ সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে)। চারণভূমি সংক্রান্ত এই বিধানের আওতায় বনভূমি, সরকারি উদ্যান, খামার ও খনিসমূহও পড়বে। কেননা এগুলোর সাথেও সর্বসাধারণের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

সরকারি ভূমিতে বিদ্যমান খনিসমূহে যে সরকারি মালিকানা থাকবে এ সম্পর্কে আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণিত একটি হাদীসে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়

عن أبيض بن حمال أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطعه له فلما ولى قال رجل من المجلس أتدرى ما اقتطعت له إنما اقتطعته الماء العد.

অর্থাৎ হযরত আবৃইয়ায্ ইবনে হাম্মাল (রা.) যখন রাসূল (সা.)-এর দরবারে আসলেন এবং তার এলাকার একটি লবণ খনি তার মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার আবেদন জানালেন, তখন রাসূল (সা.) তারজন্য তা বরাদ্দ করলেন। অতঃপর তিনি যখন মজলিশ থেকে উঠে গেলেন তখন মজলিশে অবস্থিত জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনি জানেন কি; তারজন্য কি বরাদ্দ করলেন? আপনি তো তার জন্য একেবারে প্রস্তুত পানি বরাদ্দ করেছেন। (অর্থাৎ বিনাশ্রমে উত্তোলনযোগ্য লবণ খনি তাকে দিয়ে দিয়েছেন)। ফলে রাসূল (সা.) তা থেকে তা ফিরিয়ে নিলেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনূল কুদামাহ তার প্রখ্যাত গ্রন্থ। المغنى-তে উল্লেখ করেছেন যে ঃ

ملك أحد بالاحتجاج ملك منعة فضاق على الناس فإن أخذالعوض عنه أغلاه فخرج عن المواضع الذى وضعه الله من تعميم ذوى الحوائج من غير كلفة .

এই বিধানের আওতায় পানির উৎসসমূহ, জনপথ, উদ্যান এবং জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সকলকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাক বিভাগ, চিকিৎসাকেন্দ্র, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)। কেননা এগুলোও মূলতঃ খোদায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় এবং কেউই এর কল্যাণের আওতামুক্ত নয়। সুতরাং যদি এগুলোতে কোন ব্যক্তি বিশেষের

www.eelm.weebly.com

মালিকানা সৃষ্টি হয়; তাহলে তাতে অন্যকে বারণ করার ও বাধা দেয়ার তার অধিকার সৃষ্টি হবে। আর এরূপ হলে তা সর্বসাধারণের জটিলতার কারণ হবে। আর যদি এগুলোর পরিবর্তে কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করা হয়; তাহলে এগুলোকে দুর্মূল্য করে ফেলা হবে। সুতরাং ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা হলে এগুলো থেকে বিনা আয়েশে সর্বসাধারণের উপকৃত হওয়ার যে ব্যাপকতা মহান আল্লাহ তা'আলা রেখেছিলেন; তা আর থাকবে না। – আল্-ইক্তিসাদুল ইসলামী

ব্যক্তি মালিকানা

ডঃ আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহ্সেন আত্-তারিকী ব্যক্তি মালিকানার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ঃ

إنها حكم شرعى مقدر يعطى الإنسان حق الاختصاص فى امتلاك العين أو منفعتها وحق التصرف بها من غير مانع .

ব্যক্তি মালিকানা হল শরীয়ত প্রদত্ত এক ধরনের সীমিত অধিকার যা কোন বস্তু বা তার মুনাফায় কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাকে নির্ধারিত করে এবং সেগুলোতে তার অবাধ লেনদেনের অধিকার প্রদান করে।

এই সংজ্ঞার আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ব্যক্তিকে তার মালিকানালব্ধ সম্পদ লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীয়তের বিধান মেনে চলতে হবে। কেননা তার এই মালিকানার অধিকার মূলতঃ শরীয়তই তাকে প্রদান করেছে। তাই মালিকানাভুক্ত সম্পদে অবাধ লেনদেনের অধিকার তার থাকবে, তবে সেই লেনদেন অবশ্যই শরীয়তের গন্ডিসীমার মধ্যে সীমিত থাকবে।

ব্যক্তিমালিকানার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন কারণেই ব্যক্তি মালিকানার প্রয়োজন রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো অন্যতম।

১. মালিকানা লাভের স্বভাবজাত চাহিদার মূল্যায়নার্থে

বস্তুতঃ সকল মানুষের মাঝেই জন্মগতভাবে এক ধরণের (Ego) বা অহমবোধ রয়েছে। মূলতঃ এই অহমবোধই ব্যক্তিমালিকানা সম্পর্কিত মনোবৃত্তির উৎসমূল। একটি শিশু যখন থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে শেখে এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা অনুভব করতে শুরু করে তখন থেকেই তার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার চেতনা জাগ্রত হয়। যখন থেকে একজন মানবসন্তান 'আমি', 'তুমি' ও 'সে' বলে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করে, ঠিক তখন থেকেই সে দ্রব্য সম্পদের উপর অধিকার প্রয়োগের দিক থেকেও পার্থক্য সৃষ্টির জন্য 'আমার', 'তোমার' ও 'তার' শব্দ প্রয়োগ করতে শুরু করে। এটিই পরিণত

www.eelm.weebly.com

হয়ে 'আমার মালিকানা', 'তোমার মালিকানা' ও 'তার মালিকানা' এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে বিকশিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নিজস্ব মালিকানার এই ভাবধারা ব্যক্তির শিরা-উপশিরায় এবং সমাজ ও তামাদ্দুনের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবাহিত হয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যকার এই আমিত্ববোধ ও ব্যক্তি মালিকানার এই চেতনার কথা মনস্তত্ত্ববিদরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। এ মর্মে আল্-কুরআনের বর্ণনাও একইরূপ। ইরশাদ হয়েছে ঃ

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا .

এই চেতনার প্রতিফলন মানুষের অন্তরে এক ধরণের তৃপ্তিবোধ সৃষ্টি করে, যা অন্যভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যকার এই চেতনাবোধ এত তীব্র যে, ব্যক্তিকে তার নিজস্ব মালিকানা হতে বঞ্চিত করে হাজারগুণ বেশি সুযোগ-সুবিধা এবং আরাম-আয়েশের সামগ্রী প্রদান করা হলেও সে সন্তুষ্ট হতে পারে না, কোনভাবেই সেই তৃপ্তি সে লাভ করে না।

মূলতঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভের প্রেরণা থেকেই ব্যক্তি মালিকানার ভাবধারা উৎসারিত। সুতরাং ব্যক্তিকে তার ব্যক্তি মালিকানা থেকে বঞ্চিত করলে; সেটাকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত স্বভাবজাত দাবী বিধায় এথেকে বঞ্চিত হলে মানুষ তার সঞ্জীবনী প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তাকে যতই সুখে রাখা হোক সে তাকে বিষতুল্য মনে করে। এরফলে তার উৎপাদনী অনুপ্রেরণা যে শেষ হয়ে যাবে এটা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ের নয় বরং সীমাবদ্ধ অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করা এবং সম্পদে তার সীমিত মালিকানাকে স্বীকার করে নেয়াই অধিকতর বৈজ্ঞানিক পন্থা বটে। সমাজ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিচারে এ পন্থার কোন বিকল্প থাকা সঙ্গত নয়।

ইসলাম যেহেতু ফিতরাতের ধর্ম, তাই মানুষের এই স্বভাবজাত চাহিদার মূল্যায়ণ না করে পারে না। এ কারণেই ইসলামে ব্যক্তি মালিকানাকে সীমিত পর্যায়ে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। যাতে মানুষ তার স্বাতন্ত্রবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তি অধিকারের চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে পারে এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্জীবিত রেখে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় উৎপাদনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

২. ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে

বস্তুতঃ ব্যক্তি রাষ্ট্রেরই একজন সদস্য। সুতরাং যদি রাষ্ট্রের প্রত্যেক সদস্য

www.eelm.weebly.com

সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়; তাহলে এই সমৃদ্ধি যে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার উপর উন্নয়নের প্রভাব সৃষ্টি করবে একথা বলাই বাহুল্য।

একথা সকলেরই জানা যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। বরং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও শ্রম অপরিহার্য। এই উদ্যোগ ও শ্রম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ থেকে কিংবা অঞ্চল বিশেষ থেকে গ্রহণ করলেও যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি সদস্য থেকে গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক সদস্যকেই এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা নিয়ে উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ব্যক্তি তখনই গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে যখন সে জানতে পারবে যে, এর সুফল সে ভোগ করতে পারবে। কিন্তু যদি সে জানে যে, তার শ্রমের ফসল সে নিজে ভোগ করতে পারবে না কিংবা সে শ্রম দিক বা না দিক তার ভোগের পরিমাণ অপরিবর্তীত থাকবে; তাহলে শ্রমের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ তার মাঝে কখনই সৃষ্টি হবে না। ফলে জাতীয় উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টি আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারব। একজন দিন মজুরকে সারা দিনে ২৫ টাকা দেয়া হবে এ শর্তে ধানের চারা রোপণের কাজে নিয়োগ করলে সারাদিন অবিরত কাজ করেও সে মাত্র ৫ ডেসিমেল জমি রোপণ করতে পারে। কিন্তু যদি সেই শ্রমিককেই এই শর্তে কাজে নিয়োগ করা হয় যে, প্রতি ৫ ডেসিমেল জমি রোপণ করলে তাকে ২৫ টাকা দেয়া হবে, তাহলে দেখা যায় যে, সে একদিনে ১০ ডেসিমেল জমি রোপণ করে ফেলে। এক্ষেত্রেও সে সারাদিনই অবিরত কাজ করে। তবে প্রথম প্রকার চুক্তিতে তার মজুরি নির্ধারিত থাকে। সে জানে সারাদিনের কাজের শেষে সে ২৫ টাকা পাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার স্বতঃস্ফূর্ত কোন উদ্যোগ থাকে না। যা থাকে তা হল দায়বদ্ধতা। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার চুক্তিতে তার জানা থাকে যে, কাজের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে তার মজুরীর হার ততই বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার কাজের স্বতঃস্ফূর্ততা বেড়ে যায়। ফলে একই সময়ে তার দ্বারা দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে একথা বলার অবকাশ নেই যে, প্রথম প্রকার চুক্তিতে সে কাজে ফাঁকি দেয়। কেননা নিয়োগকর্তা কর্মক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থেকে কাজের তদারকি করলেও এবং শ্রমিককে কোনরূপ অবকাশের সুযোগ না দিলেও কাজের পরিমাণের এই তারতম্যে কোন ফারাক সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে যা হয়, তা হল স্বতঃস্ফূর্ততার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি জনিত ফারাক, যা অনুভব করা যায়, কিন্তু ফাঁকিকে চিহ্নিত করা যায় না। এটি নিতান্তই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।

ইসলাম তার অর্থনীতিতে এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টির গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুধাবন করেই উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং উৎপাদনকে গতিশীল

www.eelm.weebly.com

করতঃ সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এটা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধিকেই অগ্রগতি দান করবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলো যাতে অন্যের ক্ষতির কারণ না হয় সেজন্য অন্যভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যার আলোচনা সম্পদ উপার্জনের নীতিমালায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে।

৩. প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে উপকৃত করা ও সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে

বস্তুতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনকারীদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা এই প্রতিযোগিতা উৎপাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে রাখে। আপন আপন ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই অধিক শ্রম রিনিয়োগে এবং পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রত্যেককেই আপন আপন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হওয়ার উৎসাহ দান করে। এভাবে এই প্রতিযোগিতা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়ক হওয়ায় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে পণ্য সহজলভ্য হয় এবং পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। এভাবে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনও ত্বরান্বিত হয়। আবার এই প্রতিযোগিতা পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও প্রভাব সৃষ্টি করে। কেননা যে উৎপাদনকারী কমমূল্যে ভাল পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়; তার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ক্রেতা সাধারণ দামের ক্ষেত্রে রেয়ায়েত পারে।

এই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ব্যক্তি মালিকানার মাধ্যমেই সম্ভব। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত এই উন্নতিও প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি। তাই ইসলাম উৎপাদনকে গতিশীল, উন্নত ও ত্বরান্বিত করার স্বার্থে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

৪. রাষ্ট্রকে উৎপাদনসংক্রান্ত ঝামেলামুক্ত রেখে জনগণের বৃহত্তর খিদমতের সুযোগদানের স্বার্থে

রাষ্ট্র হলো দেশ ও জাতির সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। সুতরাং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো রাষ্ট্রকেই আঞ্জাম দিতে হয়। যথা- দেশ রক্ষা, নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, নাগরিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, জনস্বাস্থ্য ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ধর্ম ও নৈতিকতার উন্নয়ন ইত্যাদি বহুবিধ দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং রাষ্ট্র যদি যাবতীয় উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে এমন এমন ক্ষেত্রে তাকে শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হবে, যা উপরোক্ত দায়িত্বসমূহের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যেমন- খেলা-ধুলার উপকরণ, শিশুদের পুতুল ও খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী, মুখরোচক খাদ্য ইত্যাদি। এগুলো উৎপাদনের চিন্তায় যদি রাষ্ট্রকে সময় ব্যয় করতে হয়; তাহলে প্রতিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের বিষয় নিয়ে ভাববার সময় থাকবে কোথায়? অথচ উৎপাদনের এ দায়িত্ব জনগণের হাতে অর্পণ করলে অনায়াসেই তা সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে। রাষ্ট্র এ দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার সুযোগ পাবে। এ কারণেই ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

ব্যক্তি মালিকানা লাভের উপায়সমূহ

১. উত্তরাধিকার

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ শরীয়তের বিধানানুসারে তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টিত হয়। উত্তরাধিকারীরা বন্টিত মালের যে অংশ লাভ করেন; তাতে তাদের বৈধ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরাধিকার লাভের মূল ভিত্তি হল তিনটি ঃ

১. বংশগত সম্পর্ক

২. বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক

৩. ওয়ালা বা গোলাম মালিক সম্পর্ক।

নিম্নলিখিত তিনটি কারণ এই উত্তরাধিকারিত্ব থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে।

১. উত্তরাধিকারী যার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবে; তাকে যদি সে হত্যা করে।

২. উত্তরাধিকারী ও যার উত্তরাধিকার লাভ করবে; এই দু'জনের কোন একজন গোলামে পরিণত হলে।

৩. ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হলে।

পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্পদেই উত্তরাধিকারী থাকবে। তিন ধরনের লোক উত্তরাধিকার লাভ করবে। যথা ঃ

১. ذوى الفروض (যবিল ফুরূয) ঃ 'যবিল ফুরূয' বলা হয় মাইয়েতের সাথে সম্পর্কিত এমন ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ কিংবা নারী)কে যাদের উত্তরাধিকারের পরিমাণ কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। যথা ঃ

ক. স্বামী ঃ স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেক পাবে যদি স্ত্রী নিঃসন্তান হয়।
ঃ এক চতুর্থাংশ পাবে যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে।

www.eelm.weebly.com

খ. **স্ত্রী** ঃ স্বামীর সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে যদি সন্তান না থাকে।
ঃ স্বামীর সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে যদি সন্তান থাকে।

গ. **পিতা জীবিত থাকলে** ঃ সন্তানের সম্পদের এক ষষ্ঠামাংশ পাবে, মাইয়েতের সন্তান থাকলে।

ঘ. **মাতা জীবিত থাকলে** ঃ সন্তানের সম্পদের এক ষষ্ঠামাংশ পাবে, মাইয়েতের সন্তান থাকলে
ঃ সন্তানের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে, মাইয়েতের সন্তান না থাকলে।

ঙ. **কন্যা** ঃ ১ জন হলে পিতার সম্পদের অর্ধাংশ পাবে, ভাই না থাকলে।
ঃ ২-এর অধিক হলে পিতার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ সকলে পাবে, ভাই না থাকলে।

চ. **বৈপিত্রেয় ভাইবোন** ঃ পিতামাতা জীবিত নেই এমন কোন নিঃসন্তান পুরুষ কিংবা স্ত্রীর সম্পদের এক ষষ্ঠমাংশ করে পাবে, যদি ভাই কিংবা বোন একজন হয়।
ঃ তিনের এক অংশ সকলে পাবে সমান হারে, যদি ভাইবোন একাধিক হয়।

উপরোক্ত কয়জনের উত্তরাধিকারের পরিমাণের কথাই কুরআনে বর্ণিত আছে। সুতরাং এরা হলেন যবিল ফুরুয।

২. **عصبة** (আসাবাহ) ঃ আসাবাহ বলতে মাইয়েতের রক্তের সম্বন্ধযুক্ত উর্ধ্বতন বা অধঃস্তন নিকটতম পুরুষ আত্মীয় স্বজনকে বুঝায়। যথা ঃ (এক) মাইয়েতের পিতা, পিতার পিতা (দাদা), পিতার পিতার পিতা (পরদাদা)। (দুই) মৃত ব্যক্তির ছেলে, ছেলের ছেলে (নাতি), ছেলের ছেলের ছেলে (পুতি)। (তিন) মাইয়েতের পিতার অন্যান্য পুত্র সন্তানেরা অর্থাৎ ভাইয়েরা। (চার) মাইয়েতের দাদার অন্যান্য সন্তানেরা অর্থাৎ চাচারা।

৩. **ذوالرحم** (জবির্ রেহ্ম) ঃ জবির্ রেহ্ম বলতে মাইয়েতের রক্তের সম্পর্কযুক্ত দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে বুঝায় অর্থাৎ প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর অবর্তমানে রক্তের সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী ব্যক্তিবর্গ, সম্পর্কের নৈকট্যের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করবেন।

উত্তরাধিকার লাভের জন্য চারটি শর্ত রয়েছে

১. যার উত্তরাধিকার লাভ করা হবে তার মৃত্যু বাস্তবে কিংবা আইনগতভাবে ঘটতে হবে।

২. যার উত্তরাধিকার লাভ করা হবে তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীকে বাস্তবে বা আইনগতভাবে জীবিত থাকতে হবে।

www.eelm.weebly.com

৩. যেসব কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তা বিদ্যমান না থাকতে হবে।

৪. মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন, ঋণ ও ওসিয়ত আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পদে উত্তরাধিকারের বিধান কার্যকর হবে।

উপরোল্লিখিত বিধানের আলোকে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভ করলে সেই সম্পদে তার মালিকানা সৃষ্টি হবে। সূরায়ে নিসায় উত্তরাধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া রাসূল (সা.) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

من ترك مالا فلورثته (بخاري، مسلم)

কোন ব্যক্তি মাল-সম্পদ রেখে গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তার মালিক হবে। (বুখারী ও মুসলিম) তাছাড়া এ ব্যাপারে উলামায়ে উম্মতের ইজমাও রয়েছে।

ইসলাম তার উত্তরাধিকারের বিধান প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছে।

* নিকটস্থদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। একারণেই সন্তানদেরকে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক প্রদান করা হয়েছে।

* প্রয়োজনকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, যার প্রয়োজন বেশি তাকে বেশি প্রদান করা হয়েছে। যেমনঃ ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দেয়া হয়েছে। কেননা ছেলের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব অনেক। যথা ঃ পিতামাতার ভরণ-পোষণ, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণ, নিজের ভরণ-পোষণ, আত্মীয় মেহমানের দায়-দায়িত্ব বহন ইত্যাদি। সে বিচারে রমণীর তেমন কোন অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব নেই বললেই চলে। কেননা তার নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বিয়ের পূর্বে বাবা কিংবা ভাইয়ের, বিয়ের পর স্বামী কিংবা সন্তানের। পিতামাতার ভরণ-পোষণের আইনগত কোন দায়িত্ব তার নেই। ছেলে মেয়েদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। আত্মীয় স্বজনের দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। একারণেই তাকে পুরুষের অর্ধেক দিয়ে ইসলাম বরং তাকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিই দিয়েছে।

* উত্তরাধিকার বন্টনের মাধ্যমে সম্পদ এককেন্দ্রে পুঞ্জিভূত হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করে দিয়েছে। এজন্যই উত্তরাধিকার একজনকে মাত্র না দিয়ে বিভিন্ন জনকে দেয়া হয়েছে; যাতে সম্পদ বিভিন্ন হাতে বন্টিত হয়ে যায়।

২. ব্যবসা বাণিজ্য

শরীয়তের পরিভাষায় বেচাকেনা বলা হয় ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিক্রমে দ্রব্য সম্পদের বিনিময়ে দ্রব্য সম্পদের বিনিময়কে।

এ ধরনের বিনিময়ের ফলে ক্রেতা; বিক্রেতার সরবরাহকৃত দ্রব্যের এবং বিক্রেতা; ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহকৃত দ্রব্যের মালিক হয়ে যায়।

www.eelm.weebly.com

মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই এই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা বিদ্যমান ছিল। কেননা মানুষ নিজে তার জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু একাই উৎপাদন করতে পারে না। একজন হয়ত কাপড় উৎপাদন করে, আরেকজন চাষাবাদ করে খাবার চাল উৎপাদন করে। ফলে চাষীর কাপড়ের প্রয়োজন পড়ে, আবার তাঁতীর চালের প্রয়োজন পড়ে। দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় প্রথা দ্বারা মানুষ পারস্পরিক এই প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। অতএব বেচাকেনা বৈধ না রাখলে মানুষ জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারবে না। ফলে অন্যের হাত থেকে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও রাহাজানীর মাধ্যমে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। এ কারণেই ইসলাম বেচা-কেনা ও ব্যবসা বাণিজ্যকে বৈধ রেখেছে। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أحل الله البيع وحرم الربوا

আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ রেখেছেন, তবে সুদকে হারাম করে দিয়েছেন।

ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যকে কেবল বৈধই রাখেনি বরং নবী করীম (সা.) ব্যবসার বহু ফযীলতের কথা বর্ণনা করে ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ولاصديقين والشهداء

বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।

কিন্তু ব্যবসায় যেহেতু ধোকা, প্রতারণা, ভেজাল দেয়া, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী ও মাপে কম দেয়া ইত্যাকার নানা ধরনের অপরাধের অবকাশ রয়েছে, একারণে এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য তিনি ইরশাদ করেন ঃ

التجار يحشرون يوم القيامة فجارا .

কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপাচারী হিসেবেই সমবেত করা হবে। অতঃপর যার আমল ও কর্ম তাকে পাপাচারী নয় বলে প্রমাণ করবে তাকে মুক্তি দেয়া হবে।

ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যকে বৈধ রাখলেও এমন কতিপয় মূলনীতির আওতায় তাকে বৈধ করেছে, যাতে বাণিজ্যিক দুর্নীতির যে সম্ভাবনা ব্যবসা বাণিজ্যে রয়েছে; তা রহিত হয়ে যায়। যেমন ঃ

১. যে দু'দ্রব্যের মাঝে লেনদেন হবে; সেগুলোর অবশ্যই মূল্যমান থাকতে হবে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে লেনদেনের যোগ্য হতে হবে।

২. যে দু'জন লেনদেন করবেন; তাদের মাঝে অবশ্যই লেনদেনের যোগ্যতা থাকতে হবে।

৩. লেনদেন অবশ্যই উভয় পক্ষের পূর্ণসম্মতিক্রমে হতে হবে।

৪. দু'পক্ষ যে বিষয়ের লেনদেন করবেন তাতে অবশ্যই উভয়ের বৈধ মালিকানা থাকতে হবে।

www.eelm.weebly.com

৫. যে দ্রব্যের মাধ্যমে লেনদেন সংঘটিত হবে তা অবশ্যই হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে ও হস্তান্তরে সক্ষম এমন অবস্থায় থাকতে হবে।

৬. যে বিষয়ের লেনদেন হবে; তা অবশ্যই উভয়পক্ষের জ্ঞাত থাকতে হবে।

৭. দ্রব্য ও তার মূল্যের পরিমাণ অবশ্যই পূর্বাহ্নে নির্ধারিত করে নিতে হবে।

৮. লেনদেনে এমন কোন অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না; যা পরে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

৯. লেনদেনের চুক্তি অবশ্যই এমন হতে পারবে না; যাতে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ ও অপর পক্ষের নিশ্চিত লোকসানের সম্ভাবনা থাকবে। এমন বেচাকেনা বৈধ হবে না।

১০. 'গবনে ফাহেশ' থাকতে পারবে না। অর্থাৎ দ্রব্যের এমন মূল্য সাব্যস্ত করা যাবে না; যা স্বাভাবিক বাজার দরের সাথে অস্বাভাবিক সামঞ্জস্যহীন।

১১. উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে ধোকা দেয়ার বা প্রতারিত করার মানসিকতা থাকতে পারবে না।

১২. উভয় পক্ষকে আপন প্রাপ্য অংশ গুণে মেপে বা ওজন করে নিজের আয়ত্বাধীন বা হস্তগত করে নিতে হবে।

৩. কৃষিকাজের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মালিকানা লাভ

ভূমিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা উৎপাদনী শক্তি সন্নিহিত করে রেখেছেন। চাষাবাদ ও বপণ-রোপণের যথার্থ পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূমি থেকে দ্রব্য-সামগ্রী ও আহার্য উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। ভূমি ব্যক্তি মালিকানাভুক্তই হোক; কিংবা সরকারি মলিকানাভুক্ত হোক, যে তাতে শ্রম দিবে, উৎপাদিত পণ্যে তার অংশ নির্ধররিত হয়ে যাবে। ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত জমি হলে যদি মালিক নিজেই উৎপাদনে শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাহলে উৎপাদিত পণ্যের সবটুকু উৎপাদনকারী পাবে। যদি ভূমি উশরী কিংবা খেরাজী হয়, তাহলে উশর কিংবা খেরাজ প্রদান করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা উৎপাদনকারী লাভ করবে। আর যদি অন্যের জমি বর্গাচাষ করা হয়; তাহলে শর্তানুসারে জমির মালিককে তার প্রাপ্যাংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে; উৎপাদনকারী তা লাভ করবে। ভূমি থেকে উৎপাদিত পণ্যের যে অংশ যে লাভ করবে, সে সেই অংশের মালিকানা লাভ করবে।

ভূমি থেকে শ্রম দিয়ে যে উৎপাদন করা হয়; তা অত্যন্ত নির্ভেজাল ও পবিত্রতম উৎপাদন।

আল্লামা মাওয়ারদী উল্লেখ করেছেন যে, উৎপাদনের মূল উপায় দু'টি ঃ ১. কৃষি ২. ব্যবসা-বাণিজ্য। তবে এ দু'য়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম হলো কৃষি।

www.eelm.weebly.com

কৃষি উৎপাদনের দ্বারা শুধু যে মানুষ লাভবান হয় তাই নয়, এ দ্বারা পশুপাখী, কিটপতঙ্গও উপকৃত হয়। এ কারণেই আল্‌-কুরআনে কৃষিকাজকে শুধু বৈধই ঘোষণা করা হয়নি বরং এ ব্যাপারে উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

إذاقضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله

সুতরাং ভূমিজ উৎপাদন মালিকানা লাভের অন্যতম উপায়।

৪. অনাবাদী ভূমি আবাদ করার মাধ্যমে মালিকানা লাভ

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মালিকানাহীন অবানাদী ভূমি রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে আবাদ করে তার মালিকানা লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি যতটুকু ভূমি আবাদ করবে, সে ততটুকুর মালিকানা লাভ করবে। এর বৈধতার স্বপক্ষে ইমাম আবু দাউদ একটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন : من أحيا أرضا ميتة فهى له কেউ যদি অনাবাদী ভূমি আবাদ করে তাহলে সেটা তার।

আল্লামা আবু উবায়দ তার কিতাবুল আমওয়ালে হযরত আয়শা (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন ভূমি আবাদ করবে, যা কারো মালিকানাভুক্ত নয়, সে তার মালিকানা লাভের অগ্রাধিকার রাখে।'

অনাবাদী ভূমি আবাদ করে মালিকানা লাভের বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. সে ভূমি অবশ্যই অন্য কোন নাগরিকের মালিকানাভুক্ত না হতে হবে।

২. সে ভূমি অবশ্যই কোন নগরসীমার অভ্যন্তরে না হতে হবে।

৩. সে ভূমি অবশ্যই নগরবাসীর প্রয়োজনীয় কাজের জন্য নির্ধারিত না হতে হবে। যেমন খেলার মাঠ, চারণভূমি, ঈদগাহ্ ইত্যাদি।

৪. সর্বোচ্চ তিন বছর সময়ের মধ্যে অবশ্যই তা আবাদ করে চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। কেননা আবাদ না করে কেবলমাত্র আবাদ করার জন্য সীমা নির্ধারণ করা দ্বারাই মালিকানা লাভ হবে না। তবে নির্ধারিত ভূমিতে বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করে নিলে কিংবা চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে ফেললে কিংবা বৃক্ষরোপণ করে ফেললে কিংবা পানির কূপ খনন করে ফেললে ভূমি আবাদ করা হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হবে। অবশ্য সীমা নির্ধারণ করা দ্বারা সীমা নির্ধারণকারী কিংবা তার উত্তরাধিকারীরা তিন বছরের মধ্যে তা আবাদ করার জন্য অগ্রাধিকার লাভ করবে। কেননা এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন : من سبق إلى مالم يسبق إليه غيره فهو أحق به যে ব্যক্তি অন্যের আগে পৌঁছবে, সে আবাদ করার অগ্রাধিকার লাভ করবে।

– আবুদাউদ

www.eelm.weebly.com

৫. আবাদকারীর আবাদ করার সামর্থ থাকতে হবে।

৬. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবশ্যই অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় অনুমতির এ শর্তটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আরোপ করেছেন। কেননা এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه (طبراني وفيه ضعف)

ইমাম সন্তুষ্ট চিত্তে যেটুকুর সম্মতি দিবেন, ব্যক্তি কেবল সেটুকুরই অধিকার লাভ করবে।

যদি স্থানটি নগরীর নিকটবর্তী হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় অনুমতির কথা ইমাম মালিক (রহ.)ও বলেন। তবে ইমাম আহমদ, শাফেয়ী, আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ প্রমূখ মনিষীগণ মনে করেন যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। ভূমি যদি নগরী থেকে দূরে অবস্থিত হয়, তাহলে ইমাম মালিক (রহ.)ও সেক্ষেত্রে এ মতই পোষণ করেন অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

৫. ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমে মালিকানা লাভ

ভূমির অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে যে সম্পদ সন্নিহিত থাকে, তা উত্তোলন করলে; তার মালিকানাও উত্তোলনকারীর পক্ষে সংরক্ষিত হয়। খনিজ সম্পদও এর অন্তর্ভূক্ত। তবে খনিতে যদি সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; তাহলে তা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং রাষ্ট্রই তা উত্তোলনের দায়-দায়িত্ব বহন করবে।

তবে হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ভূমির অতি গভীরে কঠিন পদার্থের যেসব খনি বিদ্যমান রয়েছে, যা যথেষ্ট আর্থিক ব্যয় ও কায়িক পরিশ্রম ছাড়া উত্তোলন করা সম্ভব হয় না, সেধরনের খনির বিধান অনাবাদী ভূমির বিধানের অনুরূপ হবে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অনুমোদন থাকলে; যে তা উত্তোলন করবে সেই তার মালিকানা লাভ করবে। অবশ্য উত্তোলিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা করতে হবে।

কিন্তু কেউ কোন ভূমির মালিকানা লাভ করার পর তাতে যদি খনির সন্ধান পাওয়া যায়, আর তা যদি কঠিন পদার্থ জাতীয় খনি হয় তাহলে ভূমির বর্তমান মালিক উক্ত খনিজ সম্পদেরও অধিকারী বলে গণ্য হবে। কেননা সে ভূমি ক্রয়ের সময় এর যাবতীয় অংশ সহই মালিকানা লাভ করেছে। এক্ষেত্রে খনি ভূমির উপরিভাগে বিদ্যমান হোক কিংবা গভীরে বিদ্যমান হোক তাতে মালিকানার বিধানে কোন তারতম্য সৃষ্টি হবে না। তবে ভূমির মালিকানা লাভের পূর্বেই যদি খনি আবিষ্কার হয়ে যায়; তাহলে অবশ্যই ক্রয়কারী খনির মালিকানা লাভ করবে না।

অনুরূপভাবে তরল পদার্থের খনির বিধানও হাম্বলীদের নিকট একই হবে। অবশ্য খনির মালিকানার ব্যাপারে আধুনিককালের ফিকাহ্‌বিদদের ভিন্ন মত

www.eelm.weebly.com

রয়েছে। যা আমরা বায়তুলমালের আয়ের উৎস সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছি। তথায় দ্রষ্টব্য।

৬. কারিগরি শিল্প ও আবিষ্কারের মাধ্যমে যে সম্পদ লাভ হয়

বস্তুতঃ প্রকৃতিতে যে অসংখ্য উপাদান বিদ্যমান রয়েছে; তার স্বাভাবিক অবস্থাকে বলা হয় কাঁচামাল। প্রকৃতির এসব উপাদানের কিছু কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের প্রয়োজন পূরণে কাজে আসে। আবার অনেকগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের কোনই কাজে আসে না। কিন্তু তার বাহ্যিক রূপ, আকৃতি ও আঙ্গিক পরিবর্তন করলে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী হয় কিংবা তার ব্যবহারিক মূল্য অনেকগুণ বেড়ে যায়। যেমন পাটের কথা বলা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় তা দিয়ে রশি পাকিয়ে বাঁধা-ছাদার কাজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর আঙ্গিক পরিবর্তন করে তা দিয়ে চট বা কার্পেট তৈরি করলে তার ব্যবহারের পরিধি বেড়ে যায় এবং তার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। আবার প্রাণীর পশম স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কাজেই আসে না। কিন্তু এর আঙ্গিক পরিবর্তন করে তা দিয়ে কম্বল তৈরি করা হলে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়।

প্রকৃতিতে বিরাজমান উপাদানসমূহের আঙ্গিক পরিবর্তন করে তাকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, তার ব্যবহার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা কিংবা তার মূল্যমান বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় শিল্প। শিল্পকে বহুমুখী করণের মানসিকতাই মূলতঃ মানুষের মধ্যে আবিষ্কারের প্রেরণা যোগায়। মানুষ নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার করে। যিনি যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেটা তার ব্যক্তিগত সম্পদ বটে (যদি তিনি এমনকিছু আবিষ্কারের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগকৃত বেতনভুক্ত কর্মচারী না হন)। এই আবিষ্কৃত যন্ত্র কিংবা তার প্রযুক্তি বিক্রি করে ব্যক্তি যা উপার্জন করবে তা তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে গণ্য হবে।

বস্তুতঃ আবিষ্কৃত শিল্প ও শিল্পজাত পণ্য মানুষের অর্থ উপার্জনের অন্যতম উপায়। বরং আধুনিক পৃথিবীতে শিল্পই মানব সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি বলে পরিগণিত হয়।

শিল্প তা ক্ষুদ্রায়তনেরই হোক কিংবা বৃহদায়তনই হোক আধুনিক সভ্যতার বিকাশে ও জীবনকে অধিকতর স্বাচ্ছন্দময় ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিল্প ও শিল্পজাত উপকরণকে বাদ দিয়ে আজকের সভ্যতা বলতে গেলে অচল।

কুরআন সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে শিল্প ও কারিগরি ব্যবস্থা একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। যেকালে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেকালে শৈল্পিক পৃথিবীর বিকাশ না ঘটলেও তৎকাল পর্যন্ত বিকশিত শৈল্পিক বিষয়গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় কুরআনে কারীমে। যেমন - নৌকা, জাহাজ, লৌহদূর্গ, বয়লার, খেলনা, পানির গভীর ও

www.eelm.weebly.com

অগভীর নলকূপ, লৌহ প্রাচীর, বিরাট বিরাট তৈজসপত্র ইত্যাদি। সূরায়ে সাবায় এ ধরনের শিল্পকর্মের বিস্তর বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। দাউদ (আ.)-এর শিল্পকর্মের উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولقد آتينا داود منا فضلا ...... وألناله الحديد. أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا.

আমি অবশ্যই দাউদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলাম ---- এবং আমি তারজন্য লৌহকে নমনীয় করে দিয়েছিলাম। এজন্য যে, তুমি পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করবে এবং (বর্মের জালি) বপণকালে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তা তৈরি করবে। আর তোমরা সৎ কাজ কর। – সূরা ঃ ৩৪ - সাবা ঃ ১০–১১

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শিল্প কর্মের উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ... يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا.

আর আমি সুলায়মানের জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবন প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম। জ্বিনদের কতিপয় তাঁরই সম্মুখে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম আঞ্জাম দিত। ----- তিনি যা ইচ্ছা করতেন তারা তাঁর জন্য তাই তৈরী করে দিত। সুউচ্চ প্রসাদ (বা দূর্গ), মূর্তি (বা খেলনা), হাউয সদৃশ বৃহদায়তন পাত্র, এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদকার ডেকচি (বা বয়লার) ইত্যাদি। অতএব হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে (শিল্প কর্মের বিকাশে) কাজ করে যাও। – সূরা ঃ ৩৪ - সাবা ঃ ১২-১৩

হযরত নূহ (আ.)-এর শিল্পকর্মের উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا তুমি জাহাজ নির্মাণ কর আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশানুসারে। – সূরা ঃ ১১ - হূদ ঃ ৩৭

পোষাক শিল্পের প্রতি আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا

হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি এমন পোষাক যা তোমাদের লজ্জা নিবারণ করে এবং তা তোমাদের ভূষণও বটে। – সূরা ঃ ৭ - আরাফ ঃ ২৬

وجعل لكم.... سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.....

তিনিই তোমাদের জন্য এমন জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রাক্ষা করে এবং তিনিই ব্যবস্থা করেছেন এমন পরিধেয় বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষা করে। – সূরা ঃ ১৬ - নহল ঃ ৮১

তাছাড়া লৌহজাত শিল্পের বিপুল সম্ভাবনার কথা আল্-কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই

www.eelm.weebly.com

বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس এবং আমি দিয়েছি লৌহ, এতে বিপুল শক্তি ও বহুবিধ উপকারের সম্ভাবনা বিদ্যামন রয়েছে।

শিল্পের বিকাশে লোহা ও লৌহজাতীয় উপাদান যথা, স্টীল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদির বিপুল ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। বলতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকাংশই লৌহ জাতীয় পদার্থের উপর ভিত্তিশীল। এই বিপুল সম্ভাবানার কথাই উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীসেও বিভিন্ন নবীর শিল্পকর্মের উল্লেখ রয়েছে ঃ

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا .

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, নবী যাকারিয়্যাহ ছিলেন করাতী। – মুসলিম

ইমাম নববী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে শিল্পকর্মের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে এবং এ দিয়ে এও বুঝা যাচ্ছে যে, করাতী হওয়া মানুষের সম্ভ্রান্ততাকে বিনষ্ট করে না। বরং এটি একটি সম্মানিত পেশা। ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المؤمن المحترف .

রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শিল্পকর্মে নিয়োজিত মু'মিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন। – তাবরানী

উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালে শিল্পের ব্যাপক বিকাশ না ঘটলেও কুরআন ও হাদীসে শিল্পকর্মকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারিণী বিষয়সমূহের উপর কুরআন ও হাদীসে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলাম শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করলেও শিল্পের বিকাশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১. যে শিল্প সৃষ্টি করা হবে, তা অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। অবৈধ কোন উপকরণ ব্যবহার করে কিংবা অবৈধ কোন পন্থা অবলম্বন করে যে শিল্প বিকাশিত হবে; তা অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে অনুমোদিত হবে না। যেমন ঃ শুকর কিংবা মানুষের দেহের কোন অংশ ব্যবহার করে কোন শিল্প তৈরি করা হলে তা বৈধ হবে না।

২. উদ্ভাবিত শিল্পের বৈধ ব্যবহারের দিক থাকতে হবে। যে শিল্পের ব্যবহারের কোন বৈধ ক্ষেত্র নেই এ ধরনের শিল্পের উদ্ভাবন অবশ্যই বৈধ হবে না। যেমন সঙ্গীতের জন্য বাদ্যযন্ত্র।

www.eelm.weebly.com

৩. উদ্ভাবিত শিল্পের দ্বারা মানুষ, দেশ ও জাতির দৈহিক আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকতে হবে।

৪. উদ্ভাবিত শিল্প বৈধ হলেও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈধতার সীমা মেনে চলতে হবে। কেননা অনেক সময় উদ্ভাবিত শিল্পের ব্যবহার বৈধ ও অবৈধ উভয় ক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব বৈধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে শিল্পটি বৈধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তাকে অবৈধ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন শিল্পটি বৈধ হওয়ার পরও তার ব্যাবহার অবৈধ হয়ে যাবে। যেমন - টেলিভিশন, যন্ত্র হিসেবে বৈধ হলেও যদি তা গান-বাজনা ও পর্ণ ছবি প্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করা হয়; তাহলে তার ব্যবহার বৈধ হবে না।

এ ধরনের দ্বিমূখী ব্যবহার উপযোগী শিল্পের উৎপাদন ও বেচা-কেনা বৈধ হবে। তবে ব্যবহারকারী যে কাজে ব্যবহার করবেন; সে হিসেবে তার বৈধতা ও অবৈধতা নিরোপিত হবে।

৭. শ্রম বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ

বস্তুতঃ মানুষের শ্রমও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য একটি সম্পদ। তাই শ্রম বিক্রি করে অর্জিত সম্পদের উপরও ব্যক্তির মালিকানা সৃষ্টি হবে।

আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ....

পুরুষ যা উপার্জন করে তা তারই মালিকানাভুক্ত বলে গণ্য হবে, আর রমণী যা উপার্জন করবে তা তারই মালিকানাভুক্ত বলে গণ্য হবে। – সূরা ঃ ৪ - নিসা ঃ ৩২

এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

اطيب الكسب عمل الرجل بيده (أحمد والحاكم)

ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমের দ্বারা উপার্জিত সম্পদ অতি উত্তম উপার্জন।

বুখারী বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة

আমি কয়েক কিরাত[৪] মালের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরি চড়াতাম।

শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ বৈধ হওয়ার জন্যও কতিপয় বিধি-নিষেধ রয়েছে যথা ঃ

১. শ্রমিকের শ্রমের ধরন ও পারিশ্রমিকের পরিমাণ কাজ শুরু করার পূর্বে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

২. শ্রমিককে অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে শ্রম দিতে হবে। যদি সময়ের ভিত্তিতে

www.eelm.weebly.com

তাকে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে; তাহলে পূর্ণ সময় নিষ্ঠার সাতে তাকে শ্রম দিতে হবে। ফাঁকি দেয়ার চিন্তা থাকতে পারবে না। আর যদি কর্মের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে; তাহলে কাজের গুণগতমান অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে ফাঁকি দেয়ার মনোভাব দূর করতে হবে। কেননা রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ خير الكسب كسب يدى العامل إذا نصح (بيهقى)
শ্রমিকের উপার্জন অতি উত্তম উপার্জন যদি সে শ্রম দানের ক্ষেত্রে মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

৩. পারিশ্রমিক হিসেবে লব্ধ মাল অবশ্যই হালাল হতে হবে। অতএব যদি কেউ শ্রমের বিনিময়ে কোন হারাম দ্রব্য যেমন- শরাব বা শুকর গ্রহণ করে; তাহলে তা অবশ্যই তার জন্য বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে যদি এমন কোন শর্তারোপ করা হয়, যা সুদের পর্যায় পড়ে, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

তাবিজ-তুমার ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে কারো কোন ব্যাধির চিকিৎসা বা বৈধ উদ্দেশ্য সাধন করে দিয়ে তার বিনিময়ে যে সম্পদ পাওয়া যাবে তাও বৈধ মালিকানাভুক্ত বলে গণ্য হবে।

৮. পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ

পুরস্কার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যথা ঃ

১. কোন নির্ধারিত কাজের বিনিময়ে ঘোষিত পুরস্কার। যেমন কেউ বলল, আমার অমুক কাজটি যে করে দিবে; তাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। সুতরাং এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে যদি কেউ উক্ত কাজটি করে দিয়ে ঐ ১০০০ টাকা গ্রহণ করে; তাহলে সে তার মালিক হয়ে যাবে। তবে কাজটি অবশ্যই বৈধ হতে হবে। এর বৈধতা সূরা ইউসুফের একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাপের বাটি হারিয়ে গেলে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল ঃ

نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.

আমরা বাদশার মাপের পাত্রটি হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং যে তা এনে দেবে, তাকে এক উট বোঝাই পণ্য দেয়া হবে এবং আমি এই পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব নিচ্ছি।

– সূরা ঃ ১২ - ইউসুফ

২. প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কারঃ কোন নির্ধারিত বিষয়ের প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে; তাকে যে পুরস্কার দেয়া হবে, তা যদি সরকারি ফান্ড থেকে সংগৃহীত হয় বা কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংগৃহীত হয়; তাহলে তা বৈধ হবে এবং বিজয়ী ব্যক্তি প্রাপ্ত পুরস্কারের মালিক হয়ে যাবে। তবে প্রতিযোগিতা অবশ্যই বৈধ বিষয়ে হতে হবে।

www.eelm.weebly.com

আর যদি পুরস্কার দুই প্রতিযোগির কোন একজন প্রদান করেন, যেমন – এরূপ বলা হল যে, 'যদি তুমি দৌড়ে আমাকে হারাতে পার; তাহলে তুমি ১০০ টাকা পুরস্কার পাবে' তাহলে তাও বৈধ হবে। কিন্তু যদি পুরস্কার উভয় প্রতিযোগির পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়, যেমন বলা হল, 'যদি আমাকে হারাতে পার তাহলে তুমি ১০০ টাকা পাবে'। আর যদি আমি তোমাকে হারাতে পারি তাহলে তুমি ১০০ টাকা দিবে। তাহলে এটি বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে কোন ভাল কাজ করার কারণে কিংবা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে যদি পুরস্কার প্রদান করা হয় তাহলে তাও গ্রহণ করা বৈধ হবে।

৯. দান, হেবা ও হাদিয়া-ওসিয়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ

* আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন অভাবীকে যদি কোন বস্তু বা টাকা পয়সা দেয়া হয়; তাহলে তাকে বলে দান।

* আর যদি কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশী করার জন্য কিংবা তার নৈকট্য ও ভালবাসা লাভের জন্য তাকে কিছু প্রদান করা হয়; তাহলে তাকে বলে হাদিয়া। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ تهادوا تحابوا একজন অন্যজনকে হাদিয়া দাও, এতে পরস্পরের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।

* আর হেবা বলা হয় কাউকে কোন সম্পদ বংশানুক্রমে ভোগ করার জন্য বিনা মূল্যে কিংবা যৎসামান্য মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করা।

* ওসিয়ত বলা হয় মরণোত্তর দানকে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে যদি এ মর্মে কোন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক সম্পদের মালিক অমুক ব্যক্তি হবে, তাহলে এটি ওসিয়ত বলে গণ্য হবে। তবে ওসিয়ত কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে যথা ঃ

১. ওসিয়তকারী অবশ্যই বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ওসিয়তই কার্যকরী হবে।

২. ওসিয়ত অবশ্যই তার পরিত্যক্ত মালের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে হতে হবে। এরচেয়ে বেশি পরিমাণ ওসিয়ত করলেও ঐ এক তৃতীয়াংশের মধ্যেই তা কার্যকর হবে। তবে যদি উত্তরাধিকারীরা সর্বসম্মতভাবে তা কার্যকর করার অনুমতি দেয়, তাহলে তা কার্যকর করা যাবে।

৩. যিনি ওসিয়ত করবেন; তার উত্তরাধিকারী যারা হবে, তাদের কারো জন্য ওসিয়ত করা যাবে না। কেননা রাসূল (সা.) হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

www.eelm.weebly.com

إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث.

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার যথার্থ প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারীদের জন্য ওসিয়ত করা যাবে না। (তবে যদি অপরাপর উত্তরাধিকারীরা তা মেনে নেয়; তাহলে তা করা যাবে)।

৪. যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার জন্য সমস্ত সম্পদের ওসিয়ত করে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ওসিয়ত করার বিধান মূলতঃ উত্তরাধিকারীদের স্বার্থেই ছিল।

৫. যার জন্য ওসিয়ত করা হবে; তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ওসিয়তকৃত সম্পদ সেই ব্যক্তির হস্তগত হতে হবে। কেননা এই সম্পদ তার হস্তগত হওয়া; তার মালিকানা লাভের পূর্বশর্ত। যখন তা তার হস্তগত হবে তখন থেকে তা তার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর বৈধতা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং এসকল প্রক্রিয়ায় কেউ কোন সম্পদের অধিকারী হলে, তাতেও তার বৈধ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১০. যাকাত ও সাদাকাহ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ

যাকাত ও সাদাকাহ হিসেবে যে সম্পদ মানুষ গ্রহণ করে; তার উপরও তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পদ সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে।

যাকাতের বিষয়টিও কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

যারা যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন তাদের বিবরণ নিম্নোক্ত আয়াতে প্রদান করা হয়েছে ঃ

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم .

(সূরা ঃ ৯ - তাওবা ঃ ৬০) উক্ত আয়াতে মোট আট শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. الفقراء অর্থ নিঃস্ব যার কিছু নেই।

২. المساكين অর্থ অভাবগ্রস্থ-সামান্য সম্পদ থাকলেও যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় না। অবশ্য অনেকেই মিস্‌কীন বলতে এমন অভাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, যারা অন্যের কাছে হাত পাতে না। আর প্রয়োজন বলতে মৌলিক প্রয়োজনকেই বুঝানো হয়েছে যথাঃ পানাহার, বাসস্থান, উপার্জনের উপকরণ ইত্যাদি। অর্থাৎ যাদের নিজ উপার্জনের মাধ্যমে এসকল প্রয়োজন পূর্ণ হয় না তারাই মিস্‌কীন।

www.eelm.weebly.com

৩. العاملين عليها অর্থাৎ যারা সরকার কিংবা তার প্রতিনিধি কর্তৃক যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত। তারা ধনী হলেও পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে।

৪. المؤلفة قلوبهم। অর্থ যাদের চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজন অর্থাৎ যেসব মুসলমান মালদার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের দুর্বলতার কারণে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা না পেলে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশংকা রয়েছে, অথবা যেসব অমুসলিমদের ব্যাপারে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে, অর্থনেতিক সুবিধা দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, কিংবা যাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের প্রতি দুর্বল করে না রাখলে তাদের দ্বারা ক্ষতির আশংকা রয়েছে, কিংবা যাদেরকে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিলে; অন্যকোন শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে কাজে লাগানো যাবে বলে মনে করা হবে, এরা সকলেই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এরা অমুসলিম হলেও তাদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে, কিংবা মালদার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ইসলামের উপর টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

৫. وفى الرقاب অর্থ দাসমুক্তির জন্য অর্থাৎ যে গোলামের মুক্তিপণ দিলে মালিক তাকে আযাদ করে দিবে, এমন গোলামের মুক্তিপণ আদায়ের টাকা যাকাতের ফান্ড থেকে দেয়া যাবে।

৬. الغارمون। অর্থ ঋণে ভারাক্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যে নিজের অথবা অন্যের প্রয়োজনে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে বা অন্যের কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে ঋণী হয়েছে, যেমনঃ দুই বিবদমান পক্ষের মিমাংসা করতে গিয়ে অর্থ ব্যয় করে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েছে, এ ধরনের ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের ঋণ পরিশোধের জন্যও যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

৭. فى سبيل الله অর্থ আল্লাহর পথে অর্থাৎ আল্লাহব পথে জিহাদরত মুজাহিদরা যদি কোন কারণে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অথবা রাষ্ট্র ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে যদি তাদের ব্যয়ভার বহন না করে, তাহলে তাদের অস্ত্রের যোগান, ভরণ পোষণ ও তাদের সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮. ابن السبيل অর্থাৎ যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির (ভ্রমণকারী) বলে স্বীকৃত; তারা যদি সফররত অবস্থায় অর্থসংকটে নিপতিত হয়, তাহলে তার জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। স্বদেশে সে ধনী হয়ে থাকলেও বিদেশে অবস্থানকালে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

www.eelm.weebly.com

১১. মহর কিংবা খুলার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ

বিবাহ-শাদীতে স্ত্রী তার বিবাহের বিনিময়ে স্বামী থেকে যে সম্পদ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করেন, তাকে মহর বলা হয়। মহর অবশ্য নগদও পরিশোধ করা যায়, আবার বাকিও রাখা যায়, যা পরে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। কিংবা কিছু নগদ ও কিছু বাকিও রাখা যায়। এই মাল স্ত্রীর হস্তগত হলে স্ত্রী তার মালিকানা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি কোন কারণে স্বামী থেকে তালাক কামনা করে, তার স্বামী যদি কোনরূপ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বিধানের শর্তে তা দিতে সম্মত হয়, তাহলে যে অর্থের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেবে, তাতে স্বামীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে (অবশ্য মহরের টাকা পরিশোধ কতে হবে না এরূপ শর্তেও খুলা হতে পারে)।

১২. নফকাহ্ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ

স্ত্রী স্বামী থেকে ভরণ পোষণ বাবদ যে সম্পদ পাবে অথবা তালাকের পর ইদ্দত পালনকালে স্বামী থেকে যে ভরণ পোষণের খরচ পাবে; তাতেও তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্ত্রী ছাড়াও নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা অভাবী তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ব্যক্তির উপর বর্তায়। যেমন, বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাত্নী ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে ভরণ পোষণের বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত রয়েছে। যথা ঃ

১. যার জন্য ব্যয় করা হবে তাকে অবশ্যই দরিদ্র হতে হবে, সে প্রাপ্ত বয়স্কই হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কই হোক।

২. যে ব্যয় করবে তাকে অবশ্যই ধনী ও সচ্ছল হতে হবে।

৩. দু'জনের ধর্মের অভিন্নতা থাকতে হবে।

ভরণ পোষণের জন্য যাকে যেসম্পদ দেয়া হবে, সে তার মালিক হয়ে যাবে।

১৩. সরকারি ভূমি থেকে আহরিত সম্পদ

এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়; আবার সরকারি নিষেধাজ্ঞা নেই এরূপ বন থেকে প্রাণী শিকার করে কিংবা কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করে যদি কেউ অর্থ উপার্জন করে তাহলে তার মালিকানাও সে লাভ করবে।

১৪. রাষ্ট্র প্রদত্ত জায়গীর ও অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ বা রাষ্ট্রীয় বন্টননীতি অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পদ ঃ রাষ্ট্র কর্তৃক কাউকে কোন সম্পত্তি দান কিংবা মাথাপিছু বন্টন অথবা কোন নির্দিষ্ট কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রদত্ত অর্থ বা

www.eelm.weebly.com

জায়গীরও ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের অন্যতম উপায়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল যে, যদি সরকার কোন নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে তা প্রদান করেন, তাহলে উক্ত শর্ত অবশ্যই পূর্ণ পকরতে হবে এবং যেখাতে ব্যয় করার জন্য এ অর্থ বরাদ্ধ করা হবে তা সেই খাতেই ব্যয় করতে হবে।

ব্যক্তি মালিকানার উপর সরকারি হস্তক্ষেপ ও মালিকানা সীমিতকরণের অধিকার

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিয়েছে তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করলেও সামষ্টিক অধিকারকে সংরক্ষণ করেই ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর ব্যক্তি মালিকানা ও সামষ্টিক মালিকানার জন্য পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফলে ব্যক্তি মালিকানা ও সামষ্টিক মালিকানা উভয়টির আলাদা আলাদা ব্যাপক ক্ষেত্র সূচিত হয়েছে।

এটি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট যে, তা একই সময়ে উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম তার অর্থনৈতিক বিধানাবলী এভাবে ঢেলে সাজিয়েছে; যাতে ব্যক্তিস্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত না হয় – যার পরিণতিতে ব্যক্তি তার মেধা ও শ্রমকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আবার প্রদত্ত ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা যাতে সামষ্টিক স্বার্থের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করতে পারে; একই সময়ে তার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এ-দুই মালিকানার মাঝে কোনরূপ বিরোধাভাসের সম্ভাবনা দেখা না দিয়েছে; ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রকার মালিকানাকে যথা মর্যাদায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি মালিকানা ও সামষ্টিক মালিকানার অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাঝে বিরোধাভাস পরিলক্ষিত হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা কিংবা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। আবার যেখানে ব্যক্তি স্বার্থ সামষ্টিক স্বার্থ দ্বারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে কিংবা ব্যক্তি অসহায়ত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, সেখানে ব্যক্তিকে এই চরম দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমষ্টি মানুষকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছে এবং সামষ্টিক স্বার্থকে ব্যক্তির কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাদের যাকাত, সাদাকাহ, কাফ্ফারা, সাধারণ দান ইত্যাদির মাধ্যমে তার সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। বায়তুলমাল থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে এই সংকট কাটিয়ে উঠার সুযোগ করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

যেখানে ব্যক্তি-স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থ পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়েছে সেখানে যে ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থ ও ব্যক্তি মালিকানার উপর প্রাধান্য দিয়েছে; তার কতিপয় উপমা আমরা নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, নবী বলেছেন ঃ (لايبع الحاضر لباد (بخاري مسلم অর্থাৎ শহরের কোন ব্যবসায়ী গ্রাম থেকে আগত কোন পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে বেচাকেনা করে দেবেন। কেননা পণ্যের স্থানীয় দাম সম্পর্কে শহুরে ব্যক্তি অবগত থাকবেন; এটাই স্বাভাবিক। আর ব্যবসায়ী কায়দা কানুন ও টেকনিকও তার ভালভাবে রপ্ত থাকেব। ফলে গ্রাম থেকে আগত পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে সে বেচাকেনা করে দিলে অবশ্যই তা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হবে। গ্রামীণ ব্যক্তি নিজে সরাসরি বিক্রি করলে হয়ত এত উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। অবশ্য তার জন্য শহুরে বিক্রেতাকে যদি সে দালালী বা আড়ৎদারী হিসেবে একটা অংশ দিয়েও দেয়; তবু তার লাভ নিজে বিক্রি করার চেয়ে বেশী হবে; আর স্বাভাবিকভাবে তাই হয়। এতে যদিও বিক্রেতা ও আড়তদার এই দুই ব্যক্তি লাভবান হচ্ছে, কিন্তু এর পরিণতিতে সাধারণ ভোক্তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। কেননা পণ্যের মালিক সরাসরি বিক্রি করলে ভোক্তারা যদি ১ কেজি মাছ ৬০ টাকায় ক্রয় করতেন; তাহলে দালাল কিংবা আড়ৎদারের মধ্যসত্ত্বভোগের কারণে এবং বিক্রেতার পক্ষে তদারকীর কারণে ভোক্তাদেরকে তা এখন কিনতে হবে ৮০ টাকায়। ফলে ক্রেতা সাধারণ সামষ্টিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। একারণেই রাসূল (সা.) এরূপ দালালী বা আড়ৎদারী করে পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে বিক্রি করার এ নীতেকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

২. হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ (لاتلقوا الركبان (بخاري مسلم অর্থাৎ শহরের বাইরে গিয়ে পণ্য বহনকারী মালিকদের থেকে কিছু ক্রয় করবে না। হাদীসটি যে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলা; তা বলাই বাহুল্য। কেননা শহরে পৌঁছার আগে পণ্যের মালিক থেকে পণ্য যিনি ক্রয় করে আনবেন তিনি যদি একে বাজারজাত করেন; তাহলে পণ্যের মালিক নিয়ে এসে বাজারজাত করলে যে মূল্যে করতেন, তার চেয়ে অধিক মূল্যেই বাজারজাত করবেন। কেননা একেতো তার পণ্যের স্থানীয় দাম সম্পর্কে জানা আছে, তদুপরি জানা আছে ব্যবসায়িক টেকনিক এবং তার ফিরে যাওয়ার তাড়াহুড়া নেই, আর পণ্যের উপর যেহেতু তার অনেকটা একচেটিয়া দখল রয়েছে, অতএব সে যে মূল্যে বিক্রি করবে, ক্রেতা সাধারণকে সেই মূল্যেই ক্রয় করতে হবে। কিন্তু যদি পণ্যের মালিক নিজে এসে বাজারজাত করতেন; তাহলে স্থানীয়

www.eelm.weebly.com

দাম ও ব্যবসায়ী টেকনিক সম্পর্কে ততটা অবগত না থাকার কারণে এবং বাড়ী ফিরে যাওয়ার তাড়ার কারণে, তদুপরি নিজের উৎপন্ন দ্রব্য সামান্য কম মূল্যে বিক্রি করলেও তার লোকসান হবে না বিধায় তার কাছ থেকে যতকম মূল্যে ক্রেতা সাধারণের ক্রয়ের সম্ভাবনা ছিল, নগরের বাইরে গিয়ে যিনি ক্রয় করে আনবেন তাথেকে ক্রয় করার মূহুর্তে ততকমে ক্রয় করার কোনরূপ সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে যিনি নগরের বাইরে থেকে পণ্য ক্রয় করে এনে বিক্রি করলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও যেহেতু তার এই লাভের জন্য সমষ্টি মানুষ তথা সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাই ব্যক্তিস্বার্থের উপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.) এ প্রক্রিয়াকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

৩. তাছাড়া হযরত আবইয়ায্ ইবনে হাম্মাল (রা.) নবী করীম (সা.) এর দরবারে এসে তদীয় এলাকার একটি খনি তাকে দিয়ে দেয়ার আবেদন করলে রাসূল (সা.) তাকে তা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এ খনি তাকে বরাদ্দ করলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে, তখন তিনি তা ফিরিয়ে নেন। – তিরমিযী

এ ধরনের আরো অনেক নজির পেশ করা যাবে; যার সারকথা এই যে, ব্যক্তি স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হলে; ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তবে যেখানে এরূপ বৈপারিত্য নেই, স্বাভাবিক অবস্থায় সেক্ষেত্রে ইসলাম কেবলমাত্র ব্যক্তি অধিকারকে স্বীকারই করে নেয়নি বরং তা সংরক্ষণের পূর্ণ নিশ্চয়তাও প্রদান করেছে।

ইসলামী বিধান অনুসারে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করলে; অর্জিত ব্যক্তি মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করা বা তা হরণ করার অধিকার রাষ্ট্র, সরকার বা আইন পরিষদ কারো নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, সম্পদ ও সম্মান এসবকিছুই সম্মানার্হ ও সংরক্ষিত এবং এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্বভার রাষ্ট্রই বহন করে। বিদায় হজ্জে রাসূল (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে এ ঘোষণা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ اعلموا أن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا.
জেনে রেখো, তোমাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য এই দিন ও এই নগরীর ন্যায়ই সম্মানার্হ ও হারাম।

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (مسلم)

প্রত্যেক মুসলমানের জান, মাল ও সম্মান বিনষ্ট করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হারাম।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু ইউসুফ তার কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন ঃ وليس للإمام أن يخرج شيئامن يد احدإلا بحق ثابت معروف–

www.eelm.weebly.com

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়া কারো কাছ থেকে কোন জিনিস বলপূর্বক গ্রহণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যও বৈধ হবে না। – কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৬৫-৬৬।

এ সমস্ত বর্ণনার আলোকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাভাবিক অবস্থায় কারো বৈধ মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার যেমন অন্য কোন নাগরিকের নেই, অনুরূপভাবে রাষ্ট্র প্রধানেরও নেই। তা সে ব্যক্তি প্রয়োজনেই করুক বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই করুক।

ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ বা তা সীমিতকরণ কখন বৈধ হবে

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কারো ন্যায়সঙ্গত বৈধ ব্যক্তিমালিকানার উপর হস্তক্ষেপের অধিকার কারো নেই। তবে যদি দেশে কোন কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করে, কিংবা চরম খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; তাহলে প্রথমে বায়তুল মালের সম্পদ দিয়ে তার মুকাবেলা করার চেষ্টা করা হবে। যদি তাতেও মানুষের ন্যূনতম পর্যায়ের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহলে বিত্তবানদের সম্পদ দিয় এ সংকটের মুকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হবে। তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসে; তাহলে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ জবরদস্তি আদায় করে অভাবীদের অভাব পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিত্তবানরা যদি ইতিপূর্বে তাদের উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে বর্তানো যাকাত-সাদাকাহ্ যথাযথভাবে আদায় করেও থাকে; তবুও তাদের থেকে দারিদ্র বিমোচনের স্বার্থে, ভূখানাঙ্গা মানুষের জীবন জীবিকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে তা করতে হবে।

এর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, বিশ্বচরাচরের যাবতীয় সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা। আর মানুষ হল আল্লাহর পরিবারের সদস্য। সুতরাং আল্লাহর পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করা হবে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

هوالذي خلق لكم مافي الإرض جميعا

তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় কিছু।

– সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ২৯

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার আলোকে মনে হয়, পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তিনি ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। অতএব কোন সম্পদেই কারো একচ্ছত্র নির্দিষ্ট কোন মালিকানা নেই। বরং (الخلق عيال الله) সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত বিধায় সকল বস্তুর উপরই সব মানুষের মালিকানা

www.eelm.weebly.com

সত্ত্ব রয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে সবকিছুতেই সকল মানুষের যৌথ মালিকানা রয়েছে। তবে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ যাতে না হয় এবং প্রত্যেকেই যাতে ধন-সম্পদ দ্বারা যথার্থভাবে উপকৃত হতে পারে, সেজন্য বৈধ দখল ও অধিকারকে মালিকানার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কারো মালিকানাভুক্ত সম্পদে অন্যের হস্তক্ষেপের অধিকারকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তবে মালিকের নৈতিক কর্তব্য হল নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ অন্যকে দিয়ে দেয়া। কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদে অন্যের অধিকার রয়েছে। এ কারণেই যাকাত ও সাদাকাহ যথাযথভাবে আদায় করার পরও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করে রাখা উচিৎ নয়। এমনকি কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ী তো প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জমা করে রাখাকে হারাম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

– ইযাহুল্ আদিল্লাহ্ ঃ ২৬৮

আল্-কুরআনেও ইন্‌ফাকের নির্দেশ দিতে গিয়ে সম্পদের উপর মানুষের মালিকানার ধরনটা কি তা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،

তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদে তিনি খলিফা নিযুক্ত করেছেন তা থেকে ব্যয় করো।

– সূরা ঃ ৫৭ - হাদীদ ঃ ৭

আল্লামা আলুসী বাগদাদী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে ঃ

أي جعلكم سبحانه خلفا، عنه عز وجل في التصرف فيه من غير أن تملكون حقيقة (روح المعاني ٦٨ ص٦٩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর সম্পদে প্রকৃত অর্থে মালিক না হয়ে; কেবল ভোগ ব্যয়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

সুতরাং এই ভিত্তিতে আল্লাহর সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখে আল্লাহর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে অনাহারী অভুক্ত রাখা কি করে সঙ্গত হবে? অথচ সঞ্চয়কারীর সঞ্চিত সম্পদে তাদের যথার্থ অধিকার বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন ঃ

বিত্তবানদের সম্পদের দ্বারা গরীবদের জীবন জীবিকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন। যদি গরীবরা অন্ন, বস্ত্র কিংবা অন্য কোন আর্থিক সংকটের মুখোমুখী হয়, তাহলে তা এ কারণে হবে যে, বিত্তবানরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ্র দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এজন্য তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

– মুহাল্লা, খন্ড ঃ ৬, পৃ ঃ ১৫৭

www.eelm.weebly.com

আল্লামা ইবনে হযম উল্লিখিত মতামতের স্বপক্ষে বেশ কয়েকটি হাদীসও উদ্বৃত করেছেন। যথা ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি সামর্থের উপকরণ রয়েছে; তা দুর্বলদের দিয়ে দেয়া উচিত। যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহারের উপকরণ রয়েছে; তা যার অভাব রয়েছে তাকে দিয়ে দেয়া উচিত। হযরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন, এভাবে রাসূল (সা.) বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর নাম উল্লেখ করে এমনভাবে বলছিলেন যে, আমরা বুঝতে পারলাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন দ্রব্যসামগ্রী আগলিয়ে রাখার কোন অধিকার আমাদের নেই।

– মুহাল্লা, খন্ড ঃ ৬, পৃ ঃ ১৫৭-১৫৮

হযরত আবু উবায়দা (রা.) একবার যুদ্ধের সফরে রসদে ঘাটতি দেখা দিলে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমাদের যার কাছে যাকিছু আছে তা এনে উপস্থিত কর। অতঃপর সব মাল একত্রে জড়ো করে সবার মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছিলেন। – মুহাল্লা,খন্ড ঃ ৬, পৃ ঃ ১৫৮

এ মর্মে বহু আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইবনে হযম যাহেরী (রহ.) তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ 'প্রতি মহল্লার (বা গ্রামের) বিত্তবানদের জন্য ফরয হচ্ছে, সেখানকার গরীব ও বিত্তহীনদের আর্থিক জীবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা। যদি বায়তুলমালের আয় দ্বারা বিত্তহীনদের জীবন ধারণের সংস্থান করা সম্ভব না হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বিত্তবানদের বাধ্য করতে পারবেন। (অর্থাৎ বিত্তবানদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে গরীবদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবেন) তাদের জীবনোপায়ের নূন্যতম অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলোর সংস্থান অবশ্যই করতে হবে। আর ন্যূনতম প্রয়োজন হল, জীবন ধারণ পরিমাণ আহার্য, শীত ও গরমের পরিধানের উপযোগী বস্ত্র এবং রোদ, বৃষ্টি ও গরম থেকে রক্ষা করার মত একটি গৃহ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে সকল সাহাবা ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যদি কোন লোক ক্ষুধার্ত বা বিবস্ত্র থাকে অথবা প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়, তাহলে বিত্তবানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে তার ব্যবস্থা করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। – মুহাল্লা, খন্ড ঃ ৬, পৃ ঃ ১৫৬

তাছাড়া ইসলামী ফিকায় একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, দেশে দুর্ভিক্ষ চলাকালে কেউ যদি সামগ্রী মওজুদ করে রাখে; তাহলে তাকে তা ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করার জন্য সরকার বাধ্য করবে। এমতাবস্থায় কেউ অধিকমূল্যে পণ্য বিক্রয়

www.eelm.weebly.com

করলে তাকেও ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করার জন্য সরকার বাধ্য করবে। কেউ তাতে সম্মত না হলে, তার থেকে দ্রব্য-সামগ্রী ছিনিয়ে নেয়া হবে (তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পরিমাণ রেখে) এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রি করে দেয়া হবে। কেননা এহেন কর্ম জনস্বার্থের পরিপন্থী।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ভূমির মালিকানাও আল্লাহর, আর রাষ্ট্র হল ভূমির দখলদার মালিক, আর নাগরিকরা খেরাজ কিংবা উশরের বিনিময়ে চাষাবাদের অধিকার বা সাময়িক মালিকানা প্রাপ্ত হয় মাত্র। ভূমির দখলদার মালিক যে রাষ্ট্র, নাগরিকরা যে তার পরবর্তী পর্যায়ের মালিক, তার ইঙ্গিত হাদীসে পাওয়া যায়। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ عادي الأرض الله وللرسول ثم هي لكم অনাবাদী ভূমি প্রথমে আল্লাহর অতঃপর রাসূলের (বা রাষ্ট্র প্রধানের) অতঃপর তোমাদের। – কিতাবুল আমওয়াল্, পৃ ঃ ২৭৮

তাছাড়াও দেশের সমগ্র ভূসম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের যে এক ধরনের মালিকানা থাকে তা এ থেকেও বুঝা যায় যে, পতিত ও অনাবাদী মালিকানাহীন সম্পত্তি আবাদ করার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুমতির প্রয়োজন হয়। যদি রাষ্ট্রের কোন ধরনের মালিকানা ভূমিতে না থাকত তাহলে আবাদ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হত না। অন্য কথায় একে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা বলা চলে। (ভূমির মালিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ভূমি নীতির আলোচনায় আসবে)

তাছাড়া ভূমির সাথে যেহেতু মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর জীবিকার প্রশ্ন জড়িত, কেননা আহর্যের যোগন মূলতঃ ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত ভূমির প্রাথমিক পর্যায়ের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই রেখে দিয়েছে। যাতে ব্যক্তি মালিকানার সীমাবদ্ধতা থেকে খাদ্যসংকট সৃষ্টি না হয়।

তবে উশর বা খেরাজের ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে চাষাবাদের যে অধিকার বা সামিয়ক মালিকানা দেয়া হয়, তা জনস্বার্থে কিংবা সরকারি প্রয়োজনে অথবা চাষাবাদ না করে অনাবাদী ফেলে রাখলে, রাষ্ট্র সেই অধিকার (স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করলেও) বাতিল করে দিতে পারবে এবং ব্যক্তির এই সাময়িক মালিকানা ছিনিয়ে নিতে কিংবা সংকোচিত করে দিতে পারে।

ভূমির সাময়িক মালিকানা ছিনিয়ে আনার জন্য নিম্নোক্ত কারণের কোন একটি অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে।

১. ভূমি আবাদ না করে অনাবাদী ফেলে রাখলে।
২. উৎপাদন করে রাষ্ট্রের যথাপ্রাপ্য অধিকার আদায় না করলে।
৩. জনস্বার্থে প্রয়োজন দেখা দিলে বা সরকারের প্রয়োজন হলে।
৪. ভূমি মালিকানার বৈষম্য নিরসন করে সুষম বন্টনের প্রয়োজনে।

www.eelm.weebly.com

১. ভূমি আবাদ না করে অনাবাদী ফেলে রাখলে

যেহেতু ভূমির উৎপাদনের সাথে প্রাণীকূলের জীবন জিবীকার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ভূমির সাময়িক মালিকানা ততদিন পর্যন্তই বহাল থাকবে; যতদিন তা আবাদ রাখা হবে এবং চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু কেউ তার মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি আবাদ না করে ফেলে রেখে সামগ্রিক উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এ অধিকার কাউকে দেয়া যায় না। কেননা মানুষের জীবিকা উৎপাদনের উপকরণকে অকেজো করে রেখে অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের খাদ্যঘাটতি সৃষ্টি করার অধিকার কারো নেই। সঙ্গত কারণে কেউ যদি তিন বছর পর্যন্ত আবাদ করতে না পারে তাহলেও তার অধিকার বহাল থাকবে। কিন্তু তিন বছরের পর সঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকলেও আবাদে অক্ষম ব্যক্তির নিকট ভূমি ফেলে রাখা হবে না। বরং তার নিকট থেকে এই অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। আবাদ করার শর্তে অনাবাদী জমি আবাদ করার অধিকার লাভের ঘোষণার সাথে সাথে নবী করীম (সা.) এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে ঃ

وليس للمحترف حق بعد ثلاث سنين.

তিন বছরের পর আবাদে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর ভূমিতে কোন অধিকার থাকবে না।

– কিতাবুল খারাজ, পৃ ঃ ৬৫

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম তার কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) এ সংক্রান্ত একটি মুকাদ্দমার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন ঃ

من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له (كتاب الخراج ليحي بن ادم ص ٩١ (بحواله العيني)

যদি কেউ তিন বছর পর্যন্ত ভূমি অনাবাদী ফেলে রাখে, অতঃপর (সরকারের অনুমতিক্রমে) অন্য কোন ব্যক্তি এসে তা আবাদ করে, তাহলে সে ভূমিতে দ্বিতীয় ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

কেউ যদি বিপুল জমির মালিক হয়ে বসে। আর ভূমিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার না করে অনাবাদী ফেলে রাখে। তাহলে যেহেতু সে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত থেকে নিজেও বঞ্চিত হচ্ছে এবং দেশ ও জাতিকেও বঞ্চিত করছে। বরং বলা যায় যে, সে আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎপাদন উপকরণের গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করছে না; অতএব এরূপ নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে ভূমি ছিনিয়ে আনাই যুক্তিসঙ্গত। তবে সে যতটুকু আবাদ করার সামর্থ রাখে এবং আবাদ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভূমি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে অন্য কৃষকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে।

রাসূল (সা.) আকীক নামক স্থানের বিশাল এলাকা হযরত বিলাল ইবনে

www.eelm.weebly.com

হারেস (রা.)-কে চাষাবাদের জন্য দান করেছিলেন, কিন্তু তিনি যথেষ্ট ভূমি অনাবাদী ফেলে রাখলে হযরত উমর (রা.) তার খিলাফতকালে বিলাল ইবনে হারেসকে ডেকে এনে বললেন ঃ

ان رسـولله صلى الله عليـه وسلم لم يقطعك لتـحـجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ماقدرت على عمارته ورد الباقى،

রাসূল (সা.) এই ভূমি তোমাকে দখল করে রাখার জন্য বরাদ্দ করেননি। বরং তিনি এ ভূমি তোমাকে দিয়েছিলেন যাতে তুমি তা থেকে উৎপাদন কর। সুতরাং তুমি যতটুকু উৎপাদনের কাজে লাগাবার সামর্থ রাখ, সেই পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট ভূমি ফিরিয়ে দাও। – কিতাবুল আমওয়াল - ২৯

২. উৎপাদন করে রাষ্ট্রের প্রাপ্য ওশর ও খারাজ আদায় না করলে

উৎপাদন করে রাষ্ট্র প্রাপ্য ওশর বা খারাজ আদায় না করলে তার কাছ থেকে এই ভূমি ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে। কেননা তাকে তো এই ভূমি দেয়াই হয়েছিল ওশ্‌র ও খারাজ আদায়ের শর্তে। অতএব যখন শর্ত আদায় না করা হবে তখন তা স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে আসবে। শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ

قـال فى رد المحتـار ثم لعلم أن أراضي بيت المال إذا كانت فى أيدي زراعـهـا لاتنزع من أيديهم مادامـوا يودون ما عليها.

রদ্দুল মুহতারে বলা হয়েছে যে, বায়তুলমালের ভূমি যদি কৃষকদের দখলে থাকে; তাহলে তাদের থেকে তা ছিনিয়ে আনা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তার উপর আরোপিত ওশর ও খারাজ আদায় করে যাবে। – শামী ৩য় খন্ড, পৃ ঃ ৩৫৪

এথেকে বুঝা যায় যে, ওশর খারাজ আদায় না করলে যথাবিহিত সতর্ক করার পরও কোন ফলোদয় না হলে; রাষ্ট্র তা ছিনিয়ে আনতে পারবে। তাছাড়া এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে যদি কেউ ওশর খারাজ আদায় না করে; তাহলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কিছু করার থাকবে না। এভাবে রাষ্ট্র খারাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

৩. জনস্বার্থে বা সরকারের প্রয়োজনে ভূমির প্রয়োজন হলে

সর্বসাধারণের উপকারার্থে কিংবা সর্বসাধারণের (সাধারণ বা অত্যাবশ্যকীয়) প্রয়োজন পূরণার্থে যেমন- পথ, ঘাট, অফিস, আদালত নির্মাণের প্রয়োজনে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনে, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ইত্যাদি নির্মাণ কিংবা প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের জন্য মিল-ফ্যাক্টরী ইত্যাদি স্থাপনের প্রয়োজনে সরকার বিধিসঙ্গতভাবে নাগরিকদের থেকে (যথার্থ মূল্য পরিশোধ করে কিংবা বিনামূল্যে) ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারবে। এর স্বপক্ষে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে, যথা ঃ

www.eelm.weebly.com

১. রাসূল (সা.) মদীনায় নকী (نقيع) নামক একটি স্থানকে মালিকদের থেকে নিয়ে একটি চারণভূমি গড়ে তুলেছিলেন – আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

হযরত আবুবকর জুবদা নামক একটি চারণভূমি গড়ে তুলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) রবযা নামক স্থানকে স্থানীয় জনগণের মালিকানা থেকে নিয়ে এসে সর্বসাধারণের চারণগাহ হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন সেখানকার অধিবাসী ভূমির মালিকরা আপত্তি জানিয়েছিল। তারা বলেছিল, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি এ কি করলেন? জাহেলিয়্যাতের যুগে আমরা এই ভূমির জন্য কত মারপিট করেছি, যুদ্ধ বিগ্রহ করেছি। এ জমিতে বসবাসরত অবস্থায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। অথচ আপনি আমাদের মালিকানা হরণ করে তা রাষ্ট্রায়ত্ব করে নিলেন। কিন্তু তা হয় কিভাবে?'

হযরত উমর (রা.) সহসা এর কোন জবাব দিতে পারেননি। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন ঃ

المال مال الله والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ماحميت من الأرض شبرافي شبر.

সমস্ত সম্পদের মালিক হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা, আর সকল মানুষ হল তাঁর বান্দা। আল্লাহর শপথ যদি আমি এই চারণভূমিকে আল্লাহর নামে সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত না করতাম; তাহলে কারো ভূমি থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ জমিও আমি চারণভূমির জন্য গ্রহণ করতাম না।

উক্ত চারণভূমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হযরত হানী (রা.)-কে প্রদানকালে তার উদ্দেশে হযরত উমর (রা.) যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তা ইসলামী অর্থনীতির জন্য নীতিনির্ধারকরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, হে হানী! মানুষের উপর নীপিড়ন ও নির্যাতন থেকে নিজেকে বিরত রেখো। নির্যাতিত মানুষের ফরিয়াদকে ভয় করো। কেননা তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়েই থাকে। উট ও ছাগল ভেড়ার মালিকদেরকে (পশু চারণের জন্য) হেথায় প্রবেশ করতে দিও। কিন্তু ইবনে আফন ও ইবনে আওফের পশুগুলোকে এখানে প্রবেশ করতে দিও না। কেননা তাদের পশুগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তারা খেজুর বাগান ও ক্ষেতখলার আয় দিয়ে তা পুষিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ঐসব গরীব পশুর মালিকরা; যদি তাদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তারা 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আমীরুল মু'মেনীন! বলে চিৎকার করতে করতে আসবে। অতএব ঘাস পানির ব্যবস্থা করে দেয়া আমার জন্য সহজ হবে, না সোনা-রূপা দিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ করা আমার জন্য সহজ হবে? মূলতঃ সেটা তাদেরই ভূমি, সেই ভূমির অধিকার রক্ষা করার জন্য তারা জাহেলিয়্যাতের যুগে লড়াই করেছে, এ ভূমির

www.eelm.weebly.com

উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর আজকে তারা দেখছে যে, আমরা তাদের প্রতি জুলুম করছি। বস্তুতঃ আল্লাহ্র পথে ভার বহনকারী ঐসব জন্তুগুলো যদি না হত, তাহলে আমি তাদের নগরীর সামান্য অংশও চারণভূমি গড়ে তোলার জন্য গ্রহণ করতাম না। – বুখারী, আবু উবায়দ-কিতাবুল-আমওয়াল, পৃ. ৩৭৬, নায়লুল আওতার - ৫ ঃ ৩৪৬

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও হযরত উমর (রা.)-এর উপরোক্ত ঘোষণার আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণের প্রয়োজনে কিংবা সরকারি প্রয়োজনে অথবা জনস্বার্থে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবে এবং জনস্বার্থে ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের কাজে তা ব্যবহার করতে পারবে। ফিকাহ্র একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান রয়েছে যে, নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকারে রাষ্ট্র প্রধানের হস্তক্ষেপের বিষয়টি জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য এজন্য সরকারকে পূর্বাহ্নে আদালতের নিরপেক্ষ রায় গ্রহণ করতে হবে এবং মালিককে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. ভূমি মালিকানার বৈষম্য নিরসন ও সুষম বন্টনের প্রয়োজনে

উপরোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে, যে দেশে বা যে অঞ্চলে অসম ভূমিবন্টন নীতির ফলে কিংবা সামন্তবাদী ভূমি মালিকানার ভারসাম্যহীন নীতির ফলে দেশের সাধারণ কৃষকরা বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং তারা ভূমিহীন হয়ে অত্যন্ত করুণ ও মার্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে অসহায় জীবন যাপণ করছে, সেখানে জনগণের মাঝে ভূমি মালিকানায় ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমি নীতির সংস্কারকল্পে প্রয়োজনবোধে ভূমি মালিকানা সীমিতকরণের অধিকারও ইসলামী সরকারের থাকবে। কেননা একজন বিশাল ভূখন্ডের দখল আগলে বসে থাকবে, আর অন্যান্য মানুষ চাষাবাদের জন্য সামান্য ভূমির অভাবে না খেয়ে মরবে এরূপ অবিচার অবশ্যই মেনে নেয়া যায় না। তাছাড়া এরূপ বিশাল ভূখন্ডের মালিকের একার পক্ষে এসব আবাদী ভূমির চাষাবাদ, রক্ষণাবেক্ষণ, ফসল সংগ্রহ, স্বাভাবিকভাবে খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষেতমজুর নিয়োগ করেই তাকে এসব কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা দেয়া হয়না বরং এসব ভূ-স্বামীদের দ্বারা ক্ষেতমজুররা চরমভাবে শোষিত হয়। এমনকি অনেক জমি অনাবাদীও পড়ে থাকে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং দেশ ক্রমে খাদ্য সংকটের দিকে এগিয়ে যায়। যা দেশ ও জাতির সামগ্রিক ক্ষতিকে অপরিহার্য করে তোলে। সুতরাং সরকার যদি মনে করে যে, এক ব্যক্তিকে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হতে দিলে দেশের নাগরিকদের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার এবং

www.eelm.weebly.com

বিপুলসংখ্যক মানুষের ভূমিহীন, বেকার ও উপার্জন থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে; তাহলে এই ক্ষতি থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য ভূমির ব্যক্তি মালিকানাকে যথার্থ বিধানের আওতায় একটি সীমিত পরিমাণ পর্যন্ত সংকোচিত করে দেয়ার অধিকার সরকারের অবশ্যই থাকবে। এ ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ ইসলামী ফিকার মূলনীতি سد الذرائع (ক্ষতি প্রতিরোধের নিমিত্ত আইন)-এর আওতায় অবশ্যই বৈধ হবে। তাছাড়া পণ্য মওজুদ করে কিংবা অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে চাইলে যদি সরকার একটি নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে মালিককে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারে, তাহলে ভূমির মালিকানা সীমিত করনের অধিকার অবশ্যই থাকবে। কেননা এখানেও তার সম্ভাব্য লাভের পরিমাণকে সীমিতই করা হয় মাত্র। কেননা ভূমির দখলদার মালিক তো মূলতঃ রাষ্ট্র।

তবে জনস্বার্থে ও সামষ্টিক কল্যাণের উদ্দেশে এহেন কিছু করার জন্য সরকারকে পূর্বাহ্নে আদালতের নিরপেক্ষ রায় গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিককে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা উপরোক্ত এ বিধান ইসলামে কোন সাধারণ নীতি বা স্থায়ী আদর্শরূপে স্বীকৃত নয়। সাধারণ স্বীকৃত নীতি হল ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃত ও তা সংরক্ষণ করা এবং রাষ্ট্রই এর জন্য দায়িত্বশীল।

www.eelm.weebly.com

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয় অর্থনৈতিক পরিভাষা

অভাব

অভাব কাকে বলে?

সাধারণ অর্থে অভাব বলতে আর্থিক অনটন ও অসচ্ছলতাকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় অর্জন করার সামর্থ আছে এমন যে কোন সামগ্রী লাভ করার ইচ্ছা ও আকাংখাকে অভাব বলে। একজন শ্রমিক বা ভিক্ষুকের মোটর গাড়ি ক্রয়ের ইচ্ছাকে অর্থনীতির ভাষায় অভাব বলা হয় না। বস্তুতঃ জীবন ধারণের প্রয়োজনে অথবা স্বাচ্ছন্দ্যভোগ কিংবা বিলাস ব্যসনের উদ্দেশে মানুষের মনে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী কিংবা সেবা-আর্তি লাভের যে ইচ্ছা বা আকাংখার সৃষ্টি হয়; অর্থনীতির পরিভাষায় তাকেই অভাব বলে। এই অভাব একদিকে পৃথিবীর সকল মানুষকে যেমন কর্মচঞ্চল রাখে, সকল কর্মপ্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করে; তেমনি এই অভাব পৃথিবীর সকল অনাচার ও বিপর্যয়ের কারণও হয়ে থাকে।

মানুষের অভাবের কোন শেষ নেই। একটি অভাব পূরণ হওয়ার সাথে সাথে আরও বহু অভাব দেখা দেয়। এই অভাব কোন দিনই শেষ হয় না। এর কারণ জীবন মানের যেবিন্দুতে প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থান, সে স্তরের অভাবগুলো পূরণ হওয়ার সাথে সাথে তার চেয়ে উর্ধ্বমানের অভাবগুলো তার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে এবং সেগুলো পূরণ করা তখন তার কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে অভাব কেবল বেড়েই চলে। উদাহরণ স্বরূপ যার একটি ঘর নেই; সে শুধু একটি ঘরের অভাব বোধ করে এবং মনে করে একটি ঘর তৈরি করতে পারলেই তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু যেদিন তার ঘর তৈরি হয়ে যায়; তার পরদিন থেকে তার মনে ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব বোধ হয়। প্রয়োজনীয় আসবাব যখন সংগ্রহ হয়ে যায়; তখন আরাম আয়েশের উপকরণগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও অভাব তার কাছে তীব্র হয়ে উঠে। আরাম আয়েশের উপকরণগুলো সংগ্রহ হয়ে গেল; বিলাসী উপকরণের অভাব তার কাছে তীব্র হয়ে উঠে। সেও যদি পূর্ণ হয়ে যায়; তাহলে উন্নত রুচিবোধের প্রশ্ন তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। তখন পুরাতন আসবাবপত্র পরিবর্তন করে অত্যাধুনিকতার সাথে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন আসবাব উপকরণ সংগ্রহের অভাব সে তীব্রভাবে অনুভব করে। আর পৃথিবী যেহেতু নিত্য পরিবর্তনশীল সুতরাং তার অভাবও নিত্য নতুনভাবে দেখা

www.eelm.weebly.com

দেয়। ফলে অভাবের গোলক ধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের জন্য কোন দিনই সম্ভব হয় না। সুতরাং বুঝাই যায় যে, অভাব একটি আপেক্ষিক বিষয়।

এটুকু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, উপরোল্লিখিত অভাবগুলোর ধরন এক নয়। কোন কোন অভাব অতীব প্রয়োজনীয়, যা পূরণ না করলেই নয়। আর কিছু অভাব এমনও রয়েছে, যা পূরণ না করলেও কোনক্রমে জীবন নির্বাহ করা যায়। আবার কিছু অভাব এমনও রয়েছে, মানুষ হিসেবে জীবন নির্বাহের জন্য সেগুলো পূরণ করার কোনই প্রয়োজন নেই সুতরাং সব অভাবের তীব্রতা সমান নয়।

সাধারণভাবে অভাব অসীম হলেও মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় অভাবগুলো সীমিত। প্রয়োজনীয় অভাবগুলো পূরণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একটি অসীমতার দুষ্ট চক্র রয়েছে। যেমন ঃ একজনের একটি ঘরের অভাব রয়েছে। মাটি কিংবা খড়-বনের ঘর তৈরি করেও সে অভাব পূরণ করা যায়, আবার টিনের চালা তৈরি করেও সে অভাব পূরণ করা যায়, কিংবা হাফ বিল্ডিং তৈরি করেও সে অভাব দূর করা যায়। আবার উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক ডিজাইন সম্বলিত, কারুকার্যমন্ডিত, অত্যাধুনিক সুবিধাদিসহ একটি উন্নত প্রাসাদ নির্মাণ করেও সে অভাব পূরণ করা যায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, অভাব পূরণের একাধিক বিকল্প রয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেকোন একটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তা পূরণ করা যায়।

একটি অভাব মিটানোর প্রয়াস সম্পূরক অনেকগুলো অভাবকে অপরিহার্য করে তোলে। যেমন- যাতায়াতের সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য কেউ যদি একটি গাড়ির অভাব বোধ করে; তাহলে একটি গাড়ি ক্রয় করলে সে অভাব মিটে যায়। কিন্তু গাড়ি ক্রয়ের সাথে সাথে অনেকগুলো নতুন অভাব অনুভূত হয়। যেমন - গাড়ি চালানোর জন্য একজন ড্রাইভার, গাড়ির জ্বালানীর জন্য পেট্রোল, গাড়ি রাখার জন্য একটি গ্যারেজ, গাড়ি নষ্ট হলে তা মেরামতের জন্য একজন মেকানিকের অভাব দেখা দেয়।

অভাব পূরণের উপায় ও উপকরণ সবসময় সীমিত বলে মানুষ একই সময়ে তার সবগুলো অভাব পূরণ করতে পারে না। যে অভাবের তীব্রতা বেশি এবং যে অভাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো মানুষ প্রথমে পূরণ করতে চেষ্টা করে। তারপর সঙ্গতি থাকলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো গুরুত্বের পর্যায় ভেদে ক্রমঅগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করে থাকে। এদিক বিবেচনায় একটি অভাব আরেকটি অভাবের প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিযোগী হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায় যেটি অগ্রাধিকার পায় সেটিই পূরণের জন্য বিবেচিত হয়।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ তার জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে যে অভাবগুলো বোধ করে সেগুলোকে

www.eelm.weebly.com

সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ১. প্রয়োজনীয় অভাব, ২. আরাম প্রিয়তাজনিত অভাব, ৩ বিলাস ও বিনোদনজনিত অভাব, ৪ পারিপার্শ্বিকতার চাপ ও অনুকরণপ্রিয়তাজনিত অভাব।

১. প্রয়োজনীয় অভাব ঃ যে অভাবগুলো পূরণ না করলে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে; সেগুলোকে বলা হয় প্রয়োজনীয় অভাব। যেমন - অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব। অনেক সময় অভ্যাসজনিত কারণে প্রয়োজনীয় নয় এমন বস্তুও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন - চা খোরের জন্য চা, পান খোরের জন্য পান ইত্যাদি। তবে অভ্যাসজনিত প্রয়োজনগুলো মনের দৃঢ়তা দ্বারা বর্জন করা যায়।

২. আরাম প্রিয়তাজনিত অভাব ঃ আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপনের জন্য যেসব দ্রব্যের প্রয়োজন দেখা দেয়; সেগুলোর অভাবকে বলা হয় আরামপ্রিয়তাজনিত অভাব। যেমন - স্বাস্থ্যকর ও মনোরম বাসস্থান, উন্নত খাদ্য, রুচিসম্মত পোষাক ইত্যাদি। অবশ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর তারতম্য ঘটে। যেমন - একজনের জন্য যা বিলাসী খাদ্য; অন্যজনের জন্য তা অবশ্য প্রয়োজনীয় হতে পারে।

৩. বিলাস ও বিনোদনজনিত অভাব ঃ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, আরাম আয়েশকেও বৃদ্ধি করে না; শুধুমাত্র জাকজমক ও অহমিকা প্রদর্শন, সুক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও অতিরুচিশীলতার বাস্তবায়নের জন্য যেসব দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; সেসব দ্রব্যের অভাববোধকে বলা হয় বিলাস ও বিনোদনজনিত অভাব। যেমন - কারুকার্যমন্ডিত আসবাবপত্র, মূল্যবান অলংকার, দামী গাড়ি, অতি উন্নত আহার্য ইত্যাদি। দরিদ্র দেশে এধরনের বিলাস ও বিনোদনমূলক সামগ্রীর ভোগ ও ব্যবহার সীমিত সম্পদের অপচয় বৈ কিছু নয়।

৪. অনুকরণপ্রিয়তা ও পারিপার্শ্বিকতার চাপজনিত অভাব ঃ মানুষ অনুকরণপ্রিয়তার প্রভাব দোষে-দুষ্ট এক প্রাণী। অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কাউকে নতুন কিছু করতে দেখলে; নির্বিচারে তার অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। তার চতুর্পার্শের মানুষকে সে যা করতে দেখে, যেভাবে তাদেরকে জীবন যাপন করতে দেখে; অবচেতনভাবে তারই অনুকরণ সে করতে চায়। সেরূপ করতে না পারাকে সে নিজের ব্যর্থতা মনে করে। পাশের বাসায় টেলিভিশন আছে, অতএব আমার বাসায় না থাকলে তাদের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে হয়। এভাবেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের মনোজগতে অবচেতনভাবে এক ধরনের অভাব সৃষ্টি করে। এই অভাব মূলতঃ পারিপার্শ্বিকতার চাপ ও অনুকরণপ্রিয়তাজনিত অভাব। এই অভাবে অভাবী ব্যক্তি চরম সংকটের মাঝে জীবন যাপন করে। কেননা অনেকের বেলায় তা "সাধ আছে সাধ্য নেই" এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই সাধ পূরণ করার জন্য তখন মানুষ মরিয়া হয়ে

www.eelm.weebly.com

উঠে। বৈধ অবৈধের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই সে তখন উপার্জন করতে চেষ্টা করে। এহেন চাপ মানুষকে অবৈধ পথে পা বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে।

বস্তুতঃ শেষোক্ত দুই প্রকারের অভাব দুরিভূত করার জন্য মানুষের ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। বিলাস বিনোদনে লিপ্ত ব্যক্তিরা যদি নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন, তারা কি খেয়ে, কি পরে জীবন ধারণ করে; এ নিয়ে যদি তারা ভাবেন, তাহলেই তাদের বিনোদন ও বিলাস প্রিয়তার অবসান ঘটতে পারে। এ কারণেই হাদীসে রাসূল (সা.) দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রশ্নে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিম্ন পর্যায়ের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেছেন।

আর ভোগ বিলাসের তো কোন শেষ নেই, যে যত ভোগ বিলাসে জীবন যাপন করুক; তার চেয়ে আরেক জনের বিলাসী উপকরণ বেশি থাকতে পারে। আর প্রত্যেকেই যদি উর্ধ্বতন ব্যক্তির অনুকরণ করতে চেষ্টা করে; তাহলে কারোই আয়ের দ্বারা তা পূরণ করা সম্ভব হবে না, আর পৃথিবীর সীমিত সম্পদ দিয়ে তা পূরণ করাও সম্ভব হবে না। উপরন্তু এহেন চেতনা মানুষের হতাশা ও উদ্বিগ্নতার কারণ হবে। তারচেয়ে প্রত্যেক মানুষ যদি তার প্রয়োজনকে সীমিত করে; অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করে; আর এতটুকুতেই সে সন্তুষ্ট থাকে; তাহলে সে নিজেকে আর অভাবী মনে করবে না বরং সীমিত প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলেই অনাবিল মানসিক প্রশান্তি নিয়ে অনায়াসেই তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। আর প্রত্যেকেই যদি এই নীতি অনুসরণ করে চলে; তাহলে পৃথিবীর সীমিত সম্পদ সকল মানুষের অভাব ও চাহিদা মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত হয়েও অতিরিক্ত থেকে যাবে। আর তা না করে যদি প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ বিলাসী ব্যক্তির জীবনমানের অনুকরণ করতে শুরু করে; তাহলে কারোই চাহিদা পূর্ণ হবে না এবং প্রত্যেকের কাছেই তার আয়; তার অভাব ও প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত মনে হবে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে; যদি তার দ্বিগুণ সম্পদও সরবরাহ করা হয়; তবুও মানুষের অভাব মিটবে না। কারণ যে যত সম্পদ লাভ করবে; তার চেয়ে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশা তার থেকে যাবে। ফলে যথেষ্ট প্রাচুর্যের মাঝে জীবন যাপন করেও প্রত্যেকেই এক অনন্ত বুভুক্ষতার মাঝে দিন কাটাবে। এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করতেই রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

الغني غنى النفس বস্তুতঃ মনের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।

প্রথমোক্ত অভাব অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অভাব পূরণের বিষয়টিকে ইসলাম শুধু অনুমোদনই করেনি বরং তা পূরণের জন্য মানুষকে উৎসাহিতও করেছে। হাদীসে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ كسب الحلال فريضة بعد الفرائض

হালাল রিযৃকের অনুসন্ধান করা আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ আদায়ের পর

www.eelm.weebly.com

অন্যতম ফরয। কুরআনে কারীমের বিস্তর আয়াতেও এ মর্মে অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার অভাব পূরণের বিষয়টি ইসলাম সীমিত পর্যায় পর্যন্ত অনুমোদন করলেও এ ব্যাপারটিকে মোটেই উৎসাহিত করেনি বরং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো পূরণ করে পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করার জন্য উৎসাহিত করেছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرسبيل

দুনিয়ায় এমনভাবে জীবন যাপন কর; যেন তুমি একজন বিদেশী অথবা পথিক। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বিদেশ বিভুঁইয়ে বেড়াতে গেলে কিংবা কোথাও সফরে গেলে আরাম আয়েশের উপকরণ যেমন সঙ্গে নেয় না বরং পথের বোঝা হালকা করার জন্য যা না হলেই নয়, কেবল তাই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়। তেমনি হোক তোমার দুনিয়ার জীবন অর্থাৎ যা না হলেই নয়, কেবল তাই নিয়ে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে যাবে। আরাম আয়েশ ও বিলাসী উপকরণের প্রতি মনোনিবেশ করবে না।

একবার জনৈক সাহাবী এসে আল্লাহর রাসূলের (সা.) নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি কি ফকীর নই? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি আছে? উত্তরে সে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে, শীত গ্রীষ্মে আশ্রয় নেয়ার জন্য একটি ঘর আছে; আর একজন চাকরও আছে। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তো তুমি প্রাচুর্যের মাঝেই বাস করছ। সে বলল, আমার একটি ঘোড়াও আছে। এ শুনে রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তুমি সম্রাটের ন্যায়ই জীবন যাপন করছ। – মিশকাত

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম অতীব প্রয়োজনীয় অভাবগুলো পূরণ করাই মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট মনে করে। আরামপ্রিয়তাজনিত অভাবগুলো পূরণের অনুমিত ইসলাম তখনই দেয়; যখন দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় অভাবগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। একজন খেতে পারবে না আরেকজন আয়েশী জীবন যাপন করবে এহেন ইনসাফ বিরোধী বিষয় ইসলাম কখনই অনুমোদন করতে পারে না। এ কারণেই দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আহারের জন্য মিহিন আটার রুটি পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার দেশের সব নাগরিক এ ধরনের আটার রুটি খেতে পারে তো? তা না হলে আমি কি করে তা আহার করব? হ্যাঁ, সামগ্রিক প্রাচুর্য দেখা দিলে তখন অপচয় না করে আয়েশী জীবন যাপন করা যেতে পারে। তবে ইসলাম কৃচ্ছতার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অনাড়ম্বর সাদাসিধে জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

www.eelm.weebly.com

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

অতীব প্রয়োজনীয় অভাবগুলো সুষ্ঠুভাবে পূরণের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য।

সম্পদ সীমিত আর মানুষের চাহিদা অসীম। তাই একদিকে যেমন চাহিদাকে সীমিতকরণ করতে হবে; অন্যদিকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকটিকেও নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্‌সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে অপচয়কেও রোধ করতে হবে। কেননা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ ছাড়া পৃথিবীর সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের চাহিদাগুলো মিটানো কিছুতেই সম্ভব হবে না।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে আল্-কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

هوالذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم

তিনিই তো তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন এবং কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদাগত প্রাধান্য দিয়েছেন যাতে তিনি প্রদত্ত বিষয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন (যে তোমরা তার যথার্থ ব্যবহার কর কি না)।

إنا خلقنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا

নিশ্চয়ই আমি ভূ-পৃষ্ঠের উপর যা কিছু রয়েছে তা তারই সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে এ দ্বারা উত্তম কর্ম সম্পাদন করে।

আয়াতে উল্লিখিত أحسن عملا বা উত্তম কর্ম বলতে যা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এ ধরনের কাজকর্মকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় নয় তা অবশ্যই উত্তম কর্ম হবে না। সুতরাং আয়াতের স্বাভাবিক আবেদন হল সম্পদকে যথার্থ খাতে প্রয়োজন মুতাবিক খরচ করতে হবে। এটাই মহান আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচকারীকে আল্-কুরআনে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين অবশ্যই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

সম্পদের সর্বশেষ কণাটিও যাতে অপচয় না হয়; এজন্য আহারকালে খাদ্যের সামান্য এক টুকরা মাটিতে পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলাকে নবী (সা.) সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন। আহারের পর প্লেটে যে সামান্য খাদ্যকণা ও ঝুল লেগে থাকে; সেটুকুও চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মাংসের হাড়গুলো ভাল করে চিবিয়ে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে খাদ্য অপচয় রোধের কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এসব বিধানে নিহিত রয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে যাতে খাদ্যের অপচয় না

www.eelm.weebly.com

করা হয় এর প্রতিও ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা একজন মানুষ যত বেশিই আহার করুক; তার দেহের জন্য যা প্রয়োজন তা ব্যবহৃত হয়ে অবশিষ্ট অংশ বর্জ্য হয়ে মল-মূত্র আকারে বের হয়ে যাবে। তাছাড়া অতিরিক্ত আহার নানারূপ রোগ-ব্যাধির কারণ হয়ে থাকে। যার চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেও কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। অথচ পরিমিত আহার একদিকে যেমন অপচয় রোধ করে, অন্যদিকে আহার্য বস্তু দেহের প্রয়োজন পূরণে সর্বোচ্চহারে কাজে লাগে এবং রোগ-ব্যাধি থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। এ কারণেই রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমার পেটকে তিনভাগে ভাগ কর, একভাগ আহার্য দিয়ে পূর্ণ কর, একভাগ পানীয় দিয়ে পূর্ণ কর, আর একভাগ আল্লাহর যিকির-আযকারের জন্য খালি রেখে দাও। স্বস্তির সাথে কাজ-কর্ম করার জন্য পেট পূর্ণ করে আহার না করা উচিৎ। এতে অস্বস্তি বাড়ে ও কাজ কর্মে অলসতা ও গাফলতি সৃষ্টি হয়। এমনকি অধিক পরিমাণে আহার করলে স্মৃতি শক্তির উপরও চাপ পড়ে। পরিমিত আহারের অন্যান্য উপকারের সাথে সাথে খাদ্যের অপচয় রোধেও বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

সারকথা ইসলাম সম্পদের অপচয় রোধ ও তার যথার্থ ব্যবহারকে নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আবার চাহিদাকে সীমিত করণের পরামর্শ দিয়ে মানুষের চাহিদাকে অতীব প্রয়োজনীয়তার গন্ডিতে আবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে এই অর্থনীতিতে এমন একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে যে, সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা একমাত্র ইসলামী অর্থনীতির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অন্য কোন অর্থনীতি দ্বারা এটা সম্ভব নয়। এ নীতি প্রয়োগ করেই দারিদ্রে জর্জরিত আরবের ভূমিতে মাত্র দুই যুগের প্রচেষ্টার ফলেই অনাকাংখিত প্রাচুর্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। সেই প্রাচুর্যের যুগে এক পথিক সাহাবী পানি চেয়ে মধুর শরবত পেয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, আমার ভয় হচ্ছে যে, আখেরাতের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা?

সম্পদের উপযোগ

উপযোগ কাকে বলে?

সাধারণ অর্থে উপযোগ বলতে কোন দ্রব্যের উপকার করার যোগ্যতাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় কোন দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ মেয়ার্স বলেন, "উপযোগ হল কোন দ্রব্যের ঐ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে"। যেমন খাদ্য মানুষের ক্ষুধা মিটায়. বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করে, বাসস্থান আশ্রয় নেয়ার স্থানের

www.eelm.weebly.com

অভাব মিটায়, সেবা আরোগ্য লাভে সহযোগিতা করে। সুতরাং বস্তুগত বা অবস্তুগত কোন দ্রব্য যদি মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণে কাজে লাগে তাহলে তার উপযোগ আছে বলতে হবে।

উপযোগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন

১. উপযোগ একটি মানসিক অনুভূতি মাত্র। কেননা কোন দ্রব্যের অভাববোধ একটি মানসিক বিষয় এবং তা পূরণ হওয়াও একটি মানসিক বিষয়।

২. স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই দ্রব্যের উপযোগ কমে ও বাড়ে। যে স্থানে, যে কালে, যে ব্যক্তির নিকট যে দ্রব্যের অভাব যত বেশি হয়; সেই স্থানে, সেই কালে, সেই ব্যক্তির নিকট সেই দ্রব্যের উপযোগ তত বৃদ্ধি পায়। আবার যে স্থানে, যে কালে, যে ব্যক্তির নিকট দ্রব্যর অভাববোধ কমে যায়; সেই স্থানে, সেই কালে সেই ব্যক্তির নিকট উক্ত দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস পায়।

৩. উপযোগের ক্ষেত্রে বৈধ অবৈধের তারতম্য নেই। কেননা অনেক সময় অবৈধ ও ক্ষতিকর দ্রব্যেও উপযোগ থাকতে পারে। তবে এ ধরনের উপযোগকে মানুষ কাজে লাগাতে পারবে কি না এনিয়ে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) মনে করেন যে, হারাম দ্রব্যের কোন উপযোগ মানুষের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কেননা হারাম দ্রব্যে মানুষের জন্য কল্যাণকর কোন উপযোগ নেই। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) মনে করেন যে, ঐ হারাম দ্রব্যের কোন বিকল্প না থাকার বিষয়টি যদি চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়; আর সেই হারাম দ্রব্যের উপযোগ গ্রহণ করা যদি একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে; তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত হারাম দ্রব্যের উপযোগ গ্রহণ করা যাবে।

৪. উপযোগ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। এ কারণে তা অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। যেমন একজন ব্যক্তির আম খাওয়ার তীব্র চাহিদা সৃষ্টি হল, এমতাবস্থায় সে ৫.০০ টাকা দিয়ে একটি আম ক্রয় করে খেয়ে নিলে তার চাহিদা অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে আরেকটি আম সে আর ৫.০০ টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে না। তবে চার টাকায় পাওয়া গেলে হয়ত তা ক্রয় করে অবশিষ্ট চাহিদাটুকু পূরণ করতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু দু'টি আম খাওয়ার পর তার আম খাওয়ার চাহিদা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। অতএব আরেকটি আম সে ৪.০০ টাকা দিয়েও কিনে খেতে হয়ত চাইবে না। তবে ৩.০০ টাকায় পাওয়া গেলে অবশিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য যে আরেকটি আম ক্রয় করতে পারে। সুতরাং প্রথম আমের বেলায় যে পরিমাণ উপযোগ ছিল, দ্বিতীয় আমের বেলায় তা ১.০০ টাকা পরিমাণ কমে গেছে। আবার দ্বিতীয় আমের বেলায় যে পরিমাণ উপযোগ ছিল তৃতীয় আমের বেলায় তার চেয়েও ১.০০ টাকা কমে গেছে। সুতরাং তিনটি

www.eelm.weebly.com

আমের প্রত্যেকটির যে মূল্যমান দাঁড়িয়েছে; তাই তার উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় করে দিচ্ছে এবং তিনটির সর্বমোট যে দাম দাঁড়িয়েছে; তাই সেগুলোর সর্বমোট উপযোগের পরিমাণ নির্দেশ করছে। নিম্নের ছকে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে।

প্রতিটি আম	মূল্য	উপযোগ
১ম আম	৫.০০	৫
২য় আম	৪.০০	৪
৩য় আম	৩.০০	৩
আমের মোট সংখ্যা ৩টি	মোট মূল্য =১২.০০	মোট উপযোগ = ১২

মোট উপযোগ

উপরের তালিকা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই মোট উপযোগ। (যেমন - ১ম আম - ৫ + ২য় আম - ৪ + ৩য় আম - ৩ = ১২) অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকৃত দ্রব্যের মোট উপযোগ = দ্রব্যের ১ম এককের উপযোগ + ২য় এককের উপযোগ + ৩য় এককের উপযোগ + ------। উল্লেখ্য যে, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন - ১টি আমের উপযোগ ৫ হলে দু'টি আমের মোট উপযোগ ১০ হওয়ার কথা। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে ৫+৪=৯। অনুরূপভাবে তিনটি আমের উপযোগ ৫×৩=১৫ হওয়ার কথা। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে ৫+৪+৩=১২।

প্রান্তিক উপযোগ

কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের একটি একক ভোগের পর অতিরিক্ত আরেকটি একক ভোগ করলে মোট উপযোগ পূর্বের চেয়ে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। যেমন একটি আমের উপযোগ ছিল ৫; এখন দ্বিতীয় আমটি ভোগ করার ফলে মোট উপযোগ যদি ৯ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় আমের প্রান্তিক উপযোগ দাঁড়ায় ৪। এখানে প্রথম এককের মোট উপযোগ ৫-এর সঙ্গে অতিরিক্ত ১টি আম ভোগের ফলে তার উপযোগ ৪ যোগ হয়ে মোট উপযোগ ৯-এ এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় আমটির প্রান্তিক উপযোগ হয়েছে ৪।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য

বস্তুতঃ দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি হল মোট উপযোগ, আর প্রতিটি অতিরিক্ত এককের জন্য ভোক্তার নিকট যে পরিমাণ উপযোগ বিচার্য হয়; তাহল প্রান্তিক উপযোগ।

www.eelm.weebly.com

মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। কেননা প্রান্তি উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। তাই প্রতিটি এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে পেয়ে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক উপযোগ কখনো শূন্যের কোঠায় চলে যেতে পারে। কেননা ভোগের এক পর্যায়ে ভোক্তার অভাব শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্যের কোঠায় নেমে আসে তখন মোট উপযোগ যা দাঁড়ায় সেটাই সর্বোচ্চ মোট উপযোগ। ভোক্তার চাহিদা ফুরিয়ে যাওয়ার পর যদি কোন কারণে তাকে দ্রব্য ক্রয়ে বাধ্য হতে হয় (যেমন বন্ধু বান্ধবের চাপে পড়ে) তাহলে তখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে যায়। তখন মোট উপযোগ কমতে থাকে।

নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করার চেষ্টা করা হল ঃ

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম ,,	৫	৫
২য় ,,	(৫+৪)=৯	৪
৩য় ,,	(৯+৩)=১২	৩
৪র্থ ,,	(১২+০)=১২	০
৫ম ,,	(১২-৩)=৯	-৩

উপরের আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বেরিয়ে আসে

১. মোট উপযোগ হল ভোগকৃত দ্রব্যের সবগুলো এককের উপযোগের সমষ্টি। আর প্রান্তিক উপযোগ হল অতিরিক্ত এক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। অতএব প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগের একটি অংশ।

২. দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। তাই মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

৩. যখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় তখন মোট উপযোগ সর্বাধিক হয়।

৪. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ হ্রাস পায়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধি

যদিও মানুষের অভাব অসীম; কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অভাব অসীম নয় বরং তার একটি সীমা রয়েছে-এই অর্থে যে একটি নির্দিষ্ট অভাবের পরিতৃপ্তি সম্ভব। কেননা একজন ব্যক্তি একটি দ্রব্য যতবেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পায়। হ্রাস পেতে পেতে এক সময় তা শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। তারপর এমন একটি পর্যায় আসে, যখন ঐ দ্রব্যটি টাকা দিয়ে ক্রয় করাকে সে অপ্রয়োজনীয় বরং ক্ষতিকর ভাবতে শুরু করে। তখনই প্রান্তিক

www.eelm.weebly.com

উপযোগ ঋণাত্মক হয়। ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের এই প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধি বলে।

কতগুলো অনুসিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এই বিধিটি কার্যকর হয়। এই অনুসিদ্ধান্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটলে বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে। অনুসিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১. সবগুলো এককের ব্যবহারকালে ভোক্তাকে স্বাভাবিক বিচার সম্পন্ন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী থাকতে হবে। ভোক্তার বিচার বুদ্ধি লোপ পেলে বিধিটি তার বেলায় কার্যকর নাও হতে পারে।

২. ভোগকালীন সময়ের মধ্যে ভোক্তার আয়-উপার্জন, রুচি-পছন্দ ইত্যাদি অপরিবর্তনীয় থাকতে হবে।

৩. ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো পরিমাণের দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ের সমতার অধিকারী হতে হবে।

৪. ভোক্তাকে উক্ত দ্রব্যের সবগুলো একক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোগ করতে হবে।

বিধিটির ব্যতিক্রম

এই বিধি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বিধিটির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

১. ভোগকালীন সময়ে ভোগকৃত দ্রব্যের অনুকূলে ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস বৃদ্ধি পেলে পরবর্তী এককের ভোগের সময় তার প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়তে পারে।

২. আকাংখার তুলনায় ভোগকৃত দ্রব্যের একক যদি ক্ষুদ্র ও অপরিমিত হয় তাহলে পরবর্তী এককের প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩. দ্রব্যের এককগুলো ভোগের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান বেশি হলে বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমটি ভোগের পর দ্বিতীয়টির প্রান্তিক উপযোগ বাড়তেও পারে।

৪. ভোগকালীন সময়ে ভোক্তার আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়তে পারে।

৫. সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশায় মানুষ যখন কোন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়; তখন বিধিটি কার্যকর হয় না। সেক্ষেত্রে বরং বিলাস দ্রব্যের ক্রয় বাড়লে তার প্রান্তিক উপযোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

www.eelm.weebly.com

৬. সখ ও নেশাকর দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রমবর্ধমান আসক্তির দরুণ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

৭. টাকা-পয়সা, মুদ্রাজাতীয় পদার্থ এবং প্রাচীন ও দুর্লভ বস্তুসমূহ সংগ্রহের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। তাই এসব ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না। এসকল ক্ষেত্রেও প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়তে থাকে।

ভোগ

সাধারণ অর্থে ভোগ বলতে কোন দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে তা নিঃশেষ করে ফেলাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় অভাব পূরণের জন্য কোন দ্রব্যের উপযোগ লাভ করাকে ভোগ বলে। কেননা মানুষ কোন দ্রব্যকে একেবারে নিঃশেষ করতে পারে না। ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে মাত্র। সুতরাং দ্রব্য ব্যবহার করে মানুষ যা লাভ করে; তা হল ঐ দ্রব্যের উপযোগ। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ভাত, মাছ, তরি-তরকারী, কলম-ঘড়ি, জামা-কাপড় ইত্যাদি ভোগ করি। এর অর্থ হল আমরা এর উপযোগ গ্রহণ করি। পরে বস্তুটি রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তাতে অন্য ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন - আমরা যা আহার করি তার উপযোগ গ্রহণ করার পর তা পায়খানায় রূপান্তরিত হয় এবং তাতে কুকুরের খাদ্য কিংবা ভূমিতে সাররূপে ব্যবহারের উপযোগ সৃষ্টি হয়। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্য সামগ্রী ব্যবহার করলে তা মানুষের কোন কাজে আসে না। সেগুলো শুধু জীবনের বোঝাকেই ভারী করে। আহারের ক্ষেত্রেও দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্য গ্রহণ করলে; তা মানুষের কোন কাজে আসেনা। পায়খানারূপে তা নর্দমায় স্থান নেয়। উপরন্ত অধিক আহার স্বাস্থ্যগত বিড়ম্বনাকে বাড়িয়ে তোলে ও নানাবিধ ব্যাধির জন্ম দেয়। তাই ভোগের আধিক্য মানুষের কোন লাভ করে না। অথচ অধিক পরিমাণ ভোগের ফলে অন্যের জীবন নির্বাহ জটিল হয়ে পড়ে। একজনের অধিক পরিমাণ ভোগের কারণে অন্য মানুষ তার প্রয়োজন পূরণের জন্য একান্ত অপরিহার্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ভোগের প্রশ্নে ইসলাম সীমিত ও পরিমিত ভোগের পরামর্শ দিয়েছে। বরং নিজে কম ভোগ করে অন্যকে ভোগের সুযোগ করে দিতে উৎসাহিত করেছে।

চাহিদা

সাধারণতঃ কোন দ্রব্য লাভ করা কিংবা কোন বিষয়ে সেবা পাওয়ার আকাঙ্খাকে চাহিদা বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে নিছক আকাঙ্খাকে চাহিদা বলা হয় না। ব্যক্তির যে আকাঙ্খা পূরণ করার সামর্থ ও ইচ্ছা দুটোই রয়েছে, অর্থনীতির পরিভাষায় সে আকাঙ্খাকেই চাহিদা বলা হয়। যেমন কোন লোকের মটরগাড়ি

www.eelm.weebly.com

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। কিন্তু তা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও তা ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে সে আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা হবে না। গাড়ি ক্রয়ের জ প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সে অর্থ ব্যয় করে গাড়ি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তবেই আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা হবে। সুতরাং চাহিদার জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্য।

১. কোন দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা।

২. দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা।

মনে রাখতে হবে যে চাহিদার সাথে দাম ও সময়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং চাহিদা বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে, কোন দ্রব্য লাভের আগ্রহ ও চাহাতের পরিমাণকে বুঝায়। অর্থনীতিবিদ বেনহাম বলেছেন ঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্য যে পরিমাণ ক্রয় করা হয় তাই ঐ দ্রব্যের চাহিদা।

চাহিদা বিধি ঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চাহিদার সাথে দামের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্কটি এই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে, আবার দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দ্রব্যের দামের উপর চাহিদার নির্ভরশীলতার এ সম্পর্ককেই চাহিদা বিধি বলা হয়।

চাহিদার এই বিধি কার্যকর হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহ অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

১. ক্রেতার বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকতে হবে। ক্রেতার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেলে বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে।

২. ক্রেতার আয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

৩. ক্রেতার রুচি অভ্যাস অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

৫. ক্রেতার সংখ্যাও পূর্ববৎ অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো অপরিবর্তিত না থাকলে চাহিদা বিধি কার্যকর নাও হতে পারে।

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঃ চাহিদা বিধি কার্যকর হওয়ার জন্য যেসব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকার শর্ত রয়েছে, সেগুলোর পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না অর্থাৎ তখন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে এবং দাম কমলে চাহিদা না বেড়ে বরং কমে যেতে পারে। নিচে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

www.eelm.weebly.com

১. ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হলে ঃ ভোক্তার আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কাংখিত দ্রব্যটি দাম বাড়া সত্বেও তার চাহিদা কমবে না। আবার ক্রেতার আয় অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে দ্রব্যের দাম কমলেও তার চাহিদা বাড়বে না।

২. অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন হলে ঃ অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটবে। যেমন কারো চায়ের অভ্যাস ছিল। বর্তমানে সে চায়ের পরিবর্তে কফি পান করতে শুরু করেছে। তার বেলায় চায়ের দাম কমলেও চাহিদা বাড়বে না। আবার কেউ চা পান করলেও তার অভ্যাস ছিল না। বর্তমানে সে চায়ের নেশায় নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, তার ক্ষেত্রে চায়ের দাম বাড়লেও চাহিদা কমবে না।

৩. বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তন হলে ঃ কোন দ্রব্যের দাম স্থির থাকলেও তার চাহিদায় পরিবর্তন ঘটতে পারে যদি তার বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তন হয়। যেমন গুড়ের বিকল্প হল চিনি। যদি চিনির দাম বেড়ে যায় তাহলে গুড়ের দামে কোন পরিবর্তন না ঘটলেও গুড়ের চাহিদা বেড়ে যাবে।

আবার কলম ও কালি একটি আরেকটির পরিপূরক দ্রব্য। কালির দাম বৃদ্ধি পেলে কলমের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও তার চাহিদা কমে যাবে। আবার যদি কলমের দাম কমে যাওয়ার কারণে তার ব্যবহার বাড়ে, তাহলে কালির দাম বাড়লেও তার চাহিদা না কমে বরং বাড়বে অর্থাৎ চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

৪. ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে ঃ ভোক্তা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে একটি দ্রব্যের দাম আরও বাড়বে, তাহলে বর্তমানে ঐ দ্রব্যের দাম বাড়লেও তার চাহিদা না কমে বরং বাড়বে। আবার ভবিষ্যতে কোন দ্রব্যের দাম আরও কমার সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে তার দাম কমতে থাকলেও তার চাহিদা বাড়বে না।

৫. দ্রব্যটি যদি আভিজাত্য বৃদ্ধি ও জাঁকজমকের উপকরণ হয় ঃ কিছু কিছু দ্রব্য আছে যা ধনী ব্যক্তিদের জাঁকজমক ও আভিজাত্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন – মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, দুর্লভ চিত্র, নতুন ফ্যাশনের জামা কাপড় ও আসবাবপত্র। এ সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে তার চাহিদা না কমে বরং বেড়ে যায়। অতএব এসব দ্রব্যের বেলায় চাহিদা বিধি কাজ করে না।

৬. ভোক্তার অজ্ঞতা ঃ কোন কোন ভোক্তা অজ্ঞতা বশতঃ কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে তাকে মূল্যবান জিনিষ মনে করে, আবার দাম কমলে তাকে নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য বলে মনে করে। ফলে তার কাছে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে, দাম কমলে চাহিদা কমে। সুতরাং তার বেলায়ও চাহিদা বিধি কাজ করে না।

www.eelm.weebly.com

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদা বিধির ফর্মূলা মুতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা, অপরিবর্তিত থাকলে, দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে, আর দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির হার সবক্ষেত্রে সমান হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দামের বেশ পরিবর্তন হলেও চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি অতি সামান্য হয়ে থাকে। যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের যথেষ্ট তারতম্য ঘটলেও চাহিদার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দামের সামান্য পরিবর্তন হলেই চাহিদায় অতিমাত্রায় পরিবর্তন ঘটে। যেমন বিলাস দ্রব্যের দাম সামান্য পরিবর্তন হলেই চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি অতিমাত্রায় ঘটে। চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির এ হারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. স্থিতিস্থাপক চাহিদা বা নমনীয় চাহিদা।

২. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বা অনমনীয় চাহিদা।

১. **স্থিতিস্থাপক চাহিদা ঃ** দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার বেশি হলে সে চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় চাহিদা বলে। যেমন কোন দ্রব্যের দাম যখন ২০.০০ টাকা ছিল তখন তার চাহিদা ছিল হয়ত ১০০ একক। কিন্তু দাম কমে যদি ১৫.০০ টাকা হয় আর তখন যদি তার চাহিদা বেড়ে ১৫০ এককে এসে দাঁড়ায় তাহলে দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রে দাম কমেছে ২৫% কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০% অর্থাৎ দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি সুতরাং উক্ত দ্রব্যের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা হিসেবে গণ্য করা হবে। সাধারণতঃ বিলাসদ্রব্য টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটরগাড়ি, সৌখিন দ্রব্যাদি ইত্যাদির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে।

২. **অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ঃ** দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার কম হলে সে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। যেমন কোন দ্রব্যের দাম যখন ১০.০০ টাকা ছিল, ধরা যাক তখন তার চাহিদা ছিল ১০০ একক। দাম কমে যখন ৬.০০ টাকা হল তখন যদি তার চাহিদা বেড়ে ১২০ একক হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হার ছিল ৪০% কিন্তু চাহিদা পরিবর্তনের হার ছিল ২০%। যেহেতু এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হারের চেয়ে চাহিদা পরিবর্তনের হার কম; অতএব এটিকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে গণ্য করা হবে।

যোগান

সাধারণ অর্থে বাজারে কোন দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণকে যোগান বলে। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের

www.eelm.weebly.com

যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতা প্রস্তুত থাকেন সে পরিমাণকে উক্ত দ্রব্যের যোগান বলে। দাম ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন হয়। এ কারণে যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দামের প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যোগান ও মওজুদের পার্থক্য ঃ অর্থনীতিতে যোগান ও মওজুদ দুটি পৃথক ধারণা। বস্তুতঃ একটি দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মোট পরিমাণকে মওজুদ বলা হয়। কিন্তু ঐ মওজুদ থেকে একটি নির্ধারিত দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে ঐ পরিমাণকে ঐ দ্রব্যের যোগান বলে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একজন বিক্রেতার নিকট ৫০০ মণ বিক্রয়যোগ্য চাউল রয়েছে। এই চাউল থেকে বর্তমান বাজার দর ৭৬০ টাকা মণ হিসেবে ২০০ মণ চাউল বিক্রয় করবে বলে সে ইচ্ছা করেছে (বাকিগুলো ৮০০ টাকা মণ না হলে বিক্রয় করবে না)। তাহলে ঐ ৫০০ মণ চাউলকে মওজুদ বলা হবে; আর ২০০ মণ চাউলকে যোগান বলা হবে। সুতরাং বোঝাই যায় যে মওজুদ দাম ও সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে মওজুদের যে অংশ যোগান হিসেবে গণ্য হয়, তা একটি নির্দিষ্ট দাম ও সময়ের প্রেক্ষিতে বিক্রয়ের জন্য তৈরি থাকে।

যোগান বিধি ঃ দ্রব্যের দামের সাথে তার যোগানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যেসব বিষয় দাম ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে সেগুলো অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের যোগান তার দামের অনুগামী হয়। অর্থাৎ দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে। দাম ও যোগানের মধ্যকার এই সম্পর্ককেই যোগান বিধি বলা হয়।

উল্লেখ করা নিষ্প্রোয়জন যে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি না পেয়ে দাম বাড়লে বিক্রেতার মুনাফা বেশি হয়; সুতরাং সে যোগান বাড়াতে চেষ্টা করে। আর দাম কমলে মুনাফা কম হয়; সুতরাং বিক্রেতা উক্ত দ্রব্যের যোগান কমিয়ে দেয়। অতএব দ্রব্যের দাম যে দিকে পরিবর্তন হয়, যোগানও সে দিকেই পরিবর্তন হয়।

যেসব অবস্থাসমূহ অপরিবর্তিত থাকলে যোগান বিধি কার্যকর হয়, তা নিম্নে উল্লেখ করা গেল ঃ

১. উৎপাদন উপকরণের সহজলভ্যতা পূর্ববৎ বহাল থাকলে।

২. উৎপাদন উপকরণের দাম পূর্ববৎ বহাল থাকলে।

৩. উৎপাদন পদ্ধতি পূর্ববৎ বহাল থাকলে।

৪. প্রাকৃতিক অবস্থা পূর্ববৎ বহাল থাকলে।

৫. পরিবহন ব্যবস্থা পূর্ববৎ বহাল থাকলে।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর পরিবর্তন হলে যোগান বিধি কাজ করে না।

www.eelm.weebly.com

যোগান বিধির ব্যতিক্রম ঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যোগান বিধি কাজ করে না অর্থাৎ দাম বাড়লেও যোগান বাড়ে না; আবার দাম কমলেও যোগান কমে না। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল।

১. যোগান সীমাবদ্ধ হলে ঃ কিছু কিছু দ্রব্য এমন আছে যা পুনরায় উৎপাদন করা যায় না। যেমন মরহুম কোন শিল্পীর আঁকা ছবি, পুরাকীর্তি ইত্যাদি এসব দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ, ফলে এসব দ্রব্যের দাম যতই বাড়ুক না কেন তার যোগান বাড়ে না।

২. ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে ঃ ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়তে পারে এরূপ সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে দাম বেশি হলেও যোগান বাড়বে না। কেননা এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার মওজুদ বৃদ্ধি করতে চাইবে, তাই যোগান বাড়াবে না। আবার ভবিষ্যতে দাম আরো কমার সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে দাম কমতে থাকলেও যোগান কমবে না বরং বাড়বে। কেননা বিক্রেতা ঐ দ্রব্য দ্রুত বিক্রয় করে ফেলতে আগ্রহী হবে।

৩. শ্রমিকের শ্রমের ক্ষেত্রে ঃ শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম দিতে পারে। এর বেশি শ্রম দিতে পারে না। ফলে শ্রমিকের শ্রমের মজুরী বাড়লেও শ্রমের যোগান বাড়ে না। তদুপরি যখন মজুরী বৃদ্ধি পায় তখন শ্রমিক শ্রমদানে কম যত্নবান হয় এবং অলসতা প্রদর্শন করে। ফলে যোগান পূর্বের তুলনায় কমে যায়।

৪. উৎপাদন হ্রাস করা হলে ঃ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়লে মুনাফা হ্রাস পায় এ কারণে অনেক কোম্পানী উৎপাদন হ্রাস করে দেয়, ফলে দ্রব্যটির মূল্য বাড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল্য বাড়লেও যোগান বাড়ে না।

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে ঃ বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে উৎপাদনে ব্যাহত হলে সেক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়লেও যোগান বাড়ে না।

৬. পরিবহনে জটিলতা দেখা দিলে ঃ যাতায়াত ও পরিবহনে অসুবিধা সৃষ্টি হলে কোন কোন এলাকায় দ্রব্যের দাম বাড়লেও তার যোগান স্বল্প সময়ে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

যোগান বিধির নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় দাম বাড়লে দ্রব্যের যোগান বাড়ে, আর দাম কমলে যোগান কমে। কিন্তু এই হ্রাস বৃদ্ধির হার সবসময় এক রকম হয় না। কোন কোন দ্রব্যের দাম সামান্য পরিবর্তন হলে যোগানের পরিবর্তন অতিমাত্রায় হয়। আবার কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে

www.eelm.weebly.com

দামের ব্যাপক হ্রাস বৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগানের পরিবর্তন অতি সামান্য মাত্রায় হয়। হ্রাস বৃদ্ধির হারের প্রেক্ষিতে যোগানকে দুইভাগে ভাগ করা হয়।

১. স্থিতিস্থাপক যোগান বা নমনীয় যোগান।

২. অস্থিতিস্থাপক যোগান বা অনমনীয় যোগান।

১. স্থিতিস্থাপক যোগান ঃ দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগান পরিবর্তনের হার বেশি হলে সে যোগানকে স্থিতিস্থাপক যোগান বা নমনীয় যোগান বলে। যেমন একটি দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা ছিল, তখন তার যোগান ছিল ১০০ একক। কিন্তু দাম বৃদ্ধি পেয়ে যখন ৩০ টাকা হল তখন যদি তার যোগান ১৭৫ একক হয়, তাহলে এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হার ছিল ৫০% আর যোগান পরিবর্তনের হার ছিল ৭৫%। সুতরাং একে স্থিতিস্থাপক যোগান বলে গণ্য করা হবে। সাধারণতঃ শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। কেননা শিল্পজাত দ্রব্যের দাম সামান্য বাড়লেই নতুন করে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে যোগান দেয়া সম্ভব। আবার দাম একটু কমে গেলে উৎপাদন হ্রাস করা যায় এবং দ্রব্য গুদামজাত করে রাখা যায়।

২. অস্থিতিস্থাপক যোগান ঃ দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগান পরিবর্তনের হার কম হলে সে যোগানকে অস্থিতিস্থাপক যোগান বা অনমনীয় যোগান বলে। যেমন কোন দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা ছিল তখন তার যোগান ছিল ১০০ একক। দাম বেড়ে যখন ৪০ টাকা হল তখন যদি তার যোগান ১২৫ একক হয়; তাহলে এক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের হার ছিল ১০০%। আর যোগান পরিবর্তনের হার ছিল ২৫%। সুতরাং একে অস্থিতিস্থাপক যোগান বলে গণ্য করা হবে। সাধারণতঃ কৃষিজাত পচনশীল দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে। কেননা এসব দ্রব্য যখন ইচ্ছা তখন উৎপাদন করা যায় না। আবার দীর্ঘদিন সংরক্ষণও করা যায় না। সেজন্য দাম বেশি বাড়লেও এসব দ্রব্যের যোগান ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না। আবার দাম বেশি কমলেও এগুলো মওজুদ করে রাখা যায় না অর্থাৎ অতিমাত্রায় দাম বাড়লেও বা কমলেও এসব দ্রব্যের যোগান তেমন একটা বাড়ানো কমানো যায় না।

www.eelm.weebly.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎপাদন

স্মর্তব্য যে মানুষ ক্রমেই বাড়ছে। ফলে মানুষের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই যোগান বাড়াতে হবে। যোগান বৃদ্ধির জন্য সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করাও জরুরি। উৎপাদন না বাড়লে মানুষের ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা মিটানো কিছুতেই সম্ভব হবে না। উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের উপকরণও পর্যাপ্ত থাকতে হবে। অন্যথায় উৎপাদন সম্ভব হবে না।

অবশ্য উৎপাদনের মূল উপকরণগুলো মহান আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব প্রাকৃতিতে সন্নিহিত করে রেখেছেন। প্রাকৃতির অফুরন্ত ও অবারিত এই সম্পদকে মেধা-বুদ্ধি ও শ্রম-মেহনত ব্যয় করে মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী করে তোলার কিংবা তাতে কোন উপযোগ সৃষ্টি বা সংযোজন করার নামই উৎপাদন। বস্তুতঃ মানুষ কোন কিছুই নতুন করে উৎপন্ন বা সৃষ্টি করতে পারে না। সে কেবল পারে স্রষ্টার উৎপাদিত উপকরণসমূহকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে তার মাঝে বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করতে। রাসায়নিক ক্রিয়া ও অভিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের উপযোগী করতে।

প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণের উপযোগী করার উদ্দেশে তার সাথে মানুষের মেধা ও শ্রম, মেহ্নত ও বুদ্ধিকে যোগ করে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের কাজ আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। সভ্যতার প্রথম স্তরে তা হয়ত অতি ক্ষুদ্র পরিসরে কুটির শিল্পের সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে অধুনা তা অতি বৃহৎ পরিসরে যান্ত্রিক গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

কাজেই অনায়াসেই বলা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের মেধা, শ্রম ও প্রয়োজনীয় মূলধন এগুলোই হল উৎপাদনের বুনিয়াদী বিষয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম কৃষি উৎপাদনকে যেমন উৎসাহিত করেছে, তেমনিভাবে শিল্প ও শৈল্পিক উৎপাদনকেও উৎসাহিত করেছে। তবে ইস-লামের দৃষ্টিতে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য অধিক মুনাফা লুণ্ঠন, ভোক্তাদেরকে প্রতারিত করে অর্থোপার্জন কিংবা শ্রমিক মজুরকে শোষণ করে অর্থের পাহাড় গড়ে তোলা নয়। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বমানুষের প্রয়োজন পূরণ, জীবন জীবিকার চাহিদা মিটানো, মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ও জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধন তথা মাখলুকের সেবা করা।

www.eelm.weebly.com

এ কারণেই ইসলাম মনে করে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লক্ষ্য দিতে হবে মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও চাহিদা মিটানোর প্রতি। যেসব পণ্যের উৎপাদন মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করে; ইসলামী সমাজে সেসব পণ্যের উৎপাদনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যাতে কোন মানুষই জীবনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না থাকে। এজন্যই ইসলাম কৃষি উৎপাদনকে সমাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। পক্ষান্তরে এমন সব বিষয়ের উৎপাদনকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে যা মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটায়, মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে ধ্বংস করে কিংবা যা মানুষের কোন কল্যাণ সাধনের উপযোগী নয় বরং মানুষকে অহেতুক কর্মকান্ডে লিপ্ত করে।

উৎপাদনের প্রক্রিয়া

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে কেবল পারে প্রকৃতি প্রদত্ত্ব বস্তুসম্ভারে অতিরিক্ত উপযোগ সংযোজন করতে। উপযোগ সংযোগের এ প্রক্রিয়া নানাভাবে সংঘটিত হতে পারে। যেমন ঃ

১. **রূপান্তরের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি ঃ** প্রকৃতি প্রদত্ত্ব কোন বস্তুর রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে যে নতুন উপযোগ বৃদ্ধি করা হয় তাকে রূপান্তরগত উপযোগ বলা হয়। যেমন একটি কাঠের টুকরাকে চেয়ারে রূপান্তরিত করলে তার উপযোগ বৃদ্ধি পায়। একটি লোহার টুকরাকে দা বা ছুরিতে রূপান্তরিত করলে তার উপযোগ বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি।

২. **স্থানান্তরগত উপযোগ ঃ** কোন কোন বস্তুকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন বনের কাঠকে শহরে আনতে পারলে তার উপযোগ বৃদ্ধি পায়।

৩. **কালগত উপযোগ ঃ** সময়ের ব্যবধানের ফলেও কোন কোন দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। একে কালগত উপযোগ বলে। যেমন ঃ পৌষ-মাঘে ধানের মৌসুমে ধানের দাম কম থাকে, এসময় তা মওজুদ করে রাখলে ভাদ্র আশ্বিন মাসে তার উপযোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে দাম বাড়ে।

৪. **শ্রম ও সেবাগত উপযোগ ঃ** অনেক সময় শ্রম কিংবা সেবারও উপযোগ সৃষ্টি হয়। একে শ্রম ও সেবাগত উপযোগ বলে। যেমন ঃ মজুর তার শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করে, ডাক্তার তার সেবা দিয়েও অর্থোপার্জন করে, গায়ক গান গেয়ে অর্থোপার্জন করে থাকে।

৫. **মালিকানাগত উপযোগ ঃ** দ্রব্যের মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তনের ফলেও অনেক সময় তার উপযোগ বৃদ্ধি পায়, একে মালিকানাগত উপযোগ বলে। যেমন

www.eelm.weebly.com

একটি পরিত্যক্ত বাড়ির যে মূল্য ছিল, কোন শিল্পপতি যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তা ক্রয় সূত্রে মালিকানা লাভ করেন কিংবা আইনগতভাবে তার মালিকানা লাভ করেন তখন তার উপযোগ বেড়ে যায়, ফলে তার মূল্যও বেড়ে যায়।

উৎপাদনের প্রকারভেদ

মৌলিকতার বিচারে উৎপাদনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. কৃষিজাত উৎপাদন।

২. শিল্পজাত উৎপাদন।

সাধারণতঃ কৃষিজাত উৎপাদন মানুষের খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা পূরণ করে থাকে। আর শিল্পজাত উৎপাদন সাধারণতঃ মানুষের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ভোগ বিলাসের উপকরণের চাহিদা পূরণ করে থাকে। তাই গুরুত্বের বিচারে কৃষিজাত উৎপাদনের গুরুত্ব অনেক বেশি। যদিও শিল্পজাত উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ উৎপাদন যে প্রকারেরই হোক না কেন তার জন্য উৎপাদন-উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, কৃষিজাত উৎপাদনের বেলায় উৎপাদন-উপকরণের কোয়ালিটি শিল্পজাত উৎপাদনের উপকরণের চেয়ে ভিন্ন ধরনের হবে। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখি যে, কৃষিজাত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় একখন্ড ভূমির। আর এটিই হল কৃষিজাত উৎপাদনের মূল উপকরণ। তৎসঙ্গে প্রয়োজন হয় লাঙ্গল, জোয়াল, গরু অথবা ট্রাক্টর মেশিনের। আর প্রয়োজন হয় সার, বীজ, (সেচ ব্যবস্থার জন্য) জ্বালানী ও কীটনাশকের; যেগুলো কৃষককে টাকা দিয়ে কিনতে হয়। আর প্রয়োজন হয় দৈহিক শ্রমের। আরো প্রয়োজন হয় কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন দক্ষ কৃষকের, যিনি গোটা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ একই ব্যক্তি ভূমি, গরু ও লাঙ্গলের মালিক হয়ে থাকেন। আবার তিনি নিজেই পুঁজি সরবরাহ করেন, শ্রম দিয়ে থাকেন এবং তত্ত্বাবধানও করে থাকেন। অর্থাৎ উপাদানের সকল উপকরণের যোগানদাতা একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন। অবশ্য অনেকেই ব্যবসায়ীক উদ্দেশে চাষাবাদ করে থাকেন। তাছাড়া বর্গাচাষের প্রচলনও আমাদের দেশে রয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। তাহলে দেখা যায় যে, কৃষিজাত উৎপাদনে মৌলিকভাবে চারটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। যথা ঃ ১. ভূমি, ২. মূলধন, ৩. শ্রম, ৪. সংগঠন।

অনুরূপভাবে শিল্পজাত উৎপাদনের জন্যও প্রয়োজন হয় একখন্ড ভূমির, যেখানে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হবে। আর প্রয়োজন হয় কিছু দক্ষ শ্রমিকের

www.eelm.weebly.com

যারা উৎপাদন কার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রম দিয়ে দ্রব্যটি উৎপাদন করবেন। এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় মেশিনারী ও কাঁচামালের - যা দ্বারা কাংখিত দ্রব্যটি উৎপাদন করা হবে। এছাড়াও প্রয়োজন হয় একজন অভিজ্ঞ উদ্যোক্তার - যিনি উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে সমন্বিত করে বস্তুটি উৎপাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, লাভ লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে কাজটি শুরু করবেন, তদারকী করবেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিবেন এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাহলে দেখা যায় যে, শিল্পজাত উৎপাদনেও মৌলিকভাবে চারটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। যথা ঃ ১. ভূমি, ২. শ্রমিক, ৩. মূলধন, ৪. উদ্যোক্তা বা সংগঠক।

বস্তুতঃ কৃষিজাত উৎপাদন ও শিল্পজাত উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই ৪টি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিষয়গুলোর শিরোনাম এক হলেও কোয়ালিটিগত পার্থক্য রয়েছে।

এই উভয় প্রকার উৎপাদনের মাঝে কৃষিজাত উৎপাদনের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা পৃথিবীর সকল মানুষ ও জীবের জীবন ধারণের বিষয়টি মৌলিকভাবে কৃষিজাত উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। একারণে আমরা প্রথমে কৃষিজাত উৎপাদনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। অতঃপর শিল্পজাত উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

কৃষিজাত উৎপাদন

কৃষি ব্যবস্থা ও চাষাবাদ

কৃষি কাকে বলে ঃ মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করাকে কৃষি বা কৃষিকাজ বলা হয়। সুতরাং কৃষির পরিধি খাদ্য-শস্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ভূমিজাত পণ্যের উৎপাদন, পশুপাখি লালন-পালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

কৃষির গুরুত্ব ঃ মানুষ ও প্রাণীর জীবন জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে জীবিকার প্রয়োজন হয়; তা আসে কৃষি থেকে, বাসস্থানের উপকরণের অধিকাংশের উৎপাদন হয় কৃষির মাধ্যমে অথবা কৃষি উপকরণের সহযোগিতায়, লজ্জা নিবারণের জন্য যে কাপড়ের প্রয়োজন হয় তাও আসে কৃষি থেকে। শিল্পের অধিকাংশ বুনিয়াদী কাঁচামালের যোগান হয় মূলতঃ কৃষিজাত উপকরণের মাধ্যমে। অতএব মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বলতে গেলে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষের সাথে মাটির এই ঘনিষ্ট সম্পর্ককে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ভূমিজ উৎপাদন সর্বকালেই সমান

www.eelm.weebly.com

গুরুত্ববহ। ভূমিজ উৎপাদন ছাড়া সভ্যতার চাকা সামান্যক্ষণের জন্যও সচল থাকতে পারে না। আর কৃষিই হল ভূমিজ উৎপাদনের একমাত্র উপায়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কৃষির গুরুত্বের দিকটি সুস্পষ্ট করে তোলে।

১. পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পেশা হল কৃষি। আমাদের বাংলাদেশেও শতকরা ৮০ জন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

২. কৃষি মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করে।

৩. অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামালের যোগান কৃষি থেকে হয়ে থাকে। তাই কৃষিজাত পণ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান। যেমন ঃ ধান মাড়াই কল, ধানভাঙ্গা কল, আটা কল, চিনি কল, খাদ্যদ্রব্য প্রসেজ করণের বিভিন্ন কারখানা এবং পাট, চা, চামড়া কেন্দ্রিক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

৪. কৃষিকাজে ব্যবহৃত পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যেও গড়ে উঠে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান। যেমন ঃ সার কারখানা, কীটনাশক প্রস্তুতকারক কোম্পানী, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রস্তুতকারক কোম্পানী, পাওয়ার ট্রিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদির কারখানা।

৫. ব্যবসায়ের এক বিরাট অংশ কৃষিপণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৬. বয়নশিল্পও অনেকাংশে কৃষির উপরই নির্ভরশীল। মানুষের প্রয়োজনীয় পোশাক ও বস্ত্রের সংস্থান যেসব উপাদানের মাধ্যমে হয়, তার অধিকাংশই কৃষিজাত।

৭. ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল মূলতঃ কৃষিজাত পণ্য থেকেই আহরণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসা ও কবিরাজী চিকিৎসা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্যের সহযোগিতায় হয়ে থাকে।

৮. শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টিতেও কৃষির ভূমিকা রয়েছে। কেননা কৃষকের আয় বাড়লে শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্পজাত পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়।

৯. উন্নত কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানী করা যায়। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

১০. সরকারের রাজস্বের একটি বিরাট অংশ কৃষিখাত থেকে আসে। জমির খাজনা, কৃষি পণ্যের আয়করু, কৃষিপণ্য পরিবহণের ভাড়া, কৃষিপণ্যের উপর আমদানি রপ্তানী শুল্ক ইত্যাদি পন্থায় যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে।

সারকথা কৃষি উন্নয়নের উপরই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। এ কারণেই ইসলাম কৃষির উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে।

www.eelm.weebly.com

মহান আল্লাহ তা'আলা কৃষিজ উৎপাদনকে বিশ্ব মানুষের প্রতি তার অবারিত অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর কৃষির বিপর্যয়কে তিনি মানুষের জন্য চরম বঞ্চনা বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

أفرأيتم ما تحرثون * ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون * لونشاء لجعلنه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون بل نحن محرومون –

চিন্তা করে দেখেছ কি, চাষাবাদ করে যে বীজ তোমরা বপণ কর, তা কি তোমরা অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করে থাকি? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়কুটোয় পরিণত করে দিতে পারতাম, তখন তোমরা দিশা হারিয়ে ফেলতে আর বলতে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমরা হৃতসর্বস্ব (ও বঞ্চিত) হয়ে গেছি।

– সূরা ঃ ৫৬ ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৬৩-৬৭

সূরা জুমা'আয় নামাযান্তে ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযৃক অনুসন্ধানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে উদাত্তভাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله –

যখন নামায আদায় হয়ে যায়, তখন যমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফযূল (রিযৃক) অনুসন্ধান কর। – সূরা ঃ ৬২ জুম'আ ঃ ১০

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুফাস্‌সির এই আয়াত থেকে কৃষিতে আত্মনিয়োগের অর্থই গ্রহণ করেছেন। সূরায়ে মুল্‌কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور –

তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন; অতএব তোমর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর পুনরুত্থান তো তারই নিকট। – সূরা ঃ ৬৭ - মুল্‌ক ঃ ১৫

রাসুলে করীম (সা.)ও কৃষিকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেন এবং কৃষির বহু ফযীলতের কথা হাদীসে উল্লেখ করেছেন। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

اطلبو الرزق فى خبايا الأرض –

জমির পরতে পরতে জীবিকা অন্বেষণ কর। – মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খন্ড।

আল্লামা সারাখ্‌সী (রহ.) তার তফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা.)-এর উক্ত বাণীর অর্থ হচ্ছে কৃষি ও চাষাবাদ।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما من مسلم يغرس غرسا اويزرع زرعًا فيأكل منه طير او إنسان أو بهيمة الا كان له به صدقة –

www.eelm.weebly.com

কোন মুসলমান যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে, অথবা ক্ষেত-খলায় ফসল ফলায়, আর তা থেকে যদি কোন পাখী, মানুষ অথবা প্রাণী আহার করে; তাহলে তার জন্য তা সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। – বুখারী, মুসলিম, কৃষি অধ্যায়।

আল্লামা আইনী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, বৃক্ষ রোপণকারী কৃষক যদি সাওয়াবের নিয়্যত নাও করে এমনকি যদি সে উৎপন্ন ফসল বিক্রিও করে দেয়; তবুও এ কাজের দ্বারা তার সাওয়াব হবে। কেননা এ দ্বারা সৃষ্টি জীবের জীবিকায় প্রবৃদ্ধি ঘটে। – আইনী ৫ম খন্ড পৃঃ ৭১১

আল্লামা সারাখ্সী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, এক হাদীসে কুদ্সীতে নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

عمروا بلادى فعاش فيها عبادى –

আমার জনপদগুলো আবাদ কর, যাতে আমার বান্দারা এতে বসবাস করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সারাখসী (রহ.) বলেছেন যে, এ কারণেই আমরা মনে করি যে, কৃষিকাজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই একটি উত্তম কাজ। – মবসুত খন্ড-২৩ ঃ কৃষি অধ্যায়

মবসুতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ازدرع رسول الله بالجرف –

জারিফে রাসূল (সা.) স্বহস্তে কৃষি কাজ করেছেন।

প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) কৃষির প্রতি উদাসীনতা ও অনীহাকে একটি জাতির অনিবার্য ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় লিখেছেন ঃ

فإنهم إن كان أكثرهم مكتسبين بالصناعة وسياسة البلد والقليل مكتسبين بالرعى والزراعة فسد حالهم فى الدنيا –

কোন দেশের অধিকাংশ নাগরিক যদি শিল্পকলা ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর কৃষি কাজ ও পশুপালনের দায়িত্ব যদি স্বল্প সংখ্যক নাগরিকের কাঁধে বর্তায়; তাহলে তাদের পার্থিব জীবন-সভ্যতা ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।
– হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ঃ খন্ড-২, পৃঃ- ১০৬

আয় উপার্জনের তিনটি মৌলিক পন্থার (কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য) মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম তা নিয়ে মনীষীগণের মতভেদ থাকলেও ইমাম সারাখসী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের হানাফী ইমামগণের অনেকেরই অভিমত এই যে, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়ে কৃষি উত্তম।

অবশ্য আল্লামা আইনী (রহ.) এই অভিমত পেশ করেছেন যে, যেখানে যে বিষয়ের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে এবং যে বিষয়ে আত্মনিয়োগ করা অধিক

www.eelm.weebly.com

কল্যাণকর ও লাভজনক হবে, সেখানে সেটিই উত্তম হবে। অতএব যেখানে কৃষির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, সেখানে কৃষিই উত্তম হবে। কিন্তু যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষির অনুকূল নয় অথচ শিল্পের অনুকূল সেখানে শিল্পই উত্তম হবে। আর যদি কৃষি ও শিল্প কোনটিরই অনুকূল পরিবেশ না থাকে, আর ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ থাকে; তাহলে সেখানে ব্যবসাই উত্তম হবে।

আল্লামা আব্দুর রহমান জাযায়েরী (রহ.) তো কৃষিকে ফরযে কিফায়া বলে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায় ঃ

أما الزرع فى ذاته سواء كان مشاركة أولا فهو فرض كفاية لاحتياج الإنسان والحيوان إليه -

যেহেতু মানুষ ও প্রাণী প্রয়োজন পূরণের জন্য কৃষির মুখাপেক্ষী, অতএব যৌথভাবেই হোক কিংবা ব্যক্তিগতভাবেই হোক কৃষিকাজ করা ফরযে কিফায়াহ্।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কৃষিকে কতটা গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম কৃষিকাজকে শুধু উৎসাহিতই করেনি বরং এটাকে জীবিকা উপার্জনের সর্বোত্তম পন্থা বলেও অভিহিত করেছে।

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন

কান কোন হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ বুঝা যায় যে, রাসূল (সা.) কৃষিকাজকে লাঞ্ছনাকর বলে অভিহিত করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (রা.) বুখারী শরীফের কৃষি অধ্যায়ে হযরত আবু উমামাহ্ বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আবু উমামাহ্ (রা.) এক জায়গায় লাঙ্গল ও কৃষিকাজের অন্যান্য কিছু সরঞ্জাম দেখতে পেয়ে বললেন ঃ

سمعت النبى ص يقول لايدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل -

আমি রাসূল (সা.)কে বলতে শুনেছি যে, যে গৃহে এসব উপকরণ প্রবেশ করে; সে গৃহে আল্লাহ্ তা'আলা দারিদ্র ও লাঞ্ছনাকে চাপিয়ে দেন।

এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, কৃষিকাজে লিপ্ত মানুষ দারিদ্র ও লাঞ্ছনার শিকার হয় এবং খোদা প্রদত্ত সম্মান থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কি ইসলাম কৃষিকাজকে পছন্দ করে না।

এ প্রশ্নের মিমাংসা করার জন্য হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে আল্লামা ইবনে মাতীন (রহ.) এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; তাতে উক্ত হাদীসের প্রকৃত অর্থটিই যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এবং উভয় ধরনের

www.eelm.weebly.com

হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনও সহজতর হয়ে গেছে। তার মতে ঃ

هذا من أخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات لأن المشاهدة الآن أن اكثرالظلم إنما هو على اهل الحرث –

এটি রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যত বাণী সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ভবিষ্যৎ বাণী। কেননা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, অদ্যাবধি কৃষকরাই সমাজে অবহেলিত ও সর্বাধিক জুলুমের শিকার। বাস্তবিক পক্ষে কৃষক হল সমাজের সেই শ্রেণী; যারা মানুষ ও প্রাণীর জীবনোপকরণ ও জীবিকার যোগান দিয়ে থাকে। কৃষকের অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতেই শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকারীরা বেঁচে থাকতে পারছে, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা খেতে-পড়তে পারছে। কৃষকের উৎপাদন আছে বলেই রাজনীতিকরা রাজনীতির চর্চা করতে পারছে। এক কথায় সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই আপন আপন জীবন-জীবিকার জন্য কৃষকের মুখাপেক্ষী। কৃষিখাতের রাজস্ব দিয়ে সরকার পরিচালনা করছে প্রশাসন। কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের শ্লোগান দিয়ে নেতারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছেন এবং সংসদ সদস্য হয়ে সংসদে আসছেন। কৃষক সকলের তরে সঞ্জীবনী সরবরাহ করতে যেয়ে খেটে খেটে তার জীবনী শক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে। কিন্তু বেচারা কৃষকের ভাগ্যের কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কেউ কি কোন চেষ্টা করছে? উপরন্তু সুদী অর্থ ব্যবস্থার কারণে শিল্পপতির ব্যাংক ঋণের দায়ভার অবচেতনভাবে গিয়ে পড়ছে অসহায় কৃষকের উপর। ফলে কৃষক শুধু বঞ্চিতই হচ্ছে না বরং তিলে তিলে শোষিতও হচ্ছে চরমভাবে।

নগর জীবনের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বা কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কয় টাকা খরচ করা হচ্ছে? উপরন্তু সার, কীটনাশক, জ্বালানী তেলসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের দামের ক্রমঃউর্ধ্বগতি এবং উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে কৃষকের মেরুদন্ড ক্রমেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্ষুদা, দারিদ্র, রোগব্যাধি, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ কৃষক পারছে না তার জীবন তরী বেয়ে নিতে। অথচ কৃষি খাতকে সরকারি সহযোগিতায় উন্নত করা হলে আর কৃষি সরঞ্জামের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হলে এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে, জাতির সেবায় নিয়োজিত কৃষকও মানুষরূপে বেঁচে থাকতে পারত।

আমাদের দেশে সরকারি বই-পুস্তকে কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমবায়ের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু যার 'নূন আনতে পান্তা ফুরায়' তাকে সমবায়ের পরামর্শ দেয়া বৃথা। বরং সরকারি খরচে কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়া একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে আমাদের কৃষকরা অদূর ভবিষ্যতে সর্বশান্ত হয়ে পথে বসতে বাধ্য হবে।

www.eelm.weebly.com

শহরের নাগরিক জীবনের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয়ে যদি রাস্তাঘাট, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পয়নিষ্কাশন, পার্ক ও ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে, তাহলে গ্রামীণ কৃষকের কৃষি সুবিধাদি বর্ধন যেমন ঃ খাল খনন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত বীজ সরবরাহ, স্বল্পমূল্যে কিংবা বিনামূল্যে সার তেল ইত্যাদি সরবরাহ করে কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার পদক্ষেপ নেয়া যাবে না কেন? কৃষকরাও তো এদেশেরেই নাগরিক। তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থায়নে এসবের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? যে কৃষক সবার তরে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, সকল নাগরিকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করছে, তার বেঁচে থাকার জন্য কৃষির ত্রুটি নিরূপণ ও সমবায়ের মাধ্যমে তা নিরসনের পরামর্শ দেয়াই কি যথেষ্ঠ?

আমাদের বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা রয়েছে। যেমন ঃ অনুন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, ভূমির অতি বিভাজন, সার ও উন্নত বীজের অভাব, অপর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কীটনাশক সংকট, কৃষকের অশিক্ষা ও কুসংস্কার, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, কৃষি ঋণের দুস্প্রাপ্যতা, জটিল ঋণদান পদ্ধতি, ঋণদান প্রকল্পে নিরত কর্মকর্তাদের ঘুষখোরীর প্রবণতা, ভূমির অনুর্বরতা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা, স্বাস্থ্যহীন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত দুর্বল কৃষক, ভূমির অসমবন্টন, ভূমিহীন কৃষক, সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতার অভাব, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি ও আধুনিক প্রযুক্তির উচ্চমুল্য ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত আমাদের কৃষি ব্যবস্থা। এগুলো নিরসনের জন্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়। দরিদ্র কৃষককে এজন্য দায়ী করাও উচিৎ নয়। বরং এজন্য দায়ী হল আমাদের কৃষিনীতি। কারণ যারা কৃষি অধিদপ্তরে কর্মরত রয়েছেন কিংবা কৃষিমন্ত্রী হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাদের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। আর ইয়ারকন্ডিশন রুমে বসে যারা কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করেন, তারা কৃষকের মূল সমস্যাগুলো সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা রাখেন না। সুতরাং তাদের পরিকল্পনার সুফল কৃষক পর্যন্ত পৌছায় না। তাছাড়া সরকারি পর্যায়ে কৃষি খাতের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, কৃষকদের অসচেতনতা ও অশিক্ষার কারণে তা সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও কর্মকাতারা ভাগ বাটোয়ারা করে নিজেরাই ভোগ করেন বেশি। প্রকৃত কৃষক পর্যন্ত তা পৌছায় না বললেই চলে।

আবু উমামা বর্ণিত ঐ হাদীসে রাসূল (সা.) সম্ভবত কৃষকদের এই দুর্ভোগের কথাই উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে, কৃষকরা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হওয়া সত্ত্বেও তারাই সবচেয়ে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত নির্যাতিত ও নিগৃহীত শ্রেণী হিসেবে বেঁচে থাকবে।

www.eelm.weebly.com

অবশ্য ইসলাম কৃষকের সুবিধার্থে ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যথা ঃ ১. রাজস্ব ন্যূনতম করা, ২. রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কৃষকদেরকে বিশেষ সুবিধা দান, ৩. অনাবাদী ভূমি আবাদ করণের বহুমুখী পদক্ষেপ, ৪. কৃষি উপকরণ ও কৃষিঋণ সহজলভ্য করণের পদক্ষেপ, ৫. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগে খাল খনন ও নলকূপ ইত্যাদি স্থাপন, ৬. উৎপাদন ব্যাহত হলে রাজস্ব মওকুফ করা ইত্যাদি।

কৃষকের প্রকারভেদ

সাধারণতঃ দুই উদ্দেশে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে।

১. আত্মপোষণ বা আত্মপালনের জন্য কৃষিকাজ।

২. বাণিজ্যিক উদ্দেশে কৃষিকাজ।

১. আত্মপোষণ বা আত্মপালনের জন্য কৃষিকাজ ঃ এক শ্রেণীর কৃষক নিজের ও পরিবার পরিজনের গ্রাসাচ্ছাদনের যোগান দেয়ার জন্যই কৃষিকাজ করে থাকে। এটাকে বলা হয় আত্মপালনের জন্য কৃষিকাজ।

এ ধরনের কৃষকরা সাধারণতঃ নিজেকে ও নিজের পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কৃষিকাজ করে থাকে। পরিবারের ভোগই এখানে মূল উদ্দেশ্য হয়। এ ধরনের কৃষকরা যথাসম্ভব নিজে ও নিজের পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমেই কৃষিকাজ আঞ্জাম দিতে চেষ্টা করে। ভাড়া করা শ্রমিক একান্ত দায়ে না ঠেকলে নিয়োগ করে না। যা পরিবারের কাজে লাগে সাধারণতঃ এ ধরনের পণ্যই তারা উৎপাদন করে থাকে। পারিবারিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তা বিক্রি করে পরবর্তী মৌসুমের উৎপাদনের আয়োজন করে থাকে। কোন কোন সময় তারা অর্থ উপার্জনের চিন্তা নিয়েও কোন কোন পণ্য উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যাই বেশি।

২. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ ঃ যে কৃষিকাজের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে অর্থ উপার্জনই উদ্দেশ্য হয় তাকে বলা হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষি কাজ।

এহেন মানসে যারা কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তারা সমাজের সচ্ছল শ্রেণী। তাই তারা নিজেরা সরাসরি চাষাবাদ করে না বরং ভাড়া করা শ্রমিক দিয়েই তারা কৃষিকাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। যেহেতু তাদের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন, সেহেতু যে পণ্য উৎপাদন করলে মুনাফা বেশি হয়, তাই তারা উৎপাদন করে থানে। উৎপন্ন দ্রব্য পরিবারের লোকদের ভোগ ব্যবহারে কাজে আসলেও এটা তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে না।

www.eelm.weebly.com

কৃষিকাজের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান

কাজের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না, এ ধরনের লোককে বলা হয় বেকার। আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি। বেকারদেরকে নিজের জীবন জীবিকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে; নিজের উদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাকে বলা হয় স্ব-কর্মসংস্থান। স্বল্পভূমি ও স্বল্পপুঁজির উপর ভিত্তি করে কৃষিভিত্তিক স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যেমন ঃ হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ, ফুল ও ফলের বাগান, নার্সারী, পশুপালন, ক্ষুদ্রায়তনের কুটির শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে বেকারত্ব কাটিয়ে উঠার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য এ জন্য যৎসামান্য পুঁজি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় স্বকর্মসংস্থানের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নবী (সা.) ভিক্ষা প্রার্থী জনৈক সাহাবীকে ভিক্ষা না দিয়ে তার একমাত্র সম্বল একটি কম্বল ও একখানি বাটি বিক্রি করে কুঠার ক্রয় করে তাতে হাতল লাগিয়ে দিয়ে বন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করতে বলেছিলেন। যা দিয়ে সাহাবীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয়েছিল। – বুখারী

উক্ত হাদীসে স্বকর্মসংস্থানের ব্যাপক অনুপ্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। এর সাথে এ দিক নির্দেশনাও রয়েছে যে, বেকারদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও প্রযুক্তি সরবরাহ করাও প্রয়োজন। রাষ্ট্রের বুদ্ধিমান নাগরিক এবং রাষ্ট্র ও সরকারে নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য এতটুকু সহযোগিতা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। হযরত উমর (রা.) উপার্জনক্ষম কোন বেকার লোক দেখতে পেলে বলতেন ঃ لا تكونوا عيالا على المسلمين –

মানুষের গলগ্রহ ও অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ো না। অর্থাৎ নিজে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ কর। তবে সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যে সামান্য পুঁজির প্রয়োজন হবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় তার যোগানের সুন্দরতম ব্যবস্থা রয়েছে। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐসব বেকারদের স্বকর্মসংস্থানের পুঁজি যোগানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ধনবানদের যাকাতের পয়সার মাধ্যমে বেকাররা তাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবে। এমনকি প্রয়োজনে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বায়তুলমাল থেকে ঋণও এককালীন অনুদানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

বর্গাচাষ

একজনের ভূমিতে অন্যজনের শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে যে ফসল উৎপন্ন হবে, তা হারাহারি বন্টন করে নেয়ার শর্তে যে চাষাবাদ হয় তাকে বলা হয় বর্গাচাষ।

www.eelm.weebly.com

সমাজের একশ্রেণীর মানুষ এমন থাকে যারা ভূমিহীন অথচ শ্রমদানে সক্ষম, আর একশ্রেণী এমনও থাকে যারা ভূমির মালিক বটে, কিন্তু শ্রমদানে অক্ষম কিংবা অপারগ। এমতাবস্থায় এ দু'ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় যদি উৎপাদন সম্ভব হয় তাহলে পরিণামে উভয়েই লাভবান হতে পারে। এ কারণেই ইসলাম বর্গাচাষের এ পদ্ধতিকে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বৈধ রেখেছে।

শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. উভয় পক্ষকে যৌথ অংশীদারিত্বের মনোভাব নিয়ে একাজে প্রবৃত্ত হতে হবে। একজন প্রভু অন্যজন তার দাস এহেন মনোবৃত্তি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

২. অসহায় কৃষকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অধিক মুনাফা লুটার মনোবৃত্তি ভূ-স্বামী অবশ্যই পোষণ করতে পারবে না। কিংবা ভূ-স্বামী একতরফাভাবে লাভবান হন এমন কোন শর্তও আরোপ করতে পারবে না।

৩. বর্গাচাষীকে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ থেকে বঞ্চিত করে এমন কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না।

৪. কেউ কারো ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করতে পারে এমন কোন আচরণ করা চলবে না।

৫. বর্গাচাষীও তার শ্রমদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ কুতাহী করতে বা বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না।

৬. উভয় পক্ষকে সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হবে।

৭. পরস্পরের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে উভয় পক্ষ যদি নিজ নিজ বৈধ পাওনা লাভের আশায় বর্গাচাষের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই তা বৈধ হবে।

যদি পরিবেশ বর্গাচাষের অনকূল না হয় কিংবা ভূ-স্বামীর মাঝে যদি অসহায় কৃষকের অভাব ও দুরবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটার প্রবণতা স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে খলিফা (বিচারক) এ ধরনের চুক্তি থেকে তাদেরকে বিরত থাকার ফরমান জারি করতে পারবেন এবং আইন করে এ পন্থায় চাষাবাদ বন্ধও করে দিতে পারবেন।

বর্গাচাষ বৈধ কি না?

অবশ্য চর্গাচাষের বৈধতার প্রশ্নে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মনে করেন যে, বর্গাচাষ বৈধ নয়, তবে জমি ভাড়ায় নিয়ে চাষাবাদ করা তাঁর দৃষ্টিতে বৈধ।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফসহ অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদদের মত হল, বর্গাচাষ ও ভাড়ায় চাষাবাদ দু'টুই বৈধ। অবশ্য হযরত আবুযর গিফারী (রা.)-এর অভিমত এই ছিল যে, জমি বর্গা কিংবা ইজারা দেয়া কোনটিই বৈধ নয়। তাউস ও ইবনে হযম (রহ.) মনে করতেন যে বর্গায় দেয়া বৈধ, কিন্তু ভাড়ায় দেয়া বৈধ নয়। তবে উলামায়ে কিরামের সর্ববাদী মতামত এই যে জমি ইজারা ও বর্গা দেয়া দু'টুই বৈধ।

যারা ভাড়ায় চাষ ও বর্গাচাষকে বৈধ মনে করেন তাদের পক্ষে বেশ কিছু দলীল প্রমাণ রয়েছে।

১ নং দলীল ঃ

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ص أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها اويزرعوها ولهم شطر ماخرج منها -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রাসূল (সা.) ইয়াহূদীদেরকে খায়বরের যমীন এই শর্তে প্রদান করেছিলেন যে, তারা তা চাষাবাদ করে উৎপাদন করবে এবং তারা উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেক পাবে। – বুখারী, কিতাবুল মুযারা'আহ্।

খায়বরের ভূমিসমূহ নবী (সা.) ইয়াহূদীদের নিকট বর্গাচাষের ভিত্তিতে প্রদান করেছিলেন। সুতরাং বর্গার ভিত্তিতে চাষাবাদ বৈধ হবে।

২নং দলীল ঃ

عن سعد بن أبى وقاص أن الزراع فى زمن النبى ص كانو يكرون مزارعهم -

হযরত সা'দ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, ভূ-স্বামীরা নবী (সা.)-এর যুগে আপন ভূমি অন্যকে ভাড়ায় প্রদান করতেন। – আবু দাউদ, নাসাঈ

৩নং দলীল ঃ

আবু জা'ফর (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, মদীনায় মুহাজিরদের কোন ঘর এমন ছিল না, যারা তিন ভাগায় কিংবা চার ভাগায় জমি চাষ করতেন না। হযরত আলী (রা.), সা'দ ইবনে মালিক (রা.), আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.), উমর ইবনে আব্দুল আযীয, কাসেম, অরওয়া, উমর (রা.)-এর পরিবার পরিজন, আলী (রা.)-এর পরিবার পরিজন এবং ইবনে সিরীন (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আপন আপন ভূমি বর্গায় প্রদান করতেন।

এসকল বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) মন্তব্য করেছেন যে, এক্ষেত্রে আমি যত মন্তব্য শুনেছি, তার মাঝে সর্বোত্তম মত এটিই যে, জমি আধা-আধি, তে-ভাগায় ও চার ভাগায় অর্থাৎ বর্গার যে কোন প্রক্রিয়ায় বর্গা দেয়া বৈধ। আর এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মত। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এটি ব্যবসার ক্ষেত্রে মুদারাবার সমার্থক। (অর্থাৎ যেভাবে ব্যবসায় একজনের মূলধন অন্যজনের শ্রম মিলে যৌথ ব্যবসা হতে পারে, অনুরূপভাবে চাষাবাদেও

www.eelm.weebly.com

একজনের ভূমি অন্যজনের শ্রম মিলে যৌথ চাষাবাদ হতে পারবে।)

– কিতাবুল খারাজ -৮৮

আর যারা বর্গাচাষকে বৈধ মনে করেন না, তাদেরও কিছু যুক্তি প্রমাণ রয়েছে। তাদের যুক্তি প্রমাণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১নং দলীল ঃ

যারা বর্গাচাষকে বৈধ মনে করেন না তাদের মতে খায়বরের ভূমিসমূহ মূলতঃ বর্গা ছিল না বরং রাসূল (সা.) তাদের পূর্ব মালিকানা বহাল রেখেছিলেন। আর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের থেকে খারাজ হিসেবে আদায় করা হত। এ ধরনের উৎপন্ন ফসলের হারাহারি ভিত্তিতে খারাজ আদায়কে শরীয়তের পরিভাষায় খারাজে মুকাসামাহ বলা হয়।

২ নং দলীল ঃ

وعن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله ص عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم فقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أو ليزرعها -

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) আমাদেরকে এমন একটি বিষয়ে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। সেটি ছিল এই যে, আমাদের কারো নিকট জমি থাকলে সে তা বর্গা কিংবা ভাড়ায় প্রদান করত। কিন্তু তিনি বললেন, তোমাদের কারো নিকট জমি থাকলে সে তা অপর ভাইকে মুফ্‌তে দিয়ে দেবে কিংবা সে নিজে চাষ করবে। – বুখারী মুযারা'আহ অধ্যায়, তিরমিযী।

৩নং দলীল ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন যে ঃ

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه -

যার জমি আছে সে যেন তা নিজেই চাষাবাদ করে নতুবা অন্য ভাইকে তা যেন মুফ্‌তে দিয়ে দেয়। এ দুইয়ের কোনটাই যদি সে না করে, তাহলে অনর্থক সে তার ভূমি আটকিয়ে রাখতে চাইলে আটকিয়ে রাখুক। – বুখারী মুযারা'আহ অধ্যায়।

৪ নং দলীল ঃ

وعن جابر بن عبد الله رض قال نهى رسول الله ص أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ -

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন যে, রাসূল (সা.) ভূমির মুকাবেলায় ভাড়া কিংবা উৎপন্ন ফসলের অংশ বিশেষ নিতে নিষেধ করেছেন। – মুসলিম

www.eelm.weebly.com

৫নং দলীল ঃ

كان ابن عمر يكرى مزارعه على عهد النبى ص وأبى بكر وعمر وعثمان وصددا من إمارة معاوية فلما سمع حديث رافع ترك ذلك خشية إن يكون النبى ص قد أحدث فيه شيئا -

হযরত ইবনে উমর (রা.) আপন ক্ষেত-খলা নবী (সা.)-এর যুগে এবং আবুবকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে এমনকি হযরত মু'আবিয়াহ (রা.)-এর শাসনামলের শুরুভাগেও বর্গা দিতেন। পরে যখন হযরত রাফে' (রা.)-এর ঐ হাদীস শুনলেন, তখন তিনি তা বর্জন করলেন, এই ভয়ে যে, হয়ত নবী (সা.) পরে এ সম্পর্কে নতুন বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। (যা তিনি শুনেননি)। - বুখারী মুযারা'আহ অধ্যায়।

৬নং দলীল ঃ

وعن حنظلة بن قيس رض قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله ص عنه فقلت أبالذهب والورق قال فلا باس به -

হানযালা ইবনে কায়েস (রহ.) বলেন আমি রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.)-কে ভূমি বর্গা ভাড়া দেয়া সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, রাসুল (সা.) এ করতে নিষেধ করেছেন, আমি প্রশ্ন করলাম সোনা-রূপা অর্থাৎ নগদ টাকার বিনিময়েও? তিনি বললেন, ওতে কোন অসুবিধা নেই। - বুখারী, মুসলিম।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের বাহ্যিক অর্থ একথাই প্রমাণ করে যে, ভূমির বর্গাচাষ প্রথা শরীয়ত সমর্থিত নয়। সুতরাং উভয় ধরনের হাদীসের মধ্যে স্ববিরোধীতা ও বৈপরিত্য দেখা যায়।

তবে উপরোক্ত দলীল প্রমাণগুলোর প্রকৃত অবস্থা ও নিহিত অর্থ কী ছিল, তা অনুধাবন করতে পারলে এ ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়ত সম্ভব হবে।

বস্তুতঃ খায়বরের ভূমির মালিকানা মুসলমানদের হাতে ছিল, না ইয়াহূদীদের হাতে ছিল, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উপর বর্গাচাষ বৈধ কি অবৈধ/এর ভিত্তি।

যারা বর্গাচাষ বৈধ মনে করেন, তাদের দাবি হল খায়বরের ভূমির মালিকানা ছিল মুসলমানদের হাতে। আর ইয়াহূদীরা তা বর্গাচাষের ভিত্তিতে আবাদ করত।

আর যারা বৈধ মনে করেন না, তাদের বক্তব্য হল রাসূল (সা.) তাদের ভূমির মালিকানা বহাল রেখে ছিলেন। তবে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ তারা খারাজ হিসেবে পরিশোধ করত।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, খায়বরের যেসব ইয়াহূদী প্রতিরোধে না গিয়ে স্বেচ্ছায় সন্ধি করেছিল, কেবল তাদের ভূমির মালিকানাই বহাল রাখা হয়েছিল। কিন্তু যারা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করার পর পরাস্ত হয়েছিল, তাদের ভূমির মালিকানা বহাল রাখা হয়নি। বরং সেসব অঞ্চলের কিছু অংশ গনীমত হিসেবে যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছিল। আর কিছু অংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখা হয়েছিল। অতএব ইয়াহূদীরা মুসলমানদের ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভূমি চাষাবাদ করে ফসলের যে অর্ধাংশ পরিশোধ করত, তাকে বর্গাচাষ ছাড়া অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই।

তিনজন সাহাবী 'বর্গাচাষ অবৈধ হওয়ার পক্ষে' দলীল হিসেবে পেশকৃত হাদীসসমূহের পেক্ষাপট ও নিহিত অর্থ বর্ণনা করেছেন। তাদের বক্তব্যের আলোকে এ সর্ম্পকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে।

১. **হযরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.)-এর অভিমত ঃ** হযরত রাফে' ইবনে খাদিজ (রা.) যিনি বর্গাচাষ অবৈধ হওয়ার পক্ষে বর্ণনাকারীদের একজন; তিনি অন্যত্র বলেন যে ঃ

حدثنی عمای انهم كانوا يكرون الارض على عهد النبى ص بما ينبت على الاربعاء او شيئ يستثنيه صاحب الارض فنهى النبى ص عن ذلك –

আমরা চাচা (যুবায়র) বর্ণনা করেছেন যে, তারা নবী (সা.)-এর যুগে জমি এই শর্তে ভাড়া দিতেন যে, ড্রেনের পাশের ভূমির ফসল আমাদের থাকবে, অথবা জমির একটি নির্দিষ্ট অংশের ফসল আমাদের থাকবে। নবী (সা.) যখন এটা জানতে পারলেন তখন তা নিষেধ করে দিলেন। – বুখারী কিতাবুল মুযারা'আহ্

হযরত রাফে' ইবনে খাদিজের উপরোক্ত বর্ণনার অর্থ হল, রাসূল (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞাটি উক্ত শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যখন ভূ-স্বামী নির্দিষ্ট অংশের ফসলের শর্ত লাগাবেন; তখন এ ধরনের ইজারা বৈধ হবে না। কেননা এতে কৃষকের লাভবান হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কে জানে হয়ত বাকী অংশে ফসল হবেই না বা হলেও তা পরিমাণে এত অল্প হবে যে, কৃষকের বিনিয়োগকৃত মূলধনই উঠে আসবে না। ফলে তাদের মাঝে এ নিয়ে পরে মনোমালিন্য হতে পারে। তাই রাসূল (সা.) এ ধরণের শর্তের ভিত্তিতে ইজারা দেয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

২. **ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত ঃ** যেসব হাদীসে 'জমি হয়ত নিজে চাষ করবে না হলে অন্যকে দিয়ে দিবে' এ ধরণের বর্ণনা রয়েছে, সেসব হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ

www.eelm.weebly.com

ان النبى ص لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح أحدكم أخاه خيرله من ان يأخذ شيئا معلوما -

নবী করীম (সা.) জমি ইজারা দেয়াকে নিষিদ্ধ করেননি। তবে তিনি একথা বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যদি তার কোন ভাইকে মুফ্তে দিয়ে দেয়; তাহলে তা নির্দিষ্ট কোন কিছুর বিনিময়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম হবে। - বুখারী-বর্গা চাষ অধ্যায়

মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈতে এই রিওয়ায়াতে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে। এসকল গ্রন্থে বর্ণিত শব্দ নিম্নরূপ ঃ

ان رسول الله ص لم يحرم المزارعة ولكن امر أن يرفق بعضهم ببعض -

অর্থাৎ রাসূল (সা.) বর্গাচাষকে অবৈধ ও হারাম করেননি। তবে তিনি পরস্পরের প্রতি সদাচার ও সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.)- এর বক্তব্যের সারকথা এই যে, রাসূল (সা.) উল্লিখিত হাদীসসমূহে নিজে চাষ করতে না পারলে অন্যকে দিয়ে দেয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মূলতঃ অবশ্য পালনীয় বিধানরূপে নয় - যে জমি বর্গা কিংবা ইজারা দিলে তা হারাম হয়ে যাবে। বরং এটি একটি উপদেশমূলক বক্তব্য ছিল। যার মর্মার্থ এই যে, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মীতার দাবী এই যে, নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি অন্য ভাইকে মুফতে দিয়ে দেয়া, যাতে সে তা দিয়ে উপকৃত হতে পারে। একারণেই হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) একে نهى تنزيهى و ارشادى বা উপদেশমূলক ও অপছন্দনীয় নিষেধাজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করেছেন। - অর্থাৎ বিষয়টি বৈধ হলেও শরীয়ত তা পছন্দ করে না। বরং শরীয়ত চায় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুসারে বিনা ভাড়ায় ও বিনা বিনিময়ে অন্যকে তা দিয়ে দেয়া হোক। যদিও ভাড়ায় কিংবা বর্গায় দেয়াকে শরীয়ত হারাম করেনি।

৩. হযরত যায়েদ (রা.)-এর অভিমত ঃ

وكان ذلك الحكم على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم فى هذه المعاملة حينئذ وهو قول زيد رضى الله عنه -

কিংবা এ নির্দেশটি একটি বিশেষ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছিল। কেননা সে সময়ে এসকল বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে ব্যাপক হারে দ্বন্দ্ব কলহ বেধে যেত। আর এটি হল হযরত যায়েদের অভিমত।

হযরত যায়েদ (রা.)-এর অভিমতের সারকথা হল, রাসূল (সা.)-এর এ সংক্রান্ত নির্দেশটি ছিল নিতান্তই সাময়িক এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল মাত্র। যেহেতু তাদের মাঝে এসব বিষয় নিয়ে প্রায়ই কলহ বিবাদ বেধে যেত, অথচ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার জন্য এটি শোভন ছিল না, তাই তিনি এহেন

www.eelm.weebly.com

বিষয় থেকে তাদেরকে বারণ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত তিনজন সাহাবীর মতামতের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হয় যে, ভূমি ভাড়ায় দেয়া কিংবা বর্গা দেয়া মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ নয়। যদিও রাসূল (সা.) মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদেরকে নিজ চাষের অতিরিক্ত ভূমি অন্য ভাইকে মুফতে দিয়ে দিতে উৎসাহিত করেছেন অথবা সাময়িকভাবে তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিংবা বিষয়টি বৈধ থাকলেও শরীয়তের দৃষিটতে পছন্দনীয় নয়। পছন্দনীয় বিষয় হল ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য ভাইকে মুফ্‌তে দিয়ে দেয়া।

এছাড়াও সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে নিয়ে পরবর্তীকালের ইসলামী মনীষীবৃন্দের ব্যক্তিগত কর্মধারাও বিষয়টি বৈধ হওয়ার পক্ষে দলীলরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

বর্গা চাষের একটি নতুন প্রক্রিয়া

সাধারণতঃ বর্গাচাষ দ্বিপাক্ষিকভাবে হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভূ-স্বামী ও বর্গাচাষীর যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন হয়ে থাকে। আমাদের দেশ যেহেতু দরিদ্র প্রাধান দেশ, এ কারণে ভূ-স্বামী ও কৃষক দু'জনই থাকে দারিদ্রের শিকার, ফলে অর্থের অভাবে সময়মত সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে না পারার কারণে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় যদি ত্রিপাক্ষিক বর্গাচাষ পদ্ধতি চালু করা হয় তাহলে এ সংকট কাটিয়ে উঠা সম্ভব। অর্থাৎ ভূ-স্বামী, চাষী ও পুঁজি যোগানদাতা এই তিন পক্ষ মিলে যদি যৌথ উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করা যায়, তাহলে পুঁজির সংকট কাটিয়ে উঠা যেতে পারে। তারা যদি এ ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ভূ-স্বামী ভূমি সরবরাহ করবেন, চাষী শ্রম দিবেন ও তত্ত্বাবধান করবেন, আর পুঁজির যোগানদাতা সেচ, জ্বালানী, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করবেন।

আর উৎপাদিত ফসল হারাহারিভাবে তারা ভাগ করে নিবেন। তাহলে এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। এবং এই ত্রিপাক্ষিক বর্গাচাষ পদ্ধতিতে দরিদ্র প্রধান দেশে কৃষিখাতের পুঁজির সংকট কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। আর এতে উৎপাদনও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া অর্থ সংকটের জন্য যথাসময়ে পুঁজির যোগান দিতে না পেরে কৃষক দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে তারা ফসল বাঁচানোর জন্য উচ্চসুদে সাময়িক ঋণগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পরে ঋণের টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করতে যেয়ে তার প্রাপ্ত অংশের সব ফসল বিক্রি করেও কুলিয়ে উঠতে পারে না। এভাবে কৃষক ক্রমাগত ঋণের চাপে ধুঁকে ধুঁকে সর্বশান্ত হয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে কৃষক এহেন জুলুমের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ করার পাপ থেকেও বেঁচে যাবে।

www.eelm.weebly.com

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান

কৃষি খাত থেকে উৎপাদিত ফসলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যথাঃ ক. খাদ্য জাতীয় ফসল, খ. অর্থকরী ফসল।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের প্রায় ৭০ ভাগ জমিতেই কৃষিকাজ চলে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপকভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের শস্যের চাষাবাদ করা হয়। উৎপাদিত এসব শস্যকে প্রধাণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল।

যেসব শস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে খাদ্যশস্য বলে। এ শস্যগুলো মূলতঃ পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদিত হয়; তবে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনা হয় অথবা প্রয়োজনবোধে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, যব, ভুট্টা, আলু, ফলমূল, শাক-শব্জি, মশলা ইত্যাদি প্রধান খাদ্যশস্য। অপরদিকে মুনাফা লাভের উদ্দেশে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় সেগুলোকে অর্থকরী ফসল বলে। এসব ফসল মূলতঃ বিক্রয়ের উদ্দেশেই উৎপাদিত হয় এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, রাবার প্রভৃতি বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল।

বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের বিবরণ

বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, ভুট্টা, আলু, ফলমূল, মশলা শাকসব্জি প্রভৃতি প্রধান। নিচে বাংলাদেশের এসব খাদ্যশস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

১. ধান ঃ ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান থেকে প্রস্তুতকৃত চাল এদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। এদেশে মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ধানচাষ করা হয়। নদী বিধৌত পলিময় ও বেশী কাদাযুক্ত সমতল ভূমি এবং ১৬^{o} সেঃ থেকে ৩০^{o} সেঃ উত্তাপ ও বার্ষিক ১০০ সেঃ মিঃ থেকে ৩৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ধান চাষের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু এ রকম হওয়ায় এদেশের প্রায় সর্বত্রই ব্যাপকভাবে ধানের চাষ হয়। তবে বরিশাল, পটুয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদিত হয়। তবে সাম্প্রতিককালে এ তিন ধরনের ধান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল

www.eelm.weebly.com

(উফশী) ধান অন্য কথায় ইরি ধানের চাষ করা হয়। আমাদের দেশে বার্ষিক প্রায় ১.৮০ কোটি মেঃ টন ধান উৎপন্ন হয়।

২. গম ঃ বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই গমের স্থান। গম থেকে প্রাপ্ত আটা ও ময়দা বর্তমানে এদেশের অধিবাসীদের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাসহ সমতল ভূমি, ১৬° সেঃ থেকে ২২° সেঃ উত্তাপ এবং বার্ষিক ৪০ সেঃ মিঃ থেকে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু গম চাষের জন্য বিশেষ অনুকূল নয়; তবে এদেশে শীতকালের জলবায়ু মোটামুটিভাবে গম চাষের উপযোগী। এখানে শীতকালে সীমিত পর্যায়ে গমের আবাদ করা হয়। বাংলাদেশে গড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে গমচাষ করা হয়। দেশে গম উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলো হল, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ফরিদপুর ও ঢাকা। ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতি, ধানের উচ্চ মূল্য, গমের অনুকূলে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে গমচাষের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এদেশে বার্ষিক গম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টন।

৩. ডাল ঃ ডাল বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার একটি অন্যতম উপাদান। সাধারণত ১৫° থেকে ২০° সেঃ উত্তাপ ও পানি নিষ্কাশনসহ বালুময় মাটিই ডাল চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এদেশে বার্ষিক গড়ে প্রায় ১৮ লক্ষ্য একর জমিতে ডাল চাষ করা হয়। বাংলাদেশে শীতকাল এবং পদ্মা ও যমুনার দোয়াব অঞ্চল ডাল চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে দেশের অন্যান্য স্থানেও ডালের চাষ হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ডাল উৎপন্ন হয়। এসব ডালের মধ্যে মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই, মটরশুটি, খেসারী, অড়হর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেশে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ মেঃ টন ডাল উৎপাদিত হয়।

৪. তেলবীজ ঃ সাধারণত সয়াবিন, জলপাই, বাদাম, নারিকেল, তিল, তিসি, তুলাবীজ, সরিষা, সূর্যমুখী প্রভৃতি বীজ থেকে উদ্ভিদ তেল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার তেলবীজের মধ্যে সরিষা, রাই, বাদাম, তিল, তিসি, সয়াবিন, নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতি প্রধান। উদ্ভিদ তেল রান্নার কাজ ছাড়াও সুগন্ধি দ্রব্যাদি, বার্ণিস, মোমবাতি এবং সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেশের শীতকালীন জলবায়ু তেলবীজ চাষের উপযোগী বলে এখানে অধিকাংশ তেলবীজের চাষ শীত মৌসুমেই করা হয়। দেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় বেশি তেলবীজ উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত তেলবীজ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় আমাদেরকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর ভোজ্য তেল ও তেলবীজ আমদানি করতে হয়। দেশে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ টন তেলবীজ উৎপাদিত হয়।

www.eelm.weebly.com

৫. **যব :** গমের মত যবও এক প্রকার দানাদার শস্য। যবের রুটি, ছাতু ইত্যাদি সহজপাচ্য খাবার। যব থেকে রোগীদের আদর্শ খাবার বার্লি তৈরি হয়। যব চাষের জন্য ১০° সেঃ থেকে ১৩° সেঃ উত্তাপ এবং ৪০ সেঃ মিঃ থেকে ৬০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের জলবায়ু যব চাষের জন্য উপযোগী নয় বলে এখানে খুব বেশি যব উৎপাদিত হয় না। এদেশের রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলায় যব উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১৪ হাজার টন যব উৎপাদিত হয়।

৬. **ভুট্টা :** বাংলাদেশের দরিদ্র লোকদের জন্য ভুট্টার আটা ও খৈ মুখরোচক খাদ্য হিসেবে গণ্য হয়। গ্লুকোজ উৎপাদনেও এটি প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি, ১০° সেঃ থেকে ১৫° সেঃ উত্তাপ এবং ৫০ সেঃ মিঃ থেকে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ভুট্টা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী নয়; তাই এখানে ভুট্টার চাষ খুব কম হয়। এদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন, রাজশাহী ও পাবনা জেলায় কিছু কিছু ভুট্টার চাষ হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৩ হাজার টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়।

৭. **আলু :** এদেশে দু'ধরনের আলু উৎপাদিত হয়; যথা : গোল আলু ও মিষ্টি আলু।

ক) গোল আলু : বাংলাদেশে তরকারি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গোল আলু একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানি সেচের সাহায্যে এদেশে শীতকালে এ আলুর চাষ করা হয়। দেশের প্রায় সর্বত্রই গোল আলুর চাষ হয়। তবে ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলায় বেশি আলু উৎপন্ন হয়। দেশে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়।

খ) মিষ্টি আলু : বাংলাদেশে দরিদ্র লোকেরা প্রধান খাদ্য চালের বিকল্প হিসেবে মিষ্টি আলু আহার করে। এদেশের নদীবাহিত চরাঞ্চলের বালুময় জমিতে মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়। প্রধানত ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, ঢাকা, নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় মিষ্টি আলুর চাষ হয়ে থাকে। দেশে বার্ষিক প্রায় ৫.৮০ লক্ষ টন মিষ্টি আলু উৎপাদিত হয়।

৮. **ফলমূল :** বাংলাদেশের খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে ফলমূলের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে এদেশে নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য ফলের চাষ করা হত। কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিকভিত্তিতে এর চাষ করা হচ্ছে। এদেশে উৎপাদিত ফলমূলের মধ্যে আম, কাঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, কুল, বেল, আনারস, লিচু, তরমুজ, নারিকেল, কমলালেবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাটি ও আবহওয়ার তারতম্য অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

www.eelm.weebly.com

বিভিন্ন ফল কমবেশি পরিমাণে জন্মে। তবে রাজশাহী দিনাজপুরে আম ও লিচু, ঢাকার মুন্সীগঞ্জে কলা, সিলেটে কমলা ও আনারস, নোয়াখালী ও খুলনায় নারিকেল অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

৯. **শাকসব্জি** ঃ বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জি উৎপাদিত হয়। এদেশে উৎপাদিত শাকসব্জির মধ্যে লাউ, কুমড়া, পটল, ঝিঙ্গে, বেগুন, শসা, কলা, করলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বরবটি ও বিভিন্ন ধরনের শাক উল্লেখযোগ্য। এদেশের জনসাধারণ এসব শাকসব্জি ব্যাপকভাবে আহার করে থাকে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১২.৫০ লক্ষ টন শাকসব্জি উৎপাদিত হয়।

১০. **মশলা** ঃ মশলা প্রধানত খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। মশলা উৎপাদনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা ও অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন জলবায়ূ মশলা চাষের জন্য উপযোগী। এদেশে প্রায় সব জায়গায় বিভিন্ন প্রকার মশলা, যেমন ঃ হলুদ, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, ধনিয়া প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। অন্যান্য মশলা যেমন এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা প্রভৃতি এদেশে উৎপাদিত হয় না। দেশে বছরে প্রায় ৩.২০ লক্ষ টন মশলা উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাট, চা, আখ, তামাক, তুলা, রেশম, রাবার প্রভৃতি প্রধান। নিচে এসব ফসলের বিবরণ দেয়া হল ঃ

১. **পাট** ঃ বাংলাদেশের অর্থকরী বা বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে পাটই প্রধান। বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বাংলাদেশে জন্মে। উৎকৃষ্ট জাতের পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি থেকে পাওয়া যায়। পাট থেকে চট, বস্তা, থলি, কার্পেট, পর্দার কাপড় প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এজন্য পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হত।

পাট চাষের জন্য পলিযুক্ত হালকা দোঁ-আশ মাটি, ২০° সেঃ থেকে ২৬° উত্তাপ এবং ২০০ সেঃ মিঃ থেকে ২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই মাটি ও জলবায়ু একরকম হওয়ায় এখানে প্রায় সব জায়গাতেই পাটের চাষ হয়। তবে ময়মনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর ও যশোর জেলাতে বেশি পাট উৎপাদিত হয়। দেশে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপন্ন হয়।

২. **চা** ঃ চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। শারীরিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করা তথা ধনী-গরিব এবং শহর-গ্রাম সর্বত্রই আপ্যায়নের সহজ

www.eelm.weebly.com

উপাদান হিসেবে চা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। চা চাষের জন্য ১৬° সেঃ থেকে ২৭° সেঃ উত্তাপ এবং ১৫০ সেঃ মিঃ থেকে ২৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। একই সাথে ঢালু দোঁ-আশ মাটি চা চাষের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ঢালু, টিলা ও পাহাড়িয়া অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাই ঐ সমস্ত এলাকায় প্রচুর পমিাণে চা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে দেশে ১৫২টি চা বাগান আছে এবং প্রায় ১.২০ লক্ষ একর জমিতে চা চাষ করা হয়। আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৭ ভাগ চা রপ্তানি থেকে আসে। দেশে বছরে প্রায় ৪৮ হাজার মেঃ টন চা উৎপন্ন হয়।

৩. আখ ঃ বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল আখ। আখ চিনি ও গুড় উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আখ চাষের জন্য সাধারণত পলিযুক্ত অথবা কাদাযুক্ত দোঁ-আশ মাটি, ২৪° সেঃ থেকে ২৭° সেঃ উত্তাপ এবং ১০০ সেঃ মিঃ থেকে ১৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের কিছু এলাকার মাটি ও জলবায়ু এ রকম হওয়ায় সেখানে ব্যাপকভাবে আখের চাষ হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৪.৮০ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ করা হয়। দেশের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিং, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপন্ন হয়।

৪. তামাক ঃ তামাক বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। এককালে ধুমপায়ীদের প্রধান উপাদান হিসেবে হুক্কা বা কলকিতে করে তামাক সেবনের প্রথা চালু ছিল। বর্তমানে এর বিকল্প বিড়ি-সিগারেট আবিষ্কার হওয়ায় হুক্কার প্রচলন রহিত হয়ে যায়। যার ফরে উৎপাদিত তামাক পাতার সিংহভাগই ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন টোবাকো কোম্পানীগুলোতে। তাছাড়া কীটনাশক ওষুধ তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হয়।

তামাক চাষের জন্য হালাকা দোঁ-আশ মাটি, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের মাটি ও শীতকালীন জলবায়ু তামাক চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এদেশে মোট তামাক উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ কেবল রংপুর জেলাতেই উৎপাদিত হয়। এছাড়া নীলফামারী, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা, ময়মনসিং, কুমিল্লা, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল এবং রাজশাহী জেলাতেও তামাকের চাষ হয়। এদেশের বার্ষিক প্রায় ১.২০ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ করা হয়। দেশে বছরে প্রায় ০.৪০ লক্ষ মেঃ টন তামাক উৎপন্ন হয়।

৫. তুলা ঃ তুলা বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল।

www.eelm.weebly.com

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অল্পবিস্তর তুলার চাষ হচ্ছে। তুলাচাষের জন্য উর্বর, হালকা চুনযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনক্ষম দোঁ-আশ মাটি, উষ্ণ জলবায়ু ও ৭৫ সেঃ মিঃ থেকে ১০০ সেঃ মি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু তুলা চাষের জন্য উপযোগী নয়। তাই দেশে খুব কম তুলা উৎপন্ন হয়। এ দেশে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষ করা হয়। বাংলাদেশে যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিং অঞ্চলে কিছু কিছু তুলার চাষ হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় প্রায় ০.৭৪ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন হয়।

৬. রাবার ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাবার একটি সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। রাবার চাষের জন্য দোঁ-আশ ঢালুমাটি এবং ২০° সেঃ থেকে ২৭° সেঃ উত্তাপ এবং মোটামুটি বার্ষিক ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু রাবার চাষের পক্ষে তত উপযোগী নয়। এখানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, সিলেট, ময়মনসিং ও টাঙ্গাইল জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চলে উঁচু জমিতে রাবারের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে অল্প সময়ের মধ্যেই রাবার চাষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাবার চাষে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে এদেশে বার্ষিক প্রায় ৯০ হাজার একর জমিতে গড়ে ৭ শত টন রাবার উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক ৮০% জাতীয় শ্রম শক্তির প্রায় ৭৫% কৃষিখাতে নিয়োজিত। জাতীয় আয়ের প্রায় ৪০% আসে কৃষিখাত থেকে।

শিল্পজাত উৎপাদন

বিশ্বচরাচরে মহান আল্লাহ তা'আলা নানাবিধ সম্পদ ও শক্তি সন্নিহিত করে রেখেছেন। যার কতিপয় মানুষ সরাসরি ব্যবহার করতে পারে, আর কতিপয় এমন যা সরাসরি মানুষের ব্যবহার উপযোগী নয়। কিন্তু তার পিছনে সামান্য কলাকৌশল ও মেহ্‌নত ব্যয় করলে তাকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। আবার কতিপয় এমনও রয়েছে যা সরাসরি ব্যবহার করা যায় বটে; কিন্তু সরাসরি ব্যবহার করলে যতটুকু উপযোগ তা থেকে লাভ করা যায়, সামান্য কলাকৌশল ও মেহ্‌নত ব্যয় করলে তা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

বিশ্বচরাচরে সন্নিহিত শক্তি ও সম্পদসমূহে নানাবিধ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও শ্রম সংযোগ করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা কিংবা তার উপযোগকে বৃদ্ধি করার নাম শিল্প। যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান দ্রব্য সামগ্রীকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার কিংবা তার উপযোগ বৃদ্ধি করার কার্য সম্পন্ন করে, তাকে

www.eelm.weebly.com

বলা হয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা। শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তাকে বলা হয় শিল্পজাত উৎপাদন। শিল্পজাত উৎপাদনের জন্যও মৌলিকভাবে ৪টি উপকরণের প্রয়োজন হয়। শিল্প স্থাপনের জন্য এক খন্ড ভূমি ও কলকজার প্রয়োজন হয়, আবার কাঁচামাল সংগ্রহ ও শ্রমিকের মজুরী প্রদানের জন্য পুঁজির প্রয়োজন হয়। আর কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য একদল শ্রমিকের এবং উল্লিখিত উপকরণত্রয়কে একত্রিত করে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য একজন উদ্যোক্তা (ব্যবস্থাপক) বা একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

সারকথা এই যে, শিল্পের মূল উপকরণ ও ৪টি। যথাঃ ভূমি, মূলধন, শ্রম ও সংগঠন। ইংরেজিতে যাকে Land, Labour, Capital & Organization (LLCO) বলা হয়। এক্ষেত্রেও প্রতিটি উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সরবরাহ করতে পারে। আবার একই ব্যক্তি একাধিক উপকরণ বা সবগুলো উপকরণ সরবরাহ করতে পারে। অবশ্য বৃহদায়তন শিল্পে একই ব্যক্তির জন্য সবগুলো উপকরণ সরবরাহ করা অসম্ভব।

প্রকৃতি প্রদত্ত্ব সম্পদকে মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে তার সাথে মানুষের শ্রম-মেহ্নত, বুদ্ধি-প্রতিভাকে যুক্ত করে পণ্যের উৎপাদনের কাজ আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। সভ্যতার প্রথম স্তরে তা হয়ত ক্ষুদ্রায়তন হস্তশিল্পের গন্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। মানুষের মেধা ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষ শিল্পোৎপাদনের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্রপাতির ক্রমোন্নতি, কর্মক্ষমতা ও কর্মপরিসর বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে বৃহদায়তন শিল্প কারখানা ও বৃহৎ পরিমাণে শিল্পোৎপাদনের সূচনা হয়েছে।

শিল্পজাত উৎপাদন সাধারণতঃ মানুষের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণ, ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধির উপকরণের চাহিদা পূরণ করে থাকে। আর কৃষিজাত উৎপাদন প্রাণী ও মানুষের মৌলিক খাদ্য ও খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তাছাড়া শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল কৃষিজাত উৎপাদন থেকে আসে। এদিক বিচারে কৃষির গুরুত্ব শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি।

তথাপি শিল্পজাত উৎপাদনকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। কেননা মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য খাদ্যই যথেষ্ট নয়। বরং শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘর-বাড়ি, লজ্জা নিবারণের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসার জন্য ঔষধ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য বহুবিধ উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে। যেগুলোর যোগান হয় শিল্পজাত উৎপাদন থেকে। আধুনিক কালে মানুষ তার জীবন ব্যবস্থাকে এভাবেই গড়ে নিয়েছে যে, এখন শিল্পজাত উৎপাদন ছাড়া

www.eelm.weebly.com

মানুষের জীবন সামান্য ক্ষণের জন্যও সচল থাকতে পারে না। এ কারণেই এ যুগের নামকরণ করা হয়েছে শৈল্পিক যুগ বা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ।

শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম শিল্পজাত উৎপাদনের এই প্রয়োজনীয়তার কথা কেবল স্বীকারই করেনি বরং শিল্পজাত উৎপাদনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। আল্-কুরআনে বিভিন্ন শিল্পের স্বপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে এবং শিল্পজাত উৎপাদনের উৎকর্ষের সম্ভাবনাকে বিভিন্ন আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। অনেক নবীর ব্যক্তিগত পেশা ছিল শিল্পকর্ম। নবীদের মাধ্যমেই যে পৃথিবীতে শিল্পকর্মের সূচনা হয়েছে একথাও বিভিন্ন আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে খানিকটা আলোকপাত করে এসেছি।

ইসলাম শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহিত করলেও তা কতিপয় বিধিবদ্ধ নিয়মের আওতাভূক্ত করে দিয়েছে। যথা ঃ

১. কেবল মুনাফা অর্জনের উদ্দেশেই নয় বরং মানুষের প্রয়োজন পূরণ, জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে সৃষ্টির সেবা ও মানব কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যও এতে সন্নিহিত থাকতে হবে।

২. স্রষ্টার দেয়া সম্পদ ব্যবহার করে তাঁর সৃষ্টিকে শোষণ করার জঘন্য মনোবৃত্তি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

৩. মেধা ও প্রাকৃতিক সম্পদ দু'টোই আল্লাহর দান বিধায় খোদায়ী বিধানের অনুকূলে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। তাঁর বিধানের প্রতিকূলে সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হবে না। সুতরাং

ক) এমন কোন শিল্পের উৎপাদন অবশ্যই বৈধ হবে না, যা মানবতা ও মানুষের মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে।

খ) এমন কোন শিল্পোৎপাদন বৈধ হবে না, যার ব্যবহারের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

গ) এমন শিল্পপণ্য; যার ব্যবহারের বৈধ অবৈধ দু'টো দিকই রয়েছে, তা উৎপাদন করা বৈধ হলেও ব্যবহারকারীর ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তার বৈধতা অবৈধতা নিরূপিত হবে।

ঘ) যে পণ্য ইসলামী মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপন্থী তা উৎপাদন বৈধ হবে না। যেমন ঃ মুর্তি তৈরি, ব্লু ফিল্ম ইত্যাদি।

ঙ) মানুষের জীবন জীবিকার মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সংশ্লিষ্ট

www.eelm.weebly.com

শিল্পোৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

চ) এমন কোন শিল্প স্থাপনা অবশ্যই গড়ে তোলা যাবে না, যা স্থাপন করতে গিয়ে দেশের মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিতে হয়।

ছ) এমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি গড়ে তোলা হয় যার কারণে এ পেশায় পূর্ব থেকে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বেকার হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা আগে করে নিতে হবে। কিংবা তাদেরকে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করার যোগ্য করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) কোন শিল্পই একচেটিয়া দখলদারিত্বে ছেড়ে দেয়া যাবে না, যাতে জনগণকে শোষণ করার পথ উন্মুক্ত হয়।

ঝ) শিল্পোৎপাদনের কারখানায় এমন কোন আইন করা যাবে না, যাতে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আল্লাহর বিধান পালনে অক্ষম কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়।

ঞ) যে সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করলে জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কিংবা শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন করতে হবে।

অবকাঠামোর বিচারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাজন

অবকাঠামোর বিচারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথাঃ ক) বৃহদায়তন শিল্প খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ) কুটির শিল্প।

ক. বৃহদায়তন শিল্প ঃ যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের মূলধন, বিশাল পরিমাণে কাঁচামাল এবং ব্যাপকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে বিপুল পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে বৃহদায়তন শিল্প বলে।

বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুব বেশি নেই। তবে পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি ধরনের কিছু কিছু বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

খ. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ঃ যে শিল্প কারখানায় বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কম মূলধন এবং মূলধনের তুলনায় বেশিসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সাধারণভাবে সেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে। ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। প্লাস্টিক ও নাইলন সামগ্রী, সাবান, প্রসাধনী, চামড়া, কাঁচ,

www.eelm.weebly.com

দিয়াশলাই, চীনামাটি ও এলুমুনিয়াম ইত্যাদি কেন্দ্রিক শিল্পকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানই পূরণ করে থাকে।

গ. কুটির শিল্প ঃ যেসব শিল্প সাধারণতঃ স্বল্প মূলধন, সহজলভ্য কাঁচামাল ও অল্পসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা নিতান্ত পারিবারিক পরিবেশে পরিচালিত হয় তাকে কুটির শিল্প বলে। কুটির শিল্পের মূলধন সাধারণতঃ পরিবার থেকেই সরবরাহ করা হয় এবং পরিবারের লোকেরাই এতে শ্রমদান করে থাকে। এ শিল্পে সাধারণতঃ বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র ব্যবহার হয় না। হস্তচালিত মেশিনারী ও মান্ধাতা আমলের কলাকৌশল প্রয়োগ করেই কুটির শিল্পে উৎপাদন করা হয়। যেমন, হস্তচালিত তাঁত, মৃতশিল্প, বাঁশ-বেতের শিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প, শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্প ইত্যাদি। অবশ্য বিভিন্ন দেশের কুটির শিল্প বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কেননা যে দেশে যে ধরনের কাঁচামাল সহজলভ্য হয় এবং যে ধরনের পণ্যের চাহিদা সে দেশে থাকে, সে নিরিখেই সে দেশের কুটির শিল্পগুলো গড়ে উঠে।

ব্যবহারিক দিক বিচারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাজন

ব্যবহারিক দিক বিচারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ক) মৌলিক শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান খ) বিলাসী পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গ) বিনোদনমূলক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ক. মৌলিক শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ঃ যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মৌলিক সামগ্রী ও মানুষের নিত্যদিনের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তাকে বলা হয় মৌলিক শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। যেমনঃ লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, বস্ত্র তৈরির কারখানা, লবণ তৈরির কারখানা, ভোজ্যতেল উৎপাদনের কারখানা, ঔষধ কারখানা, গুড় ও চিনি উৎপাদনের কারখানা ইত্যাদি। মৌলিক শিল্পকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। ১. ভোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের অধিকাংশ মৌলিক শিল্প এ শ্রেণীভূক্ত। ২. মৌলিক উপকরণ উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেমনঃ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই বললেই চলে।

খ. বিলাসী পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ঃ যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিলাসী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় বিলাসীপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান। যেমন ইয়ারকন্ডিশান, গৃহসজ্জার আসবাবপত্র, গহনাগাটি ও বিভিন্ন প্রকার উপাদেয় আহার্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

www.eelm.weebly.com

গ. **বিনোদনমূলক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান** ঃ যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে সেগুলোকে বলা হয় বিনোদনমূলক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান। যেমন ঃ রেডিও, টেলিভিশন, বাদ্যযন্ত্র, প্রসাধন সামগ্রী, খেলনা ইত্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ইসলামী শিল্পনীতিতে প্রথম প্রকার শিল্প অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিলাসী পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করে, শরীয়তের পরিপন্থী না হলে তা উৎপাদনের অনুমতি দেয়া যাবে। কিন্তু যে দেশের মানুষের মৌলিক পণ্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে বিনোদনমূলক পণ্য উৎপাদনের অনুমতি দেয়াই সঙ্গত হবে না। কেননা এ ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হবে; তা দিয়ে একটি মৌলিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে। সচ্ছল দেশে বিনোদনমূলক পণ্যসমূহের মাঝে যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য হবে, সেগুলোর সীমিত পর্যায়ে উৎপাদনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেগুলোর ব্যবহারের বৈধ কোন দিক নেই, এ ধরনের পণ্য কোন অবস্থাতেই উৎপাদনের অনুমতি দেয়া যাবে না।

কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

মূলতঃ কৃষি ও শিল্প একটি আরেকটির পরিপূরক। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া যেমন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তেমনি শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া কৃষির উন্নয়নও অসম্ভব। তাই মানব সভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি তুলে ধরা হল।

কৃষির উপর শিল্পের নির্ভরশীলতা

১. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল কৃষিখাত সরবরাহ করে। সুতরাং কৃষি না থাকলে কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়েই উঠবে না। আর গড়ে উঠলেও সেগুলো দ্বারা উৎপাদনকর্ম আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হবে না। অধিকন্তু কৃষি না থাকলে শিল্পকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আহার্যের যোগানই বা হবে কোত্থেকে?

২. কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে; কৃষিখাত থেকে আহরিত শিল্পের কাঁচামালের দাম কমবে। ফলে শিল্পের কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করা সম্ভব হবে। এতে শিল্পোৎপাদন সহজতর ও অধিক লাভজনক হবে।

৩. শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী আমদানি করতে হলে প্রচুর বৈদেশিক

www.eelm.weebly.com

মুদ্রার প্রয়োজন। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়ার মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী আমদানি করা এবং শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

তাছাড়া খাদ্য ঘাটতি পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়; কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ করা গেলে; এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং তা দিয়ে শিল্প সামগ্রী আমদানি করে শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

৪. কৃষিখাতের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হলে জনগণের আয় বাড়বে। কৃষকের আয় বাড়লে তারা শিল্পজাত পণ্য ক্রয় করবে। এতে শিল্পজাত পণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে এবং শিল্পের উন্নয়ন ঘটবে। তাছাড়া জনগণের আয় বাড়লে শিল্পখাতে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে।

শিল্পের উপর কৃষির নির্ভরশীলতা

১. কৃষির উন্নয়নের জন্য যেসব শিল্পজাত উপকরণের প্রয়োজন হয়, যেমন ঃ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ইত্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প দেশে গড়ে উঠলে; এসকল উপকরণ সস্তায় সহজলভ্য হবে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২. অধিক হারে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে শিল্পের কাঁচামালের জন্য কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়বে এবং কৃষি অধিক লাভজনক হবে।

৩. অধিক হারে শিল্প গড়ে উঠলে উৎপাদিত শিল্পপণ্য রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সঠিক ব্যয় ও বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি আমদানি করে কৃষি ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে।

৪. বেকারত্বের কারণে কৃষিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জনশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। ফলে মাথাপিছু গড় আয়ের হার অনেক কম হওয়ায় কৃষি অলাভজনক পেশায় পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপকহারে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে সেখানে স্থানান্তর করা সম্ভব হলে; কৃষির উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ কমবে ফলে মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি লাভজনক উৎপাদনে পরিণত হবে।

৫. দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে কৃষিপণ্যের পচন রোধ ও অবচয় রোধ করা সম্ভব হবে। ফলে তা পণ্যের ন্যায্য দাম প্রাপ্তির জন্য সহায়ক হবে এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে

www.eelm.weebly.com

প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব হবে।

সারকথা কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দু'টি ক্ষেত্রের উন্নয়নই অপরিহার্য। বিশেষ করে যদি কোন দেশের কৃষি উৎপাদন ও কৃষি খাতের আয় দিয়ে সে দেশের সম্পদের চাহিদা মিটানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে দেশকে অবশ্যই শিল্প ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপর্যাপ্ত। সুতরাং দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ছাড়া এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। অবশ্য কৃষি উন্নয়নের চেষ্টাও অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। কেননা কৃষি উন্নয়ন ছাড়া শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীর অনেক দেশ কৃষির প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব প্রদান করে না; অথচ শিল্পে তারা উন্নত। ফলে অর্থনৈতিকভাবে তারা সমৃদ্ধ। যেমন- ইংল্যান্ড।

এর উত্তর এই যে, কৃষি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে যেসব দেশ শুধু শিল্পোন্নয়নের দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, তারা কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য কৃষি প্রধান দেশকে অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করে তাদের থেকে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা পূরণ করে নিচ্ছে। এ জুলুমের ফলেই তারা সমৃদ্ধির মুখ দেখছে। পৃথিবীর সবদেশ যদি কৃষি ছেড়ে শিল্পের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে পড়ে তাহলে শিল্প অচল হয়ে পড়বে এবং পৃথিবী চরম খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হবে।

বাংলাদেশ ও শিল্পায়ন

বাংলাদেশ ও শিল্পায়ন ঃ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ৪০% কৃষিখাত থেকে আসে। অবশিষ্ট ৬০% বৈদেশিক সাহায্য ও অন্যান্য উৎপাদনী খাত থেকে যোগান দেয়া হয়। মোট জনশক্তির ৭৫% ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। অল্প কিছুসংখ্যক লোক শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত। দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বেকার। কৃষিতে যে জনসংখ্যা নিয়োজিত আছে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কর্মসংস্থান নেই বলেই তারা কৃষিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এদেরকে বলা যায় ছদ্ম বেকার। এ ধরনের ছদ্ম বেকারের সংখ্যা ২০%। সুতরাং এদেশের ৫০% লোক প্রকৃত বেকার। এমতাবস্থায় এদেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্তও আমাদের শিল্প ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত থেকে গেছে। আয়ের মাত্র ১০% শিল্পখাত থেকে আসে। এর অর্থ হল প্রয়োজনের তুলনায় আমরা শিল্পায়নে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছি।

বাংলাদেশে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটির এ তিন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকলেও এর

www.eelm.weebly.com

অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক। ভারী ও মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। অতীতে এদেশের কুটির শিল্পের যথেষ্ট সুনাম থাকলেও বর্তমানে তার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। যেসব শিল্পকারখানা রয়েছে তাতে অত্যন্ত নিম্নমানের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ফলে উৎপাদনের মান ও পরিমাণ দু'টোই কম। রপ্তানীমুখী শিল্পের আমাদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্য, আর তৈরি পোষাক ছাড়া অন্যসব শিল্পপণ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতেই লেগে যায়। অবশ্য বর্তমানে রপ্তানী বৃদ্ধি ও শিল্পে বিদেশী পুঁজিদাতাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটি রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা [Export Processing Zone (EPZ)] স্থাপন করা হয়েছে। এদেশের শিল্পে ব্যক্তি ও সরকারি দু'ধরনের মালিকানাই বিদ্যমান রয়েছে। শিল্পে এই পশ্চাদ্পদতার বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেমন ঃ বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে শিল্প স্থাপনে অত্র এলাকার প্রতি অবহেলা, খনিজ ও শক্তি সম্পদের অপর্যাপ্ততা, উদ্যোক্তার অভাব, পুঁজির অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা, কারিগরী জ্ঞানের অভাব, দক্ষ শ্রম শক্তির অনুপস্থিতি, অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্পঋণের অব্যবস্থা, সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নৈতিকতা বোধের অভাব, ব্যাপক দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ শিল্পায়নে যথেষ্ট পশ্চাদমুখীতার শিকারে পরিণত হয়েছে।

এই পশ্চাদমুখীতা কাটিয়ে উঠার জন্য আমাদেরকে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ দূরীভুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর সাথে সাথে শিল্পায়ন ও শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিতে গবেষণা চালাতে হবে। এদেশের জন্য উপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে আমাদের শিল্পপণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পণ্যের মানোন্নয়নের জন্য দুর্নীতি থেকে মুক্ত থেকে আমাদের জনশক্তিকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। যেহেতু আমাদের পুঁজির সংকট রয়েছে এবং কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে অতএব ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় ভারী শিল্প সরকারি উদ্যোগে গড়ে তুলতে হবে। শিল্পে যৌথ পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের শিল্পোৎপাদিত পণ্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে অর্থনীতিতে প্রধানত তিন ধরনের শিল্প রয়েছে। যথা ঃ ক) বৃহদায়তন শিল্প, খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও গ) কুটির শিল্প।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৃহদায়তন শিল্প

www.eelm.weebly.com

নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৃহদায়তন শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

১. পাট শিল্প ঃ পাটশিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এদেশে প্রায় ২০/২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয়। বার্ষিক কাঁচা পাটের উৎপাদন প্রায় ৬০/৭০ লক্ষ বেল। এটা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫ ভাগ। আমাদের পাটশিল্পে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কোন পাটকল ছিল না। অবিভক্ত ভারতে বৃটিশ আমলে স্থাপিত ১০৮টি পাটকলের সবগুলোই ভারতের ভাগে পড়ে। ১৯৫১ সালে এদেশের প্রথম পাটকল 'আদমজী জুট মিল' নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৮টি পাটকল রয়েছে। এসব পাটকলে প্রায় ৬ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এর প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাটকলগুলোর উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চট, চটের বস্তা, কার্পেট, ত্রিপল, জায়নামাজ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ১৯৯৩-৯৪ সালে ৪৪.৫০ লক্ষ মে. টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৯৯২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।[১]

২. বস্ত্র শিল্প ঃ বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৯টি কাপড়ের কল ছিল। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে বস্ত্র ও সুতাকলের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪টি। বর্তমানে এদেশে মোট ৫৮টি বস্ত্র ও সুতাকল আছে। বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১২ কোটি লোকের জন্য বছরে প্রায় ১৪০ কোটি পাউন্ড সুতা উৎপাদিত হয়। সুতরাং কাপড়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কাপড় ও সুতা আমদানি করতে হয়। কাপড় ও সুতাকলগুলো প্রধানত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। আমাদের বস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা হল কাঁচা তুলার অভাব। বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে একদিকে কাঁচা তুলার উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং অন্যদিকে আরও বেশি সংখ্যক কাপড় ও সুতাকল স্থাপন করতে হবে।

৩. চিনি শিল্প ঃ ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫টি চিনির কল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা মোট ১৬টি। এগুলো সরকারি মালিকানায় পরিচালিত। এ চিনিকলগুলো প্রধানতঃ রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সেতাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, রাজশাহী, নাটোর, কুষ্টিয়া, দর্শনা ও ফরিদপুরে অবস্থিত। এটি একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে চিনির প্রয়োজন প্রায় ৩ লক্ষ মে. টন। কিন্তু আমাদের চিনিকলগুলোর বার্ষিক মোট উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ মে. টন।

---

১. উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ-১৯৯৩-৯৪

www.eelm.weebly.com

সুতরাং চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি, চিনিকলগুলোর সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং নতুন চিনিকল স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চিনি রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে এদেশে মোট প্রায় ২.২২ লক্ষ মে. টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।[২]

৪. **কাগজ শিল্প** ঃ ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কোন কাগজের কল ছিল না। ১৯৫৩ সালে দেশের প্রথম কাগজের কল 'কর্ণফুলী পেপার মিল' পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ সালে পাকশীতে স্থাপিত হয় 'নর্থবেঙ্গল পেপার মিল'। এছাড়া খুলনায় একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় একটি করে হার্ডবোর্ড মিল রয়েছে। সিলেটের ছাতকে একটি কাগজের মন্ড তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কাগজের কলগুলোতে প্রধানতঃ বাঁশ, নরম কাঠ, আখের ছোবড়া প্রভৃতি কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দেশের সবগুলো কাগজের কল সরকারি খাতে পরিচালিত।

কাগজ উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশীয় চাহিদা পূরণের পর এদেশ থেকে কিছু পরিমাণ কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৪৪ হাজার মে. টন ও ৬ হাজার মে. টন।[৩]

৫. **সার শিল্প** ঃ কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি সার কারখানা রয়েছে। এগুলো হল ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ঘোড়াশাল সার কারখানা, খুলনা টিএসপি কারখানা, সিলেট এ্যামোনিয়া সালফেট কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা এবং জামালপুরে যমুনা সার কারখানা। এই সার কারখানাগুলো সরকারি মালিকানাধীন। বাংলাদেশ সার উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে সারের উৎপাদন ছিল ইউরিয়া ২১ লক্ষ ৩৯ হাজার মে. টন, টিএসপি ৫৯ হাজার মে. টন ও অ্যামোনিয়া সালফেট ৭ হাজার মে. টন।[৪]

৬. **সিমেন্ট শিল্প** ঃ স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশে মাত্র ১টি সিমেন্ট কারখানা ছিল সিলেটের ছাতকে। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জয়পুরহাটে আরেকটি সিমেন্ট কারখানা নির্মাণের কাজ চলছে। এই সিমেন্ট কারখানাগুলো সরকারি খাতে পরিচালিত। বর্তমানে বাংলাদেশে সিমেন্টের আভ্যন্তরীণ বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩ লক্ষ মে. টনের মত। ১৯৯২-৯৩ সালে এদেশে ২.০৭ লক্ষ মে. টন সিমেন্ট উৎপাদন হয়েছে।[৫]

---

২. উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ-১৯৯৩-৯৪

৩. উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ-১৯৯৩-৯৪

৪. উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ-১৯৯৩-৯৪

৫. উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ-১৯৯৩-৯৪

www.eelm.weebly.com

৭. লোহা ও ইস্পাত শিল্প ঃ বাংলাদেশের একমাত্র লোহা ও ইস্পাত কারখানা চট্টগ্রামে স্থাপিত হয় ১৯৬৭ সালে। এর বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.৫ লক্ষ টন। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা এ কারখানায় ইস্পাত সীট, লোহার পাত ও রড, ঢেউটিন এবং লোহা ও ইস্পাতের অন্যান্য দ্রব্য তৈরি হয়। এসব দ্রব্যের উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম।

৮. ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ঃ ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোটেই উন্নত নয়। গাজীপুর জেলায় জয়দেবপুরে একটি মেশিন টুলস কারখানা রয়েছে। এ কারখানায় পানি সেচের পাম্প ও মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। ঢাকার অদূরে টঙ্গিতে একটি ডিজেল প্লান্ট এবং গাজীপুরে দেশের একমাত্র অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মিত হয়েছে। চট্টগ্রামে একটি বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল তৈরির কারখানা এবং একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি তৈরির কারখানা নির্মিত হয়েছে।

৯. জাহাজ নির্মাণ শিল্প ঃ ১৯৫৭ সালে খুলনায় একটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। সেখানে জাহাজ মেরামত ছাড়াও বার্জ, লঞ্চ, টাগ প্রভৃতি জলযান এবং চিনি কলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে আভ্যন্তরীণ নৌপথের জাহাজ ও লঞ্চ নির্মাণ এবং মেরামত করা হয়। চট্টগ্রামে অবস্থিত ডাকইয়ার্ড-এ সামুদ্রিক জাহাজ মেরামত করা হয়।

১০. পোশাক শিল্প (গার্মেন্টস) ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে পোষাক শিল্প (গার্মেন্টস) দ্রুত বিকশিত একটি রপ্তানিমুখী শিল্প। ১৯৭৬ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকার তৈরি পোষাক রপ্তানির মাধ্যমে এই শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। মাত্র ২০ বছরে আমাদের পোষাক শিল্প অকল্পনীয় উন্নতি করেছে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৬ শত পোষাক তৈরির কারখানা (গার্মেন্টস) আছে। এসব কারখানায় তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বড় বড় ক্রেতা হল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ। আমাদের দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫৫ ভাগই আসে তৈরি পোষাক রপ্তানি থেকে। এ শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ, যার প্রায় ৮০% মহিলা। এ শিল্পে ব্যবহৃত কাপড়ের প্রায় সবই বিদেশ থেকে আসে। ১৯৯৩-৯৪ সালে আমাদের তৈরি পোষাকের রপ্তানি আয় ছিল ৫৮০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল ঃ

১. প্লাস্টিক ও নাইলন শিল্প ঃ এই শিল্পে বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর ছোট ছোট ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ রকম অনেক কারখানা রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

২. বস্ত্র সংক্রান্ত শিল্প : ছোট ছোট কাপড়ের কারখানায় চাদর, পোষাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, রেশম বস্ত্র প্রভৃতি তৈরি হয়। ঢাকা, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে এ শিল্পের অনেক কারখানা রয়েছে।

৩. প্রসাধনী ও সাবান শিল্প : দেশে সাবান, তেল, পাউডার, ক্রীম, টুথপেষ্ট, চুড়ি ও অন্যান্য নানা প্রকার প্রসাধনী তৈরির বহু কারখানা রয়েছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানেও এ শিল্পের অনেক কারখানা রয়েছে।

৪. চামড়া শিল্প : চামড়ার ব্যাগ, সুটকেস, জুতা, স্যান্ডেল, মানিব্যাগ, বেল্ট প্রভৃতি দ্রব্য আমাদের চাহিদা পূরণ করে। ঢাকার হাজারীবাগ ও দেশের অন্যান্য স্থানে এ শিল্পের কারখানা রয়েছে।

৫. চীনামাটি ও এলুমিনিয়াম শিল্প : বাংলাদেশে চীনামাটির বাসনপত্র, পেয়ালা, ফুলদানি প্রভৃতি এবং এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি পাতিল, বাসন ইত্যাদি তৈরির অসংখ্য কারখানা আছে।

৬. দিয়াশলাই শিল্প : ঢাকা ও বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দিয়াশলাই তৈরির কারখানা আছে। শিমুল, কদম, ছাতিয়ান কাঠ এ শিল্পের কাঁচামাল।

৭. কাঠ শিল্প : কাঠের কারখানাগুলোতে নানা ধরনের আসবাবপত্র যেমন- হার্ডবোর্ড, প্লাইউড এবং অন্যান্য কাঠের আসবাবপত্র তৈরি হয়। দেশের সর্বত্র কাঠের ছোট বড় কারখানা রয়েছে।

৮. খাদ্য সংক্রান্ত শিল্প : ডেয়ারি ফার্ম, ফলমূল ও মাছ মাংস, চাল ও আটার কল, বেকারি প্রভৃতি এই শিল্পের অন্তর্ভূক্ত।

৯. লোহা ও ইস্পাত সংক্রান্ত শিল্প : দেশে লেদ কারখানা, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, তালা চাবি, লোহা ও ইস্পাত জাতীয় অসংখ্য বস্তু তৈরি ও মেরামতের বহু কারখানা রয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশে বহুবিধ ছোটখাট ভোগ্যপণ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্রশিল্প কারখানা আছে। এই ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলো প্রথমত জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্রের চাহিদা মেটায়। দ্বিতীয়ত এগুলোর মধ্যে কতিপয় শিল্প বৃহৎ শিল্পের অনুপূরক হিসেবে কাজ করে। এ শিল্পগুলোর অধিকাংশই দেশের সহজলভ্য কাঁচামাল ব্যবহার করে। এ ধরনের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা গঠন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে শ্রম নিবিড় ক্ষুদ্রশিল্প কারখানার সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কুটির শিল্প

এক সময় বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সুনাম ছিল। কিন্তু কালক্রমে দেশের বৃহৎ শিল্পের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় এবং অন্যানা সমস্যার কারণে আমাদের

www.eelm.weebly.com

কুটির শিল্পগুলো টিকে থাকতে পারছে না। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনও বেশ কিছুসংখ্যক কুটির শিল্প আছে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

১. হস্তাচালিত তাঁত শিল্প ঃ এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান কুটির শিল্প। অতীতে ঢাকার মসলিন শাড়ির বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি ছিল। বর্তমানে এ শিল্পের কারখানাগুলোতে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, গামছা, চাদর, মশারি, তোয়ালে, কাতান ও জামদানি শাড়ি ইত্যাদি তৈরি হয়। টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, ঢাকা, পাবনা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪.৫০ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত রয়েছে। এসব তাঁতে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের দেশের মোট কাপড়ের চাহিদার বেশির ভাগই তাঁত শিল্প মিটিয়ে থাকে।

২. মৃৎ শিল্প ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কুমারেরা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, কলস, বাসন, বদনা, টব, ফুলদানি, খেলনা প্রভৃতি দ্রব্য তৈরি করে। এ শিল্প দেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করে। এ শিল্পে মূলধন লাগে খুব কম। বাংলাদেশের পাবনা ও ফরিদপুর জেলা মৃৎ শিল্পে সুনাম অর্জন করেছে।

৩. বাঁশ ও বেত শিল্প ঃ বাঁশ ও বেত থেকে তৈরি মোড়া, সোফা সেট, সুটকেস, ঝুড়ি, কুলা, ফুলদানি, পাটি, মাদুর, হাত ব্যাগ, দোলনা ইত্যাদি এ শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য। সিলেট, কুমিল্লা, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে এ শিল্পের উন্নতমানের দ্রব্য তৈরি হয়।

৪. রেশম শিল্প ঃ বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, পাবনায় রেশম চাষের কেন্দ্র আছে। রেশম থেকে শাড়ি, চাদর, থানকাপড় তৈরি হয়। রাজশাহী সিল্ক শাড়ি খুব জনপ্রিয়। রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজশাহীতে একটি পৃথক 'সেরিকালচার' বোর্ড আছে।

৫. কাঁসা ও পিতল শিল্প ঃ রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলায় কাঁসা ও পিতলের থালাবাসন, কলস, চামচ, ঘটিবাটি, ফুলদানি তৈরি হয়। কাঁসা পিতলের তৈরি এসব সামগ্রী এদেশে কিছুকাল আগেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

৬. বিড়ি শিল্প ঃ দেশের প্রায় সর্বত্র বিড়ির কারখানা থাকলেও কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। দেশে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। সিগারেট শিল্পের প্রসারের ফলে বিড়ি তৈরি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে।

৭. শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্প ঃ বাংলাদেশের ঢাকা, যশোর ও রংপুর জেলা এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এসব স্থানে শঙ্খ, ঝিনুক, হাতির দাঁত ও হাড় থেকে শাঁখা, মালা, বোতাম, বালা, আংটি, চিরুনি, খেলনা ইত্যাদি জিনিস তৈরি হয়।

www.eelm.weebly.com

৮. ধাতব শিল্প ঃ দেশের সর্বত্র কামারেরা ধাতব পদার্থ থেকে কোদাল, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি, বটি, লাঙ্গলের ফলা, নিড়ানি প্রভৃতি জিনিস তৈরি করে।

৯. ছোবড়া শিল্প ঃ নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ, ব্রাস, জাজিম প্রভৃতি তৈরি হয়। খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

১০. চরকা শিল্প ঃ বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় চরকায় কাটা সুতা দিয়ে খদ্দরের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের খদ্দরের কাপড়, চাদর ও তৈরি পোষাক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

১১. পাট নির্ভর কুটির শিল্প ঃ বাংলাদেশে কুটির শিল্পে কাঁচা পাট থেকে দড়ি, সিকা, থলে ও গৃহসজ্জার বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয়। দেশের ভেতরে ও বাইরে এসব দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে।

১২. অলংকার শিল্প ঃ দেশের গ্রাম ও শহরের সব স্থানেই অলংকার শিল্প গড়ে উঠেছে। এ শিল্পে স্বর্ণকারেরা সোনা ও রূপা দিয়ে নানা ধরনের অলংকার তৈরি করে। এ শিল্প দিন দিন প্রসার লাভ করছে।

১৩. কাঠ শিল্প ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে কাঠের ছোটখাটো আসবাবপত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী, লাঠি, লাঙ্গল, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি জিনিস তৈরি হয়। দেশের সব স্থানেই এসব দ্রব্যের চাহিদা আছে।

১৪. সাবান শিল্প ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কুটির শিল্পে সাধারণ মানের কাপড় কাঁচা সাবান উৎপন্ন হয়।

১৫. লবণ শিল্প ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে সমুদ্রের লোনাপানি থেকে লবণ তৈরি হয়। এভাবে দেশে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়।

১৬. অন্যান্য কুটির শিল্প ঃ চামড়ার ছোট ছোট গৃহস্থালি দ্রব্য তৈরি, বই বাঁধাই, তেলের ঘানি, ঢেঁকি, মিষ্টি, দই ও ঘি তৈরি ইত্যাদি নানা প্রকার কুটির শিল্প আমাদের অসংখ্য ভোগ্য পণ্যের চাহিদা মেটায়।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি জমি সীমিত এবং বৃহৎ শিল্প অনুন্নত। তাই দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান অধিক। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১. বেকার সমস্যা লাঘব ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনশক্তি বেকার। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে; চাষীদের জন্য সহকারী পেশা এবং অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

www.eelm.weebly.com

২. মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান ঃ বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। এ বিপুলসংখ্যক নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা দরকার। কুটির শিল্পের প্রসার ঘটলে মহিলাদের জন্য পর্দা রক্ষা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পরিবারের আয় বাড়বে।

৩. কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। তাহলে কৃষির উপর যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ রয়েছে তা এসব শিল্পে স্থানান্তরিত হবে।

৪. দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার ঃ বাংলাদেশের পাট, চা, চামড়া, বাঁশ, বেত, কাঠ এবং অন্যান্য বহুবিধ কাঁচামাল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এসবের সদ্ব্যবহার হলে দেশের উৎপাদন ও আয় বাড়বে।

৫. গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঃ বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বেশিসংখ্যক কারখানা স্থাপন করা দরকার। তাহলে গ্রামীণ জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

৬. মূলধনের সমস্যা লাঘব ঃ বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় বেশ কম। ফলে এদেশের ভারি শিল্পে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই এখানে স্বল্প মূলধন নির্ভর কুটির শিল্পের উন্নয়নই বেশি সুবিধাজনক।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতি ও বিদেশী কাঁচামাল আমদানি করতে হয় না। ফলে আমাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়ে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যায়।

৮. বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক ঃ যেসব দ্রব্য বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন করা সম্ভব নয় সেগুলো কুটির শিল্পে উৎপাদিত হয়। সুতরাং কুটির শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

৯. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পগুলো শহরাঞ্চলে স্থাপিত হওয়ায় উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রধানত শহর কেন্দ্রিক। দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

১০. সম্পদের সুষম বন্টন ঃ দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটলে স্বল্প আয়ের লোকেরা শিল্প কারখানা স্থাপনে অংশীদার হতে পারে। এতে দরিদ্র লোকের আয় বাড়বে এবং সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন হবে।

১১. জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলার সংরক্ষণ ঃ বাংলাদেশে জনগণের পুরনো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা রয়েছে। বহুকাল থেকে বিরাজমান কুটির শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলা রক্ষা করা সম্ভব।

www.eelm.weebly.com

সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সমাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। তবে দেশের সার্বিক শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থান

জীবিকা অর্জনের জন্য নিজের উদ্যোগে কাজের ব্যবস্থা করাই হল স্বকর্মসংস্থান। বাংলাদেশে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প কারখানাগুলোতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনশক্তি বেকার। প্রকট বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এদেশে সাম্প্রতিককালে স্বকর্মসংস্থানকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অনেক নারীপুরুষ বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থানের জন্য এগিয়ে আসছে। এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ঃ

ক্ষুদ্র শিল্পে স্বকর্মসংস্থান ঃ অল্প জায়গা আর সামান্য পুঁজি সংগ্রহ করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনমুখী কাজ শুরু করা যায়। যেমন সাধারণ মানের পোশাক ও হোসিয়ারী দ্রব্য, রেশমের শাড়ি ও কাপড় তৈরির কারখানা, চাল ও আটা কল, কাপড় কাচা সাবান, বেকারি, ফাস্ট ফুডের দোকান, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করা যায়। এছাড়াও নানা প্রকার প্রসাধনী দ্রব্য, যেমন- মাথার তেল, পাউডার, স্নো, লেখার কালি, বলপেন, আঠা, ছোট ছোট প্লাস্টিক সামগ্রী ইত্যাদি তৈরির কাজ নিজের বাড়িতে করা যায়। এসবের জন্য দেশজ কাঁচামাল এবং স্বল্পমূল্যের কিছু সরঞ্জামাদির দরকার হয়। এসব উৎপাদনমূলক উদ্যোগে নিজের কাজের সাথে সাথে সমাজের আরও কিছু লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা পরিচালিত হলে এসব ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র কালক্রমে বড় আকারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থান ঃ বাংলাদেশের প্রায় সব কুটির শিল্পই স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত। শহর ও গ্রামের বেকার লোক নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন কুটির শিল্পের কারখানা স্থাপন করতে পারে। যেমন তাঁতের শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর, মশারী, গামছা প্রভৃতি জিনিস দেশের বিভিন্ন স্থানে স্ব-উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে। এছাড়া মাটির সামগ্রী, বাঁশ বেত ও কাঠের জিনিস, কাঁসা, পিতলের বাসন-কোসন, নারকেলের ছোবড়ার সামগ্রী, মাদুর, বিড়ি, সুচি শিল্প ইত্যাদি কুটির শিল্পের কাজ নিজ উদ্যোগে সহজেই শুরু করা যায়। এসব কর্মকান্ডে সামান্য পুঁজি এবং মামুলি ধরনের যন্ত্রপাতি হলেই চলে। কাঁচামালও সহজলভ্য। দেশে এসব দ্রব্যের ব্যাপক

www.eelm.weebly.com

বাজার রয়েছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এসব কাজের মাধ্যমে নিজেরা কর্মসংস্থান করে আয় বাড়াতে পারে। আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র এসব কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগ ক্রমশ বাড়ছে।

নিজ উদ্যোগে কাজের সংস্থানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা সম্ভব। এজন্যই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে দেশে বিদেশে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা মনে করি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য বিনা মূল্যে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং সুদ বিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত কর্তব্য। বরং সম্ভব হলে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এ সকল উদ্যোক্তাদেরকে এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা করা উচিত। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করে শ্রম ও মেধার যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

www.eelm.weebly.com

৭ম অধ্যায়

উৎপাদনের উপকরণ

কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেসকল দ্রব্য-সামগ্রী, শ্রম ও সেবার প্রয়োজন হয় মূলতঃ সেগুলোকেই উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়। উৎপাদনের সর্বস্বীকৃত উপাদান মোট চারটি। যথাঃ ১. ভূমি (Land), ২. শ্রম (Labour), ৩. মূলধন (Capital), ৪. সংগঠন (Organization)।

১. ভূমি (Land) ঃ উৎপাদনে সাহায্য করে এ ধরনের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকেই অর্থনীতির পরিভাষায় ভূমি বলা হয়। অন্য কথায় একে প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণও বলা যায় অর্থাৎ ভূমি বলতে এমনসব উপকরণকে বুঝায় যার সৃষ্টিতে মানুষের কোন ভূমিকা বা দখল নেই। কিন্তু অন্যান্য সামগ্রীও উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. শ্রম (Labour) ঃ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সব ধরনের পরিশ্রমকেই অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রম বলে। সুতরাং শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের মেধাগত প্রচেষ্টাও শ্রম।

৩. মূলধন (Capital) ঃ মূলধন বলতে সাধারণ অর্থে সম্পদ ও টাকা পয়সাকেই বুঝায়। তবে অর্থনীতির পরিভাষায় যে সামগ্রী মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত কিন্তু সরাসরি তা ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হয় সেগুলোকে মূলধন বলে। সংক্ষেপে, উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণকে মূলধন বলে। যেমন ঃ নগদ টাকা, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদি হল মূলধন।

৪. সংগঠন (Organization) ঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম এবং মূলধনকে একত্রিত করে এগুলোর যথার্থ সমন্ব ঘটিয়ে উৎপাদন কার্য পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনাকে সংগঠন বলা হয়। আর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই কাজ সম্পাদন করেন তাকে বা তাদেরকে বলা হয় সংগঠক। সংগঠককে উদ্যোক্তাও (Entrepreneurs) বলা হয়ে থাকে।

উৎপাদনে সংগঠকের ভূমিকাই সর্বাধিক। উৎপাদনের পরিকল্পনা এবং অন্যান্য উপকরণত্রয়ের যোগানদান ও সেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন, উৎপাদন কাজের তদারকি, লাভ লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ, উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও উৎপাদিত

www.eelm.weebly.com

পণ্য বাজারজাত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ এসবই উদ্যোক্তার কাজ। সর্বোপরি পণ্যের উৎপাদিত ব্যয় (Production cost) এবং বিক্রয় মূল্য (Selling Price)) নির্ধারণ এবং উক্ত উৎপাদিত ব্যয় বাদ দিয়ে লভ্যাংশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই একজন স্বার্থক সংগঠকের অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজে যে যত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদনে সে তত সফলতার পরিচয় দিবে।

উৎপাদনে উপরোল্লিখিত উপকরণ চতুষ্টয়ের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মাঝে যে কোন একটির অভাব হলে উৎপাদন সম্ভব নয়।

অবশ্য উৎপাদনের উপকরণকে মূল কয়টি ভাগে ভাগ করা হবে এনিয়ে অর্থনীতিবিদদের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ উৎপাদনের মূল উপকরণ দু'টি বলে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ তিনটি বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অনেক ইসলামী অর্থনীতিবিদও উৎপাদনের মূল উপকরণ তিনটি হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন মাওলানা তকী উসমানী উৎপাদনের মূল উপকরণ তিনটি বলে উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ ভূমি, শ্রম ও সংগঠক। তার মতে পুঁজির বিপরীতে কোন লভ্যাংশ বরাদ্দ করা হয় না। পুঁজি সরবরাহ করা সংগঠকেরই দায়িত্ব, যার বিনিময়ে তিনি লভ্যাংশ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি মনে করেন যে, পুঁজির বিনিময়ে লভ্যাংশ বরাদ্দ করা হলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। ইসলাম যেহেতু সুদকে অনুমোদন করে না, তাই পুঁজির বিনিময়ে কোন লাভ বরাদ্দ করা যাবে না। অতএব এর পৃথক অস্তিত্বের কোন অর্থ হবে না। কিন্তু তাঁর কথাটি সর্বাংশে মেনে নেয়া যায় না। কেননা পুঁজির বিনিময়ে লভ্যাংশ বরাদ্দের বিধান ইসলামে রয়েছে। যেমন ঃ মুদারাবায় উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী পৃথক পৃথক ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং পুঁজির মালিক পুঁজির বিনিময়ে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। মুফতী শফী (রহ.)ও 'ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা' নামক পুস্তিকায় উৎপাদনের উপকরণ তিনটি বলে উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ ভূমি, শ্রম ও পুঁজি। তার মতে সংগঠকের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। কেননা উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি মূলতঃ শ্রমেরই একটি অংশ। যদিও তা মানসিক শ্রম ও উন্নত পর্যায়ের শ্রম। অতএব এটি শ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

বস্তুতঃ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উৎপাদনের যে চারটি উপকরণের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, উৎপাদনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। মৌলিকভাবে এই চারটি উপকরণের কথা স্বীকার করে নেয়ার মাঝে কোন অসুবিধাও নেই। কেননা ইসলামের মূলনীতির সাথে এর কোন সংঘাত নেই। তবে সবক্ষেত্রে এই চারটি উপরকণ পৃথক পৃথক ব্যক্তি থেকে পাওয়া অপরিহার্য নয়। কোন কোন সময় একাধিক উপকরণ একই ব্যক্তি সরবরাহ করতে

www.eelm.weebly.com

পারেন, অথবা এক ব্যক্তিই সবগুলো উপকরণ যোগান দিতে পারেন। যেমন ঃ যিনি উদ্যোক্তা, তিনিই ভূমির মালিক, তিনিই পুঁজির যোগানদাতা, আবার তিনি নিজেই শ্রমদাতা হতে পারেন। তবে উৎপাদনের মুনাফা বন্টনের যে ব্যাখ্যা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় দেয়া হয়েছে তার সাথে ইসলামের বিরাট সংঘাত রয়েছে।

উৎপাদনের মুনাফা বন্টন

মুনাফা বন্টনের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু উৎপাদনে চারটি উপকরণ ব্যবহৃত হয়, অতএব এই চার উপকরণই মুনাফার যথার্থ হকদার। তবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকেন যে, ভূমি বা ভূমির মালিকের প্রাপ্য হবে ভূমির নির্ধারিত ভাড়া (Rent)। শ্রম বা শ্রমিকের প্রাপ্য হবে নির্ধারিত মজুরী বা পারিশ্রমিক (Wages), পুঁজি বা পুঁজি সরবরাহকারী পাবে নির্ধারিত সুদ (Interest), আর সংগঠন বা সংগঠক পাবে লাভ (Profit)।

সারকথা, প্রথমোক্ত তিন উপকরণ অর্থাৎ ভূমির ভাড়া, শ্রমিকের মজুরী ও পুঁজির সুদ পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে। আর তা নির্ধারণ করা হয় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির ভিত্তিতে। (অর্থাৎ চাহিদা বেশি হলে ভাড়া, মজুরী ও সুদ বৃদ্ধিপায়; আর চাহিদা কম হলে এগুলো কমে যায়) কিন্তু উদ্যোক্তার লাভের অংশ কারবার শেষে ধার্য হয় অর্থাৎ উৎপাদনের সাকূল্য ব্যয় বহন করার পর যে লাভ দাঁড়ায়; তার সবটাই উদ্যোক্তা ভোগ করে থাকেন।

এই ব্যবস্থায় একটি বিরাট ফাঁক থাকে যে, উদ্যোক্তা পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর অপর তিন অংশীদারের প্রাপ্য অংশ (ভূমির ভাড়া, শ্রমের মজুরী ও পুঁজির সুদ) যোগ করে পণ্যের বাজারদর নির্ধারণ করে থাকেন। ফলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং এর খেশারত দিতে হয় সাধারণ ভোক্তাদেরকে। এর সারকথা এই দাঁড়ায় যে, উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জনের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তার যাবতীয় ব্যয়ভার চাপিয়ে দিলেন ভোক্তাদের কাঁধে। আর পূর্ণ লভ্যাংশ নিজে একাই ভোগ করলেন। অথচ এই দায়ভার ভোক্তাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার দ্বারা ভোক্তারা শোষিত হয়। এই ফাঁক দিয়েই উদ্যোক্তারা সমাজকে শোষণ করেন। অথচ তারা শোষণকারী হিসেবে চিহ্নিত হয় না। আর সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে তিলে তিলে শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে সর্বশান্ত হয়ে যায়।

মুনাফা বন্টনের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়; তাই এ ব্যবস্থায় পুঁজি ও ভূমির মালিক হয় রাষ্ট্র। আর

www.eelm.weebly.com

সকল উৎপাদনী কার্যক্রম যেহেতু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীনে আঞ্জাম পায় সেহেতু এ ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা বা সংগঠক হয় রাষ্ট্র। কাজেই উৎপাদনের এই তিন উপকরণের প্রাপ্য অংশ রাষ্ট্র লাভ করে। শুধু থেকে যায় শ্রমের প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক পায় মজুরী। তবে মজুরীও চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির ভিত্তিতে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করার অধিকার শ্রমিকের থাকে না বরং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিককে শ্রম দিয়ে যেতে হয়। প্রদত্ত মজুরীতে সে সন্তুষ্ট না থাকলে তার বিরুদ্ধে কিছু বলার ক্ষমতা শ্রমিকের থাকে না। কাজ বর্জন করে অন্যত্র চলে যাওয়ার সুযোগও তার থাকে না। হরতাল ধর্মঘট আহ্বান করে বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করার সুযোগও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় থাকে না। শ্রমিক সেখানে নিতান্তই অসহায়।

মুনাফা বন্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ঃ ইসলাম উৎপাদনের চার উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিলেও মুনাফা বন্টনের পুঁজিবাদী ব্যাখ্যাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। কেননা ইসলাম সুদকে কিছুতেই অনুমোদন করে না। মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের স্বীকৃত নীতি হল এই যে, ভূমির মালিক ভূমির উপযুক্ত ভাড়া পাবে, শ্রমিক উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে, পুঁজির মালিক ও সংগঠক উভয়েই যদি এক ব্যক্তি হয়, তাহলে উদ্যোক্তা সংগঠক ও পুঁজি বিনিয়োগকারী হিসেবে পূর্ণ লভ্যাংশ লাভ করবে। আর উৎপাদনের লাভ লোকসানের ঝুঁকি তাকেই গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি সংগঠক ও পুঁজি বিনিয়োগকারী পৃথক পৃথক ব্যক্তি হয়; তাহলে উভয়কে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। লভ্যাংশ উভয়ে পাবে। তবে এ দু'জনের মাঝে লভ্যাংশের বিভাজন পূর্বনির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে হারাহারিভাবে হবে। যেমন পূর্বনির্ধারিত শর্ত যদি থেকে থাকে পুঁজি বিনিয়োগকারী পাবে ২৫% আর সংগঠক পাবে ৭৫% অংশ। তাহলে লভ্যাংশ এভাবেই বন্টন হবে এবং যিনি যে হারে লভ্যাংশ পাবেন, তিনি সে হারে লোকসানেরও ঝুঁকি বহন করতে বাধ্য থাকবেন।

এক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারী পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত কোন অংক পাবেন না। কেননা পুঁজির বিনিময়ে এ ধরনের নির্ধারিত কোন অংক কিংবা নির্ধারিত হারে কোন টাকা পরিশোধের শর্তই সুদ বলে গণ্য হয়।

তবে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করলে, এটি মুদারাবা হিসেবে গণ্য হবে। তখন লভ্যাংশের হারাহারি বন্টনের ভিত্তিতে সে যা পাবে তা আর সুদ হবে না বরং মুনাফা হবে। যে কারণে তা বৈধ হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার মিমাংসা ঃ অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, যিনি ভূমি

www.eelm.weebly.com

সরবরাহ করবেন তিনি যদি নির্ধারিত কোন অংক (যেমন ঃ মাসিক ১০০০ টাকা) ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে যিনি পুঁজি সরবরাহ করবেন তিনি কেন পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত অংকের টাকা (যেমন ঃ বছরে প্রদত্ত পুঁজির বিনিময়ে ১০% টাকা ভাড়া হিসেবে অথবা লাভ হিসেবে) গ্রহণ করতে পারবেন না?

এর উত্তর এই যে, ভূমি আর পুঁজি এক জিনিস নয়। ভূমিকে ভাড়ায় খাটানো বৈধ হলেও পুঁজি ভাড়ায় খাটানো বৈধ নয়। কেননা ভূমি ও পুঁজির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। যথা ঃ

১. ভূমিকে আপন অস্তিত্বে বহাল রেখেই তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। ভূমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তাকে বিলুপ্ত বা ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ ভূমিকে স্বঅস্তিত্বে বহাল রেখেই উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এবং তাদিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। অতএব ভাড়া হিসেবে যা প্রদান করা হয়, তা মূলতঃ ভূমি থেকে সরাসরি যে লাভ ও উপকার সাধিত হয় তারই বিনিময়।

কিন্তু মূলধনের অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা মূলধনের অস্তিত্ব ঠিক রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। যতক্ষণ টাকা বা মূলধন আপন অস্তিত্বে বহাল থাকে ততক্ষণ তাদিয়ে কোন উপকারই সাধন হয় না। টাকা ব্যয় করে; উপকৃত হওয়া যায় এমন কোন দ্রব্য ক্রয় না করা পর্যন্ত তাদিয়ে মানুষের কোন উপকারই সাধিত হয় না। সুতরাং যিনি পুঁজি সরবরাহ করলেন, তিনি এমন কোন দ্রব্য সরবরাহ করেননি যার অস্তিত্ব বহাল রেখে তাদিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। অতএব এক্ষেত্রে ভাড়া কিসের বিনিময় হিসেবে গণ্য হবে?

২. ভূমি ও মেশিনারী ইত্যাদি এমন উপকরণ যা ব্যবহারের কারণে স্বল্প হারে হলেও তার ক্ষতিও (Depreciation) (মূল্যমান হ্রাস) হয়। তার ব্যবহার যত বেশি হয় অবচয়ের পরিমাণও তত বেড়ে যায়। অতএব ভাড়া হিসেবে যে টাকা গ্রহণ করা হয়, তাতে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

কিন্তু টাকা পয়সার লেনদেন যত বেশিই হোক আর যত হাতই বদল হোক না কেন, তার মূল্যমান মোটেও হ্রাস পায় না বরং ১০০ টাকার মান ১০০ টাকাই থেকে যায়।

৩. যিনি কোন ভূমি, মেশিনারী ইত্যাদি ভাড়ায় নিয়ে থাকেন, এসব দ্রব্যের দায়-দায়িত্ব বা (Risk) তাঁর থাকে না অর্থাৎ ভাড়ায় গ্রহণকারীর কোন দায়িত্বহীন কর্মকান্ড কিংবা সীমালঙ্ঘন ব্যাতিরেকে যদি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কোন কারণে এসব জিনিস ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায় তাহলে ভাড়াকারীকে এর কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। বরং এগুলোর দায়-দায়িত্ব থাকে মালিকের। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণে এগুলো ক্ষতিগ্রস্থ, ধ্বংস বা চুরি

www.eelm.weebly.com

হয়ে গেলে ক্ষতি হবে মালিকের। যেহেতু মালিক এই ঝুঁকি নিয়ে তার মালিকানায় রেখে উক্ত দ্রব্য ভাড়াকারীকে ব্যবহার করতে দিয়ে থাকেন, এজন্য তিনি ভাড়া পাওয়ার অধিকার রাখেন।

কিন্তু যিনি কাউকে টাকা পয়সা ঋণ দেন, সে ক্ষেত্রে টাকা পয়সার দায়-দায়িত্ব মালিকের উপর থাকে না বরং এ দায়িত্ব চলে যায় ঋণ গ্রহীতার উপর। অতএব ঋণ গ্রহীতার হাতে থাকা অবস্থায় উক্ত টাকা পয়সা যে কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা হালাক হয়ে গেলে তাকে অবশ্যই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ঋণদাতা বা মালিকের কোনই ক্ষতি হয় না বরং তিনি যত টাকা ঋণ দিয়েছিলেন তাই ফিরে পান। যেহেতু তিনি এক্ষেত্রে কোন দায়-দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণ করেন না অতএব তিনি এর বিনিময়ে কোন কিছু পাওয়ার হকদার হবেন না।

উল্লিখিত এই পার্থক্যের কারণে ভূমির বিনিময়ে ভাড়া গ্রহণ বৈধ হলেও পুঁজির বিনিময়ে ভাড়া গ্রহণ বৈধ হবে না।

আর যিনি লাভ-লোকসানে ঝুঁকি গ্রহণ করবেন না, পুঁজির বিনিময়ে তাকে প্রদেয় টাকাকে কিছুতেই লভ্যাংশ বলে গণ্য করা যায় না। অতএব যে পুঁজি সরবরাহকারী লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করবে না, তাকে পুঁজির বিনিময়ে যা দেয়া হবে সেটাকে সুদ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

মুনাফা বন্টনের এই নীতিগত পার্থক্যের প্রভাব

সমাজতন্ত্রীদের দাবি ছিল লভ্যাংশে সকলের সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এর দ্বারা বুঝা গিয়েছিল যে, দেশের সকল নাগরিক লভ্যাংশ সমান হারে লাভ করবে। কিন্তু এটি দর্শন হিসেবেই থেকে গেছে। বাস্তবে এই সাম্য প্রতিষ্ঠা করা কোন কালে কোন দেশেই সম্ভব হয়নি। বর্তমানে দর্শন হিসেবেও এটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও মজুরীর ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে।

উপরন্তু মানুষ এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে উৎপাদনে অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি এই অর্থ ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকেনি। যে কারণে উৎপাদনে মারাত্মক মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। তদুপরি শ্রমিক ও মজুরশ্রেণী এ ব্যবস্থায় চরমভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। কেননা এ ব্যবস্থায় শ্রমের মজুরীর হার নির্ধারণ করে থাকে রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে শ্রমিকের কোন দখল নেই। শ্রমের হার মনোপুতঃ না হলে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করারও কোন পথ এ ব্যবস্থায় নেই। হরতাল ধর্মঘট করে দাবি দাওয়া পেশ করারও কোন অবকাশ এ ব্যবস্থায় নেই। মজুরীর হার যুক্তিসঙ্গত না হলে কাজ ছেড়ে চলে যওয়ার পথও এ ব্যবস্থায় খোলা নেই। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকের জীবনমান পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় অনেক নিচে নেমে গেছে। যে দেশের

www.eelm.weebly.com

একাংশ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যস্থার অধীন থেকেছে, অপর অর্ধাংশ পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অধীনে থেকেছে, সেখানে এই ব্যবধান প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে জার্মানীর কথা বলা যায়। পশ্চিম জার্মানী পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার অধীনে উন্নতির চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছে গেছে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শাসনাধীন পূর্ব জার্মানী তার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। ফলে পূর্ব জার্মানীর লোকেরা ব্যর্থ সমাজতন্ত্রকে বিদায় জানিয়ে জার্মান প্রাচীর ভেঙে পশ্চিম জার্মানীর অর্থ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও মুনাফা বন্টনের পদ্ধতিসমূহ ন্যায়ভিত্তিক ও ইনসাফপূর্ণ বরং যে সমস্যাগুলোর কারণে পুঁজিবাদ ছেড়ে মানুষ সমাজতন্ত্রকে স্বাগত জানিয়েছিল তা আজো তথৈবচ রয়ে গেছে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বার্থকে অবাধ ও বল্গাহীন করে দেয়া হয়েছে। ফলে সুদ, ঘুষ, জুয়া, ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপক সয়লাবে ভরে গেছে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত দেশসমূহ। শোষণের অভিনব পন্থায় সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে গুটিকতক পুঁজিপতির কাছে। মানুষের হীন প্রবণতাগুলো উস্কিয়ে দিয়ে সেই পথে তাদের পকেটের পয়সা দেদারসে উজার করে দিয়ে যাচ্ছে পুঁজিপতিরা। সমাজ যাচ্ছে রসাতলে। নৈতিকতা বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। সহানুভূতির গন্ধ মাত্রও অবশিষ্ট রয়নি। সহানুভূতির লেবেল লাগিয়ে আরও অভিনব কৌশলে শোষণের পন্থা উদ্ভাবিত হচ্ছে। আর তাদের দৌরাত্মের শিকার হয়ে এক শ্রেণী ক্রমেই নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে লক্ষ কোটি মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, খোলা আকাশের নীচে জীবন যাপন করছে। রেলস্টেশন, ফুটপাত কিংবা নর্দমায় পাড়ে যাদের অসহায় জীবনের চিত্র নীরব কণ্ঠে ঘোষণা করছে পুঁজিপতিদের শোষণের জঘণ্যতার কথা।

সমাজের একশ্রেণীকে সহায় সম্বলহীন পথের ভিখারী করে ফেলার পিছনে মৌলিকভাবে কাজ করেছে সুদী অর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু সুদী অর্থ ব্যবস্থায় শোষণ যেহেতু অতি সুক্ষ্মভাবে অজ্ঞাতসারে করা হয়, তাই কেউ এটি অনুভব করতে পারে না। ইতোপূর্বে সুদী অর্থ ব্যবস্থায় শোষণের স্বরূপ সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা হয়েছে যে, সুদী ব্যাংকিং অর্থ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র গরীবরাই শোষিত হয় না বরং ফকীর মিস্‌কীন পর্যন্ত শোষিত হচ্ছে অহর্নিশ।

এ ব্যবস্থার ফলে অর্থসর্বস্ব এক মানসিকতা জন্ম নিয়েছে পৃথিবীময়। ফলে সম্পদ আহরণের নেশায় মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার মানবীয় গুণাবলী। অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের মাঝেও এক ধরনের হাহাকার অহর্নিশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে গুটিকতক মানুষের হাতে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে

www.eelm.weebly.com

আরেক ধরনের নয়া সংকট। সম্পদ আছে, কিন্তু অভাবীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ সঞ্চয়ের বল্গাহীন চেতনার কারণে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যে দ্রব্য বাজারজাত করে শোষণ করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। শ্রমিককে দেয়া হচ্ছে না তার ন্যায্য পাওনা। কাঁচামাল সরবরাহকারীকে দেয়া হচ্ছে না তার যথার্থ মূল্য। দুর্বলতার সুযোগে শ্রমিককে অমানুষিক পরিশ্রমে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ মুনাফায় তাদের কোনরূপ অংশীদারিত্বের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। তাদেরকে যন্ত্রের ন্যায় শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে। বাজার দরে একচেটিয়া দখলদারিত্ব সৃষ্টি করে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে দেদারসে শোষণ করা হচ্ছে সাধারণ অসহায় মানুষকে। সমাজ কোন অবৈধ প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়লে তার উপকরণ সরবরাহ করে লাভ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে অনৈতিকতা হুঁ হুঁ করে বাড়ছে।

ধনীক শ্রেণী অর্থ ও সম্পদের অতি প্রাচুর্যের কারণে যে বিলাসী জীবন যাপন করছে, তা দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অথচ সেই পরিমাণ অর্থ না থাকার কারণে তারা অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় মেতে উঠেছে। ফলে সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, জুয়া, হাউজী, লটারী, ধোঁকা, জালিয়াতী, অন্যের হক হনন, আমানতের খিয়ানত, সরকারি সম্পদ লুটপাট ইত্যাদি অনাচার হুঁ হুঁ করে বেড়েই চলছে।

সরকার ও তার প্রশাসন নীতি পুঁজিপতিদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সুসংগঠিত পুঁজিপতিরা তাদের অবৈধ অন্যায় আবদার মেনে নেয়ার জন্য নানা কৌশলে সরকারকে বাধ্য করছে। সরকার ক্ষমতার অন্ধমোহে সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থের দিকটি জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পুঁজিপতিদের অন্যায় আবদার স্বেচ্ছায় মেনে নিচ্ছে।

এই শোষণের গ্যাড়াকল থেকে বেরিয়ে আসার কোনই সুযোগ নেই। অসহায়ের মত কেবল শোষিত হয়েই যেতে হচ্ছে মানুষকে।

অথচ ইসলাম যে অর্থনৈতিক দর্শন পেশ করেছে তাতে ন্যায়ভিত্তিক, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠার পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে। যে ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক উন্নতির সাথে সাথে অসহায় বঞ্চিত মানুষ শোষিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের নিশ্চিত ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থ সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে সহজ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ আবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য গড়ে তোলার অভিনব ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিল্পবিপ্লবের পর অদ্যাবধি ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নের কোন ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। রাসূলে করীম (সা.)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগে এই অর্থনীতির সফল বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র পীড়িত আরবে জীবন সমৃদ্ধির যে জোয়ার বয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই।

www.eelm.weebly.com

উৎপাদনের উপকরণ-১

ভূমি

ভূমির সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে পৃথিবীর স্থলভাগকে বুঝায়। তবে অর্থনীতির পরিভাষায় ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-পৃষ্ঠকে উৎপাদনের উপযোগী করে তোলার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক দ্রব্য ও পরিবেশগত অনুকূল্যকে বুঝায়। যেমন মাটি ও তার উর্বরতা, বৃষ্টিপাত, সূর্যকিরণ, তাপ, আর্দ্রতা, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, খনিজদ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্ভার, জলবায়ু ইত্যাদি সবকিছুই ভূমির আওতাভুক্ত। ভূমির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ মার্শাল বলেছেন- "ভূমি বলতে সেই সব পদার্থ ও শক্তিকে বুঝায় যা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যের জন্য উদার ও মুক্ত হস্তে দান করেছে। যেমন - স্থলভূমি, পানি, বায়ু, আলো ও উত্তাপ ইত্যাদি।" এ হিসেবে যেসব খনিজ পদার্থ সরাসরি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাও ভূমি হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

ভূমির বৈশিষ্ট্য ঃ উৎপাদনের আদি ও মৌল উপকরণ হল ভূমি। ভূমির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

* ভূমি মহান আল্লাহ তা'আলার দেয়া এক বিরাট নিয়ামত। এটি মানুষের সৃষ্ট বা শ্রমোৎপাদিত কোন বস্তু নয়। মানুষের জীবিকা উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا-

তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) সেই সত্তা যিনি ভূমিস্থ যাবতীয় কিছুকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। — সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ২৯

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين

আমি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে জীবিকার উপকরণ তৈরি করে রেখেছি এবং যাদের জীবিকা তোমরা প্রদান কর না; তাদের জন্যও। — সূরা ঃ ১৫ - হিজর ঃ ২০

و جعل فيها رواسى من فوقها وبرك فيها وقدر فيها اقوا تها فى اربعة ايام سواء للسائلين -

এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপর তিনি আকাশচুম্বী পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাতে কল্যাণ সন্নিহিত করে দিয়েছেন এবং তাতে খাদ্য সম্ভারের ব্যবস্থা করেছেন চারদিনে যা অন্বেষণকারীদের জন্য সমভাবে প্রদত্ত।

— সূরা ঃ ৪১ - হা-মীম, আস্-সাজ্দা ঃ ১০

* ভূমি আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এমন উপকরণ; যার পিছনে কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। অর্থাৎ ভূমি সৃষ্টির জন্য মানুষকে কোন ব্যয়-ভার বহন করতে হয়নি। (অবশ্য মালিকানা লাভের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, সেটা ভিন্ন কথা)।

www.eelm.weebly.com

* ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। কেননা ভূমির চাহিদা যতই বৃদ্ধি পাক, কিন্তু মানুষ যেহেতু তা উৎপাদন করতে পারে না অতএব তার যোগান বাড়ানোর কোন উপায় নেই। আবার এর যোগান কমানোরও কোন ক্ষমতা মানুষের নেই। এজন্য ভূমির যোগানকে স্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়।

* ভূমি স্থায়ী একটি উপকরণ যা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

* ভূমি একটি অনড় উপকরণ যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায় না।

* ভূমি একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান অর্থাৎ ভূমি নিজে কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না। বৃক্ষ যেমন নিজেই ফল দান করে ভূমি সেরূপ নয় বরং ভূমিকে কর্ষণ করে অন্যকে তাথেকে উৎপাদন করে নিতে হয়।

* ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সমান নয়। কোন ভূমি বেশি উর্বর কোন ভূমি কম উর্বর, আবার কোন ভূমি একেবারে ধূসর মরুভূমি-যাতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না।

* ভূমির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির আওতাভূক্ত।

ভূমির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থেকে উৎপাদন বাড়াতে হলে উৎপাদনের অপরাপর উপকরণ যথা শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করতে হয়। কিন্তু ক্রমাগত উপকরণ বৃদ্ধি করতে থাকলে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়েহ্রাস পায়। অর্থাৎ উপকরণ যে হারে বৃদ্ধি করা হয় উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না। উপকরণ বৃদ্ধির হারের তুলনায় উৎপাদনের হার ক্রমেহ্রাস পাওয়ার এই নীতিকে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম দিকে উপকরণ বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কিন্তু ক্রমাগত উপকরণ বৃদ্ধি করতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমেহ্রাস পেতে থাকে। যেমন ঃ এক একর জমিতে শ্রম ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ১০০০ টাকা খরচ করলে যদি উৎপাদন হয় ৩৫ মণ ধান, তাহলে ঐ জমিতে শ্রম ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২০০০ টাকা খরচ করা হলে; উৎপাদন হয় ৫৫ মণ। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় ৩০০০ টাকা হলে তখন উৎপাদন হয় ৭০ মণ। আবার উৎপাদন ব্যয় ৪০০০ টাকা হলে তখন উৎপন্ন হয় ৮০ মণ। এক্ষেত্রে প্রথমবার ১০০০ টাকা ব্যয় করলে ধান উৎপাদন হয়েছে ৩৫ মণ। দ্বিতীয়বারে ১০০০ টাকা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ মণ। তৃতীয়বার আরো ১০০০ টাকা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ মণ। চতুর্থ দফায় আরো ১০০০ টাকা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১০ মণ। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে।

www.eelm.weebly.com

নিচে একটি চিত্রের মাধ্যমে বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল

চাষের পদ্ধতি নং	ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন বাবদ ব্যয়	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ নং পদ্ধতি	১-একর	১০০০.০০ টাকা	৩৫ মণ	৩৫ মণ
২ নং পদ্ধতি	১-একর	২০০০.০০ টাকা	৫৫ মণ	২০ মণ
৩ নং পদ্ধতি	১-একর	৩০০০.০০ টাকা	৭০ মণ	১৫ মণ
৪ নং পদ্ধতি	১-একর	৪০০০.০০ টাকা	৮০ মণ	১০ মণ

বিধিটির ব্যতিক্রম ঃ

১. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে যদি উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়; তাহলে বিধিটির ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

২. কোন দৈব কারণে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে বিধিটি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

৩. উৎপাদন খরচের সাথে জমির পরিমাণ বাড়ানো হলে বিধিটি কার্যকর হয় না।

৪. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই ব্যয় বৃদ্ধি উত্তমরূপে চাষাবাদ করার জন্য সহায়ক হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

এক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিনীতির উপর খানিকটা আলোকপাত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। তাই আমরা নিম্নে ইসলামের ভূমিনীতির উপর খানিকটা আলোচনার প্রয়াস পেলাম।

ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্ব

মানুষের জীবনে ভূমির বা জমির গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের বসবাস, চলাফেরা, প্রয়োজনীয় পানীয় ও আহার্যের উৎপাদন, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি বলতে গেলে ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট। এমনকি মানুষের সৃষ্টির সূচনাও মাটি দিয়েই হয়েছে। একারণেই ভূমির সাথে মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ কিছুতেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষ যতই অগ্রগতি অর্জন করুক না কেন, সকল কিছুর মূল ভিত্তি হল ভূমি। শুধু মানুষ কেন প্রাণীর জীবনধারণ ও অস্তিত্ব এই ভূমির উপরই ভিত্তিশীল। এ সত্যের প্রতিধ্বনি করে আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ والأرض وضعها للأنام –

আর ভূ-পৃষ্ঠকে তিনি সমগ্র প্রাণীকূলের জন্য সৃজন করেছেন।

– সূরা ঃ ৫৫ আর-রাহ্মান ঃ ১০

www.eelm.weebly.com

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون -

অবশ্যই আমি তোমাদের ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তার মাঝেই তোমাদের জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় উপাদান সন্নিহিত করে দিয়েছি। তবে তোমরা খুব কমই এর শুকরিয়া আদায় কর। – সূরা ঃ ৭ আ'রাফ ঃ ১০

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى منا كبها وكلوا من رزقه وإليه النشور -

তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা দিক দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর। প্রত্যাবর্তন তো তারই দিকে। – সূরা ঃ ৬৭ - মূলক ঃ ১৫

ভূমিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রয়োজন পূরণের অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার কিছু কিছু মানুষ আবিষ্কার করে কাজে লাগিয়েছে, আর কত যে অজানা অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে, তা কে জানে। অনাগত মানুষ হয়ত ভূমির সেসব অজানা উপাদান আবিষ্কার করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণে কাজে লাগাবে। এই ভূ-পৃষ্ঠের কোন কিছুই তো তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে সৃজন করেননি। ইরশাদ হয়েছে ঃ

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا -

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরই জন্য ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় উপকরণ সৃজন করেছেন। – সূরা – ২ ঃ বাকারা ঃ ২৯

ভূমির মালিকানা

ভূমি ও ব্যক্তিমালিকানার ইসলামী দর্শন

ইসলাম মনে করে এ জগতের সমুদয় কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও একমাত্র মালিকানার অধিকারী মহান আল্লাহ তা'আলা। এ দর্শনেরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে আল্-কুর্আনে। ইরশাদ হয়েছে ঃ الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما-

আল্লাহ্ই আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

ربنا الذى أعطى كل شيئ خلقه -

আমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি সকল বস্তুর অবকাঠামো দান করেছেন।

وله ما فى السموات ومافى الأرض -

আসমান এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে তার মালিক তিনিই।

সুতরাং এই দর্শনের আলোকে সমস্ত ভূমির একচ্ছত্র ও প্রকৃত মালিকানা

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র। কিন্তু তার এই মালিকানা যে তার নিজের ভোগ ব্যবহারের জন্য নয়, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা তিনি এসকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তার এই মালিকানা সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সৃষ্টির তরে ভোগ-ব্যবহারের নিয়মনীতি নির্ধারণের নিরংকুশতার মধ্যদিয়েই স্বীকৃত ও কার্যকর হবে। তাঁর এই মালিকানার হক তখনই আদায় হবে যখন মানুষ তার দেয়া বিধানের আলোকে ভূমিস্ত সম্পদের ভোগ-ব্যবহার করবে। মানুষ কিভাবে তা করায়ত্ব করবে, কিভাবে তার মালিক হবে, কোন নিয়মে তা ভোগ-ব্যবহার করবে তার নিয়ম-নীতি তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده –

নিশ্চয়ই যমীন আল্লাহ্‌র, তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করেন। আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ – ان الحكم الا لله। বিধান দেয়ার ক্ষমতা তো কেবল আল্লাহ্‌র।

সুতরাং মানুষ ভূমির যে মালিকানা লাভ করবে তাআল্লাহর মালিকানার নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ তার বিধি-বিধানের আওতায় মানুষ তা ভোগ-ব্যবহারের অধিকার লাভ করবে। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের ভূমি নীতি পর্যালোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, রাষ্ট্রের অন্তর্গত যাবতীয় ভূমির উপর রাষ্ট্রের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ অধিকার রয়েছে। কেননা রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন ভূমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকলেও তার বিপরীতে রাষ্ট্রকে খারাজ (ভূমি রাজস্ব) কিংবা উশর প্রদান করতে হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন অনাবাদী ভূমি আবাদ করতে হলে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। অনুরূপভাবে বিজিত অঞ্চলের ভূমি মুজাহিদদের মাঝে ভাগ বন্টন করা হবে, না রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্র প্রধানের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়। তদুপরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিকে রাষ্ট্র হুকুম দখল করতে পারে। (যদিও তার জন্য রাষ্ট্রকে আদালতের রায় গ্রহণ করতে হয় এবং মালিককে তার ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করতে হয়)।এসকল বিধি-বিধানের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূ-সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিলেও তা অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয় বরং এই মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মালিকানা।

এই আলোচনার সার-সংক্ষেপ হল, ভূমির প্রকৃত ও নিরঙ্কুশ মালিকানা হল আল্লাহ্‌র। ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর বিধি-বিধান কার্যকরী করার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। অতএব ভূমির দ্বিতীয় পর্যায়ের মালিকানা হল রাষ্ট্রের। আর জনসাধারণ আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের আওতায়, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝে থেকে ভূমির ভোগাধিকারের মালিকানা লাভ করে।

www.eelm.weebly.com

এভাবে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের আওতায়, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে ব্যক্তি মালিকানা প্রদানের কারণে ভূ-স্বামী কর্তৃক কৃষক নির্যাতনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিরীহ কৃষকদেরকে ভূমিদাসে পরিণত করে তাদেরকে শোষণ করার এবং বেগার খাটাবার যাবতীয় পথও রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ভূমির বিশাল অঞ্চল ব্যক্তি বিশেষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করার পথও রহিত হয়ে গেছে। যা পূর্বকালে সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থায় অহরহই ঘটত।

ভূমি মালিকানা ও মানব রচিত আইন

অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্ব যতবেশি রয়েছে তার ভোগ-ব্যবহারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানব রচিত ব্যবস্থাগুলো ততটাই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার ভূমিনীতি দ্বারা ভূমিচাষীদের বিড়ম্বনা ও তাদের উপর জুলুম ও শোষণের মাত্রা কেবল বৃদ্ধি পেতেই দেখা গেছে। তৎকালে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে জায়গীরদারী প্রথায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভূমির নিরঙ্কুশ মালিকানা দিয়ে দেয়া হয়েছিল। এরা নিজেরাই ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের হর্তাকর্তা ছিল। দেশের কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চিত করে তাদেরকে দেয়া ভূমিতে অপরাপর নাগরিকদের কোনরূপ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই ভূ-স্বামী জায়গীরদারগণ অল্প অল্প জমি চাষীদেরকে চাষাবাদের জন্য এমন কঠিন শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করতো, যাতে উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগই ভূ-স্বামীদের গোলায় গিয়ে উঠত। অবশিষ্ট অংশ থেকে গীর্জার জন্য বাধ্যতামূলক দেয় চাঁদা আদায় করার পর কৃষকের ভাগে খুব কমই অবশিষ্ট থাকত।

বাস্তব অর্থে কৃষকরা ছিল ভূ-স্বামীদের ভূমিদাস, আর জায়গীরদারগণ হয়ে বসত তাদের দন্ডমুন্ডের হর্তাকর্তা। এভাবে কৃষক ও ভূ-স্বমীদের মাঝে গড়ে উঠত প্রভু-ভৃত্তের এক পাহাড়সম অসামঞ্জস্য। প্রভুত্বের প্রভাব ফলিয়ে জায়গীরদাররা দেদারসে শোষণ করে যেত অসহায় দরিদ্র কৃষকদেরকে। ভূমির মালিকানা হতে বঞ্চিত কৃষক জায়গীরদারদের রক্তচক্ষু ও নির্যাতনের ভয়ে দিনের পর দিন অমানুষিক শ্রম দিয়ে যেত। বিনিময়ে নিদেনপক্ষে বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থাও তাদের হত না। এভাবে বলতে গেলে জায়গীরদারদের করুণার উপর তাদের বেঁচে থাকতে হত। ক্ষুধা, দারিদ্র, জরা, ব্যাধিতে ভুগে ভুগেও ভূ-স্বামীদের সুখের জন্য তাদেরকে শ্রম দিয়ে যেতে হত। চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার মত উপায় ও অধিকার কোনটাই তাদের ছিল না। এই মর্মান্তিক জীবনকে ললাট লিখন ধরে নিয়ে বংশানুক্রমে তারা অকাতরে শ্রম দিয়ে যেত।

পরবর্তীকালে কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হলে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এতদদৃষ্টে বড় বড়

www.eelm.weebly.com

পুঁজিপতিগণ ভূমি দখলের পায়তারা শুরু করে। ছোট ছোট ভূ-স্বামীদেরকে কোথাও টাকার জোরে ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়, কোথাও জোর-জবরদস্তি করে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এভাবে গড়ে উঠে নতুন সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণী। এই সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার ফলে ছোট ছোট ভূস্বামীরা আপন জায়গীর থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হয়ে চরম অসহায়ত্বের শিকার হয়। ফলে তারা শিল্পায়ীত শহরের দিকে ধাবিত হয়। বেকার অসহায় শ্রমিক হিসেবে তারা শিল্প কারখানার সম্মুখে এসে ভীড় জমাতে থাকে। এই সামন্তবাদী জমিদারদের দ্বারা কৃষকশ্রেণী যে কি নির্মমভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হত তার ইতিহাস সকলেরই জানা। ভূমির উপর অসঙ্গতিপূর্ণ খাজনা বসিয়ে তা কৃষকদেরকে চাষাবাদ করতে দেয়া হত। জমিদারের এলাকায় বসবাসকারী মানুষ তাদের রায়ত বলে গণ্য হত। কারণে অকারণে এসব জমিদাররা রায়তদের উপর কর চাপিয়ে দিত। নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও জমিদারের ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির জন্য রায়ত সাধারণের উপর কর বসানো হত। তাছাড়াও জমিদারের সাথে দেখা করতে হলে তাকে নজরানা দিতে হত। জমিদার কোন এলাকায় ভ্রমণ করতে গেলে সে এলাকার রায়তদেরকে তার সাথে বাধ্যতামূলক দেখা করতে হত এবং নজরানা পেশ করতে হত। এমনকি কোন কোন জমিদার এমনও আইন করে দিয়েছিল যে, তার রায়তদের কেউ বিয়ে করতে চাইলে সেজন্যও জমিদারকে কর দিতে হত। ভারতের কোন কোন জমিদার তো তার রায়তদের কেউ দাড়ি রাখলে তার উপরও কর ধার্য করে দিয়েছিলেন। এক কথায় জমিদাররা আপন খেয়ালখুশি মত রায়ত ও চাষীদেরকে শোষণ করত। বন্যা খড়া ইত্যাদি কারণে ফসল না ফললেও জমিদারকে দেয় কর পরিশোধে কোনরূপ কম বেশি করা হত না। এমনকি এসকল প্রাকৃতিক কারণে যথাসময়ে এসব কর পরিশোধ করতে না পারলে জমিদার কিংবা তার লাঠিয়াল বাহিনী কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত হতে হত রায়তদেরকে। এরূপ ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে কৃষকের স্ত্রী-কন্যাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন পর্যন্ত করা হত।

এই সামন্তবাদী জমিদারদের শোষণের যাতাকলে পিষ্ট মানুষ একদিন ক্ষেপে উঠে। এই প্রতিক্রিয়ার ফসল হিসেবে যে ভূমিনীতি আত্মপ্রকাশ করে, তা হল সমাজতান্ত্রিক ভূমিনীতি। সমাজতান্ত্রিকরা মনে করলেন যে, জমিদারদের এই শোষণ ও নির্যাতনের মূলে যে বিষয়টি কাজ করছে, তা হল ভূমির উপর তাদের ব্যক্তি মালিকানার দাপট। সুতরাং এই শোষণ ও নির্যাতন রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে ভূমির ব্যক্তি মালিকনার প্রথা খতম করে দিতে হবে। পৃথিবী এই দর্শনকে স্বাগত জানাল এবং জমিদারদের দৌরাত্ম খতম করে প্রলেতারিয়েত বা মেহ্‌নতি

www.eelm.weebly.com

মানুষের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হল। ব্যক্তিমালিকানা থেকে ভূমি ছিনিয়ে আনা হল এবং তা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হল। এজন্য কত লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা করা হল কে তার হিসাব রাখে। কিন্তু এর পরিণতি যা হওয়ার তাই হল।

পুঁজিবাদী ভূমি ব্যবস্থায় সমাজ বঞ্চিত হয়েছিল গুটিকতক ব্যক্তির অবাধ ও নিরঙ্কুশ মালিকানার খপ্পরে পড়ে। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষ বঞ্চিত হল তার স্বভাবজাত চাহিদা তথা ব্যক্তি মালিকানার অনুপ্রেরণাদায়ী ও উৎপাদনের চালিকা শক্তি থেকে। ফলে সমাজতন্ত্রীরা ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন থেকে যে শুভ পরিণতির আশা করেছিলেন, তা মাঠে মারা গেল। উৎপাদন হ্রাস পেতে পেতে এমন অবস্থা হল যে, একদিন সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দের গভীর প্রত্যাশায় অপেক্ষমান মানুষগুলোর গলা চেপে ধরল মৃত্যুরূপী দারিদ্রতা। এ ব্যবস্থায় কৃষক পরিণত হল রাষ্ট্রের ভূমিদাসে।

সারকথা এই যে, ব্যক্তিকে ভূমির একচ্ছত্র মালিক বানিয়ে দেয়ার জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথার বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যান্ত বেধনাদায়ক ও মর্মান্তিক। অনুরূপভাবে ব্যক্তির নিকট থেকে মালিকানার অধিকার সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করার চীনা ও রুশীয় অভিজ্ঞতা আরো করুণ, নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও হৃদয় বিদারক।

এ কারণেই ইসলামী ভূমি মালিকানা দর্শনে ব্যক্তিকে ভূমির মালিকানা প্রদান করা হলেও তা নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্রভাবে নয়। বরং আল্লাহর আইন ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকারের মধ্যে সীমাদ্ধ ইখতিয়ারের পরিবেশে ভোগ দখলের প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ভূমির উপর সমাজ ও সমষ্টির অধিকার ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে বটে, তবে তা ব্যক্তি স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নয় এবং তা সর্বগ্রাসী, সীমাহীন ও ব্যক্তি স্বার্থের বিরোধী পর্যায়ের নয়।

ফলে এতে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার, জুলুম, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা ও অবজ্ঞামূলক নীতি গ্রহণের বিন্দুমাত্র অধিকার ব্যক্তির থাকেনি। আবার কৃষককে যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়ার এবং তাকে কৃতদাসের ন্যায় অমানুষিক খাটা-খাটুনিতে বাধ্য করার সুযোগও রাষ্ট্রের থাকেনি।

ভূমির স্বত্ত্বাধিকারের ইসলামী পদ্ধতি

ইসলামী আইনের আলোকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জমিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি।
২. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমি।

www.eelm.weebly.com

ইসলাম ব্যক্তিকে চাষবাদ করে খাওয়ার জন্য ভূমির ব্যক্তিমালিকানা প্রদান করেছে, যাতে ব্যক্তি তার মেধা ও শ্রমকে সর্বোচ্চ হারে নিয়োজিত করে ভূমি থেকে স্বাধীনভাবে আয় উৎপাদন করতে পারে। ভূমি-স্বত্বহীন চাষাবাদ যাতে তাকে দাসানুদাসে পরিণত করতে না পারে, চাষাবাদ করে বলেই যাতে সে অন্যের সেবাদাসে পরিণত না হয় এবং ভূ-স্বামির যথেচ্ছা নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার তাকে না হতে হয় এজন্য ব্যক্তি মালিকানা তার জন্য ছিল অত্যাবশ্যকীয়। তাই ইসলাম ব্যক্তিকে ভূমিতে নিয়ন্ত্রিত মালিকানা প্রদান করেছে। তবে ভূমি থেকে সে যা উৎপাদন করবে তাতে সমাজ ও সমষ্টি মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা থেকেও তাকে রেহাই দেয়া হয়নি। বরং ওশ্‌র ও খারাজরূপে সমাজের প্রাপ্য অংশ তাকে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করতে বাধ্য করা হয়েছে।

আবার রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন সার্বজনীন প্রয়োজন পূর্ণ করা, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়া ও ভবিষ্যত নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের মালিকানায় কিছু ভূমি ও ক্ষেত খামার রাখারও অনুমতি প্রদান করেছে। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই ভূমি দেশের ভূমিহীন নাগরিকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া যায় এবং রষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সেই ভূমিকে ব্যবহার করা যায়, অথবা তা বর্গা কিংবা ইজারা দিয়ে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণে কিংবা নাগরিকদের কল্যাণে ব্যয় করা যায়। সরকারি অফিস ও ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমি, চারণভূমি, জলাশয়, বনাঞ্চল, রাজপথ, রেলপথ, নদ-নদী, পার্ক ও খেলা-ধুলার মাঠ ইত্যাদি এবং মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরাইখানা, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ভূমি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা এগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হতে দিলে, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। এগুলোর উপর সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। কুরআন হাদীস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা থেকে এরূপ তথ্যই জানা যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রে ভূমির মালিকানা লাভের পন্থা

ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করে, যথা ঃ

১. মুসলিম নাগরিক।

২. অমুসলিম নাগরিক।

ভূমির ব্যক্তি মালিকানা লাভের প্রশ্নে মুসলিম ও অমুসলিমদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। তাই প্রত্যেক প্রকার নাগরিকদের মালিকানার পন্থাগুলো পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

মুসলিম নাগরিকদের ভূমিমালিকানা লাভের পন্থা

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের ভূমির মালিকানা লাভের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। যথা ঃ

www.eelm.weebly.com

১. উত্তরাধিকার ও মিরাসী সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি।
২. ক্রয় সূত্রে লব্ধ ভূমি।
৩. ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে দান বা হেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি।
৪. অনাবাদী ভূমি আবাদ করে মালিকানাপ্রাপ্ত ভূমি।
৫. গণীমতের মালের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত ভূমি।
৬. রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমিবন্টন কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত ভূমি।
৭. রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কার বা জায়গীর হিসেবে প্রদত্ত ভূমি।

১. মিরাসী সূত্রে ভূমির মালিকানা ঃ মিরাস ও উত্তরাধিকারের বিধান সম্পর্কে আল্-কুরআনে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন সূরায়ে নিসার এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ – يوصيكم الله فى أولادكم للذكرمثل حظ الأنثيين

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান ইসলামে উত্তরাধীকার আইনের উপর রচিত 'সিরাজী'সহ অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে আলোচিত হয়েছে। তথায় দ্রষ্টব্য।

২. ক্রয়সূত্রে লব্ধ ভূমি ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত ভূমি অন্যের নিকট ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী জিম্মি নাগরিকরাও তাদের ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি অন্যের নিকট বিক্রি করতে পারবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যদি কোন মুসলমান অন্য মুসলমান থেকে উশরী জমি ক্রয় করে তাহলে তা উশ্‌রীই থাকবে। আর যদি কোন অমুসলিম থেকে খারাজী ভূমি ক্রয় করে তাহলে তা খারাজীই থাকবে। কিন্তু কোন অমুসলিম যদি কোন মুসলমান থেকে উশরী ভূমি ক্রয় করে নেয়, তাহলে তা খারাজী বলে গণ্য হবে। (উশ্‌র ও খারাজ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে)।

৩. ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে দান বা হেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিক তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি ইচ্ছা করলে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান হেবা করে যেতে পারে। যাকে দান বা হেবা করা হবে সে উক্ত ভূমির মালিকানা লাভ করবে। তবে হেবার ক্ষেত্রে মালিকানা লাভের জন্য হেবাকৃত ভূমির দখল গ্রহণ অপরিহার্য।

৪. অনাবাদী ভূমি আবাদ করার মাধ্যমে লব্ধ মালিকানা ঃ যেসকল ভূমিতে কারো ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, (যেমন ঘন অরণ্য, বনজঙ্গল, হাওর, বিল) কিংবা যে ভূমির মালিক মৃত, লুপ্ত বা দেশান্তরিত হয়ে গেছে এবং তার কোন উত্তরাধীকারীও নেই এসকল ভূমি অনাবাদী ভূমি বা – الارض موات। হিসেবে গণ্য হয়। এসকল ভূমি জনকল্যাণার্থে রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে আবাদ করার

www.eelm.weebly.com

জন্য ন্যায়নীতির ভিত্তিতে নাগারিকদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে ঃ

وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وليس أحد يعمل في ذلك بالذى يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعا –

রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য হল, যেসকল মাওয়াত (অনাবাদী, অনুর্বর, মালিকানাবিহীন, উত্তরাধিকারীহীন ভূমি) এবং এমন ভূমি যাতে কারো মালিকানা নেই এবং কোন ব্যক্তি তা আবাদও করেনা এ ধরনের ভূমি এমন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের মাঝে বিলি-বন্টন করে দেয়া, যাতে মুসলমানদের কল্যাণ সাধিত হয় এবং সর্বসাধারণের ব্যাপক উপকার হয়। – কিতাবুল খারাজ–পৃ ঃ ৬৬

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) মদীনায় হিজরত করে আসার পর তথাকার সকল শু‍্‌, মৃত, অনাবাদী ও পরিত্যাক্ত জমি ইনসাফভিত্তিক পন্থায় মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

এসকল ভূমি যারা চাষাবাদের উপযোগী করে তুলবে তারা এর মালিকানা লাভ করবে। হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ من عمر رضا ليست لأحد فهو أحق بها –

যে ব্যক্তি কোন ভূমি আবাদ উপযোগী করে তোলবে মালিকানার প্রশ্নে সে অগ্রাধিকার রাখে। – বুখারী

জনৈক সাহাবী বলেছেন ঃ

أشهد أن رسول الله قضى ان الأرض أرض الله والعباد عباد الله فمن أحيا مواتها فهو أحق بها –

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল (সা.) এরূপ ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, ভূমি হল আল্লাহর ভূমি, আর বান্দারা হল আল্লাহর বান্দা, সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মৃত ভূমি আবাদ করবে, মালিকানার প্রশ্নে সে অগ্রাধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।

৫. গণীমতের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত ভূমি ঃ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক সৈনিক হিসেবে নিয়োজিত হয়ে কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করে শত্রু-দেশ জয় করতে পারলে, সেসব বিজিত অঞ্চলের ভূমি ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে সেসব ভূমি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে বিধিসম্মতভাবে বন্টন করে দিতে পারেন। যেসব সৈনিক এ ভূমি লাভ করবে তারা তার মালিক বলে গণ্য হবে। বনূ কুরায়যার ভূ-সম্পত্তি দখল করার পর নবী (সা.) তা গণীমতের মাল হিসেবে মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

খায়বর বিজয়ের পর তথাকার সমগ্র ভূমিকে নবী করীম (সা.) মোট ৩৬টি খন্ডে বিভক্ত করে ১৮ খন্ড ভূমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

www.eelm.weebly.com

অবশিষ্ট ১৮ খন্ড ভূমি মুসলিম মুজাহদিদের মাঝে এভাবে বন্টন করে দিয়েছিলেন যে, প্রতি ১ খন্ডের মালিকানা লাভ করেছিল ১০০ জন। নবী করীম (সা.) নিজেও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য সেখান থেকে একাংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে খায়বরের সমস্ত ভূমিই (সরকারি ও বেসরকারি) স্থানীয় অধিবাসীদেরকে অর্ধেক ফসল পরিশোধের শর্তে চাষাবাদ করতে দিয়ে দেয়া হয়েছিল।

৬. রাষ্ট্রীয় ভূমিবন্টন কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত ভূমি ঃ ইসলামী রাষ্ট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমি জনগণের কল্যাণার্থে বিনাশর্তে কিংবা শর্ত সাপেক্ষে নাগরিকদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) মদীনায় হিযরত করে আসার পর সেখানকার সকল শুষ্ক, মৃত, অনাবাদী ও পরিত্যাক্ত জমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) কিসরা ও তার পরিবার পরিজনের সম্পদ, আর যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে তাদের সম্পদ, জলাশয়, ডুবোভূমি, ডাকঘর ও তৎসংলগ্ন ভূমিসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ব করে নিয়েছিলেন। পরে তিনি এই ভূমি যাদেররকে মুনাসিব মনে করতেন তাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

৭. রাষ্ট কর্তৃক পুরস্কার বা জায়গীর হিসেবে প্রদত্ত ভূমি ঃ ইসলামী রাষ্ট্র তার কোন নাগরিককে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কিংবা বৃহত্তর কোন জাতীয় খিদমাত অঞ্জাম দেয়ার জন্য পুরস্কৃত করতে পারে। সে পুরস্কার যেমন নগদ অর্থে হতে পারে, তেমনিভাবে ভূমিস্বত্বদানের মাধ্যমেও হতে পারে। নবী করীম (সা.) মালিকানাবিহীন সম্পত্তি দ্বারা এ ধরনের পুরস্কার প্রদান করতেন। যেমন তিনি হযরত বিলাল ইবনে হারেস (রা.)-কে একখন্ড ভূমি জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন। যার বর্ণনা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) ইরানী সম্রাটের ব্যক্তিগত ভূমি মুসলমানদেরকে জায়গীর হিসেবে প্রদান করেছিলেন।

তবে ইসলাম যে জায়গীর প্রাদন করে, তা অবশ্য সামন্তবাদী জায়গীরদারী প্রথার ন্যায় নয়। কেননা এখানে জায়গীরদাররা যে ভূসম্পত্তি লাভ করবে, তার ভোগ ব্যবহারও তাকে আল্লাহ্র বিধান ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝে থেকে করতে হবে। তাই এহেন জায়গীরদারী প্রথায় সামন্তবাদী জায়গীরদারীর মত জুলুম ও শোষণের কোন পথ খোলা থাকে না।

অমুসলিম নাগরিকদের ভূমির মালিকানা লাভের পন্থা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। সে প্রেক্ষিতেই তাদের মালিকানার বিষয়টি নিরূপিত হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

১. কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর সেখানার যেসব নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম ইমামের আনুগত্য মেনে নেয়, তাদের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ তাদের মালিকানাতেই থাকবে। হাদীসে আছে ঃ

من قال لاإله إلا الله فقد عصم منى دمائهم وأموالهم –

যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর স্বীকৃতি জ্ঞপন করবে সে আমার থেকে তাঁর জান ও মালের হিফাযত করে ফেলল।

মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের ভূমি তাদের হাতেই ছিল। যেসকল অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় বসবাস করতে আগ্রহী, তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র নিরাপত্তা প্রদান করলে তাদের ভূ-সম্পত্তি তাদেরই মালিকানায় থাকবে এবং সেই সম্পত্তিতে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে উত্তরাধিকারের বিধান কার্যকর হবে। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রে জান মালের নিরাপত্তা নিয়ে বসবাসের জন্য তাদেরকে জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর প্রদান করতে হবে। তাদের দখলভুক্ত ভূমির উপর সরকারের পক্ষ থেকে যে খারাজ বা রাজস্ব নির্ধারণ করা হবে তাও যথা নিয়মে আদায় করতে হবে।

এ ধরনের নাগরিকরা কোন মুসলমানের ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভূমি যথানিয়মে ক্রয় করতে পারবে। ক্রয়কৃত ভূমিতে ক্রয়কারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে সে ভূমি যদি উশ্‌রী হয়ে থাকে তাহলে অমুসলিম নাগরিকের মালিকানাভুক্ত হওয়ার পর তা খারাজী ভূমিতে পরিণত হবে।

২. কোন অমুসলিম জনপদ স্ব-আগ্রহে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বসবাস করতে চাইলে, তাদের ভূ-সম্পত্তিতেও তাদের মালিকানা বহাল থাকবে এবং যে শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি হবে সে হিসেবেই তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব আদায় করে যাবে। যেমন খায়বর বিজয়ের পর সেখানকার ফিদাক অঞ্চলের অদিবাসীগণ স্ব-আগ্রহে সন্ধি করতে আসলে তাদের সাথে এ মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা তাদের ভূ-সম্পত্তি হতে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের অর্ধেক ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করবে। ফলে রাসূল (সা.) সে অঞ্চলের ভূমি সেখানকার অধিবাসীদের হাতেই রেখে দেন।

– কিতাবুল খারাজ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম - খন্ড ১, পৃ ঃ ৩৯।

অবশ্য পরে হযরত উমর বিশেষ কারণে তাদেরকে সেখান থেকে নির্বাসিত করেন এবং তাদের ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্রের পক্ষে খরিদ করে নেন।

তাইমা অঞ্চলের লোকেরা স্ব-আগ্রহে সন্ধি করতে চাইলে তাদের সাথে এ মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা নিজ নিজ বাসস্থানে বসবাস করবে, তাদের ভূ-সম্পত্তি তাদের দখলেই থাকবে। তবে ইসলামী রাষ্ট্রকে তারা যথারীতি খারাজ পরিশোধ করবে। – আহ্‌কামুস সুলতানিয়্যাহ, ফতুহুল বুলদান – ৪৮

www.eelm.weebly.com

নাজরান এলাকার খৃষ্টানরা এ মর্মে সন্ধি চুক্তিকে আবদ্ধ হয় যে, তাদের জানমাল জায়গা-জমি, ধর্ম বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুই নিরাপদ থাকবে। এজন্য তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে জিযিয়া প্রদান করবে। – ফতুহুল বুলদান - ৭৭

ইয়ামানের অধিবাসীরাও রাসূল (সা.)-এর সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে নবী করীম (সা.) এ মর্মে লিখিত চুক্তি পেশ করেছিলেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, গচ্ছিত ও প্রোথিত সম্পদের উপর ইসলামী রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। অবশ্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধার্যকৃত অন্যান্য কর সকলকে যথারীতি আদায় করতে হবে।

– আহ্কামুস সুলতানিয়্যাহ্।

৩. কোন অমুসলিম জনপদ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর পরাজিত ও পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে তারা জিম্মি বলে গণ্য হবে। তাদের ধন-সম্পত্তি, জায়গা-জমি বিজয়ী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে গণ্য হবে। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তা যোদ্ধাদের মাঝে বিধিসম্মতভাবে বিলি-বন্টন করে দিতে পারবে কিংবা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে তা চাষাবাদের জন্য ইজারা কিংবা বর্গাচাষের ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে ইজারা কিংবা বর্গাচাষের ভিত্তিতে পূর্ব মালিকদের হাতেও তা রেখে দেয়া যাবে, তবে পূর্ব মালিকরা তখন আর ভূমির মালিক হিসেবে গণ্য হবে না।

রাসূল (সা.) মদীনায় হিযরত করার পর ইয়াহূদীরা তাঁর সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বনু কায়নুকা গোত্রের লোকোরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। ফলে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নবী করীম (সা.) তাদের ধন-সম্পত্তি মুজাহিদদের মাঝে গণীমতের মাল হিসেবে বন্টন করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে রেখে অবশিষ্ট অংশ যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। তবে বনূ নযীর গোত্রের সাথে কোনরূপ যুদ্ধ হয়নি বিধায় তাদের পরিত্যাক্ত মাল সম্পত্তি "ফাই" হিসেবে গণ্য হয়। আবু উবায়েদের 'কিতাবুল আমওয়ালে'র বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, 'মালে ফাই' রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত তহবিল হিসেবে গণ্য হত। রাসূল (সা.) তাঁর নিজ ইখতিয়ারে তা জনকল্যাণে ব্যয় করতেন।

বনূ কুরায়যাকে অবরোধ করলে তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের মাল সম্পদও যোদ্ধাদের মাঝে যুদ্ধ সরঞ্জামের হিস্সা অনুসারে বন্টন করে দেয়া হয়।

খায়বরের যুদ্ধে ইয়াহূদীরা পরাস্ত হলে তাদের সকল ভূ-সম্পত্তি মতান্তরে অর্ধেক বা এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব ভূমির ব্যাপারে তাদের সাথে এ মর্মে চুক্তি হয় যে, সকল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দেয়ার শর্তে তারা তা চাষাবাদ করবে। তবে এতে তাদের মালিকানা বহাল থাকবে না। কিংবা রাষ্ট্র প্রধান ইচ্ছা করলে সেই ভূমিতে পূর্ব মালিকদের

www.eelm.weebly.com

মালিকানা বহালও রাখতে পারবেন। সিরিয়া, ইরাক ও মিশর বিজয়ের পর হযরত উমর (রা.) সেখানকার ভূমির ব্যাপারে এই নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের উপর জিযিয়া ও খারাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আবার রাষ্ট্র প্রধান ইচ্ছা করলে কিছু ভূমি রাষ্ট্রীয়করণ করে বাকী ভূমি পূর্ব মালিকদের হাতেও রেখে দিতে পারেন। যেমন- ইরাকের কতিপয় ভূমি হযরত উমর রাষ্ট্রায়ত্ব করে নিয়েছিলেন।

৪. যেসব অমুসলিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয় কিংবা, রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যায়, তাদের সম্পদের যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে সেগুলোও রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় এবং রাষ্ট্র প্রয়োজনে তা জনগণের মাঝে পুনঃপন্টন করে দিতে পারে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন ঃ

ان عمر رض أصفى أموال كسرى وكل من فر عن أرضه أو قتل فى المعركة وكل مغيض ماء اوجمة فكان عمر يستقطع من هذه لمن أقطع--

হযরত উমর (রা.) কিসরা ও তার পরিবার পরিজনের সম্পদ, আর যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে তাদের সম্পদ, পানিতে ডুবন্ত ভূমি, ডাকঘর ও তৎসংলগ্ন ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ব করে নিয়েছিলেন। পরে তিনি এই ভূমি যাদেরকে মুনাসিব মনে করতেন; বন্টন করে দিতেন। – কিতাবুল খারাজ

৫. রাষ্ট্রীয় ভূমিবন্টন নীতির আওতায় প্রাপ্ত, পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত ভূমিতেও তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার ও ক্রয় সূত্রেও তারা ভূমির মালিকানা লাভ করতে পারবে। আবার রাষ্ট্রের পক্ষে কোন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার কারণে রাষ্ট্র যদি কোন অমুসলিমকে কোন ভূমি জায়গীর হিসেবে প্রদান করে তাহলে তাতেও তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি বন্টন নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতী শফী (রহ.) রচিত 'ইসলাম কা নেযামে আরাদী' নামক পুস্তকটি দেখা যেতে পারে।

জমিদারী প্রথা ও ইসলাম

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে কি ইসলাম জমিদারী ও জায়গীরদারীর এই নির্যাতনমূলক ও জুলুমাত্মক প্রথাকে বৈধ রেখেছে?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ইসলাম প্রাচীন সামন্তবাদী জমিদারী প্রথাকে যেমন সমর্থন করে না তেমনি "লাঙ্গল যার জমি তার" এই সমাজতন্ত্রী শ্লোগানেও বিশ্বাস করে না বরং এক্ষেত্রেও ইসলাম চিরাচরিত প্রথায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে।

www.eelm.weebly.com

প্রাচীনকালে জমিদারী প্রথা বলতে যা বুঝাত, তা হলো "কোন একজন পুঁজিপতি রাষ্ট্রকে বাৎসরিক নির্ধারিত অংকের কর দেয়ার শর্তে সরকারের কাছ থেকে বিশাল এলাকার আধিপত্য গ্রহণ করতেন।" জমিদার যে এলাকার আধিপত্য লাভ করতেন, সে এলাকার শাসনকর্তা হিসেবে তিনিই স্বীকৃত হতেন। সে এলাকার শাসন ব্যবস্থা ও আইন কানূনের তিনিই হতেন হর্তাকর্তা। তাঁর এলাকার কর ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, আইন কানূন কি হবে, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। এ ব্যাপারে জমিদার ছিলেন খোদ্ মুখতার। প্রজা সাধারণ জমিদারের রায়ত বলে গণ্য হত। তাদেরকে যথেচ্ছা শাসন, শোষণ নিপীড়ন ও নির্যাতন করার অধিকার জমিদারের থাকত। রাষ্ট বছরান্তে ধার্যকৃত কর পেলেই সন্তুষ্ট থাকত।

এ ব্যবস্থায় ভূ-স্বামী তথা, জমিদারদের অবাদ নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত ছিল। ভূমি চাষীদের উপর সাধ্যাতীত করের বোঝা চাপিয়ে জমিদাররা বিরাট বৈভবের মালিক বনে যেতেন। তাদের জুলুমাত্মক কর ব্যবস্থা ও নির্যাতনমূলক বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে টু-শব্দটি পর্যন্ত করার অধিকার রায়তদের ছিলনা। রাষ্ট্রের কাছে এহেন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার আশা করারও কোন সুযোগ রায়তদের থাকত না : কেননা জমিদাররাই মূলতঃ ছিলেন সে অঞ্চলের ক্ষুদে সম্রাট।

ইসলাম এহেন জমিদারী স্টেট প্রথাকে কোনক্রমেই অনুমোদন দেয়নি। রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে মধ্যসত্ত্বভোগী জুলুম ও নিপীড়ণকারী শাসক গোষ্ঠির অস্তিত্বকে ইসলাম খতম করে দিয়েছে। শুধু ভূমির ক্ষেত্রে নয় বরং ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও সকল মধ্যসত্ত্বভোগী প্রথাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা হয় রাষ্ট্রের; না হয় জনগণের। জনগণ সরাসরি রাষ্ট্রকর্তৃক শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। মধ্যসত্ত্বভোগী কোন শাসকের অস্তিত্ব ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ তার ইচ্ছা মাফিক আইন করে কোন অঞ্চল বিশেষের নাগরিকদেরকে তা মানতে বাধ্য করেব এ ধরনের কোন সুযোগ ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় নেই। অতএব জমিদারী প্রথা বলতে যা বুঝায় তার কোন অবকাশ ইসলামী শরীয়তে নেই। আল্লামা তানতাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, "হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ধন-সম্পদ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তিনি মুসলিম জনসাধারণের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সে সময় (নাগরিকদের) রেজিস্ট্রারও প্রণয়ন করা হয়। কর্মচারী ও বিচারকদেরও ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তিনি সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, জমিদারী প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুসলমানদের কৃষিকাজ ও বর্গাচাষ করা থেকেও বারণ করেন।"

– নিযামুল আমল ওয়াল ঈযাম, ২য় খন্ড, পৃঃ-১৮৩

www.eelm.weebly.com

তাছাড়া এই জমিদারী প্রথার মাধ্যমে সম্পদ গুটিকতক জমিদার শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর ইসলাম যেহেতু সম্পদ কুক্ষিগতকরণ প্রথাকে বৈধ মনে করে না, তাই জমিদারী প্রথা স্বাভাবিক কারণেই বৈধ হবে না।

জমিদারী শাসন ব্যবস্থা বৈধ না হলেও, কেবল যে চাষ করবে সেই জমির স্বত্বাধিকারী হবে অন্য কেউ জমির মালিকানা লাভ করতে পারবে না, এটাও ইসলামী নীতি নয়।

বরং ইসলাম মনে করে যে, কোন ব্যক্তি যদি বৈধ উপায়ে শরীয়তসম্মত পন্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ম নীতির মাঝে থেকে ভূমির মালিকানা লাভ করে, তাহলে সে নিজে চাষাবাদ না করলেও সেই ভূমিতে তার মালিকানা স্বত্বস্বীকৃত হবে। এই জমি সে ইচ্ছা করলে নিজে চাষাবাদ করতে পারবে, কিংবা অন্যকে বর্গাচাষের জন্য অথবা ইজারায় প্রদান করতে পারবে। বর্গাচাষ কিংবা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমি মালিক ও চাষী উভয়েই রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসনের আওতাধীন থাকবে। বর্গাচাষে ভাগের হার ও ইজারার ক্ষেত্রে ইজারার হার ও এতদসংক্রান্ত শরীয়তসম্মত শর্ত শরায়েত নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয়েই স্বাধীন থাকবে। ন্যায়সঙ্গত পন্থায় শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতায় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে এগুলো নির্ধারণ করার অধিকার উভয়ের থাকবে। এক্ষেত্রে একজন শাসক, অন্যজন শাসিত, একজন স্টেট প্রধান, অন্যজন তার রায়ত, এ ধরনের কোন সম্পর্ক অবশ্যই তাদের মাঝে থাকবে না। বরং যৌথ ব্যবসার ন্যায় উভয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে বর্গাচাষ বা ইজারার ভিত্তিতে জমি চাষাবাদের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। এই চুক্তি কেবলমাত্র এতদসংক্রান্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। জীবনের অন্যকোন ক্ষেত্রে তা অবশ্যই কোন প্রভাব ফেলবে না। এক্ষেত্রে উভয়েই রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় দায়বদ্ধ থাকবে। কোন পক্ষ কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি করলে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় তার বিচার হবে। একপক্ষ অপর পক্ষের বিচারভার অবশ্যই নিজ হাতে তুলে নিতে পারবে না। এসকল শর্তারোপের ফলে জমিদারী প্রথায় কৃষক নির্যাতনের এবং কৃষকের উপর অসঙ্গত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জুলুম, শোষণ ও নিপীড়নের যে অবকাশ ছিল তা ইসলামী ব্যবস্থায় আর থাকেনি।

চাষাবাদ না করেও ভূমির মালিকানা লাভের বৈধতার বিষয়টি সাহাবায়ে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী যুগের ইসলামী মনীষীদের কর্মধারা ও মতামতের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। রাসূল (সা.)-এর যামানা থেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল পর্যন্ত এবং তারও পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবই তাবেয়ীন ও পরবর্তীকালের মনীষীরা বর্গাচাষ কিংবা ইজারায় জমি চাষাবাদের জন্য প্রদান করতেন। এ ধরনের ব্যাপক বর্ণনা হাদীস ও

www.eelm.weebly.com

ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্গাচাষ অধ্যায়ে এ মর্মে বেশকিছু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ

عن حنظلة بن قيس رضى الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله ص عنه فقلت أبالذهب والورق قال فلاباس به –

হযরত হানযালা ইবনে কায়েস বর্ণনা করেন যে, আমি রাফে' ইবনে খাদিজকে ভূমি ইজারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন যে, রাসূল (সা.) এটি করতে নিষেধ করেছেন। আমি তখন বলালম,সোনা-রূপার বিনিময়ে ইজারা দিতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন এতে কোন অসুবিধা নেই।

– বুখারী ও মুসলিম

وعن بن عمرو رض أن رسول الله صلى عليه وسلم أعطى خيبر ليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرماخرج منها –

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) খায়বরের ভূমি ইয়াহুদীদেরকে এই শর্তে আবাদ করতে দিয়েছিলেন যে, তারা তা চাষাবাদ করবে, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা পাবে। – বুখারী ঃ কিতাবুল মুযারা'আ।

وعن سعد بن أبى وقاص رض أن الزراع فى زمن النبى ص كانوا يكرون مزارعهم –

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জমির মালিকরা নবী করীম (সা.)-এর যামানায় তাদের জমিন ইজারা (ভাড়া) দিতেন। – আবু দাউদ, নাসাঈ

হযরত আবু জা'ফর (রা.) বলেন যে, মদীনা মুনাওয়ারায় মুহাজিরদের কোন ঘর এমন ছিল না, যারা তে-ভাগায় অথবা চার ভাগায় জমি বর্গাচাষ করাতেন না। হযরত আলী (রা.) সা'দ ইবনে মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, কাসেম, ওরউয়া, উমর (রা.)-এর পরিবার-পরিজন, আলী (রা.)-এর পরিবার পরিজন এবং ইবনে সিরীন (রহ.)-এরা সকলেই নিজের জমি এভাবেই বর্গাচাষ করাতেন। – বুখারী

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন যে, এ ব্যাপারে সর্বোত্তম যে মতটি আমি শুনেছি তা হল ভূমি আধা-আধি, তে-ভাগায়, চার–ভাগায় বর্গাচাষ করতে দেয়া বৈধ এবং এটিই বিশুদ্ধতম মত। আমার নিকট এটি মুদারাবার ন্যায় একটি পদ্ধতি।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে একথা সম্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, চাষাবাদ না করেও ভূমির মালিক থাকা যায় এবং সে ভূমি ভাড়ায় কিংবা বর্গা প্রথায় অন্যের দ্বারা চাষাবাদ করানো যায়। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা বর্গাচাষকে বৈধ মনে করেন না। তবে ইজারা দেয়াকে তিনিও বৈধ মনে করেন।

– কিতাবুল খারাজ ঃ ৮৮

www.eelm.weebly.com

অবশ্য জমি বর্গা দেয়া বা ইজারা দেয়া বৈধ না হওয়ার পক্ষেও বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ হযরত রাফে' ইবনে খাদিজ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) আমাদেরকে এমন একটি বিষয় থেকে বারণ করলেন যা আমাদের জন্য ছিল লাভজনক, আর সে বিষয়টি ছিল এই যে, আমাদের কারো জমি থাকলে সে তা বর্গায় কিংবা ইজারায়া দিয়ে থাকত। কিন্তু তিনি বললেন 'তোমাদের কারো ভূমি থাকলে সে হয়ত তা নিজে চাষ করবে অন্যথায় তা অন্য ভাইকে মুফতে দিয়ে দিবে।' একই মর্মের হাদীস হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত জাবের (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। এসকল হাদীসের প্রেক্ষাপট ও নিহিত অর্থ কি হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের ব্যাখ্যার আলোকে আমরা তা বর্গাচাষ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। যার সারকথা এই যে, নবী (সা.) মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌজন্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা অবশ্য পালনীয় নির্দেশ নয়। তবে ভূমির মালিকানার প্রশ্নে ইসলাম চাষাবাদের জন্য অতিরিক্ত ভূমি রাখার অনুমতি দিলেও যেহেতু মালিকানা লাভের পন্থা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে অতএব তা কখনই বিশাল অঞ্চলের মালিক বনে যাওয়ার পর্যায় পর্যন্ত গড়াবে না। যদি হয় তাহলে তা হবে যৎসামান্য ভূ-সম্পত্তির মালিকানা, যা ইজারা কিংবা বর্গা দিয়ে কোনক্রমে জীবিকা অর্জনের পথ সুগম হবে মাত্র। সাহাবায়ে কিরামের যুগে যারা জমিদার ছিলেন, তারা মূলতঃ সে পর্যায়েরই ছিলেন।

ইসসলাম সীমিত পর্যায়ে যে জমিদারীকে স্বীকার করেছে তা দ্বারা ভূ-স্বামীরা যাতে কোনরূপ অবৈধ ফায়দা হাসিল করতে না পারে, সেজন্য ইসলাম বর্গাচাষ বা ইজারাদারীর ক্ষেত্রেও কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছে। যাতে সামন্তবাদী জমিদারী প্রথার ন্যায় কৃষক শোষণের কোন পথ খোলা না থাকে।

প্রাচীন জমিদারী প্রথায় ভূমিচাষীদের উপর কি ধরনের নির্যাতন করা হত এবং সেসকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তার একটা তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. প্রাচীন রোম ও ইরানী শাসকশ্রেণী কৃষকদেরকে নিজেদের অধীনস্থ দাস মনে করত। রাজস্ব ও লগ্নির টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে তারা রায়তদের সাথে পশুসুলভ আচরণ ও অমানুষিক নির্যাতন করত। নিজেদের বিলাসী জীবনের ব্যয় সংকুলানের জন্য প্রজা সাধারণের উপর সাধ্যাতীত করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হত, আবার তা আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা অক্ষম হলে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী দ্বারা তাদের উপর যথেচ্ছা নির্যাতন করা হত।

ইসলাম এই নির্যাতনমূলক প্রথাকে বন্ধ করে দিয়েছে এবং আইনের দৃষ্টিতে কৃষক ও জমিদার উভয়েই সমান এই ঘোষণার মাধ্যমে জমিদার কর্তৃক কৃষক

www.eelm.weebly.com

নির্যাতনের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। একজন মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে তাকে এভাবে নির্যাতন করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করে নৈতিকভাবে একে রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে কোন কর্মচারী সরকারি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেই কর্মচারীকে বরখাস্ত করে দেয়া হত। আর্থিক অসুবিধার জন্য কেউ রাজস্ব যথাসময়ে আদায় করতে না পারলে তাকে আদায় করতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়ার সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল।

একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা সার্বজনীন স্বার্থকে সবসময় বড় করে দেখেছে। এই নীতির স্বাভাবিক দাবি এই যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায়ের বিধি-বিধান ব্যক্তিগত বিধি-বিধানের চেয়ে কঠোরতর হবে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে উদার নীতি ঘোষণা করেছে তা দ্বারা জমিদারদের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা যে বৈধ হবে না তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাজা-বাদশা জমিদার যে কেউ হোক না কেন, একজন স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করা কিংবা তার সাথে দাসসুলভ আচরণ করা যে বৈধ হবে না তা নবী (সা.)-এর একটি হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى لى عهدا ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره –

আল্লাহ তা'আলা বলেন - কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব। ১. যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়েছে অতঃপর বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে। ৩. যে ব্যক্তি কোন লোককে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিয়েছে অথচ তার পারিশ্রমিক তাকে প্রদান করেনি। – বুখারী - বাবুল ইজারা

এই হাদীসে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করা যে মারাত্মক অন্যায় তা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা হয়েছে। বর্ণিত হাদীসে শেষোক্ত অংশটি দ্বারা কারো দাসসুলভ আচরণ করাও যে একই ধরনের অন্যায় তাও বুঝা যায়। কেননা হাদীসের শেষোক্ত বাক্যটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আইনী ও ইবনে হজর আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে, কারো কাছ থেকে শ্রম নিয়ে তাকে পারিশ্রমিক না দেয়া মারাত্মক ধরনের গুনাহ্। কারণ এটি তার সাথে গোলামসুলভ আচরণেরই নামান্তর। এহেন আচরণ দ্বারা সে ব্যক্তি যেন একথাই প্রমাণ করছে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছে।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা আইনীর ভাষায় ঃ

هو(أى الاستيجار بغير أجرة) فى معنى من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها ولانه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده -

বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে খাটানো; কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করারই নামান্তর। কেননা সে বিনা পারিশ্রমিকে নিজের সুবিধাটুকু পুরাপুরি আদায় করে নিয়েছে। এ যেন সে তাকে বিক্রি করে তার মূল্যই ভোগ করেছে। আর এ কারণেও যে সে তাকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়েছে। এ যেন সে তাকে গোলামই বানিয়ে নিয়েছে। - ফতহুল বারী।

ইবনে হজর আসকালানীও অনুরূপ মন্তব্য করে বলেছেন - هذاعين الظلم এটা সরাসরি জুলুম। - উমদাতুলকারী, ৫ম খন্ড, পৃ. ঃ ৫৯১।

ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নীতি ঘোষণা করেছে তা দ্বারা জমিদাররা যে ভূমি চাষীদের উপর জুলুম করতে পারবে না; তা সহজে বুঝা যায়।

জমিদার বা ভূ-স্বামীরা যে চাষীদের সাথে দুর্ব্যবহার কিংবা নির্যাতনমূলক আচরণ করতে পারবে না এ ধরণের ইঙ্গিতবহ অসংখ্য বর্ণনা খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ইতিহাসে ও ফুকাহায়ে কিরামের বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে।

একবার হযরত উমর (রা.) সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন, পথে এক জায়গায় তিনি কতিপয় লোককে রোদে দন্ডায়মান দেখতে পেলেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, জিযিয়া না দেয়ার কারণে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। জিযিয়া না দেয়ার কারণ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন যে, এ মুহূর্তে তারা তা আদায় করতে অক্ষম। এ শুনে তিনি আমেলদেরকে (কর্মকর্তা) এহেন জুলুমাত্মক প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন ঃ

دعوهم لاتكلفوهم مالا يطيقون سمعت رسول الله ص يقول لاتعذبو الناس فإن الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة وأمربهم فخلى سبيلهم -

তাদেরকে ছেড়ে দাও সাধ্যাতীত বিষয়ে তাদেরকে মজবুর করো না। আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষকে শাস্তি দিওনা, নিশ্চয়ই যারা দুনিয়ায় মানুষকে শাস্তি দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।" অতঃপর তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন, ফলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল।

- কিতাবুল খারাজ - ২৫, কিতাবুল আমওয়াল - ৪৩।

হযরত উমর (রা.) তার শাসনাধীন অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কর্মকর্তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কৃষকদের থেকে প্রতি জরিবে (৬০ বর্গ গজ, প্রায় এক একর) চার দিনারের চেয়ে বেশি রাজস্ব যেন আদায় না

www.eelm.weebly.com

করা হয় এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যেন কঠোরতা প্রদর্শন না করা হয়। বরং তাদের সাথে যেন নম্রতার আচরণ করা হয়। – কিতাবুল আমওয়াল (ভাবার্থ) ৪৪ পৃঃ

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) কুফার গভর্ণর আব্দুল হুমায়দকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে ঃ ولا من العامر إلا وظيفة الخراج فى رفق وتسكين لأهل الأرض

আবাদী জমিনের উপর বির্ধারিত খারাজের চেয়ে বেশী অবশ্যই আদায় করবে না। আর যাকিছুই আদায় করবে নম্রতার সাথে এবং কৃষকদের মনোতুষ্টির সাথে আদায় করবে। – কিতাবুল খারাজ - ৮৬ পৃঃ

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে ঃ

ولايضربن رجل فى دراهم الخراج ولايقام على رجله فإنه بلغنى أنهم يقيمون أهل الخراج فى الشمس ويضربونهم ضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم عن الصلوة هذا عظيم عندالله شنيع فى الإسلام

খারাজ আদায়ের জন্য কোন ব্যক্তিকে কিছুতেই প্রহার করা যাবে না এবং এক পায়ের উপর দাঁড় করিয়েও রাখা যাবে না। আমি জানতে পেরেছি যে, রাজস্ব আদায়কারীরা লোকদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে, মারাত্মকভাবে প্রহার করে, গলায় কলসী ঝুলিয়ে রাখে এবং তাদেরকে বন্দি করে রাখে, ফলে তাদের নামায আদায় করাও সম্ভব হয় না। এটা আল্লাহ্‌র নিকট মারাত্মক অপরাধ, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে জঘন্য কাজ। – কিতাবুল খারাজ, ১০১ পৃঃ

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সরকারি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেই যদি ইসলাম এহেন নীতি অবলম্বন করে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত জমির মালিক ও বর্গাচষী কিংবা ইজারাদারের মাঝকার সম্পর্ক কি হওয়া উচিৎ।

একথার প্রতি ইঙ্গিত করতেই হয়ত ইমাম আবু আউসুফ বলেছেন যে, هذا عندى كالمضاربة এটি আমার নিকট মুদারাবার মত। অর্থাৎ একজনের মূলধন ও অন্যজনের শ্রমের সংযোগে যে যৌথ ব্যবসা হয়; সেখানে যেমন একজন মালিক অন্যজন দাস হিসেবে গণ্য হয় না বরং উভয়েই সম অংশিদার হিসেবে গণ্য হয়। বর্গা চাষেও জমিদার ও কৃষকের মাঝকার সম্পর্ক হবে অনুরূপ। এখানে কেউ কারো প্রভু বা দাস নয়।

সরকারি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সদাচার ও অপারগদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের যে উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্র ও রাজস্ব প্রদানকারী কৃষকের মধ্যকার আচরণ সংক্রান্ত। কিন্তু জমিদার আর বর্গাচাষী ও ইজারাদারের মধ্যকার সম্পর্ক তো নিছক শরীকানার সম্পর্ক মাত্র। সুতরাং যৌথ

www.eelm.weebly.com

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক শরীক (জমিদার) অন্য শরীক (বর্গাচাষী বা ইজারাদার)-এর উপর জুলুম ও অত্যাচার করবে কিংবা দাসসুলভ আচরণ করবে এটা ইসলাম কি করে সমর্থন করবে?

২. প্রাচীন জমিদারী প্রথায় জমিদাররা রায়ত ও চাষীদের থেকে "রেওয়াজ" নামের এক ধরনের কর আদায় করত। অর্থাৎ জমিদাররা রাজস্ব বা লগ্নি হিসেবে নির্ধারিত অর্থ ছাড়াও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের নামে রায়ত ও চাষীদের থেকে মোটা অংকের কর আদায় করত। এটাকে রাজস্বের চাইতেও অধিক গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা হত। অনেক সময় "রেওয়াজ" হিসেবে যে কর নির্ধারিত করা হত, তা মূল রাজস্বের চেয়েও পরিমাণে বেশি হত। জমিদাররা এটাকে তাদের পাওনা মনে করত। এই 'রেওয়াজ' পরিশোধ না করলে চাষীদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হত।

ইসলাম রাজস্ব কিংবা লগ্নি হিসেবে নির্ধারিত অর্থ ছাড়া এ ধরনের অতিরিক্ত কর আদায়কে কৃষকের প্রতি জুলুম বলে অভিহিত করেছে এবং এ ধরনের কর আদায়কে সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি যদি কোন জমির মালিক জমি বর্গা কিংবা ইজারা দেয়ার সময় এ ধরনের কোন রেওয়াজ দেয়ার শর্তারোপ করেন তাহলে চাষী ও জমিদারের মধ্যকার এ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ তার কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যেঃ

ولايؤخذ منهم ما قد يستمريهم رواجا لدراهم يودونها فى الخراج فإنه بلغنى أن الرجل منهم ليأتى بالدراهم ليودبها فى خراجه فيقطع منها طائفة ويقال هذارواجها وصرفها –

রাজস্ব প্রদানকারীদের থেকে খারাজের অর্থ ছাড়া রেওয়াজ নামে যে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে তা কক্ষণই আদায় করা যাবে না। আমি জানতে পেরেছি যে, কৃষক যখন খারাজ আদায়ের জন্য টাকা নিয়ে আসে; তখন তার টাকা থেকে একাংশ আলাদা করে ফেলা হয় আর বলা হয় যে, এটা রেওয়াজ হিসেবে কেটে নেয়া হল। (আর এই পরিমাণ টাকা তার মূল খারাজে বাকী রেখে দেয়া হয়)।

ফিকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে 'অবৈধ ইজারা ও অসিদ্ধ বর্গাচাষ' সম্পর্কিত আলোচনায় এ ধরনের শর্তারোপের ফলে মূল চুক্তিটি যে বাতিল হয়ে যাবে এ বিষয়টি একটি আইনগত ধারা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাহরুর রায়েক-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ

لأنها (الاجارة) كالبيع تفسد بالشروط الفاسدة فكل ما أفسدالبيع أفسدها –

কেননা এটা (ইজারা) বেচা-কেনার ন্যায় ফাসেদ বা অসিদ্ধ শর্তারোপের দ্বারা অশুদ্ধ হয়ে যায়। যে সব শর্তারোপ করলে বেচা কেনা অবৈধ হয়ে যায়, সে সব

www.eelm.weebly.com

শর্তারোপের ফলে ইজারাও অবৈধ হয়ে যায়। -বাহ্‌রুর রায়েক -৭ম খন্ডঃ ৩২৯ পৃঃ

এরপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ - اوشرط فيه شرط لا يقتضيه العقد

যদি তাতে এমন কোন শর্তারোপ করা হয় যা স্বাভাবিকভাবে ইজারার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাহলে তাদ্বারাও ইজারা অবৈধ হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ খারাজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে বাদশাহ হারুন-আল-রশীদকে অবগত করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে ঃ

بلغنى أنه ربما وظف له أكثر مما يطالب به الرجل من الخراج فإذا أتاهم ذلك الموجه إليه قال له أعطنى جعلى الذى جعله لى الوالى فإن جعلى كذا او كذا فإن لم يعطه ضربه وعسفه وساق البقر والغنم ومن أمكنه ما الضعفاء والمزارعين حتى يأخذ منهم ظلما وعدوانا وهذا كله ضررعلى أهل الخراج ونقص للفىء مع ما فيه إثم -

আমি জানতে পেরেছি যে, রাজস্ব প্রদানকারীদের নিকট তহ্‌শীলদারদের বেতন হিসেবে দাবিকৃত টাকার অংক রাজস্বের মূল টাকার চেয়েও বেশি হয়ে যায়। তহ্‌শীলদার রাজস্ব প্রদানকারীদের নিকট গিয়ে বলে যে, ওয়ালীর (রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা) পক্ষ থেকে নির্ধারিত আমার পারিশ্রমিকের পরিমাণ এত টাকা। যদি তারা তা আদায় না করে তাহলে তাদেরকে মারধর করা হয়, জোর-জুলুম করা হয়, বেচারা গরীব কৃষকের গরু, বকরী কিংবা হাতের কাছে যা পায় সবকিছু ক্রোক করে নিয়ে আসে। এভাবে তাদের থেকে সে টাকা অন্যায়ভাবে জবরদস্তি করে আদায় করা হয়ে থাকে। এটা মূলতঃ খারাজ প্রদানকারীদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং এতে রাষ্ট্রীয় আমদানী হ্রাস পায়। উপরন্তু পাপ যা হবার তাতো হয়ই। - কিতাবুল খারাজ

প্রাচীন রোম ও ইরানে এরূপ প্রথাও প্রচলিত ছিল যে, রাজা-বাদশা ও জমিদাররা তাদের পূজা-পার্বন, বিয়ে-শাদী, শোকসভা, ঘরবাড়ী পাকাকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রজাসাধারণ থেকে ভেট আদায় করত। ইসলামে এ ধরনের ভেট আদায়কেও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এগুলো এমন কর; যার শর্ত করা হলে ইজারা কিংবা বর্গা চাষের চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর যদি চুক্তি ছাড়াই এগুলো আদায় করা হয় তাহলে এটা একারণে অবৈধ হবে যে, এর বিনিময়ে কৃষক কিছুই লাভ করছে না। সুতরাং এটি সুদ কিংবা ঘুষের পর্যায়ভুক্ত হবে। তৃতীয়ত এটি বলতে গেলে কৃষক থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক আদায় করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটি জুলুম বৈ কিছু নয়। জমিদারের নির্যাতনের ভয়ে কৃষকরা তা আদায়ে সম্মত হলেও প্রকৃত অর্থে এতে তার সম্মতি

www.eelm.weebly.com

থাকে না। আর এহেন লেনদেনে যদি উভয়পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি না থাকে তবে তা বৈধ হয় না।

৩. প্রাচীন জমিদারী প্রথায় কৃষকদেরকে বেগার খাটানোর একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। এর সারকথা এই যে, যারা জমিদারের জমি চাষাবাদ করত, জমিদার তার ব্যক্তি প্রয়োজনে ঐসব চাষীদের থেকে বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন ধরনের শ্রম আদায় করে নিত। অনেক সময় রাষ্ট্র ঐসব জমিদারদের থেকে বেগার চাইত অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারদিগকে কিছু কিছু কাজ করে দেয়ার কথা বলত। জমিদাররা এক্ষেত্রেও তাদের রায়ত ও চাষীদেরকে বেগার খেটে দেয়ার জন্য বাধ্য করত। ফলে গরীব চাষী ও শ্রমজীবী মানুষকে জমিদারের নির্যাতনের ভয়ে বাধ্য হয়ে বেগার খাটতে হত।

ইসলাম এ ধরনের বেগার খাটানোর নির্যাতনমূলক প্রথাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। চাষী ও শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া তাদেরকে কোন অবস্থায়ই বেগার খাটতে বাধ্য করা যাবে না। আল্লামা ইবনে হজম তার মুহাল্লা গ্রন্থে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, বর্গাচাষে নির্ধারিত কৃষিকাজ ছাড়া বর্গাচাষী দ্বারা অন্যকোন কাজ করানো জায়েয হবে না। এর কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ঃ لأن السنة إنما وردت بأن الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم وأنفسهم فقط -

কেননা সুন্নাতে নবী দ্বারা কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তাদের উপর এই একটিমাত্র শর্তই আরোপ করা যাবে যে, তারা কেবলমাত্র তাদের বর্গা নেয়া ভূমিতেই শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করবে। – মুহাল্লা, খন্ড ৮ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২২৪।

মানুষকে বেগার খাটানো এবং তার যথাপ্রাপ্য পারিশ্রমিক না দেয়া যে মারাত্মক অপরাধ এবং এ দ্বারা যে আল্লাহ্‌র ক্রোধ সঞ্চারিত হয়; এক হাদীসে কুদসীতে একথা পরিষ্কারভাবেই বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى لى عهدا ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره -

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব, ১. সেই ব্যক্তি যে আমার সঙ্গে অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। ২. সেই ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে, ৩. সেই ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তিকে শ্রমে নিয়োগ করে তা থেকে পূর্ণশ্রম আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক দেয়নি।

– বুখারী - বাবুল ইজারাহ।

৪. প্রাচীন জমিদারী প্রথায় সবচেয়ে নির্যাতনমূলক যে বিষয়টি ছিল তা এই

www.eelm.weebly.com

যে, কৃষক যদি সঙ্গত কারণে যথা সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে অক্ষম হত তাহলেও তার প্রতি সামান্য অনুকম্পা প্রদর্শন করা হত না। বরং তার কৃষি উপকরণ যথা ঃ হাল-গরু, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, এমনকি ভিটে-বাড়ি পর্যন্ত নিলামে বিক্রি করে দেয়া হত। এর ফলে কৃষকের জীবনে নেমে আসত চরম দুর্ভোগ। উৎপাদনের উপকরণ ও সামর্থ হারিয়ে তাকে পথে বসতে হত। এভাবে কত সাজানো সংসার যে জমিদারদের দৌরাত্মের কারণে সর্বস্ব হারিয়ে পথের ফকীর হয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।

ইসলাম কৃষকের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমাগ্রী ও কৃষি উপকরণ নিলাম করে তাকে জীবন নির্বাহের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করার এহেন পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাজস্ব বা লগ্নির টাকা অবশ্যই আদায় করতে হবে। কিন্তু তাই বলে কৃষকের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে পথে বসানো কোনক্রমেই বৈধ হবে না।

একবার হযরত আলী (রা.) সিরিয়ার 'আকবরা' নামক অঞ্চলের তহশীলদারকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কৃষকদের সামনে কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়ে বললেন "তাদের নিকট থেকে রাজস্বের প্রতিটি পাই তোমাকে আদায় করতে হবে।" পরে তিনি তহশীলদারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দুপুরে তুমি আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবে। তহশীলদার যথাসময়ে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বললেন, দেখ তোমরা রাজস্ব আদায় করতে কৃষকের বাড়ি গিয়ে তাদের শীত গ্রীষ্মের কাপড় বিক্রি করে নিয়ে আসবে না, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও কৃষি কাজে ব্যবহৃত গাবাদিপশু বিক্রি করেও আনবে না। তাদেরকে বেত্রাঘাত করবে না, এক পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দিবে না, রাজস্বের জন্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনের কোন মাল সামানও বিক্রি করবে না।

–কিতাবুল খারাজ-১৬

হযরত আলী (রা.)-এর এ বক্তব্যের সার অর্থ হল যদি কৃষক রাজস্ব আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। তাদের কৃষি উপকরণ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যদি রাজস্ব বাবদ নিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তাদের জীবন ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

যদি প্রাকৃতিক কারণে ভূমি আবাদ করা সম্ভব না হয়, অথবা ফসল নষ্ট হয়ে যায়; তাহলে ভূমি রাজস্ব মাফ হয়ে যাবে। আর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়; তাহলে ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে রাজস্ব মওকুফ করা হবে। অবশ্য খলীফা ইচ্ছা করলে এ অবস্থায়ও পূর্ণ রাজস্ব মওকুফ করে দিতে পারেন। জমি ইজারায় দেয়া হলে উপরোল্লিখিত অবস্থায় লগ্নির টাকা পরিশোধের বিধানও অনুরূপই হবে। অর্থাৎ আবাদ করা সম্ভব না হলে কিংবা সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট হয়ে গেলে লগ্নির টাকা সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে। আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হলে

www.eelm.weebly.com

ক্ষতির অনুপাতে মাফ হবে। বর্গাচাষের বেলায় জমি থেকে কোন কিছু উৎপন্ন না হলে জমির মালিক কিছুই পাবে না। আর ক্ষতিগ্রস্থ হলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই চুক্তির শর্তানুসারে চাষী ও জমির মালিকের মাঝে বন্টন করা হবে।

৫. প্রাচীনকালে বর্গাচাষের এমনও একটি প্রক্রিয়া চালু ছিল যে, এক খন্ড ভূমি চাষিকে এই শর্তে চাষ করতে দেয়া হত যে, চাষী তা চাষাবাদ করবে, তবে ক্ষেতের একাংশ (যে অংশে সাধারণতঃ ভাল ফসল হয়) জমির মালিকের জন্য নির্ধারিত থাকবে। অর্থাৎ ঐ অংশে যা উৎপন্ন হবে তা মালিক পাবে; আর অন্য অংশে যা উৎপন্ন হবে তা কৃষক পাবে।

ফলে অনেক সময় কৃষক তার বিনিয়োগকৃত শ্রম ও মূলধনের সমপরিমাণ ফসল নিয়েও ঘরে ফিরতে পারত না।

ইসলাম এ প্রথাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وكذالك ان شرطا ماعلى الماذيانات والسواقى ومافى معناه لاحدهما لانه اذا شرط لاحدهما زرع موضع معين افضى ذالك الى قطع الشركة لانه لعله لايخرج الأمن ذالك الموضع-جلد٤ص

অনুরূপভাবে যদি শর্ত করা হয় যে, ড্রেনের পাড় বা জলাধার সংলগ্ন ভূমির উৎপন্ন ফসল কোন একজনের হবে, তাহলেও এ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা যখন কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের ফসল কারো জন্য শর্ত করা হবে তখন শরীকানার সাধারণ চুক্তিটিকে বন্ডুল করে দিবে। কারণ এর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, কেবল ঐ স্থানটুকু ছাড়া অন্য স্থানে তেমন কিছু উৎপন্নই হবে না।

এছাড়াও জমিদারদের অনেক ধরনের শোষণের প্রক্রিয়া ছিল যা ইসলাম আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

সারকথা, ইসলাম সীমিত পর্যায়ে জমিদারী প্রথা বৈধ রাখলেও তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়া হয়েছে যে, কৃষক নির্যাতনের কোন পথই খোলা থাকেনি। বরং ভূ-স্বামী ও চাষী উভয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উভয়ের প্রয়োজন পূরণের ভ্রাতৃত্বসূলভ এক পন্থা উদ্ভাবন করে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণ লাভের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে মাত্র। যদি পাস্পরিক সহযোগিতার এই মনোবৃত্তি ও পরিবেশ না থাকে, আর জমিদারের মাঝে মেহনতী মানুষের অভাবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ ফায়দা লুটার প্রবণতা স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে রাষ্ট্র প্রধান এ ধরনের চুক্তি থেকে তাদেরকে বারণ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে আইন করে এই প্রথা বন্ধ করে দিতে পারবেন। -ইসলামকা ইকতিসাদী নেযাম-১৭৬

www.eelm.weebly.com

ইসলামের ভূমি রাজস্ব বিধান

রাজস্বের সংজ্ঞা ঃ অধ্যাপক চেস্টিবলের মতে "রাজস্ব হল কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সেই অর্থ; সরকারি কার্য সম্পাদনের জন্য যা তাথেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদয় করা হয়ে থাকে।"

অধ্যাপক ডলটন রাজস্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "রাজস্ব হল সরকারের পক্ষ হতে অপরিহার্যরূপে ধার্যকৃত একটি দাবি বিশেষ"

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় রাজস্ব হল "রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে আরোপিত এমন অর্থনৈতিক দায়িত্ব যা সামষ্টিক কল্যাণে শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যয়িত হওয়ার জন্য বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বরাবরে জমা দিতে হয়।"

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়ের শরীয়তসম্মত নির্দিষ্ট কতিপয় খাত রয়েছে এবং তা ব্যয়েরও নির্ধারিত কতিপয় খাত রয়েছে। যথাস্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ঐসব খাতসমূহের মাঝে ভূমি রাজস্ব অন্যতম একটি খাতমাত্র।

ভূমি রাজস্ব ঃ রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল প্রকার ভূমি ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে জনগণকে রাষ্ট্র ও সরকারের অনুকূলে যে কর প্রদান করতে হয় তাকে ভূমি রাজস্ব বলে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত (রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি ব্যতিত) ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ ১. মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমি ২. অমুসলিমদের মালিকানাধীন ভূমি।

সাধারণতঃ মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমিকে উশ্‌রী ভূমি ও অমুসলিম নাগরিকদের মালিকানাধীন ভূমিকে খারাজী ভূমি বলা হয়ে থাকে।

নিম্নোক্ত ভূমিসমূহ উশ্‌রী ভূমি হিসেবে গণ্য হয় ঃ

১. যে জমি কোন মুসলমান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

২. যে জমি ক্রয় সূত্রে কোন মুসলমানের হাত থেকে অন্য মুসলমানের হাতে এসেছে।

৩. যে জমি সর্বপ্রথম কোন মুসলমান আবাদ ও চাষযোগ্য করে তুলেছে – তা যদি কোন উশ্‌রী ভূমির সংলগ্ন হয় এবং বর্তমানেও কোন মুসলমানের হাতে থাকে।

৪. যে জমির মালিক ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে।

৫. যে জমি কোন মুসলমান অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করে গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পেয়েছে।

৬. যে জমি কোন মুসলমানকে চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মালিকানা স্বত্বসহ দান করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

নিম্নোক্ত ভূমিসমূহ খারাজী ভূমি হিসেবে গণ্য হয় ঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন অমুসলিম যে জমি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

২. যে জমি কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম থেকে ক্রয়সূত্রে অমুসলিমের মালিকানায় এসেছে।

৩. যে জমি সর্বপ্রথম কোন অমুসলিম আবাদযোগ্য করে তুলেছে।

৪. মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর যে জমি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান সেখানকার অমুসলিম নাগরিকদের মালিকানায় রেখে দিয়েছেন।

৫. মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর যে জমি (বিনা মালিকানায়) চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য সেখানকার অমুসলিম নাগরিকদের দিয়ে দেয়া হয়েছে।

৬. যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় কিংবা দেশের সাথে খারাজ দেয়ার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেখানকার ভূমি।

৭. যেসব দেশের সাথে এ মর্মে সন্ধি হয়েছে যে, সেখানকার ভূমি পূর্ব মালিকদের হাতেই থাকবে– সে দেশের ভূমি।

৮. যে জমি কোন মুসলমান আবাদযোগ্য করে তুলেছে বটে কিন্তু তা যদি খারাজি ভূমির সংলগ্ন হয়।

উশ্‌রের বিধান ঃ

উশ্‌র মূলতঃ একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ। বস্তুতঃ এটি ইসলামী শরীয়তের একটি পরিভাষা। ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকদের ভূমির উপর আরোপিত কর বা ট্যাক্সের জন্য এটি প্রয়োগ হয়ে থাকে।

মুসলমানদের যেসব ভূমি প্রকৃতি প্রদত্ত পানি দ্বারা সজিবতা লাভ করে; যেমনঃ বৃষ্টির পানি, সাগর-মহাসাগরের পানি, নদী-নালা (যা কারো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রবাহিত নয়)-এর পানি, ঝর্ণা ও হ্রদের পানি ইত্যাদি; তাহলে সেই ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক অংশ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করতে হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে পরিশোধিত করের পরিমাণ এক দশমাংশ তাই তাকে উশ্‌র নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অবশ্য ভূমি যদি প্রাকৃতিক পানি দ্বারা বিধৌত না হয় বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেমন ঃ কূপ খনন করে কিংবা খাল কেটে অথবা ড্রেন তৈরি করে তাতে পানি সরবরাহ করতে হয়, তাহলে সে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক (অর্থাৎ বিশ ভাগের একাংশ) রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করতে হয়। যেহেতু

www.eelm.weebly.com

এক্ষেত্রেও পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ এক দশমাংশের উপর ভিত্তি করেই নিরূপণ করা হয় (অর্থাৎ এক দশমাংশেরও অর্ধেক) তাই এ ধরনের ভূমিকেও উশ্‌রী ভূমি বলা হয়।

উশ্‌র একদিকে যেমন ভূমি রাজস্ব, অন্যদিকে এটি একটি আর্থিক ইবাদতও বটে। কেননা ভূমির উৎপন্ন ফসলাদি থেকে ব্যয় করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত। আর তার পরিমাণ রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض –

হে মু'মিনগণ! তোমরা উত্তম যাকিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তা থেকে ব্যয় কর। – সূরা ঃ ২ - বাকারা ঃ ২৬৭

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

كلوا من ثمرة إذا أثمروآتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين –

ফলমূল পরিপক্ক হলে তা আহার কর, আর ফসল কাটার দিন তা থেকে আল্লাহ্‌র হক আদায় কর। এ ব্যাপারে নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। – সূরা ঃ ৬ - আন্-আম ঃ ১৪১।

এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواقى والنضيع نصف العشر (ابوداود)

যেসব ভূমি বৃষ্টির পানি, নদী-সমুদ্রের পানি, ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত হয় কিংবা যা স্বতঃই সিক্ত থাকে তার ফসলের এক দশমাংশ, আর যে ভূমি কৃত্রিম পানি সিঞ্চনের কোন প্রক্রিয়ায় সিক্ত করা হয় তার ফসলে উশ্‌রের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ ভূমি রাজস্বরূপে আদায় করতে হবে। – আবু দাউদ

কেননা শেষোক্ত প্রকার ভূমিতে শ্রম ও উৎপাদন ব্যয় প্রথমোক্ত ভূমির তুলনায় বেশি। সুতরাং তাতে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য যদি নদীর পানি ব্যবহারের জন্য কর পরিশোধ করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উশ্‌রের অর্ধেক ভূমি রাজস্ব দিতে হবে।

যদিও কর হিসেবে উশ্‌র একটি ভারী কর, তথাপি আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ বিধায় মুসলমানদেরকে তা অবশ্য পালনীয়রূপে পরিশোধ করতে হবে। আর যেহেতু এটি একটি ইবাদত; তাই যত লাভজনকই হোক না কেন, এ কর কোন অমুসলমানের উপর ধার্য করা যাবে না। কেননা কোন অমুসলমানকে ইসলামের কোন ইবাদত আদায় করার জন্য বাধ্য করার অধিকার কোন রাষ্ট্র প্রধানের নেই।

www.eelm.weebly.com

এ কারণে যদি কোন উশ্‌রী ভূমি কোন অমুসলিম খরিদ করে নেয়; তাহলে তা আর উশ্‌রী থাকে না বরং তা খারাজি ভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলমান কোন খারাজি ভূমি ক্রয় করে তাহলে তা খারাজিই থেকে যায়।

আর উশরের পরিমাণ যেহেতু রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত, অতএব এর পরিমাণে কমবেশি করার কিংবা মওকুফ করার কোন অধিকার রাষ্ট্র প্রধানের নেই।

বস্তুতঃ উশ্‌র কারো মালিকানাভুক্ত ভূমির পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং মালিকানাভুক্ত ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই যদি কোন কারণে মালিকানাভুক্ত ভূমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না হয় (তা প্রাকৃতিক কারণেই হোক কিংবা উদাসীনতা ও অলসতাজনিত কারণেই হোক) তাহলে উশ্‌র আদায় করতে হবে না। কেননা যা উৎপাদিত হবে, রাষ্ট্রের প্রাপ্য হবে তারই এক দশমাংশ।

উশ্‌রকে যদিও 'যাকাতুল আরদ' বা ভূমির যাকাত মনে করা হয়ে থাকে, তথাপি এটিকে ভূমি রাজস্ব হিসেবে চিন্তা না করার কোন কারণ নেই। বরং একদিকে এটি যেমন ভূমির যাকাত, অপরদিকে এটি ভূমি রাজস্বও বটে। এ কারণেই মাল-সম্পদের যাকাত ও উশ্‌রের মাঝে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বাণিজ্যিক মালামাল ও স্বর্ণ-রৌপ্য যদি পূর্ণ এক বছর হাতে থাকে এবং কোনরূপ মুনাফা নাও হয়, এমনকি যদি লোকসানও হয়, তথাপি যদি তা নিসাব পরিমাণের চেয়ে কমে না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রেও যাকাত আদায় করা ফরয। পক্ষান্তরে উশ্‌র আরোপিত ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হলেই কেবল উশ্‌র ফরয হয়, ফসল না হলে কিছুই ফরয হয় না।

– বাদায়েউস্ সানায়ে, কিতাবুল খারাজ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আদম।

আবার যাকাত বছরান্তে একবারই আদায় করতে হয়। কিন্তু উশ্‌র যতবার ফসল উৎপন্ন হয় ততবারই আদায় করতে হয়।

যাকাতের হিসাব করতে নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বাদ রেখে হিসাব করা হয়। আর উশ্‌র যা উৎপন্ন হয় তার উপরই ওয়াজিব হয়। এমনকি বসত বাড়িতে উৎপন্ন নানাবিধ ফলফলাদিরও উশ্‌র পরিশোধ করতে হয়। হাদীসে আছে ঃ

ما أخرجته الأرض ففيه العشر–

ভূমি থেকে যাকিছু উৎপন্ন হয় তাতেই উশ্‌র দিতে হবে।

অবশ্য এ বিষয়ে কোন কোন ফিকাহবিদের দ্বিমত রয়েছে। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ মনে করেন যে, উশ্‌র কেবল ফসলের সেই অংশের উপর ধার্য হবে, যা

www.eelm.weebly.com

মানুষের নিকট সংরক্ষিত থাকে। যা সংরক্ষণযোগ্য নয় তাতে উশর ধার্য হবে না। আর যা সাধারণতঃ সঞ্চয় করে রাখা হয় না এ ধরনের ফসলের উপরও উশর ধার্য হবে না। — কিতাবুল খারাজ

খারাজের বিধান ঃ

খারাজ মূলতঃ ফার্সী শব্দ, যা আরবিতে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ما أخرجته الأرض ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রাচীনকালে ভূমি রাজস্ব ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অংশ বিশেষ দিয়েই আদায় করা হত, সম্ভবত সে কারণেই ভূমি রাজস্বকে খারাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এটি ইসলামী অর্থনীতির একটি পরিভাষা। রাষ্ট্রের অন্তর্গত অমুসলিম নাগরিকদের দখলভুক্ত ভূমির উপর আরোপিত কর বা ট্যাক্সের জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অমুসলিম নাগরিকদের ভূমির উপর কর সাধারণতঃ দুইভাবে ধার্য করা হয়ে থাকে।

১. উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে ধার্যকৃত খারাজ ঃ অর্থাৎ ভূমি থেকে যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক কিংবা তিনভাগের একভাগ অথবা চার ভাগের একভাগ খারাজ হিসেবে বায়তুলমালে জমা দেয়ার জন্য ধার্য করে দেয়া। এটা বর্গাচাষের সমার্থক। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় خراج مقاسمة (খারাজে মুকাসামাহ্) বলা হয়ে থাকে। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যদি খারাজ উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশ পরিশোধের ভিত্তিতে ধার্য হয়, তাহলে তা ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না বরং তা সংশ্লিষ্ট হবে উৎপাদিত ফসলের সাথে। ফসল উৎপন্ন না হলে খারাজ প্রাপ্য হবে না। আবার বছরে যতবার ফসল উৎপন্ন হবে, ততবারই খারাজ প্রদান করতে হবে। — হিদায়া, ফত্হুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড ঃ ৩৬৪ পৃঃ

২. নগদ অর্থে ধার্যকৃত খারাজ ঃ অমুসলিম নাগরিকদের দখলভুক্ত বা ভোগাধিকারভুক্ত ভূমিতে রাষ্ট্রপ্রদানের পক্ষ থেকে ভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে নগদ অর্থে বাৎসরিক কর ধার্য করারও বিধান রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় একে খারাজে মু'আজ্জাল বা খারাজে মুওয়াযৃযাফ (خراج مؤجل বা خراج موظف) বলে।

খারাজে মু'আজ্জাল আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে বাৎসরিক হারে নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত খারাজ বছরে একবারই পরিশোধ করতে হয়। ফসল উৎপন্ন হওয়া না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফসল উৎপন্ন হলেও তা পরিশোধ করতে হয় আর উৎপন্ন না হলেও তা পরিশোধ করতে হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক কারণে ফসল উৎপন্ন না হলে অবস্থাভেদে আংশিক বা পূর্ণ মওকুফ করে দেয়ার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান ফিকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য।

www.eelm.weebly.com

রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তার প্রতিনিধি খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবেন। খারাজ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে তা নির্ধারণ করতে হবে।

১. ভূমি যদি মোটেই আবাদযোগ্য না হয়; তাহলে তাতে খারাজ আরোপ করা যাবে না।

২. ভূমির উর্বরতা ও অনুর্বরতার তারতম্য, সেচ সুবিধা, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এভাবে খারাজ নির্ধারণ করতে হবে, যাতে কৃষকও ক্ষতিগ্রস্থ না হয়; আবার রাষ্ট্রও তার যথাপ্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং সম্ভাব্য উৎপাদিত ফসলের সর্বোচ্চ অর্ধাংশ এবং সর্বনিম্ন পাঁচ ভাগের একাংশের মাঝেই খারাজ নির্ধারণ করতে হবে। – হিদায়া

৩. কোন ভূমি ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ত্বে আসার পর সেই ভূমিতে যে ধরনের খারাজ (মুকাসামাহ বা মু'আজ্জালাহ) নির্ধারণ করা হবে, তা পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা বৈধ হবে না। যেমন ঃ খারাজে মুকাসামাহকে মু'আজ্জালায় পরিবর্তন করা। – শামী

উল্লেখ্য যে, খারাজ নির্ধারণের পর যদি দেখা যায়, নির্ধারিত খারাজ উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়, তাহলে তা কমবেশি করা যাবে। – হিদায়া

৪. কোন ভূমিতে খারাজ ধার্য করার পর যদি উক্ত ভূমির মালিক মুসলমান হয়ে যায়, তবুও তা খারাজি ভূমি বলেই গণ্য হবে। – হিদায়া

৫. কোন খারাজি ভূমিকে অন্যের নিকট বর্গা কিংবা উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশের বিনিময়ে ইজারা প্রদান করা হলে, যদি খারাজ খারাজে মুকাসামাহ্ হয় তাহলে উভয়ের মাঝে ফসল যে হারে বন্টন হবে, সেই হারে উভয়কে মিলে খারাজ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু যদি নগদ অর্থের বিনিময়ে ইজারা দেয়া হয়, আর খারাজে মুআজ্জাল হয়, তাহলে চাষীকেই খারাজ পরিশোধ করতে হবে

– শামী

উৎপন্ন ফসল কিংবা নগদ অর্থ এতদুভয়ের মাঝে যা দ্বারা খারাজ পরিশোধ করা কৃষকের জন্য সুবিধাজনক হয় এবং কৃষক যা দিয়ে খারাজ পরিশোধ করতে চায় রাষ্ট্রীয় কর্মচারীকে তা-ই গ্রহণ করতে হবে।

www.eelm.weebly.com

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামের উদার ও সহনশীল নীতি

১. ভূমি চাষীদের সাথে দাসসুলভ আচরণ না করা

ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের থেকে রাজস্ব আদায় করে বটে তবে নাগরিকদেরকে (মুসলিম অমুসলিম যাই হোক না কেন) কখনই দাস মনে করে না কিংবা তাদের সাথে দাসসুলভ আচরণ করে না। মবসূত গ্রন্থে মুখারাবাহ-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফার ভাষ্যে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ

هذا أصح التاويلين فإنه لم ينقل عنْ أحد من الولاة أنه تصرف فى رقابهم ورقاب أولادهم كالتصرف فى المماليك -

এদুটি ব্যাখ্যা (অর্থাৎ খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে দাসে পরিণত করা কিংবা জমি ইজারার ভিত্তিতে প্রদান করা)-এর মাঝে শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিই উত্তম। কেননা শাসকদের মাঝে কারো আচরণ দ্বারাই একথা প্রমাণ হয় না যে, তারা ইয়াহূদী কিংবা তাদের বংশধরদের সাথে দাসসুলভ আচরণ করেছেন।

– মবসূত ঃ খন্ড-২৩ ঃ পৃ.-৩

২. ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কৃষকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা ঃ ভূমি যদি ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করা হয়, আর তার বিপরীতে বার্ষিক কর নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাহলে এ করকে বলা হয় মালগুজারী বা রাজস্ব। আর যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে তা বর্গার ভিত্তিতে কিংবা ইজারায় চাষ করতে দেয়া হয় তাহলে এ ব্যবস্থাকে বলা হয় জমাবন্দী বা লাগান।

চাষাবাদের যে প্রক্রিয়াই অবলম্বন করা হোক না কেন কৃষক রাষ্ট্রীয় পাওনা নগদ অর্থেও পরিশোধ করতে পারবে কিংবা ফসলের অংশের মাধ্যমেও পরিশোধ করতে পারবে। যে ব্যবস্থা কৃষকের জন্য সুবিধাজনক হয় তা-ই সে অবলম্বন করবে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ তার কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন ঃ

ثم تكون المقاسمة فى أثمار ذلك أويقوم ذلك قيمة عادلة لايكون فيها حمل على أهل الخراج ولا يكون على السلطان ضرر فإن لم يوجد منهم مايلزمهم من ذالك أىّ ذالك كان أخف على أهل الخراج فعل ذالك بهم -

অতঃপর তাদের ফলগুলো বন্টন করে নেয়া হবে অথবা এসবের ইন্‌সাফপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করা হবে, যাতে কৃষকের উপরও বোঝা না হয়ে যায় এবং সরকারও যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এভাবে যা তাদের উপর দেয়া সাব্যস্ত হবে, তা-ই তাদের থেকে আদায় করতে হবে। উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের (ফসল কিংবা মূল্যের মাঝে) যেটি রাজস্ব প্রদানকারীদের জন্য সহজতর হবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে।

– কিতাবুল খারাজ - ৮৬।

www.eelm.weebly.com

খায়বারের ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য রাসূল (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে পরিষ্কার ভাষায় ইয়াহূদীদের উদ্দেশে ঘোষণা দেন ঃ

لم يبعثنى النبى ص لأكل أموالكم وإنما بعثنى لأقسم بينكم وبينهم ثم قال إن شئتم عملت وعالجت وكلت لكم النصف وإن شئتم عملتم وعالجتم وكلتم النصف فقالوا بهذا قامت السموات والارض -

তোমাদের মালসম্পদ (উৎপন্ন ফসল) অবৈধভাবে হযম করার জন্য নবী (সা.) আমাকে প্রেরণ করেননি। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তোমাদের ও মুসলমানদের মাঝে উৎপন্ন ফসল বন্টন করে দেয়ার জন্য। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি স্বহস্তে একাজ করতে পারি এবং অনুমানের ভিত্তিতে ও মেপে আধাআধি বন্টন করে দিতে পারি। আর যদি তোমরা চাও যে, তোমরা নিজেরাই একাজ করবে, তাহলে তাও করতে পার। একথা শুনে ইয়াহূদী কৃষকরা বলতে শুরু করল যে, এ ধরনের ইনসাফ আছে বলেই আসমান-যমীন টিকে আছে। – কিতাবুল খারাজ - ৫০

হযরত উমর (রা.) ফেরাউনী যুগের ভূমি রাজস্বনীতি পরিবর্তন করে মিশরের জন্য যে ভূমি রাজস্বনীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে উক্ত বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত নীতিগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক. ভূমি রাজস্ব নগদ মুদ্রা কিংবা উৎপন্ন ফসল এ দুইয়ের যে কোন একটি দ্বারা পরিশোধ করা যাবে। তবে রাজস্ব আদায়কারীদের যেভাবে সুবিধা হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

খ. কয়েক বছরের ফসলের গড়ের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্য করার ফেরাউনী প্রথা কৃষকদের প্রতি মারাত্মক এক জুলুম। সুতরাং ভূমির উর্বরতা ও উৎপন্ন ফসলের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সম্মতিতে তা নির্ধারণ করতে হবে।

গ. ইজারা বা লাগানের জন্য কোন সময়সীমা (চারশালা বা পাঁচশালা) নির্ধারণ করে দেয়া রাষ্ট্র ও জনগণ কারো জন্যই কল্যাণকর নয়। বরং কৃষক ও ভূমি মালিকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে যতদিন সুবিধাজনক হয়, তারা তা নির্ধারণ করে নিবে।

ঘ. এই নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া কৃষকদের থেকে অন্যকিছু আদায় করা মারাত্মক ধরনের জুলুম বলে পরিগণিত হবে।

ঙ. রোমানরা সৈন্যদের রসদ ও কনষ্টান্টিনোপলের গীর্জার জন্য যে অতিরিক্ত কর আদায় করে থাকে তা স্থায়ীভাবে রহিত করে দিতে হবে।

www.eelm.weebly.com

এমনকি হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর যুগে হারামাইনের জন্য মিশর থেকে যে খাদ্য সম্ভার প্রেরণ করা হত তার মূল্যও রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পাই পাই হিসাব করে পরিশোধ করে দেয়া হত। – কিতাবুল খুতাত্ ঃ পৃ. ৭৫-৭৯।

৩. রাজস্ব যথাসম্ভব কম নির্ধারণ করা ঃ গরীব কৃষক যাতে শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ধুকে ধুকে না মরে, সেজন্য ইসলাম রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কম রাজস্ব নির্ধারণের পন্থা অবলম্বন করেছে।

হযরত উমর (রা.) একবার হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানকে দজলা অঞ্চলে এবং হযরত উসমান ইবনে হুনায়ফকে ফুরাতের অঞ্চলে খারাজ আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তারা খারাজ বাবদ আদায়কৃত মালামাল নিয়ে ফিরে আসলে হযরত উমর (রা.) এত মাল দেখে তাদের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন ঃ

كيف وضعتما على الأرض لعلكما كلفتما أهل عملكما مالا يطيقون

তোমরা কি হারে খারাজ নির্ধারণ করেছ? মনে হয় তোমরা কৃষকদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ?

উত্তরে তারা বললেন, আমরা ভূমির জন্য যথার্থ খারাজই নির্ধারণ করেছি, আর যা তাদের জন্য রেখে এসেছি তা অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) রাজস্ব যাতে কম ধার্য্য করা হয় এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ انظر ألا تكونا حملتما الأرض مالا تطيق

দেখ, খারাজ নির্ধারণের সময় খুব লক্ষ্য রাখবে, যাতে তোমরা ভূমির উপর খারাজের এমন বোঝা চাপিয়ে না দাও যা বহন করা তার জন্য সম্ভব নয়।

– কিতাবুল খারাজ - ১১৪

হযরত উমর বিভিন্ন দেশে খারাজ নির্ধারণের বিষয়ে সেখানকার লোকদের থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ডেকে এ মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন যে, খলিফার আমেলরা (রাজ কর্মকর্তা) খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের উপর জুলুম করেনি।

৪. রাজস্ব পরিশোধে যথাসম্ভব অবকাশ দেয়া ঃ রাজস্ব পরিশোধে অক্ষম হলে নাগরিকদের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও কৃষি উপকরণ ক্রোক করাকে ইসলাম নিষেধ করে দিয়েছে এবং তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন করাকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বরং ইসলামের রাজস্বনীতিতে একথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কৃষক যদি রাজস্ব পরিশোধে অক্ষম হয়; তাহলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খারাজে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

বাংলাদেশের ভূমি উশ্‌রী না খারাজী

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কোন দেশ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক দখল হওয়ার মুহূর্তে পরাজিত দেশের নাগরিকদের স্ব স্ব ভূমির মালিকানার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আদালতে উত্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকেই ভূমির বর্তমান মালিক ধরে নেয়া হবে। এটি ইসলামের একটি স্বীকৃত নীতি। বিজয়ী খলিফা যদি দখলকৃত দেশের ভূমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা না করেন বরং দেশের অধিবাসীদের থেকে খারাজ আদায়ের ফয়সালা করেন, তাহলে পূর্ব মালিকানার ভিত্তিতে যার দখলে যে সম্পত্তি আছে, তা তার মালিকানায়ই থাকবে, যদি তার মালিকানার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের মুহূর্তে বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক ছিল অমুসলিম। ইতোপূর্বে মুসলমানরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ দেশের যেসব ভূমির মালিকানা লাভ করেছিল, তা যে হিন্দুদের কাছ থেকে ক্রয় সূত্রে লাভ করেছিল কিংবা রাষ্ট্রীয় পতিত ভূমি দখল করে বসবাস করছিল তা বলাই বাহুল্য। সে সময় পর্যন্ত এ দেশের ভূমি ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত। রাষ্ট্র জমিদারী প্রথায় প্রজাসাধারণ থেকে খাজনা আদায় করত। কিছু কিছু ভূমি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে জায়গীর হিসেবে ভোগ করতে দেয়া হত। উক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর উক্ত জায়গীরের ভূমি রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করার বিধান থাকলেও তার উত্তরাধিকারীরা তা হস্তান্তর না করে নিজেদের ভোগ দখলে রেখে দিত। এভাবে কিছু ভূমি ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত থাকলেও আইনগতভাবে সেসব ভূমি রাষ্ট্রেরই ছিল।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাপতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটি মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম সেনাপতি। তদুপরি তিনি এসে ভূমি ব্যবস্থায় সামগ্রিক কোন রদবদল করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই। অতএব তৎকালে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এ দেশের ভূমি উশ্‌রী কিংবা খারাজি হওয়ার ফায়সালা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। তৎকালে ভূমি যেহেতু সরকারি মালিকানাভুক্ত ছিল, অতএব ধরে নিতে হবে যে, বিজয়ের পর তিনি তা পূর্বাবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখে তিনি খারাজের ভিত্তিতেই নাগরিকদেরকে তা চাষাবাদ করে খাওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। দেশের অধিকাংশ নাগরিক হিন্দু থাকার কারণে তাদের উপর ধার্যকৃত কর যে উশ্‌র ছিল না, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দু'চারজন উশ্‌রী ভূমির মালিক থাকলেও যেহেতু তার কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ সংরক্ষিত নেই, তাই অধিকাংশের জন্য কৃত ফয়সালাই সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করতে

www.eelm.weebly.com

হবে। অধিকাংশ নাগরিক হিন্দু, ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরকে তা খারাজের ভিত্তিতে চাষাবাদ করতে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের উত্তরাধিকারীরা মুসলমান হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ বিধান সর্বস্বীকৃত যে, কোন ভূমিতে খারাজ নির্ধারণের পর কোন অমুসলমান মুসলামন হয়ে গেলেও তার ভূমি খারাজি থেকে যায়। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, বাংলাদেশের ভূমি উশ্‌রী নয় বরং খারাজি।

উৎপাদনের উপকরণ–২
শ্রম

শ্রমের সংজ্ঞা ঃ উৎপাদনের দ্বিতীয় মৌলিক উপকরণ হলো শ্রম। সাধারণ অর্থে কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। তবে অর্থনীতির পরিভাষায় "মানুষের যে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে শ্রম বলে (তা মানসিক পরিশ্রমই হোক বা কায়িক পরিশ্রমই হোক)। অতএব যে শিল্পী তার মানসিক তৃপ্তি ও আনন্দের জন্য ছবি আঁকেন, তার একাজ অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রম বলে আখ্যায়িত হবে না। কিন্তু যে শিল্পী অর্থ উপার্জনের জন্য ছবি আঁকেন তার কর্ম শ্রম হিসেবে আখ্যায়িত হবে। অনুরূপভাবে মা স্নেহের বসে সন্তানকে যে লালন পালন করেন, তা শ্রম বলে গণ্য হবে না। কিন্তু মাতৃসদনে নার্সদের শিশুপালন শ্রম বলে গণ্য হবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শাল শ্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "মানসিক বা শারীরিক যে কোন ধরনের পরিশ্রম যদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকার লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তাকে শ্রম বলে"। শ্রমের কতগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

শ্রমের বৈশিষ্ট

১. শ্রম শ্রমিক থেকে উৎসারিত একটি জীবন্ত এবং অবিচ্ছেদ্য উপকরণ ঃ শ্রমিক যতদিন জীবিত থাকে ততদিন শ্রমও বিদ্যমান থাকে। উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ, যেমন ঃ ভূমি, মূলধনকে তার মালিক থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করা যায় কিন্তু শ্রমকে তার মালিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই শ্রম বিক্রির জন্য খোদ শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু শ্রমিক শ্রমই বিক্রি করে নিজেকে নয়।

২. শ্রম গতিশীল উপকরণ ঃ শ্রম যেহেতু শ্রমিকের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই এটি গতিশীল। কেননা শ্রমিক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় এবং এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে পারে।

৩. শ্রম সক্রিয় উপকরণ ঃ ভূমি মূলধন এগুলো উৎপাদনের উপকরণ হলেও নিজে সক্রিয় হতে পারে না। অন্যজন এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু শ্রম

www.eelm.weebly.com

নিজেই সক্রিয় উপকরণ হিসেবে অন্য উপকরণগুলোকে ক্রিয়াশীল করে তুলে।

৪. শ্রম ক্ষণস্থায়ী তাই শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কম ঃ ভূমি মূলধন ইত্যাদি উপকরণ সময়মত ব্যবহৃত না হলে তা সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু শ্রম সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রম বিক্রি করা না গেলে সে সময়ের শ্রম সঞ্চয় করে রাখা যায় না। বরং যে সময় অতিবাহিত হয়ে যায় সে সময়ের শ্রম চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণেই শ্রমিক তার নিয়োগকর্তার সাথে শ্রমের মূল্য ও মজুরীর হার নিয়ে খুব একটা দর কষাকষি করতে পারে না। তাই অনেক সময় যথাপ্রাপ্যের চেয়ে অনেক কম মজুরীতেও শ্রমিককে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। কেননা এই সময়টুকু বেকার বসে থাকলে; পরে এইটুকু সময়ের কোন মূল্যই সে পাবে না। শ্রমের মালিকের এই সীমাবদ্ধতাই পুঁজির মালিককে সস্তায় শ্রম ক্রয়ের পথ করে দেয়। আর শ্রমের এই ক্ষণস্থায়ীত্বই পুঁজি-মালিক কর্তৃক শ্রমিক শোষিত হওয়ার মূল রহস্য।

সম্ভবতঃ এই সীমাবদ্ধতার কারণেই একজন বনে যায় মালিক, আর অন্যজন বনে যায় তার সেবাদাস। তা না হলে উৎপাদনে শ্রমের ভূমিকা পুঁজির তুলনায় কোন অংশে কম নয় বরং বেশি। কেননা পুঁজি নিষ্ক্রিয় উপাদান আর শ্রম সক্রিয় উপাদান।

৫. মজুরীর হারের সাথে শ্রমের যোগানের সম্পর্ক ঃ দেশের কর্মক্ষম মানুষ যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করতে ইচ্ছুক তাকে শ্রমের যোগান বলে। আর প্রচলিত বাজারে সাধারণতঃ একজন শ্রমিকের একদিনের শ্রমের যে মূল্য হয় তাই মজুরীর হার। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় দাম বাড়লে তার যোগান বাড়ে; আর দাম কমলে যোগান কমে যায়। কিন্তু শ্রমের বেলায় এর বিপরীত হয়। কেননা মজুরীর হার বাড়লে শ্রমিকের আয় বাড়ে। ফলে তার উপার্জনের তাড়া কমে যায়। এ কারণে শ্রমিক অবকাশ যাপনের সুযোগ খুঁজে এবং শ্রমে বিরতি দেয়। পক্ষান্তরে শ্রমের দাম কমলে শ্রমিকের উপার্জনে ঘাটতি দেখা দেয় ফলে উপার্জনের তাড়নায় তখন সে বেশি শ্রম দেয়।

৬. শ্রমের যোগানের পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ ঃ কোন দেশের কর্মক্ষম ব্যক্তিরা বিভিন্ন মজুরীতে যে পরিমাণ শ্রম বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে সে দেশের শ্রমের যোগান বলে। একজন শ্রমিকের এক ঘন্টার কাজকে শ্রমের একক ধরা হয়। অতএব কোন দেশের অসুস্থ, অক্ষম, শিশু ও বৃদ্ধদের বাদে কর্মক্ষম ব্যক্তিরা যত ঘন্টা শ্রম বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে তাই হল সে দেশের শ্রমের যোগানের মোট পরিমাণ।

শ্রমের যোগান সাধারণতঃ মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যা, শ্রমিকের শিক্ষা ও

www.eelm.weebly.com

দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়গুলো যেহেতু ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, অতএব মজুরী বাড়ানোর সাথে সাথে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় না। আবার মজুরী কমানোর সাথে সাথে শ্রমের যোগানও কমে যায় না।

শ্রমের দক্ষতা

শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত হয়। সুতরাং যে দেশের শ্রমিকদের শ্রমের দক্ষতা বেশি হবে সে দেশে উৎপাদিত পণ্যের মান ও পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি পাবে। শ্রমের দক্ষতা নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে।

ক. শ্রমিকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা : শ্রমিকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর শ্রমের দক্ষতার বিষয়টি বহুলাংশে নির্ভরশীল। শ্রমিকের যোগ্যতার সাথে অনেকগুলো বিষয় সংশ্লিষ্ট। যথা :

১. শারীরিক যোগ্যতা।
২. মেধা ও বুদ্ধিমত্তা।
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণ।
৪. স্বাস্থ্যানুকূল খাদ্য ও আবহাওয়া।
৫. নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ।

এসকল বিষয় কাংখিত মাত্রা পর্যন্ত পাওয়া গেলে শ্রমিকের দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

খ. কাজ করার ইচ্ছা : উপরোক্ত গুণাবলীর সাথে শ্রমিকের মধ্যে কাজ করার ইচ্ছা ও মনযোগ থাকতে হবে। কাজের ইচ্ছা ও মনযোগ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১. ন্যায়সঙ্গত বেতন।
২. বেতন বৃদ্ধির সুযোগ।
৩. ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা।
৪. কাজের স্থায়িত্ব ও চাকুরীর নিশ্চয়তা।
৫. ছুটি ও অবসর যাপণের সুবিধাদি।
৬. অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

এসব বিষয় শ্রমিকের কাজের ইচ্ছা, আগ্রহ ও মনোযোগকে বৃদ্ধি করে। ফলে দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

গ. কারখানার পরিবেশ : শ্রমিক যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তার চারপাশ ও ভিতরের অবস্থা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে, খোলামেলা আবহাওয়া ও প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকলে কাজ করতে সে মানসিক প্রফুল্লতা বোধ করে, ফলে তার

www.eelm.weebly.com

দেহমন সুস্থ থাকে। যার ফলে তার কাজে অবসাদ আসে না তাই সে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার কারণে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ. সংগঠনের সুনাম ও নৈপুণ্য : কারখানার পরিচালনা ব্যবস্থা দক্ষ, উচ্চমানসম্পন্ন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হলে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সুখ্যাতি থাকলে সে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে শ্রমিক আনন্দ পায়। ফলে তার কাজের আগ্রহ বাড়ে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ. আধুনিক যন্ত্রপাতি : যে কারখানার যন্ত্রপাতি আধুনিক এবং যে কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল ব্যবহার করা হয়, সে কারখানার শ্রমিকরা কাজে নতুনত্ব পায় এবং কাজে উৎসাহ বোধ করে। উন্নত প্রযুক্তি ও নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা তাদের কর্মস্পৃহা ও দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয়।

চ. নিরাপত্তা : কারখানার জীবনে শ্রমিকের নিরাপত্তা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা মালিক পক্ষ কিংবা বহিরাগতদের উপদ্রব ও ত্রাস শ্রমিককে কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে মালিক পক্ষের হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার শ্রমিককে কাজে উৎসাহিত করে।

কারখানায় কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক যদি অসুস্থ অথবা পঙ্গু হয়ে কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে কিংবা যদি সে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার ও তার পরিবারের জীবন নির্বাহের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা থাকা বাঞ্ছনীয়। এহেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে শ্রমিক সোৎসাহে নির্ভাবনায় কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ফলে তার দক্ষতা বাড়ে।

তাছাড়া শ্রমিকের উপর নির্যাতন হলে তার প্রতিকারের আইনগত সুব্যবস্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মালিক পক্ষের সদাচার, কারখানার উন্নতি, শ্রমিক মালিকের সুসম্পর্ক শ্রমিককে কাজে উৎসাহী করে তোলে। ফলে তার দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

শ্রম বিভাজন

শ্রম বিভাজন বলতে কি বুঝায় : কোন দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাগে ভাগ করে যোগ্যতার নিরিখে এক এক জনের উপর কিংবা এক এক দলের উপর এক এক ভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত করাকে শ্রম বিভাজন বলে।

যেমন একটি আধুনিক জুতা তৈরির কারখানায় একদল লোককে চামড়া শোধনের কাজে, একদলকে চামাড়া কাটার দায়িত্বে, একদলকে সেলাইয়ের কাজে, এক দলকে সোল তৈরিতে, একদলকে পেরেক লাগানোয় এবং অন্য আরেক দলকে পালিশের কাজে নিয়োগ করা হয়। আধুনিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মেধা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম বিভিন্ন শ্রমিকের মাঝে এভাবে

www.eelm.weebly.com

ভাগ করে দেয়াকে শ্রম বিভাজন (Division of Labour) বলে। শ্রম বিভাজন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এক এক দল লোক উৎপাদিত পণ্যের একেকটি অংশ উৎপাদন করে মাত্র। ফলে উৎপাদিত পণ্যের একেকটি নির্দিষ্ট অংশের উপর একেক শ্রেণীর শ্রমিকের দক্ষতা বা পারদর্শিতা অর্জিত হয়। সকলের সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ দ্রব্যটি উৎপদিত হয়। এ পন্থায় স্বল্প সময়ে বহু একক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

শ্রম বিভাগের সুবিধাসমূহ

শ্রম বিভাগের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। যেমন ঃ শ্রম বিভাগের প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে আসে। ভোক্তারা স্বল্পমুল্যে দ্রব্য ভোগ করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় একই ব্যক্তি একই কাজ বারবার করার ফলে সংশ্লিষ্ট কাজে তার কর্মনৈপূণ্য ও দক্ষ্যতা বৃদ্ধি পায়। এক ব্যক্তি বারংবার একই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কাজ করার ফলে তার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের উপর যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা বাড়ে, যন্ত্রের সদ্ব্যবহার হয় এবং যান্ত্রিক গোলযোগ ও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। একই কাজ বার বার করতে যেয়ে কি ধরনের যন্ত্র হলে আরো সহজে, কম সময়ে, কম শ্রম ব্যয় করে কাজটি করা সম্ভব হত এর পরিকল্পনা মাথায় আসে। ফলে তার এই পরিকল্পনা ও চিন্তা নতুন যন্ত্র আবিস্কারের পথ নির্দেশ করে। শ্রম বিভাগের ফলেই কারখানায় বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ে, ফলে শ্রমিকও বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত হয়। শ্রম বিভাজনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি একটিমাত্র নির্দিষ্ট কাজ আঞ্জাম দেয়; যে কারণে বিভিন্ন স্থানে তাকে ছুটাছুটি করতে হয় না, ফলে সময়ের সাশ্রয় হয়। শ্রম বিভাজনের ফলে কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়, ফলে নতুন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

শ্রম বিভাগের অসুবিধাসমূহ

শ্রম বিভাগের সুবিধাসমূহের পাশাপাশি এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন ঃ একই কাজ বারবার করার কারণে কাজে একঘেয়েমি আসার ফলে কর্মস্পৃহা কমে যেতে পারে। প্রত্যেকেই দ্রব্যের একটিমাত্র নির্দিষ্ট অংশের কাজ করে বলে সকলেই পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। একই কাজ বারংবার করতে করতে সে কাজের দক্ষতা বাড়ে ঠিকই; কিন্তু অন্য কাজের জন্য সে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কোন কারণে সেই কাজটি হারালে; অন্য কাজের জন্য সে নিযুক্ত হতে পারে না। যে কারণে হঠাৎ করেই সে বেকার হয়ে যায়। তাছাড়া একই কাজ অনবরত করতে থাকার কারণে শ্রমিকের মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি ঐটুকু কর্মের পরিসরে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবনী শক্তি বিপন্ন হয়ে যায়।

www.eelm.weebly.com

শ্রমের ভিত্তিতে শ্রমিকের প্রকারভেদ

শ্রমের ভিত্তিতে শ্রমিককে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. ব্যক্তি বিশেষের শ্রমিক (اجير خاص)।

২. সমষ্টির কাজে নিরত শ্রমিক (اجير عام)।

৩. মালিকানাভুক্ত দাস (غلام)।

১. ব্যক্তি বিশেষের শ্রমিক বলতে এমন ধরনের শ্রমিককে বুঝানো হয়; যারা নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে ব্যক্তি বিশেষের অধীনে কাজ করে। যেমন ঃ দিনমজুর, ব্যক্তিবিশেষের কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক, গৃহভৃত্য, ব্যক্তিবিশেষের অফিসে নিয়োজিত কর্মচারী।

২. সমষ্টির কাজে নিরত শ্রমিক বলতে এমন ধরনের শ্রমিককে বুঝানো হয়; যারা স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত। কারো অধীনে কাজ করে না। তবে নির্দিষ্ট শ্রমের বিনিময়ে চুক্তি মোতাবেক মজুরী আদায় করে থাকে। যেমন ঃ তাঁতী, দর্জি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ঘড়ির মেকার, ধোপা, মুচি ইত্যাদি।

৩. মালিকানাভুক্ত দাস বলতে এমন শ্রমিককে বুঝানো হয়, যাদের পূর্ণ স্বত্ত্বা মালিকের মালিকানাধীন থাকে। তার ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। মালিক তাকে যথেচ্ছা খাটাতে পারে এবং ইচ্ছা করলে বিক্রিও করে দিতে পারে।

প্রথম প্রকার শ্রমিক ও দাস শ্রেণীর শ্রমিকের মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক মালিকের কাছে শুধু তার শ্রমকেই বিক্রি করে, নিজের সত্ত্বাকে নয়। তাই প্রথম শ্রেণীর শ্রমিককে মালিক চুক্তির আওতাভুক্ত কাজে খাটাতে পারে এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খাটাতে পারে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ মালিক তাকে যত্রতত্র যথেচ্ছা খাটাতে পারে না। কিন্তু দাস শ্রেণীর শ্রমিককে মালিক যে কোন কাজে যখন তখন খাটাতে পারে এবং প্রয়োজনে তাকে অন্যের নিকট বিক্রিও করে দিতে পারে।

শ্রমিকের মর্যাদা

শ্রমিক যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, মানুষ হিসেবে তার মর্যাদার প্রশ্ন রয়েছে। উপরন্তু তার শ্রমের মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, উৎপাদনে পুঁজির গুরুত্বের চেয়ে শ্রমের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়, বরং বেশি। তা সত্ত্বেও যুগে যুগে দেশে দেশে শ্রমিক তার যথাযোগ্য সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি আজকের বিজ্ঞানোজ্জল শিক্ষিত সমাজও শ্রমকে নিতান্ত অপমানজনক কাজ বলে বিবেচনা করে। পুঁজির মালিককে মনে করা হয় অভিজাত শ্রেণীর মানুষ; আর শ্রমের মালিককে মনে করা হয় হীন নিম্ন শ্রেণীর মানুষ।

www.eelm.weebly.com

ইসলাম এই কৃত্রিম আভিজাত্যবোধ ও সামাজিক বৈষম্যের বেদীমূলে বলিষ্ঠ হাতে কুঠারাঘাত করেছে। মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে এবং শ্রমজীবি মজদুর ও মেহ্‌নতী মানুষের মর্যাদাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রম ও মূলধনের ভারসাম্য সৃষ্টি করে স্বগর্বে ঘোষণা করেছে ঃ

هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل اخاه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبس مما يلبس ولا يكلفه من العمل مايغلبه فان كلفه مايغلبه فليعنه
(بخارى ، كتاب الايمان)

তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্‌ তাদেরকে তোমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন। অতএব যার কোন ভাইকে তার অধীন করে দেয়া হয়েছে, সে যেন তাকে তাই আহার করতে দেয়, যা সে নিজে আহার করে এবং তাকে যেন এমন পরিধেয় পরিধান করতে দেয়, যা সে নিজে পরিধান করে। আর তাকে যেন এমন কাজ করতে বাধ্য না করে যা করলে সে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। আর যদি এহেন কাজ করতে তাকে বাধ্য করে, তাহলে যেন সে তাকে সহযোগিতা করে। – বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

এই হাদীসের ঘোষণার মধ্যদিয়ে শ্রমিকের মর্যাদাকে মালিকের সমপর্যায়ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ভাই বলে সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, উৎপাদনে পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিক দুই ভাইতুল্য। দু'ভাইয়ের মাঝে আভিজত্যের যেমন কোন পার্থক্য থাকে না; তেমনি পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিকের মাঝে কৃত্রিম আভিজাত্যের কোন অন্তরায় থাকতে পারবে না।

একই সঙ্গে এও ইশারা করা হয়েছে যে, থাকা খাওয়ার সুযোগ সুবিধা উভয়ের সমপর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই মজুরী সেভাবেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

উক্ত হাদীসে শ্রমিকের উপর কি পরিমাণ কাজের ভার অর্পণ করা যাবে, তারও একটা সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ যা তার সাধ্যাতীত নয় এমন কাজই তার দ্বারা করাতে হবে।

কষ্টকর কাজ হলে মালিককে শ্রমিকের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। তা যেভাবে সম্ভব, মজুরী বৃদ্ধি করে, শ্রমিক বৃদ্ধি করে, সময় বৃদ্ধি করে কিংবা নিজে কায়িক শ্রমে অংশ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে আমরা মূলধন ও পুঁজির ভারসাম্য সৃষ্টি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

শ্রমিকের অধিকার

যথার্থ মজুরী লাভের অধিকার ঃ সামাজিক মর্যাদা লাভের সাথে সাথে

www.eelm.weebly.com

পুঁজিদাতার সমমানের খাবার, বাসস্থান, ও পোষাকাশাকের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরী পাওয়ার অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীসে এর ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। অন্তত মানুষ হিসেবে জীবন ধারনের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণ মজুরী পাওয়ার আইনগত অধিকার শ্রমিকের রয়েছে।

কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, সভ্যতার ধ্বজাধারী যেসব চিন্তাবিদ দাসত্বকে অভিশাপ বলে আখ্যায়িত করে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়ান; তারাও শ্রমিকের জীবনের এই অর্থনৈতিক দাসত্বের গিট খুলতে সম্মত নয়। বরং নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য তারা এটাকে উত্তম উপায় বলে মনে করেন। এজন্যই তাঁরা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুঁজিপতিদের এহেন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে তারা আইনের পোষাক পরিয়ে আরো মজবুত করে থাকেন। এগুলোকে মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এর বৈধতার পক্ষে ধর্মের সমর্থনের ভ্রান্ত যুক্তিসমূহকে যোগ করা হয়ে থাকে। অধিক হারে শ্রম আদায় ও সে তুলনায় কম পারিশ্রমিক পরিশোধ এবং সাধারণ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে শ্রমিকরা যে কিরূপ দুর্বিসহ মানবেতর জীবন যাপন এবং তাদের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের ফসল হাতিয়ে নিয়ে পুঁজিপতিরা কিরূপ বিলাসী আয়েসী জীবন যাপন করে, তা শিল্প নগরীসমূহের শ্রমিক নিবাস ও পুঁজিপতিদের প্রাসাদোপম বাংলোর অবস্থা দেখলে অতি সহজেই বোধগম্য হয়ে উঠে। মিল মালিকের পুষ্পপল্লবিত কুটির ও স্বর্গের মত বাংলোগুলো অবলোকন করার পর, শ্রমিক কলোনীগুলোতে তারা কিরূপ নোংরা পরিবেশে ভেড়ার পালের ন্যায় গাদাগাদি হয়ে বসবাস করে তার প্রতি একবার নজর বুলালেই জীবনমানের এই ব্যবধান স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে রাখা পানির মতো সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। আর শ্রমিকদেরকে শোষণ করেই যে তারা এহেন বিলাসী জীবন যাপন করে একথা বলাই বাহুল্য।

শ্রমিকদেরকে সাধারণতঃ দু'ভাবে শোষণ করা হয়ে থাকে ঃ

১. শ্রমের যথার্থ মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পরিশোধ করে।

২. স্বল্প মজুরী প্রদান করে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ আদায় করার মাধ্যমে।

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম হিসেবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার এই ব্যবধান ঘোচাবার সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

মূলতঃ শ্রমিকদের শোষিত হওয়ার পেছনে মূল কারণ হল শ্রমের ক্ষণস্থায়িত্ব আর শ্রমিকের দারিদ্র ও জঠরজ্বালা। জঠরজ্বালা সইতে না পেরেই শ্রমিক যথার্থ মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে তার শ্রম বিক্রি করতে সম্মত হয়ে যায়। এটাই পুঁজিপতিদেরকে সস্তায় শ্রম ক্রয়ের সুযোগ করে দেয়। এত সস্তায় শ্রম ক্রয়ের বৈধতার পক্ষে পুঁজিপতিদের যুক্তি একটিই যে, আমরা তো তাদেরকে শ্রম দিতে

www.eelm.weebly.com

বাধ্য করছি না। বরং তারা স্বেচ্ছায় কাজ করার জন্য এগিয়ে আসছে। আমরা এই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে কাজে নিয়োগ না করলে তো সে না খেয়ে মারা যায়। তাই আমরা যাই কিছু পারিশ্রমিক দিচ্ছি; তা দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহই করছি। আর শ্রমিকও জানে যে, যদি সে এই স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ না করে, তাহলে সমাজে তার চেয়ে অভাবী যারা রয়েছে, তারা এই মূল্যে শ্রম দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। ফলে তাকে না খেয়ে উপোষ করতে হবে। জঠর জ্বালার এই নিদারুণ অবস্থাই শ্রমিককে যথার্থ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করে। এটাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি মনে হলেও গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এতে তার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকে না। এক অসহায় করুণ পরিস্থিতি তাকে একাজ করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইসলাম এহেন নিরুপায় অবস্থার সম্মতিকে সম্মতি বলে মনে করে না।

এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় উল্লেখ করেছেন যে, "উভয় পক্ষের সহযোগিতা ও কায়িক শ্রম ছাড়া যদি অন্য কোন আর্থিক মুনাফা (বা ভিন্ন কোন সুযোগ সুবিধা) অর্জন করা হয়, যেমন - জুয়া কিংবা জবরদস্তি সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা অথবা সুদী লেন-দেনের চুক্তি, যাতে গরীব বেচারা তার দীনতার কারণে এমনসব দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে উঠিয়ে নিতে সম্মত হয়ে যায়, যা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধরনের সম্মতিকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিভিত্তিক লেনদেন বলে মনে করা যাবে না। এ ধরনের পন্থায় উপার্জনকে উপার্জনের পবিত্র মাধ্যমও বলা যাবে না। একটি সুশীল ও আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার দৃষ্টিতে এসব কারবার নিঃসন্দেহে বাতিল ও অপবিত্র বলে গণ্য হবে"।

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে তার কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে শ্রম যদি তার সম্মতিক্রমেও ক্রয় করা হয়; তবুও সেটা বৈধ হবে না। বরং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও মানুষের জীবনমানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য পারিশ্রমিক তাকে পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলাম কোন অংক নির্ধারিত করে দেয়নি বটে, তবে ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক অবশ্যই তাকে দেয়া কর্তব্য। এসম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ "শ্রমিক যখন তার কাজ সমাপ্ত করবে তখন তার পারিশ্রমিক পূর্ণমাত্রায় আদায় করে দিতে হবে।"

– মুসনাদে আহমদ

এ ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর অনুসৃত নীতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে হযরত আনাস বলেছেন যে, তিনি পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কারো প্রতি জুলুম করতেন না।

– বুখারী

www.eelm.weebly.com

ন্যায়সঙ্গত আহার বাসস্থান ও পোষাকাশাকের অধিকার যে শ্রমিকের রয়েছে তা রাসূল (সা.) স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন। মুসলিম ও মুয়াত্তায়ে মালিক বর্ণিত এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন ঃ وللملوك طعامه وكسوته بالمعروف – মালিককে তাদের ন্যায়সঙ্গত খাবার ও পোষাকের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে তাকে স্বল্প পারিশ্রমিকে অধিক সময় খাটানো অর্থাৎ তাকে ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করা যে ইসলাম কিছুতেই অনুমোদন করে না তা একেবারেই পরিষ্কার। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন যে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন প্রকার লোকের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব, আর আমি যার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব তাকে পরাস্ত করেই ছাড়ব। ঐ তিনজনের একজন হল ঐ ব্যক্তি, যে শ্রমিক থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক প্রদান করে না।"

– বায়হাকী ৬ষ্ঠ খন্ড

শ্রমিকদেরকে ঐ পরিমাণ কাজ দিতে হবে যা তারা সহজে ভালভাবে সম্পাদন করতে পারে অর্থাৎ তাদের শক্তি সামর্থ অনুপাতে কাজ দিতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন অধিক কাজ তাদের দ্বারা করানো উচিত নয়। মালিককে অবশ্যই এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

– মুহাল্লা ইবনে হজম কৃত; আহকামুল ইজারাত – ৮ম খন্ড

এক্ষেত্রে একজন উত্তম মালিক শ্রমিকের প্রতি কি ধরনের মনোভাব পোষণ করবে তা সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে হযরত শো'আয়ব (আ.)-এর ভাষ্যে। হযরত মুসা (আ.)কে শ্রমিক নিযুক্ত করে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ

وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصلحين –

আমি তোমার উপর কোন দুঃসাধ্য ভার চাপিয়ে দিতে চাইনা। ইন্‌শাআল্লাহ তুমি আমাকে সজ্জন ও সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। – সূরা ঃ ২৮-কাসাস ঃ ২৭

এক হাদীসে রাসূল (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ

لايكلف من العمل الامايطيق –

তার সামর্থের বাইরে কোন কাজ করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

– মুয়াত্তা-মালিক

শ্রমের যথার্থ মজুরি নির্ধারিত করা হলেও আদায়ের ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে তা পরিশোধ না করা এটাও শ্রমিক শোষণের একটি প্রক্রিয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটির জন্য জরিমানা হিসেবে বেতনের টাকা কর্তন করে রাখা, ওভার টাইম করিয়ে শ্রমিককে যথাপ্রাপ্য মজুরির চেয়ে কম পরিরশাধ করা, আবার ওভার টাইম না করা হলে চাকরি খেয়ে ফেলার হুমকি দেয়া, প্রভিডেন্ট ফান্ডের

www.eelm.weebly.com

নামে নির্ধারিত বেতনের একাংশ বাধ্যতামূলক কর্তন করে রাখা এবং সেই টাকা পুঁজি হিসেবে খাটিয়ে শতরা ৫০ টাকা লাভ হলে শ্রমিককে ১০% টাকা লভ্যাংশ ইন্টারেস্টের নামে প্রদান করা এবং বাকি ৪০ টাকা নিজে হাতিয়ে নেয়া। এগুলো মূলতঃ শোষণের চিত্তাকর্ষক প্রক্রিয়া। তবে যদি শ্রমিক ইচ্ছা করে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা রাখে, আর সেই টাকাকে যদি মালিক লাভ লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পূর্বঘোষিত শতকরা হারে লভ্যাংশ বন্টনের শর্তে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, তাহলে এই লভ্যাংশ শ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু যদি জমাকৃত টাকার উপর (লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব ছাড়া) শতকরা হারে ইন্টারেস্ট দেয়া হয় তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা শ্রমিকের জন্য বৈধ হবে না। কেননা এটা তখন সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান শ্রমিক থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বাধ্যতামূলকভাবে কেটে রাখে, সে প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার উপর যে বেনিফিট প্রদান করা হয় তা গ্রহণ করা শ্রমিকের জন্য বৈধ হবে বটে; তবে যদি জানা থাকে যে, এই বেনিফিটের টাকা সুদের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে, লভ্যাংশ হিসেবে নয় তাহলে তা গ্রহণ না করা উত্তম।

সারকথা এই যে, শ্রমিকের যথাপ্রাপ্য পারিশ্রমিক আদায় করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের টালবাহান ইসলাম অনুমোদন করে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন ঃ مطل الغنى ظلم বিত্তবানদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্যের পাওনা পরিশোধে টালবাহান করা জুলুম বা অন্যায়। – বুখারী ও মুসলিম

অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও। – বায়হাকী ৬ ষ্ঠ খন্ড

শ্রমিকের দারিদ্রের সুযোগে অনেক সময় পারিশ্রমিক নির্ধারিত না করেই তাকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়; কিন্তু কাজের পর তাকে কম পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। এটাও শ্রমিক শোষণের একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি। ইসলাম এ পদ্ধতিকেও অনুমোদন করে না বরং এহেন পন্থায় শ্রমিককে খাটানো ইসলাম নাজায়েয, আমানাতের খিয়ানত ও আত্মসাৎ বলে অভিহিত করেছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ না করে তাকে কর্মে নিয়োগ করতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। – বায়হাকী-কিতাবুল ইজারা

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ ইসলাম শুধুমাত্র মালিককেই শ্রমিকের সাথে সদাচার করতে বলেনি বরং শ্রমিককেও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মালিক তার পুঁজি ও মেধা ব্যয় করে, লাভ লোকসানের ঝুঁকি

www.eelm.weebly.com

নিয়ে কর্মের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলেই শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। মালিক উদ্যোগ গ্রহণ না করলে শ্রমিকের শ্রম বিক্রি করা সম্ভব হত না। অতএব মালিকের এই অবদানের কথা স্মরণ রেখেই তাকে নিষ্ঠার সাথে কাজে আত্মনিয়াগ করতে হবে এবং মালিকের সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে তাকে যত্নবান হতে হবে। কেননা মালিক যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে শ্রমিকের পারিশ্রমিক সে পরিশোধ করবে কি করে? সুতরাং শ্রমিকের নিজের স্বার্থেই মালিকের কল্যাণ কামনা করা ও তার সম্পদের ব্যাপারে আমানতদারী রক্ষা করা এবং নিষ্ঠার সাথে শ্রম দেয়া কর্তব্য।

এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يحسن –

যখন কোন শ্রমিক কোন কাজ করে তখন যেন সে তা উত্তমভাবে নিষ্ঠার সাথে করে এটা শ্রমিক থেকে আল্লাহর কাম্য। – বায়হাকী

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ – خير الكسب كسب يد العامل اذا نصح

সর্বোত্তম উপার্জন হল শ্রমিকের উপার্জন, যদি সে মালিকের কল্যাণকামী হয়। আল্‌-কুআনে উত্তম শ্রমিকের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان خير من استاجرت القوى الامين –

যে শ্রমিককে তুমি কাজে নিয়োগ করবে তাদের মাঝে উত্তম হল সে, যে শক্তিশালী (অর্থাৎ মালিকের জন্য যে নিষ্ঠার সাথে শক্তিসামর্থ ব্যয় করতে পারে) এবং বিশ্বস্ত।

সুতরাং, শ্রমিকের কর্তব্য হবে মালিকের কল্যাণ কামনার মানসিকতা নিয়ে নিষ্ঠার সাথে শ্রম দিয়ে যাওয়া। মালিকের সম্পদ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যাপারে আমানতদারী রক্ষা করা। আর যদি তা না করা হয় তাহলে এটা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা ও খিয়ানত। আর খিয়ানতকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।

শ্রমিক যদি মালিককে ধোকা দেয়, কাজে ফাকী দেয় বা তার সম্পদ তস্রূপ বা বিনষ্ট করে, তাহলে তাকে কাল কিয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্‌-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ ولتسئلن عما كنتم تعلمون –

অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। – সূরা ঃ ১৬-নহল ঃ ৯৩

হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

كلكم راع كلكم مسئول عن رعيته ....والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته –

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শ্রমিক, কর্মচারী, খাদেম তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল। সুতরাং তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। – বুখারী

www.eelm.weebly.com

অতএব মালিকের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য যান্ত্রপাতি বা উৎপাদিত পণ্য বিনষ্ট করা বা ভাংচুর করা কিছুতেই বৈধ হবে না। যদি নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য শ্রমিকরা এরূপ করেছে তাহলে তাদের থেকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। আর যদি তদন্তে এ ধরনের কোন অপরাধ প্রমাণিত না হয়ে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, কাজ করতে গিয়ে কোন যন্ত্র, মেশিনারী কিংবা উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়েছে তাহলে সেজন্য অবশ্যই শ্রমিক থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না। তবে হানাফী মাজহাবের ইমামগণের অভিমত এই যে, যদি সমষ্টির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের হাতে মালিকের জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন কেউ দর্জিকে কাপড় দিল সেলাই করার জন্য, দর্জির হাতে কাপড় খোয়া গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দর্জিকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

– ইসলাম কা ইকতেমাদী নেযাম

ইসলাম শ্রমিককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। আবার মালিককে তার কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছে। এভাবে শ্রমিক ও মালিকের মাঝে এক হৃদ্যতাপূর্ণ আন্তরিকতার পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিক পরস্পরে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মালিক শ্রমিককে তার প্রতিপক্ষ মনে করে। অতএব যত কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে খাটানো যায় মালিক সবসময় সেই চেষ্টাই করে। আবার শ্রমিকও মালিককে তার প্রতিপক্ষ মনে করে। অতএব মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তারা ট্রেড ইউনিয়ন করে, হরতাল ধর্মঘট ডেকে মালিকের কাছ থেকে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে নেয়ার জন্য আন্দোলনমুখী হয়ে উঠে। ফলে শুরু হয় শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ। এর পরিণতি যা হবার তাই হয়। এ কারণেই ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে ন্যূনতম মজুরীর হার নির্ধারণ করে দিতে হয়েছে।

শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ ও তার প্রতিকার ঃ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ইসলাম যে পরামর্শ দিয়েছে তার সারকথা এই যে, মালিককে মনে করতে হবে শ্রমিক আমার ভাই। অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণে সে আমার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। শ্রমিকের শ্রম না হলে আমার সকল উৎপাদন কর্মই স্থবির হয়ে পড়ত। অতএব তার সুখে দুঃখে আমাকে তার পাশে থাকতে হবে। তার কল্যাণের চেষ্টা আমাকে অবশ্যই করতে হবে। আবার শ্রমিককে মনে করতে হবে যে, মালিক আমার উপকারী বন্ধু। তার উদ্যোগ না হলে আমার কর্মসংস্থান হত না। অতএব তার ক্ষতি করা আমার জন্য উচিৎ হবে না। মালিকের সদাচার, সহানুভূতি, কল্যাণকামিতার মানসিকতা, আর শ্রমিকের শ্রমদানের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও মালিকের প্রতি কল্যাণকামিতার মানসিকতা শ্রমিক ও মালিকের মাঝে

www.eelm.weebly.com

ভ্রাতৃত্বের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের পরিবর্তে শ্রমিক-মালিক পরস্পরের মাঝে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

মালিককে তার চাল-চলন, আচার-আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। ব্যবসায় ও কারবারে যৌথ উদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি করতঃ শ্রমিককে মুনাফায় অংশীদারীত্ব প্রদান করে তাকে তার অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে এই আন্তরিকতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ করা যায়। ইসলামে এরও সুযোগ রয়েছে।

শ্রমিক-মালিক যৌথ কারবার সংঘর্ষ এড়াবার অন্যতম উপায় ঃ বাস্তবিকপক্ষে যদি শ্রমিককে কারবারে অংশিদার করে নেয়া হয় তাহলে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ থাকবে না বললেই চলে। শ্রমিক যদি কারবারে অংশীদার থাকে, তাহলে একদিকে যেমন শ্রমিকের ভাগ্য উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে সুতরাং সে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে উৎসাহিত হবে। অপরপক্ষে মালিকও উৎপাদন কর্মে শ্রমিকদের নিষ্ঠার সাথে শ্রমদানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। কেননা শ্রমিক যখন উৎপাদনে ও মুনাফায় নিজেকে অংশীদার মনে করবে তখন শ্রমদানের ক্ষেত্রে তার স্বতঃস্ফূর্ততা বৃদ্ধি পাবে। সে তখন শ্রমদানে মোটেই গাফলতি করবে না। কেননা তখন শ্রমে গাফ্‌লতির অর্থ হবে তার নিজের উপার্জনে ঘাটতি দেখা দেয়া। সুতরাং সে নিজের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে শ্রমদান করবে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় যে শ্রমিক, শ্রমিক হিসেবে বহাল থেকে মূল কারবারের অংশীদার হবে কি করে?

আমরা মনে করি যে, মুদারাবার পন্থায় শ্রমিক ও মালিকের মাঝে যৌথ কারবার গড়ে উঠতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এর কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. একদল শ্রমিক ও মালিকের মাঝে এ মর্মে চুক্তি হতে পারে যে, মালিক মূলধন সরবরাহ করবে, আর শ্রমিকরা উৎপাদনের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিবে। এতে যা মুনাফা হবে তার শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের মাঝে হারাহারিভাবে বন্টিত হবে। এটি তখন মুদারাবার সমার্থক হবে। অতএব বৈধ হবে।

কিন্তু এত দীর্ঘসময় বিনা মজুরীতে লভ্যাংশের আশায় শ্রম দিয়ে যাওয়ার মত শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর হবে। কেননা শ্রমিকরা সাধারণত নিত্যঅভাবী হয়ে থাকে। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য একটি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। পন্থাটি এই যে, উক্ত কোম্পানীর বাৎসরিক সম্ভাব্য লাভ যা ধরা হবে তাতে চুক্তি মোতাবেক শ্রমিকদের কত পাওনা হয় তা বের করতে হবে। এই টাকা শ্রমিকদের

www.eelm.weebly.com

মাঝে বন্টন করলে মাথাপিছু মাসিক কত টাকা করে পড়বে তার একটা গড় হিসাব বের করতে হবে। এই সম্ভাব্য মাসিক লভ্যাংশের চেয়ে কিছু কম হারে শ্রমিকদেরকে মালিকপক্ষ প্রতি মাসে পরিশোধ করে যাবেন এই শর্তে যে, বৎসরান্তে যে মুনাফা দাঁড়াবে তাতে যদি শ্রমিকদের আরো পাওনা থাকে তাহলে তা পরিশোধ করা হবে। আর যদি দৈবক্রমে মুনাফা কম হয় এবং শ্রমিকদের কাছে মালিকের পাওনা হয়, তাহলে শ্রমিকরা তা এককালীন অথবা পরবর্তী বছরের এক দুই বা তিন মাসে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবে। যা তাদেরকে মাসিক প্রদেয় টাকা থেকে কর্তন করে রাখা হবে।

২. মালিকপক্ষ কোম্পানীর মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারে বিভাজন করে শ্রমিকদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে শেয়ারার হিসেবে তাদেরকে মুনাফায় অংশীদারিত্ব প্রাদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমস্যা এই দাড়ায় যে, শেয়ার ক্রয়ের জন্য টাকা যোগাড় করা শ্রমিকের জন্য সম্ভব হবে কিভাবে? তার তো নিত্য অভাব।

এর বেশ কয়েকটি বিকল্প সমাধান হতে পারে ঃ

ক. মালিক শ্রমিকদের জন্য বর্ধিত বেতন কিংবা বোনাস ঘোষণা করে শ্রমিকদের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হবেন যে, এই বর্ধিত বেতন বা বোনাসের টাকা শেয়ারের মূল্য বাবদ কেটে রাখা হবে। কিংবা প্রতিমাসে তার মূল বেতন থেকে ২০০/- টাকা বা ৩০০/- টাকা করে কেটে রাখা হবে। যখন শেয়ারের মূল্যের সমপরিমাণ হবে তখন তাকে শেয়ার হস্তান্তর করা হবে।

খ. মালিকের যাকাতের টাকা দ্বারা প্রতিবছর যতজন শ্রমিককে শেয়ার দেয়া সম্ভব, ততজনকে শেয়ার প্রদান করবে। এভাবে প্রতি বছর কিছু কিছু শ্রমিককে শেয়ার দেয়া যেতে পারে।

গ. অথবা যাকাত দাতারা তাদের যাকাতের টাকা দিয়েও শ্রমিককে শেয়ার ক্রয় করে দিতে পারেন। মোটকথা শ্রমিক যাতে সারাজনম শ্রমিকই না থেকে যায় সেজন্য মালিককে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে হবে। আপন কাজে অংশিদার এক ভাইয়ের জন্য এতটুকু সহানুভূতি অবশ্যই প্রদর্শন করা কর্তব্য। কেননা শ্রমিকের শ্রমের হাত সক্রিয় না হলে মালিকের ভাগ্যে তো কিছুই জুটবে না।

www.eelm.weebly.com

উৎপাদনের উপকরণ-৩

মূলধন

মূলধনের সংজ্ঞাঃ মূলধনকে ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় رأس المال বলা হয়। সাধারণ অর্থে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত টাকা পয়সাকে মূলধন বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন শব্দটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনীতির পরিভাষায় মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে পুণঃ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বম-বাওয়ার্ক-এর ভাষায় মূলধন হল উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। এই অর্থে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের সাথে মানুষের শ্রম যুক্ত হয়ে যে পণ্য উৎপাদিত হয়: তা যদি সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহার না করে পুনরায় উৎপাদণের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা মূলধন বলে গণ্য হবে। যেমন- প্রকৃতি প্রদত্ত কাঠ ও লোহা দ্বারা মানুষের শ্রম সংযোগে যদি একটি লাঙ্গল তৈরী করা হয়- যাকে কৃষি উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে- তাহলে এই লাঙ্গলটি মূলধন হিসেবে গণ্য হবে। টাকা পয়সাও মানুষ শ্রম দিয়ে উপার্জন করে পুনঃউপার্জনের জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। অতএব টাকা পয়সা, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী, গুদাম ঘর আসবাবপত্র ইত্যাদি সবই মূলধনের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত টাকা পয়সা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। টাকা পয়সা সঞ্চিত থাকলে তা দ্বারা মূলধন গড়ে তোলা শুধু বিনিময়ের ব্যাপার মাত্র। এ জন্য টাকা পয়সাকেও এক ধরনের মূলধন ধরা যেতে পারে। সারকথা, মূলধন মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১. মুদ্রাগত মূলধন (লিকুইড মূলধন) ২. দ্রব্যগত মূলধন (সলিড মূলধন)।

তবে মুদ্রাগত মূলধনকে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যগত মূলধনে রূপান্তরিত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা উৎপাদনে কোনই ভূমিকা রাখতে পারে না। তাই প্রকৃত অর্থে দ্রব্যগত মূলধনই প্রকৃত মূলধন।

সঞ্চয়

সাধারণ অর্থে টাকা পয়সা জমানোকে সঞ্চয় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় "আয় উৎপাদনের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া হয়: তাকে সঞ্চয় বলে। সুতরাং কোন ব্যক্তির মাসিক আয় যদি ২০০০/= টাকা হয়, আর মাসে সে ১৫০০/= টাকা ব্যয় করে ৫০০/= টাকা ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখে: তাহলে এই ৫০০/= টাকা তার মাসিক সঞ্চয় বলে গণ্য হবে।

www.eelm.weebly.com

ইসলাম যদিও পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রয়োজনে বৈধপন্থায় সাময়িক সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করেনি। বরং এ ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

দান-খয়রাতের হাত গুটিয়ে ফেলে পুঁজিপতি বনার চেষ্টাও করো না, আবার হাত খুলে ব্যয় করে নিঃস্বও হয়ো না। তাহলে পরো নিন্দা ও নিঃস্বতা ভোগ করতে হবে। - সূরাঃ ১৭ বনী ইসরাইলঃ২৯

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) একবার তার সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতে চাইলে আল্লাহর রাসুল তাকে নিষেধ করেছিলেন, পরে তিনি অর্ধেক দান করতে চাইলেও আল্লাহর রাসুল সম্মতি দেননি। পরে এক তৃতীয়াংশ দান করতে চাইলে আল্লাহর রাসুল সম্মতি প্রদান করেন এবং বলেন যে, এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তুমি তোমার সন্তানদেরকে এমন অসহায় করে রেখে যাবে যে, তারা অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে, তার চেয়ে তাদেরকে কিছু সম্পদের অধিকারী করে রেখে যাওয়া উত্তম। এ থেকে বুঝা যায় যে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে পরিমিত সঞ্চয়ের বিষয়টিকে ইসলাম অনুমোদন করে। তবে ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহর উপর পরম আস্থা নিয়ে কেউ যদি চরম তাওয়াক্কুলের জীবনকে বেছে নেয়-হযরত আবু বকর (রা) যেমন করেছিলেন তাহলে সেটা হবে আযীমত এবং তার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

বিনিয়োগ

সাধারণ অর্থে ভবিষ্যতে লাভের আশায় কৃষি খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা কিংবা অন্য কোন খাতে অর্থ ব্যয় করাকে বিনিয়োগ বলে।

কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায়- "কোন নির্দিষ্ট সময়ে মওজুদ মূলধন দ্রব্যের সঙ্গে যতটা অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য যোগ করা হয় তাকেই বিনিয়োগ বলে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইনসের মতে "আগে থেকেই আছে এমন মূলধন দ্রব্যসামগ্রীর সাথে অতিরিক্ত যে মূলধন দ্রব্য সংযোজিত হয় তাকেই বিনিয়োগ বলে"। যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেখানে ৫০ হাজার টাকার মূলধন দ্রব্য যোগ করা হল। এই নতুন সংযোজনকৃত ৫০ হাজার টাকা কিংবা তা দ্বারা ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীকে বিনিয়োগ বলা হবে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটি অপরটির উপর ভিত্তিশীল। কেননা

www.eelm.weebly.com

সঞ্চয় হলেই বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। আর ফলপ্রসূ বিনিয়োগ দ্বারা আয় বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিক সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। তাই সঞ্চয় হল বিনিয়োগের ভিত্তি। আর ফলপ্রসূ বিনিয়োগ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে। অতএব এ দুটিতে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বলতে গেলে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা মূলধনের উপর ভিত্তিশীল। যদি কোন দেশে মূলধন বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কেননা মূলধন বৃদ্ধি পেলে কর্মপরিসর সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয় এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। বৃহদায়তনে উৎপাদনকর্ম আঞ্জাম দিতে হলে শ্রম বিভাজনের প্রয়োজন হয়। ফলে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পায়, স্বল্প সময়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়, উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায় এবং পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দেশজ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে দেশের সকল বনজ, খনিজ, জলজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার উত্তোলন ও আহরণের তাড়না বাড়ে। এতে দেশের সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বৃহৎমানের উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারী ব্যবহার করতে হয়, এতে শ্রমিকের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় বাড়ে, ফলে মানুষের জীবনমান উন্নত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে উঠে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মূলধনের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো মূলধন সংকটের কারণেই উন্নত দেশসমূহের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। অতএব উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগে আরো যত্নবান হতে হবে।

মূলধন গঠন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে বিদ্যমান মূলধন দ্রব্যের প্রবৃদ্ধি ঘটানোকে মূলধন গঠন বা মূলধন সৃষ্টি বলে। অন্য কথায় দেশে উৎপাদিত উপকরণের মওজুদ বৃদ্ধিকে মূলধন গঠন বলে। অর্থাৎ মিল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা সামগ্রী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট পুল, কালভার্ট ইত্যাদি গড়ে তোলাকে মূলধন গঠন বলে। দেশের মানুষের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে মূলধন সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ

www.eelm.weebly.com

মূলধনীদ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ হয় তাকে মূলধন গঠন প্রক্রিয়া বলে। আর সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে যে পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাই হল গঠিত মূলধনের পরিমাণ। যেমন ঃ ১৯৯৮ সালে যদি বাংলাদেশে মোট ৫,০০০ কোটি টাকার মূলধন থেকে থাকে, আর ১৯৯৯ সালে যদি তা এসে ৬,০০০ কোটি টাকায় দাড়ায়, তাহলে এক বছরে বর্ধিত মূলধনের পরিমাণ হবে ১,০০০ কোটি টাকা। অতএব এ ক্ষেত্রে বার্ষিক মূলধন গঠনের পরিমাণ হল ১,০০০ কোটি টাকা।

মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগের কাজ আঞ্জাম পায় তাকে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া বলে। সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে এ কাজটি আঞ্জাম পায়। যথা ঃ

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টির উদ্যোগ .

২. সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ.

৩. সংগৃহীত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি ঃ এটি মূলধন গঠনের প্রাথমিক স্তর। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মূলধন গঠনের জন্য ব্যক্তিগত সঞ্চয় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় এবং সরকারি সঞ্চয়কে সমন্বিতভাবে বিনিয়োগ করা যেতে পারে, আবার পৃথক পৃথক ভাবেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। যেহেতু ইসলাম ব্যক্তিকে উৎপাদনের অধিকার দিয়েছে, অতএব ব্যক্তির উদ্যোগে মূলধন গঠন করার অধিকারও তাকে দিতে হবে। অন্যথায় উৎপাদনের এই অনুমতি অর্থহীন হয়ে পড়বে। আর রাষ্ট্র যেহেতু ব্যক্তি নাগরিকদের দায়িত্বশীল, অতএব তাদের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে উৎপাদনী মূলধনের যোগান দেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। তবে স্বাধীন উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা যে অর্থনীতিতে নাগরিকদের অর্পণ করা হয়েছে সেখানে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উদ্যোগই সঞ্চয় সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয়ের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করে সঞ্চয়ের সামর্থ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। আর সঞ্চয়ের সামর্থের বিষয়টি মুলতঃ নির্ভর করে মানুষের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণের উপর। কেননা ব্যক্তির আয় যতই হোক: যদি তার ব্যয়ের পরিমাণ কম হয় তাহলে তার সঞ্চয় স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে। আর যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয় তাহলে সঞ্চয় করা সম্ভব হবে না। তাই এ ক্ষেত্রে ইসলামের পরামর্শ হল যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচন করা, অবৈধ ব্যয় না করা, অপব্যয় ও অপচয় রোধ করা, বিলাস বর্জন করা, আত্মম্ভরিতা ও লৌকিকতা পরিহার করা খাদ্য ও দ্রব্য সামগ্রী থেকে যথাসম্ভব চূড়ান্ত উপযোগ গ্রহণ করার

www.eelm.weebly.com

চেষ্টা করা এবং মধ্যমপন্থায় জীবন-যাপন করা (এ সকল বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।) উপরোল্লিখিত নীতিসমূহ মেনে চললে জীবনের প্রয়োজন খুব সীমিত হয়ে পড়বে। ফলে প্রত্যেকের জন্যই কিছু কিছু সঞ্চয় করা (তা যত অল্পই হোক না কেন) সম্ভব হবে।

সঞ্চয়ের সামর্থ থাকলেও সঞ্চয়ের জন্য ইচ্ছা আগ্রহ থাকা অপরিহার্য। মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে বিভিন্ন বিষয় অনুপ্রাণিত করে থাকে; যথা ঃ

ক. ভবিষ্যতের সচেতনতা ঃ অর্থাৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ ও ঘটনা-দুর্ঘটনায় পরিস্থিতির মুকাবিলা করার চিন্তাভাবনা এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করে। ভবিষ্যত জীবনে সুখ-স্বাচছন্দ বৃদ্ধির আকাংখাও মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করে।

খ.সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ মমতার টান ঃ অর্থাৎ সন্তান সন্ততির প্রতি মানুষের স্বভাবজাত যে ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা রয়েছে এটা মানুষকে সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে দিতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে মানুষের মাঝে সঞ্চয়ের ইচ্ছা জাগে।

গ.অধিক মুনাফার সুযোগ ঃ সঞ্চিত অর্থ অধিক মুনাফায় বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধাও মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করে।

ঘ. মানবসেবা ও দান খায়রাতের বাসনা ঃ সমাজের অসহায় বঞ্চিত মানুষের সেবা ও সহযোগিতা করা এবং দান-খয়রাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশাও মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া হজ্জ ওমরা ইত্যাদি আদায়ের আকাংখাও মানুষকে সঞ্চয়ে আগ্রহী করে।

অবশ্য অনেকে কার্পণ্য করেও অর্থ সঞ্চয় করে থাকে। কিন্তু কার্পণ্য করা যেহেতু নিষিদ্ধ তাই এ প্রক্রিয়ায় সঞ্চয় করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না। আবার অনেকেই বিলাসী জীবন, বৈষয়িক প্রতিপত্তি ক্ষমতা ও দাপট্য লাভের মোহে পড়েও সম্পদ সঞ্চয় করে। কিন্তু এসকল উদ্দেশ্যের কোনটিই যেহেতু শরীয়ত সমর্থিত নয়; অতএব এহেন উদ্দেশ্যে সম্পদ সঞ্চয় করা অবশ্যই বৈধ হবে না।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়াও যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঞ্চয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা, রাজস্ব উদ্বৃত্ত, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ একটি দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণকে প্রভাবিত করে।

২. সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ ৩. তা মলধনী দ্রব্যে রূপান্তর

কেবলমাত্র সঞ্চয়ের দ্বারাই মূলধন গঠিত হয় না; বরং এই সঞ্চিত অর্থকে সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে কাজে লাগাতে হয় এবং যথার্থ ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করতে হয়। তবেই মূল ধন সংগঠিত হয়।

www.eelm.weebly.com

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে এই অলস নিষ্ক্রীয় সঞ্চয় সংগ্রহ করে বিনিয়োগ যোগ্য তহবিল হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়। উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে এই সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে উৎপাদনে বিনিয়োগ করেন। আর এই টুকু দায়িত্ব পালন করে ব্যাংক প্রাপ্ত সুদের অধিকাংশেরও বেশী হাতিয়ে নেয়। যার মালিক হয় গুটিকতক ব্যাংকার। অপরদিকে উদ্যোক্তারা ব্যাংককে দেয় সুদের টাকা; দ্রব্যের উৎপাদন খরচের সাথে যোগ করে তবেই পণ্য বাজারজাত করেন। ফলে এ সুদের দায়ভার গিয়ে পড়ে অসহায় ভোক্তাদের উপর। এভাবে সুদের গেড়াকলে বন্ধি হয়ে শোষিত হয় দেশের নাগরিকরা।

পুঁজি সংগ্রহের বিকল্প ব্যবস্থা

ইসলাম যেহেতু সুদী লেনদেনকে বৈধ মনে করে না এজন্য সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। নিম্নে এর একটি বিকল্প পন্থা উল্লেখ করা হল।

সরকারায়ত্ব বহু প্রতিষ্ঠান দেশে স্বাভাবিকভাবেই কর্মরত থাকে। সেসব প্রতিষ্ঠানকে এসকল নিষ্ক্রীয় পুঁজি সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হলে অনায়াসেই এ পুজিগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেমন পোস্ট অফিস সমূহে পুজি সংগ্রহের একটি কাউন্টার খোলা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট উকালতনামার মাধ্যমে সরকারকে উকিল সাব্যস্ত করা হবে। যে উকালতনামায় কোন লাভজনক উৎপাদনশীল খাতে জমাকৃত টাকা মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জমাকৃত পুঁজিসমূহের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করতঃ সরকারি তত্ত্বাবধানে উদ্যোক্তাদেরকে সেই তহবিল থেকে মুদারাবার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা হবে। বছরান্তে হিসাবের মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত লভ্যাংশ পুনরায় পুঁজি বিনিয়োগকারীদের মূল পুঁজির সাথে সংযুক্ত হয়ে উৎপাদনী মুলধন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কোন বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগকৃত টাকা কিংবা তার বাৎসরিক লাভ উত্তোলন করতে চাইলে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় তহবিলের বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেয়ার এক মাসের মধ্যে (কিংবা অনুরূপ কোন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে পোষ্ট অফিসে বিনিয়োগকারীর একাউন্টে তা প্রেরণ করা হবে।

এই প্রক্রিয়ায় মধ্যসত্বভোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক যে বিশাল অংকের লভ্যাংশ হাতিয়ে নেয় তার কোন সুযোগ থাকবে না। বরং এই লভ্যাংশ সরাসরি

www.eelm.weebly.com

বিনিয়োগকারীরা ভোগ করতে পারবে। ফলে গুটিকতক ব্যাংকার লাভবান না হয়ে লাভবান হবে বিনিয়োগকারী সর্বসাধারণ এবং সুদের হারাম পন্থা অবলম্বন থেকে মানুষ বেঁচে যাবে। অপরদিকে বৃহৎমানের উৎপাদনকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও সংগৃহীত হয়ে যাবে- যার গুরত্বের কথা তুলে ধরেই ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর গলায় প্রচার করা হয়।

অবশ্য এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি সমস্যাও রয়েছে। যথা ঃ

১নং সমস্যাঃ সরকারকে এই ওকালতির দায়িত্ব পালন করার জন্য কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে, যার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এ টাকা আসবে কোত্থেকে?

এ প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর এই যে, প্রতি বছর সরকারকে অনুৎপাদনশীল খাতে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকী দিতে হয় এ ধরনের অনুৎপাদনশীল বহু প্রতিষ্ঠান সরকারি অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত হয়। সুতরাং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা, নাগরিকদের হালাল উপার্জনের পথ সুগম করা, তদুপরি দেশের মুলধন বৃদ্ধির জন্য যদি এই খাতে গচ্ছাত দিতে হয় তাতে অসুবিধা কোথায়?

আর যদি সরকার এই খাতে গচ্ছা দিতে একান্তই অনিচ্ছুক হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীদের থেকে পুঁজি গ্রহণ ও লভ্যাংশ পৌছানোর ওকালতিদায়িত্ব পালনের জন্য সরকার শতকরা হারে মজুরী দাবী করতে পারেন এবং সেই মজুরির টাকা সরকার আমানতকারীদের অনুমতিক্রমে তাদের থেকে কেটে রাখতে পারবেন। তবে তার হার অবশ্যই এভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিদেনপক্ষে যা ব্যয় হবে তা যেন আদায় হয়ে যায়। অবশ্যই সরকারের এ দ্বারা লাভবান হওয়ার মানোবৃত্তি না থাকা বাঞ্চনীয়। আর যদি ব্যাংক ব্যবস্থার মত লাভ করাও হয় তবুও এ ব্যবস্থা ব্যাংক ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম হবে। কেননা সরকার লাভবান হলে এ টাকা মূলতঃ জনকল্যাণেই ব্যয়ীত হবে। যা দ্বারা লাভবান হবে দেশের সর্বসাধারণ।

অথবা থানা পর্যায়ে কোন একটি সরকারি অফিসের মাধ্যমে যদি এই পুঁজি সংগ্রহ ও লভ্যাংশ বিতরণের কাজটি আঞ্জাম দেয়া হয় তাহলে ব্যাংক ব্যবস্থার চেয়ে বহুগুণে ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব হবে। ফলে উৎপাদিত পণ্য যথেষ্ট সস্তায় সরবরাহ করা যাবে এবং বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি পাবে। এই পন্থায় লভ্যাংশ বিকেন্দ্রীকরণ হবে। ফলে পুঁজিপতিও গড়ে উঠবে না অথচ পুঁজি সংগ্রহের কাজও অনায়াসে আঞ্জাম পাবে।

২নং সমস্যা ঃ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানই লাভজনক হয় না বরং কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর সরকারকে ভর্তুকী

www.eelm.weebly.com

দিতে হয়। এমতাবস্থায় উৎপাদন খাতের জন্য সংগৃহীত টাকা সরকারি তত্ত্বাবধানে বিনিয়োগ করা হলে এগুলোর অবস্থাও তথৈবচ হবে নিঃসন্দেহে।আর যদি তা-ই হয় তাহলে পুঁজিবিনিয়োগকারীদের লাভের আশা তো সুদূর পরাহত হয়ে পড়বেই উপরন্তু মূল পুঁজি ফিরে পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে না। অপরদিকে এই পুঁজি উৎপাদনের জন্যে যাদেরকে সরবরাহ করা হবে; তাদেরকে অবশ্য মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যিনি পুঁজি নিয়ে উৎপাদনী খাতে খাটাবেন তিনি যদি সততা রক্ষা না করেন বরং প্রতি বছর খাতাকলমে লোকসান দেখিয়ে দেন তাহলে বিনিয়োগকারীরা লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর এরূপ হলে এ ব্যবস্থা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে।

এ সমস্যা সমাধানের একটিই মাত্র পথ যে, দেশের নাগরিকদেরকে সৎ, আমানতদার ও বিশ্বস্থ করে গড়ে তুলতে হবে। মুলতঃ হযরত আম্বিয়া (আ.) যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে ছিলেন তার মাঝে অন্যতম বিষয় হল সৎ ও আদর্শবান মানুষ তৈরী করা। আম্বিয়াদের এটিই ছিল জীবন সাধনা। কেননা সৎ আদর্শবান, বিশ্বস্থ, আমানতদার, ন্যায় পরায়ণ, সত্যবাদী মানুষ ছাড়া কোন কিছুই সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা কার্যকরী করার আগে এ কাজটি অবশ্যই করে নিতে হবে। রাসূলে কারীম (সা.)ও তাঁর মিশনের শুরু থেকেই সৎ, আদর্শবান-আমানতদার, আত্মত্যাগী, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পিছনে অক্লান্ত মেহনত করেছেন। মুলতঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা সম্ভব হলে স্বল্প সম্পদ দিয়ে সুখের নিবাস রচনা করা সম্ভব।

কিন্তু আজ পৃথিবী বলতে গেলে এ বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে সর্বত্রই দুর্নীতি ও আত্মসাতের প্রবণতা চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষের মাঝে সততার গুণ সৃষ্টি করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতদসঙ্গে এসকল দর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রশাসনিক ভাবেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারো মাঝে এ ধরনের অপরাধ প্রমাণিত হওয়া মাত্রই তার কঠোর শাস্তির বিধান দ্রুত কার্যকরী করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে তার মাল-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও টাকা-পয়সা বাজেয়াপ্ত করার আইন থাকতে হবে।

এর সাথে যে প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনের জন্য পুঁজি সরবরাহ করা হবে, তার হিসাব-নিকাশ তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন দীনদার আমানতদার ও বিশ্বস্থ ব্যক্তিকে সেই প্রতিষ্ঠানের হিসাব রক্ষকের পদে নিয়োগ দান করার বাধ্যতামূলক বিধান করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত এই হিসাব রক্ষক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। তার বেতন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বহন করবে। তাছাড়া আধুনিক ব্যাংকগুলো

www.eelm.weebly.com

তাদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও আত্মসাৎ রোধের জন্য যে কঠিন নিয়ম-নীতি মেনে চলে সেগুলোও এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যাতে আমানতদারীর পাশাপাশি সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও বিদ্যমান থাকে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে যদি দুর্নীতির প্রবণতা থেকে মুক্ত করে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা সম্ভব হয় এবং দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়া মাত্রই অপরাধীকে চিরতরে চাকরিচ্যুতির ব্যবস্থা রাখা হয়, আর আইন দ্রুত কার্যকর করার ব্যবস্থা রাখা হয়; তাহলেই ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনী কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। অন্যথায় মিথ্যা, জালিয়াতী, আত্মসাৎ ও খিয়ানতের দ্বার খোলা থাকলে কোন অর্থনীতিই শোষণ ব্যতীত মানুষের জন্য কোন কল্যাণকর পয়গাম বয়ে আনতে সক্ষম হবে না। একারণেই ইসলাম বস্তুগত সম্পদের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির চেয়ে মানব সম্পদের উন্নয়নের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। আর এই পন্থা অবলম্বন করেই ইসলাম দারিদ্র পীড়িত আরবে সমৃদ্ধির এমন জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যার নজীর অদ্যাবধী ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। তখন মানুষের জান-মালের কতটুকু নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছিল যে, মদীনা থেকে সুদূর ইয়ামেনের সান'আ নগরী পর্যন্ত কোন ষোড়শী রমনী সুন্দর অলংকারে সজ্জিত হয়ে রাতের অন্ধকারে সফর করলেও তার দিকে কেউ ফিরে তাকাত না। ঐ চেতনার ফলশ্রুতিতেই যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিকদের জন্য বয়ে আনা এক গ্লাস পানি কেউ পান না করেও আত্মত্যাগের পরমতৃপ্তি নিয়ে সকলেই ইহদাম ত্যাগ করতে পেরেছিল। আজো যদি মানব সম্পদ উন্নয়নের চূড়ান্ত উদ্যোগ সরকারিভাবে ব্যাপক ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় তাহলে আমরা সেই নির্মল পরিবেশ, সুষম সমৃদ্ধি, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত জীবন ফিরে পেতে পারি।

মূলধনের কার্যাবলীঃ উৎপাদনে মূলধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা মূলধনের উপর নির্ভরশীল।

উৎপাদনের জন্য মূলধন ও মূলধনী দ্রব্য অপরিহার্য। পর্যাপ্ত মূলধনী দ্রব্য বিদ্যমান থাকলে ব্যাপক ভিত্তিতে ও বৃহৎমানের উৎপাদনী উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। উৎপাদনে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গুণগত মান উন্নত হয়, উৎপাদিত পণ্য সহজলভ্য ও সস্তা হয়, শ্রমিকের দৈহিক শ্রম লাঘব হয়, কম শ্রমিক দ্বারা উৎপাদন কাজ করা সম্ভব হওয়ার কারণে ব্যয় সংকোচন হয়, শ্রমিকের যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়, কম সময়ে বেশী উৎপাদন করা যায়, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় উৎপাদন অব্যাহত থাকে, ফলে দ্রব্য সংকটজনিত জটিলতা থেকে নাগরিকরা রক্ষা পায়। দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

www.eelm.weebly.com

উৎপাদনের উপকরণ-৪

সংগঠন ও সংগঠক

সংগঠন ও সংগঠক কাকে বলে?

কোন কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব বিষয়ের প্রয়োজন হয় সেগুলোকে একত্রিত ও সমন্বিত করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে।

অর্থনীতিবিদ হ্যান বলেছেন-নির্দিষ্ট কোন একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে। মূলতঃ সংগঠনই উৎপাদন ক্ষেত্রের অন্যান্য উপকরণ সমূহকে কর্মচঞ্চল ও উৎপাদনশীল করে তোলে। উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন কর্মের তত্ত্বাবধান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ, ঝুঁকি বহন এসব কিছুই সংগঠনের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

আর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের এই কাজ আঞ্জাম দেয় তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা Entrepreneurs বলে। কোন কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রিত করে এগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করতঃ উৎপাদন কার্য পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও লাভ-লোকসানের ঝুঁকি পর্যন্ত সবকিছু উদ্যোক্তাকেই বহন করতে হয়। এ কারণে কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা একদিকে তার মালিক, আবার অন্যদিকে তার সংগঠকও বটে। এই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য তাকে কর্মাধ্যক্ষও বলা হয়। অর্থনীতিবিদ মার্শাল তাকে শিল্পাধিনায়ক বা Captain of the industry বলে অভিহিত করেছেন।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের ভূমিকাঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করার ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকাই সর্বাধিক। কেননা তার সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসানের বিষয়টি নির্ভর করে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠককে নিম্নলিখিত ভূমিকাসমূহ পালন করতে হয়ঃ

১. কারবার গঠনের পরিকল্পনা উদ্ভাবনঃ অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, মূলধনী দ্রব্যের যোগান ও নাগরিকদের চাহিদার বিচারে কোন দ্রব্যের উৎপাদন লাভজনক হতে পারে এই আইডিয়া করা, এর জন্য কি কি বিষয়ের প্রয়োজন হবে, কত মূলধন দরকার হবে, সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু আছে ইত্যাদি বিষয়ে একটি আইডিয়া গ্রহণ, উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, পারমিট, দলিল দস্ত

www.eelm.weebly.com

াবেজ, চুক্তিপত্র যা যা প্রয়োজন হবে তা এবং প্রাথমিক কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ কত হবে ইত্যাদি বিষয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ প্রাথমিক কাজকর্ম আঞ্জাম দান।

২. উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণঃ সংগঠককে উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কোন দ্রব্য কি পরিমাণ, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদিত হবে, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান কি হবে, কোন স্থানে তা উৎপাদন করা হবে, তার বিক্রয় মূল্য কত নির্ধারণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ করা সংগঠকের মূল দায়িত্ব।

৩. উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ঃ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব বন্টন ও বিভাগ সমূহের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন, যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকদেরকে যথোপযুক্ত কাজে নিয়োগ, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় আসবাব উপকরণ ও মেশিনারী যোগানদান এবং এগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজ সুসম্পন্ন করা সংগঠকের দায়িত্ব।

৪. উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করাঃ অর্থাৎ উৎপাদনে নিযুক্ত ভূমির যথার্থ ভাড়া বা মূল্য পরিশোধ করা, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক প্রদান করা, মূলধন বিনিয়োগকারীদের (যদি থাকে) যথাপ্রাপ্য লভ্যাংশ পরিশোধ করা ইত্যাদিও সংগঠকের দায়িত্ব।

৫. উৎপাদন প্রক্রিয়াকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করাঃ উৎপাদনকে অধিক লাভজনক করার লক্ষ্যে এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা ও কৌশল উদ্ভাবন করা, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করাও সংগঠকের দায়িত্ব।

৬. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করাঃ উৎপাদিত পণ্য কিভাবে বাজারজাত করা হবে, কোন অঞ্চলে বা কোন দেশে বাজারজাত করলে অধিক মুনাফা হবে, সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করার জন্য ভোক্তার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, ভোক্তাদের চাহিদা পণ্যের অনুকূলে আকর্ষিত করা এবং বাজারজাত করণের সময় কালের বিবেচনা করা এবং প্রয়োজনে দ্রব্য গুদামজাত করে রাখা ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদিও সংগঠকের অন্যতম দায়িত্ব বটে।

৭. লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহন করা ঃ পূর্বানুমানের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কোন কারণে পূর্বের তুলনায় কমে গেলে লাভের পরিবর্তে লোকসানের আশংকা দেখা দিতে পারে। তখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি সংগঠককেই বহন করতে হয়।

www.eelm.weebly.com

এ সকল দায়দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া ও ঝুঁকি বহনের পরিবর্তে সংগঠক লভ্যাংশের মালিক হয়ে থাকেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয় ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তা লাভ করে থাকেন।

ইসলামী অর্থনীতির বিকাশকালে এই পরিভাষা ও পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত ছিল না বিধায় এ ধরনের বর্ণনা কুরআন সুন্নাহ ও ফিকাহ-এর গ্রন্থসমূহে উল্লেখ নেই। তবে কুরআন সুন্নাহ ফিকাহ-গ্রন্থ সমূহের বর্ণনা থেকে সংগঠন ও সংগঠকের বৈধতার পক্ষে যথেষ্ট ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) জেল থেকে বের হয়ে মিশর সম্রাটের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যে দুর্ভিক্ষের আভাস দিয়ে ছিলেন তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দেশের কৃষি ও খাদ্য বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করে দেয়ার কথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের ইরশাদ-

فاجعلنى على خزائن الارض اني حفيظ عليم

অর্থাৎঃ ভাদ্যভান্ডারের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্তকরুন। আমি একজন উত্তম সংরক্ষণকারী এবং এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ।

এই আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেকে একজন ভাল সংগঠক হিসাবে দাবী করে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এতে সংগঠকের ভূমিকার স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া হযরত খাদিজা (রা.)-এর মাল নিয়ে রাসূল (সা.) বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিলেন. এতেও সংগঠকের অস্তিত্বের সুক্ষ ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে।

তাছাড়া একজন মুদারিব একাধিক রাব্বুলমাল বা পুঁজি মালিকের পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করার বৈধতা ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত একটি বিষয়। এ ক্ষেত্রেও মুদারিব মুলতঃ সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন. কেননা ব্যবসার পরিকল্পনা. উদ্যোগ. ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ. পণ্য আমদানি ও বাজারজাতকরণ সবকিছু মুদারিব নিজেই করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে মুদারিব লভ্যাংশের যে অংশবিশেষ লাভ করে থাকেন তা মূলতঃ সংগঠক হিসেবেই লাভ করে থাকেন।

www.eelm.weebly.com

অষ্টম অধ্যায়

বাজার

বাজার কাকে বলেঃ সাধারণ অর্থে বাজার বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের মাঝে দ্রব্যসামগ্রীর লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় কোন একটি দ্রব্যের লেন-দেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দরকষাকষির মাঝ দিয়ে উক্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের যে রেইট বা হার নির্ধারিত হয় তাকে বাজার বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, পাটের বাজার (৩০০ টাকা মন), স্বর্ণের বাজার ...... শেয়ার বাজার ..... মুদ্রাবাজার ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে পাটের বাজার বলতে যে স্থানে পাট ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে বুঝানো হয় না বরং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাটের ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে প্রতিমন পাটের যে সাধারণ মূল্যমান নির্ধারিত হয় তাকে বুঝানো হয়। অর্থনীতিবিদ কুর্টন বলেছেন ঃ বাজার শব্দ দ্বারা অর্থনীতিবিদরা দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ের কোন বিশেষ স্থানকে বুঝান না বরং এর দ্বারা তারা একটি সামগ্রিক অঞ্চলকে বুঝিয়ে থাকেন-যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরে স্বাধীনভাবে দরকষাকষি করে একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের নির্ধারিত পরিমাণের দাম সমানুপাতিক হারে সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে নিরূপণ করতে পারেন। হেদায়ায় এটিকে ثمن المروج বা ثمن المبيع বলা হয়েছে। সুতরাং একটি বাজারের জন্য বেশ কয়েকটি উপাদান থাকা অপরিহার্য। যথা ঃ

১. ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এক বা একাধিক দ্রব্য।

২. দ্রব্যটির এক দল ক্রেতা-বিক্রেতা।

৩. দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পরিমন্ডল।

৪. ক্রেতা-বিক্রেতার অবাধ দরকষাকষির সুযোগ এবং এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব।

বাজারের শ্রেণী বিভাগ

বাজারের পরিমন্ডল ও পরিধি, স্থায়িত্বকাল, প্রতিযোগিতার ধরন ইত্যাদি বিচারে বাজারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. পরিমন্ডল ও পরিধির ভিত্তিতে বাজার।

২. স্থায়িত্ব কালের ভিত্তিতে বাজার।

৩. প্রতিযোগিতার তীব্রতার ভিত্তিতে বাজার।

www.eelm.weebly.com

১. পরিমন্ডল ও পরিধির ভিত্তিতে বাজার ঃ পরিমন্ডল ও পরিধির ভিত্তিতে বাজারকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

(ক) স্থানীয় বাজার ঃ যেসকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় একটি অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন ঃ মাছ-মাংস, শাক-শব্জি, দুধ, কলা ইত্যাদির বাজার পণ্যোৎপাদনের অঞ্চল বা তার আশপাশের অঞ্চলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত দ্রুত পচনশীল ও সহজে পরিবহনযোগ্য নয় এমন ধরনের পণ্যের বাজার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। যেসব পণ্যের বাজার সীমাবদ্ধ তার চাহিদা কম থাকে, ফলে তার উৎপাদনও কম হয়।

(খ) জাতীয় বাজার ঃ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিধি যদি দেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকে তাহলে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন ঃ চাল, চিনি, কাগজ, কাপড়, ঔষধপত্র ইত্যাদি দেশের সর্বত্র ক্রয়-বিক্রয় হয় বলে এর বাজার জাতীয় বাজার বলে গণ্য হয়। যেসব দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না এবং সহজেই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে আনা-নেওয়া করা যায় তার বাজার জাতীয় ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেহেতু এ ধরনের পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হয় তাই তার উৎপাদনের পরিমাণও বেশী হয়ে থাকে।

(গ) আন্তর্জাতিক বাজার ঃ যেসব দ্রব্যের চাহিদা ও ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সেগুলোর বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন ঃ সোনা-রূপা, পাট, তুলা ইত্যাদি। যেহেতু এসকল দ্রব্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। অতএব তার উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেশী হয়ে থাকে।

২. স্থায়ীত্ব কালের ভিত্তিতে বাজার ঃ স্থায়িত্ব কালের ভিত্তিতে বাজারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) অতি স্বল্পকালীন বাজার ঃ যে বাজার কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় তাকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। অতি সল্পকালীন বাজারে সময়ের স্বল্পতা হেতু চাহিদা অনুপাতে যোগান বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। সুতরাং এ ধরনের বাজারে দ্রব্যের দাম বাড়া কমার বিষয়টি যোগানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না বরং দাম বাড়া কমার ক্ষেত্রে চাহিদার ভূমিকা মূখ্য হয়ে থাকে। কাঁচামালের বাজার সাধারণতঃ অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে গণ্য হয়।

(খ) স্বল্পকালীন বাজার ঃ যে বাজার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির সাথে ব্যাপক হারে যোগান বাড়ানো ও কমানো সম্ভব না হলেও অল্প হারে যোগান বাড়ানো ও কমানো সম্ভব হয়। এ ধরনের বাজারেও পণ্যের দাম যোগানের চেয়ে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হয়। গামছা, লুঙ্গী, শাড়ি কাপড় নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদির বাজার সাধারণত স্বল্পকালীন বাজার হয়ে থাকে।

www.eelm.weebly.com

(গ) দীর্ঘকালীন বাজার ঃ যে বাজার কয়েক মাস থেকে কেয়ক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। দীর্ঘকালীন বাজারে দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির সাথে যোগান ও হ্রাস বৃদ্ধির করা সম্ভব হয়। ফলে চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। মোটর গাড়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের বিভিন্ন মেশিনারী, ফ্রীজ, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি পণ্যের বাজার দীর্ঘকালীন হয়ে থাকে।

(ঘ) অতি দীর্ঘকালীন বাজার ঃ যে বাজারের স্থিতিকাল অতিদীর্ঘ এবং যার চাহিদার পরিবর্তনের বিষয়টি সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের উপর ভিত্তিশীল এ ধরনের বাজারকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজার সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ ধরনের বাজারে ক্রেতার রুচি অভ্যাস ও সংখ্যায় আমূল পরবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। ফলে চাহিদার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের আশংকা থাকে। এ ধরনের বাজার সাধারণত ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে টিকে থাকে। উড়োজাহাজ, ভারী যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী, কম্পিউটার, জাহাজ ইত্যাদির বাজার সাধারণত অতি দীর্ঘকালীন হয়ে থাকে।

৩. প্রতিযোগিতার তীব্রতার ভিত্তিতে বাজারঃ বিক্রেতাদের মাঝে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ভেদে বাজারকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ,

ক. পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজার

খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার।

ক.পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার - যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতারা বাজার সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞাতসারে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন আর শতকরা একশ ভাগ একই গুণসম্পন্ন দ্রব্যের লেনদেন হয় এবং বাজারে পণ্যের একটি মাত্র দাম বিরাজ করে সেই বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে। যেমন শেয়ার বাজার, মুদ্রা বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি।

খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ঃ যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা ও (বিশেষ করে) বিক্রেতার সংখ্যা কম হয়, বিক্রয়যোগ্য পণ্য বিভিন্ন ধরনের থাকে কিংবা এক ধরনের হলেও তাদের মাঝে গুণগত পর্থাক্য থাকে এবং বিক্রেতা দর কষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দামকে কম বেশী প্রভাবিত করতে পারে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ

*** একচেটিয়া বাজার ঃ** কোন একটি পণ্যের বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকলে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। এ বাজারে বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে এ ধরনের ঘনিষ্ঠ বিকল্প কোন দ্রব্য থাকে না। ফলে বিক্রেতার ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোক্তারা এ ক্ষেত্রে নিরূপায় হয়ে বিক্রেতার নির্ধারিত দামে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়ে পড়েন।

www.eelm.weebly.com

* **একচেটিয়া ধরনের প্রতিযোগিতার বাজার** ঃ যে বাজারে একাধিক অথচ সীমিত সংখ্যক বিক্রেতা থাকে এবং সম্পূর্ণ এক না হলেও প্রায় একই ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করা হয়ে থাকে তাকে একচেটিয়া ধরনের প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। এ ধরনের বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্যে কিছুটা ভিন্নতা থাকার কারণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পণ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা এধার উধার করতে পারেন। তাই দাম নির্ধারণের বিষয়টি সম্পূর্ণ একচেটিয়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তবে পণ্য প্রায় একই ধরনের হয় বিধায় দামের ক্ষেত্রে খুব একটা তারতম্য হয় না। তাই এটাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারও বলা যায় না আবার একচেটিয়া বাজারও বলা যায় না।

একচেটিয়া ধরনের প্রতিযোগিতার বাজার আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ

১. **কেবল দুই বিক্রেতার বাজার** ঃ অর্থাৎ যে বাজারে বিক্রেতা কেবল দু'জন থাকে। যেমন- বাংলাদেশে বিমান পরিবহনের বাজার। এ ধরনের বাজারকে ডুওপলিও বলে।

২. **কয়েকজন বিক্রেতার বাজার** ঃ অর্থাৎ যে বাজরে কোন দ্রব্যের বিক্রেতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন থাকে। যেমন বাংলাদেশ উচ্চমানের কার্পেটের বাজার। এ ধরনের বাজারকে অলিগোপলিও বলে।

বিস্তৃত বাজার ঃ যে দ্রব্যের বাজার অত্যন্ত বিস্তৃত, সমগ্র দেশ জুড়ে এমনকি দেশের বাইরেও অবাধে ক্রয়-বিক্রয় হয় সে দ্রব্যের বাজারকে বিস্তৃত বাজার বলে। এ ধরনের দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক হয়। প্রায় সব জায়গায় এগুলোর ক্রয় বিক্রয় হয়। যেমন সোনা, রূপা, ঔষধপত্র, কাপড় ,খাদ্যদ্রব্য, বই-পুস্তক ইত্যাদি। বাজারের বিস্তৃতি অনেকগুলো অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যথা ঃ

১. চাহিদার ব্যাপকতা।
২. যোগানের পর্যাপ্ততা।
৩. দ্রব্যের স্থায়িত্ব ও টেকসই দীর্ঘ হওয়া।
৪. সহজ পরিবহনযোগ্য হওয়া।
৫. গুণাগুণের ভিত্তিতে বিভাজনের সুবিধা (অর্থাৎ দ্রব্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে; এক এক শ্রেণীর ভিন্ন দাম নির্ধারণ করতঃ দূর দূরান্তের ক্রেতাদের নিকট পাঠানো সম্ভব হলেও পণ্যের বাজার বিস্তৃত হয়)।
৬. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।
৭. উদার বাণিজ্য নীতি।
৮. ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রার সহজ লভ্যতা।
৯. স্বাভাবিক শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকা।
১০. পণ্যের গুণগত মান ও প্রচারণা অব্যাহত থাকা।

www.eelm.weebly.com

পণ্যের বাজার দর

পণ্যের বাজার দর কিভাবে নির্ধারিত হবে তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দ্রব্যের বাজার দর নির্ধারণ করে সরকার বা পরিকল্পনা পরিষদ। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে অর্থাৎ বাজারে কোন দ্রব্যের দাম তার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাধারণত দ্রব্যের বাজারে একদল ক্রেতা ও একদল বিক্রেতা থাকেন। ক্রেতারা দ্রব্যের চাহিদা পেশ করেন। একটি পণ্যের বাজারে ক্রেতাদের যে পরিমাণ চাহিদা থাকে তার সমষ্টিকে বলা হয় মোট চাহিদা। অন্যদিকে বিক্রেতারা যোগান দিয়ে থাকেন। বিক্রেতাদের যোগানের সমষ্টিকে বলা হয় মোট যোগান। বাজারে দ্রব্যের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মিল ও গরমিলের ভিত্তিতেই পণ্যের দাম নিরূপিত হয়। মোট চাহিদার চেয়ে মোট যোগান কম হলে দ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী হয়, আবার মোট চাহিদার চেয়ে দ্রব্যের মোট যোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দাম নিম্নগামী হয়। এই উত্থান পতনের মাঝ দিয়ে এমন একটি পর্যায় আসে যখন একটি নির্ধারিত দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগান পরস্পরে সমানুপাতিক হয়ে যায়। তখন দ্রব্যের দাম একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে আসে। এ দামই হল দ্রব্যের নির্ধারিত দাম। চাহিদা ও যোগান সমানুপাতিক হারে পৌঁছে গেলে দাম বাড়া বা কমার কোন প্রবণতা থাকে না। একে ভারসাম্যপূর্ণ দাম বলে। একটি তালিকার সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করার চেষ্টা করা হল।

দ্রব্যের দাম	দ্রব্যের মোট চাহিদা	দ্রব্যের মোট যোগান	চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক	দামের অবস্থা
৫.০০	১০০ একক	৫০০ একক	চ<য	দাম নিম্নগামী
৪.০০	২০০ একক	৪০০ একক	চ<য	দাম নিম্নগামী
৩.০০	৩০০ একক	৩০০ একক	চ=য	দাম স্থিতিশীল
২.০০	৪০০ একক	২০০ একক	চ>য	দাম ঊর্ধ্বমুখী
১.০০	৫০০ একক	১০০ একক	চ>য	দাম ঊর্ধ্বমুখী

উপরোক্ত চিত্রে দ্রব্যের দাম যখন ৫.০০ কিংবা ৪.০০ টাকা তখন তার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী ছিল, ফলে দাম ছিল নিম্নমুখী। অর্থাৎ তখন দ্রব্যের দাম আরও কমবে। কিন্তু যখন দাম ৩.০০ টাকায় নেমে আসল তখন তার চাহিদা ও যোগান ছিল সমান সমান অর্থাৎ ৩০০ একক। অতএব ৩.০০ টাকা দ্রব্যটির নির্ধারিত দাম যা স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু যখন দ্রব্যের দাম ২.০০ টাকায় নেমে আসল তখন তার চাহিদা ছিল ৪০০ একক। অথচ তখন তার যোগান ছিল মাত্র ২০০ একক, ফলে দ্রব্যের দাম ছিল উর্ধ্বগামী অর্থাৎ এমতাবস্থায় দ্রব্যের দাম বাড়বে। এভাবে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের ফলে দাম বাড়া ও কমার এই প্রক্রিয়াকে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি বলা হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সারকথা হল দ্রব্যের বাজারদর নির্ধারণের বিষয়টি চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বাজারদর নির্ধারণের বিষয়টি আল্লাহর কুদরতী হাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এক হাদীসে নবী (সা.) ইরশাদ করেন- ان الله هو المسعر القابض الباسط (ترمزی) আল্লাহই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেন, সংকোচিত করেন ও বৃদ্ধি করেন। "আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, সেই কুদরতী নেযাম; চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির মাঝ দিয়ে প্রতিফলিত হয়- এ ধারণা পোষণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। এ জন্য ইসলাম স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈধ মনে করে না। তবে পুঁজিবাদের মত সর্বাবস্থায় তা চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির হাওয়ালাও করে না। বরং দেশে কোন দ্রব্যের সংকট দেখা দিলে এবং সেই সংকট নাগরিক জীবনকে দুর্বিসহ পর্যায়ে ঠেলে দিলে; তখন তার দাম নিয়ন্ত্রণের অধিকার ইসলাম রাষ্ট্রকে প্রদান করেছে। অপরপক্ষে পরিকল্পিতভাবে যোগানে সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার পুঁজিবাদী প্রবণতাকে রোধ করার জন্য ইসলাম কঠোর নৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করেছে। এমনকি এ ধরনের কোন প্রবণতা গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন উদ্যোগকেও ইসলাম আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে – قد صرح الفقهاء بانه لا تترك التجار يشتركون فيما بينهم لتحكم الاسعار- ফিকাহবিদরা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার দেয়া যায় না।

দরদামের বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। ফিকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের দাম সাধারণতঃ দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল পণ্যের বাজার দর। একে বলা হয় (ثمن) আর অন্যটি হল ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সাব্যস্ত্যকৃত মূল্য। একে বলা হয় (قيمة)। ইসলামী শরীয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন বাজার দরের উপর হস্তক্ষেপ করে না; তেমনি কোন পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ক্রেতা বিক্রেতার স্বাধীন মতের উপরও হস্তক্ষেপ করে না। তবে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নেই এমন কোন লোক পেয়ে যদি কেউ তাকে অস্বাভাবিকভাবে ঠকায় তাহলে সে ক্ষেত্রে ইসলাম আইগত প্রতিরোধ সৃষ্টি করে এবং বেচা-কেনাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে।

www.eelm.weebly.com

নবম অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা কাকে বলে ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, তিজারত ও বেচা-কেনা এগুলো সমার্থক শব্দ। সাধারণ অর্থে লাভের আশায় পণ্যের লেন-দেনকে ব্যবসা ও তিজারত বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় বেচা-কেনা বা তিজারত বলা হয়-

البيع هو مبادلة المال بالمال او بالنقد بالتراضى على وجه التجارة

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুই পক্ষের পূর্ণ সম্মতিক্রমে মুদ্রা কিংবা পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের হস্তান্তরকে বেচা-কেনা বলে। অবশ্য কেউ কেউ এর সংজ্ঞা এভাবেও দিয়েছেন যে- البيع اسم لتمليك عين المال بعوض فى حالة الحياة অর্থাৎ জীবদ্দশায় কারো ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত সম্পদকে কোন কিছুর বিনিময়ে অপরের মালিকানায় সমর্পণ করাকে বেচা-কেনা বলে।

বেচা-কেনার এই সংজ্ঞার আলোকে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলে এর মোট তিনটি প্রক্রিয়া নির্নিত হয়। যথা ঃ

১. পণ্যের বিনিময়ে পণ্য।

২. মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য।

৩. মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা।

১. প্রথম প্রকার লেনদেনে দুই পক্ষের পণ্য যদি একই জাতীয় না হয় বরং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হয় এবং উভয় প্রকার পণ্য এমন না হয় যেগুলো মেপে বা ওজন করে পরিমাপ নির্ধারণ করা হয় না, তাহলে বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণগত তারতম্য করে এবং নগদ ও বাকীতে বেচাকেনা করা বৈধ হবে। তবে যদি একই জাতীয় হয় তাহলে পরিমাণগত সমতা রক্ষার সাথে সাথে নগদানগদী ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। আর যদি এক জাতীয় না হয় কিন্তু দুটির মাপন প্রক্রিয়া একই হয়, তাহলে পরিমাণগত দিক থেকে তারতম্য করা যাবে; কিন্তু লেনদেন নগদানগদী হতে হবে। অন্যথায় তা সুদ বলে গণ্য হবে।

২. দ্বিতীয়ত প্রকার বেচাকেনা নগদ বাকী উভয় পদ্ধতিতে হতে পারে। পণ্য নগদ-মূল্য বাকী কিংবা মূল্য নগদ (অগ্রিম) পণ্য বাকী- এই উভয় ভাবেই তার বেচা-কেনা হতে পারে। তবে পণ্যটি সোনা-রূপা না হতে হবে।

৩. তৃতীয় প্রকার লেনদেনে পরিমাণগত সমতা রক্ষার সাথে সাথে অবশ্যই নগদানগদী লেনদেন করতে হবে। অন্যথায় তা সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে এবং অবৈধ হবে।

www.eelm.weebly.com

ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব ঃ

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সম্পদ উপার্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়কারবার। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ফিকাহবিদগণ সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে ঃ

البيع والشراء من اكبر الوسائل المباعثة على العمل فى هذه الحيواة الدنيا واحل اسباب الحضارت والعمران

ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি বিধানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট বৈধ পন্থা।

-(কিতাবুল ফিকহ- আলমাজাহিবিল আরবাআহ ২য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লামা হিফজুর রহমান সিহারোবী উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশি মনোনিবেশ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি ততবেশি সমৃদ্ধি অর্জন করে। পক্ষান্তরে যে জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে সে জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আর এ পথ ধরেই অন্যরা তাদের জীবন জীবিকার উপকরণ, তাহজীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি এমনকি ধর্মের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করে ছাড়ে। তিনি দাবি করে বলেন যে, যে জাতির মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা সক্রিয় নেই, তারা আজ না হলেও আগামীকাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য। যে জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে তারা বর্তমানে না হলেও ভবিষ্যতে ধ্বংসের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। -(ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম)।

বস্তুতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন জীবিকা লাভের অন্যতম এক উপায়। নবী (সা.) বিভিন্নভাবে এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন- تسعة اعشار الرزق فى التجارة জিবীকার নয় দশমাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যে নিহিত রয়েছে। -(কানযুল উম্মাল)

অন্য হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন- لو لا هذه البيوع لصرتم عالة على الناس যদি এই ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকত তাহলে তোমরা অন্যের উপর বোঝা হয়ে পড়তে। -(কানযুল উম্মাল)

এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যবসা করে তার গৃহে কল্যাণ ও প্রাচুর্য প্রবেশ করে। -(কানযুল উম্মাল)

www.eelm.weebly.com

মহান আল্লাহ তাআলাও এর গুরুত্বের বিষয়টি তুলে দরার জন্য নামায সমাপনান্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়তে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এর ফযীলতের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء (ترمزى)

শত্যবাদী বিশ্বস্থ ব্যবসায়ীরা কিয়াততের দিন নবী সিদ্দিক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।

তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জিত লাভ যেন ব্যবসায়ী একাই ভোগ না করে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يا ايها الذين امنوا انفقو من طيبات ماكسبتم

হে মুমিনগণ তোমরা (ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) উত্তম যা কিছু উপার্জন করবে তা থেকে ব্যয় কর।

অপর পক্ষে ব্যবসায় যেহেতু ধোকা, প্রতারণা, দ্রব্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, মওজুদদারী ও কালবাজারীর আশ্রয় নেয়া, অধিক মুনাফা লোটা, জুয়া কিংবা সুদী প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে তাই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার জন্য রাসূল (সা.) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন -

التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الامن اتق الله وبر وصدق (ترمزى)

"কিয়ামতের দিন সকল ব্যবসায়ীকেই পাপাচারী হিসেবে সমবেত করা হবে। তবে যারা এ ক্ষেত্রে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে, সততার সাথে ব্যবসা করবে এবং সত্য কথা বলবে, (তারা মুক্তি পেয়ে যাবে)। অর্থাৎ তার কৃতকর্ম যদি তাকে নির্দোষ প্রমাণ করে তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য ও বেচা-কেনার চুক্তি ঃ

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোন বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে এবং লেনদেনের জন্য নির্বাচিত পণ্য অবশ্যই মূল্যমান বিশিষ্ট ও হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার জন্য একপক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব ও অন্য পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন ও গ্রহণের সম্মতি পাওয়া যেতে হবে। প্রস্তাব ও গ্রহণের পর উভয় পক্ষ আপন প্রাপ্য অংশ অপরের নিকট থেকে বুঝে নিলে চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও সুসম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা হবে। এহেন পন্থায় বেচা-কেনাকে ইসলামী শরীয়ত বৈধ ঘোষণা করেছে। আল-কুরআনে এর বৈধতার ঘোষণা দিতে যেয়ে ইরশাদ হয়েছে- احل الله البيع وحرم الربوا–

www.eelm.weebly.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি ঃ

১. বস্তুতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য মানজীবনের অতি প্রয়োজনীয় এক অধ্যায়। জীবনের বহুবিদ প্রয়োজনের সবকিছুই একজন ব্যক্তির পক্ষে নিজে উৎপাদন করা সম্ভব নয় বিধায় পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই মানুষকে পণ্য বিনিময়ের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য পরস্পরের প্রয়োজনকে পূর্ণ করা, একজন অন্যজনের জীবন যাত্রায় সহযোগিতা করা। প্রাচীনকালে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ করে প্রত্যেকেই প্রয়োজন পূরণ করে নিত। এতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দ্বারা উপকৃত হত। কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হলে একদল লোক একজনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্যজনের কাছ থেকে এনে তার হাতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে কিছুটা লাভবান হত। এভাবেই ব্যবসায় লাভ করার প্রবণতার সূচনা হয়। এ জন্যই ইসলাম মনে করে ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার এই মানসিকতা অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। যে ব্যবসায় এ ধরনের মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকবে সে ধরনের ব্যবসাকে ইসলাম ব্যবসাই মনে করে না। এ ধরনের ব্যবসা সমাজের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতাকে ইসলাম বৈধ ব্যবসার অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করে। সুতরাং লেনদেনের এ ধরনের কোন চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় যেখানে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ ও অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির শর্ত সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন- জুয়া, হাউজী, লটারী এবং জুয়ার শর্তযুক্ত কোন ব্যবসায়ী লেনদেন ইত্যাদি।

২. ব্যবাসার মূল ভিত্তি হল পারস্পরিক সহযোগিতা। অতএব এতে উভয় পক্ষ থেকে স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকা প্রয়োজন। সুতরাং যে লেনদেনে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকবেনা তাকে ইসলামী শরীয়ত ব্যবসা বলে মনে করে না। অতএব ব্যবসার নামে অবাধ শোষণ, অন্যায় আত্মসাৎ দ্রব্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন, মুওজুদারী ও কালবাজারীর মাধ্যমে বাড়তি মূল্য আদায় কিংবা কাউকে বেকায়দায় ফেলে ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করা, কিংবা কারো বিপদের সুযোগে তাথেকে অধিক হারে লাভবান হওয়ার মানসে ক্রয় বিক্রয় করা, পণ্যের উপর একচেটিয়া দখল সৃষ্টি করে বাড়তি মূল্যে বিক্রি করা ইত্যাদি ধরনের বেচাকেনা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা যদিও এগুলো বাহ্যিকভাবে বেচাকেনার মতই মনে হয়; কিন্তু এগুলো প্রকৃত পক্ষে অর্থোপার্জনের বাতিল পন্থা। কেননা উপরোক্ত লেনদেনে বাহ্যত ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতি আছে বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকে না। যদিও অজ্ঞাতসারে,

www.eelm.weebly.com

পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে মানুষ এহেন লেনদেন করে থাকে। এ ধরনের বেচাকেনাকে মহান আল্লাহ তাআলা লেনদেনের বাতিল পন্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিপূর্ণ লেনদেনকে লেনদেনের বৈধপন্থা বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم .

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ বাতিল পন্থায় গ্রাস করো না। তবে যদি তা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যবসার ভিত্তিতে হয় (তাহলে তা তোমাদের জন্য বৈধ হবে)।

আয়াতের ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে ব্যবসায়ী লেনদেন হবে তাই কেবল বৈধ হবে। কিন্তু ব্যবসার নামে পূর্ণসম্মতিহীন যে সব লেনদেন সাধারণত হয়ে থাকে তা মূলতঃ বৈধ পন্থা নয়। সেগুলো বরং অর্থোপার্জনের বাতিল পন্থা। কেউ এহেন লেনদেন করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এক হাদীসে আছে যে, ... রাসূল (সাঃ) জবরদস্তি বেচাকেনাকে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

৩. লেনদেনকারীদ্বয়ের মাঝে অবশ্যই লেনদেনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক, কিংবা পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক না হলেও লেনদেনের অভিজ্ঞতা রাখে এমন সুস্থ মস্তিষ্ক স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। অতএব বুঝাই যাচ্ছে যে, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক, নির্বোধ, পাগল, কিংবা ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত নয় এমন ক্রীতদাসের সাথে লেনদেন করলে তা বৈধ হবে না। অনরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত নয় এমন কোন ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লেনদেনের চুক্তি করলে তাও বৈধ হবে না।

৪. ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত পণ্যের মাঝে অবশ্যই পণ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে এবং তা হস্তান্তরের আওতাভুক্ত হতে হবে। অতএব যাতে পণ্য হওয়ার যোগ্যতাই নেই তার বেচাকেনা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। পণ্য হওয়ার যোগ্য না হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমন-

ক. দ্রব্যটি এমন যা কেউ পয়সা দিয়ে ক্রয় করতে সম্মত হয় না, যেমন ড্রেনের ময়লা পানি, পায়খানা, মৃত প্রাণী ইত্যাদি।

খ. দ্রব্যটি এত সম্মানী, যাকে শরীয়ত পণ্য হিসেবে গণ্য করা সঙ্গত মনে করে না। যেমন- মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অংশ বিশেষ।

গ. দ্রব্যটি এত জঘন্য যে, এটিকে মূল্য দিয়ে কেউ ক্রয় করুক শরীয়ত তা চায় না। যেমন- শুকর ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

ঘ. দ্রব্যটি এমন যার ভোগ ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় হারাম। যেমন- শরাব, মাদক দ্রব্য, মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত ইত্যাদি। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (হিদায়া দ্রষ্টব্য)

৫. লেনদেনের চুক্তিতে এমন কোন অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না; যা পরিণামে আত্মকলহ ও ঝগড়া বিবাদের কারণ হতে পারে। যেমন ঃ

ক. বেচাকেনার চুক্তিতে পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টিই অস্পষ্ট থাকা।

খ. যে পণ্য ক্রয়ের আগে দেখার প্রয়োজন ছিল তা না দেখে চূড়ান্তভাবে ক্রয় করা।

গ. পণ্যের অসম এককসমূহের মাঝে যে কোন একটি অনির্ধারিত ভাবে ক্রয় করা।

ঘ. পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টি হস্তগত হওয়ার পূর্বেই পূণরায় ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করা।

৬. বেচা-কেনার চুক্তিতে এমন কোন শর্ত জুড়ে দেয়া যাবে না যা উক্ত পণ্যের বেচা-কেনার চুক্তির সাথে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন ঃ কেউ একটি গাভী ১০০০ টাকায় এই শর্তে ক্রয় করল যে, গাভীটি আপনি দুই বছর লালন-পালন করে দিবেন কিংবা কেউ একটি গাভী ২০০০ টাকায় এই শর্তে বিক্রয় করল যে, আপনি আপনার তালগাছটি আমার কাছে বিক্রি করবেন ইত্যাদি।

৭. বেচা-কেনায় কোনরূপ ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতি ও ফটকাবাজী থাকতে পারবে না এবং এমন কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাবে না যা দ্বারা সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। -(ইসলাম কা ইকতিসাদী নেযাম থেকে সংক্ষেপিত)

এ ছাড়াও অনেক টুকিটাকি নীতিগত বিষয় রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কাকে বলে ঃ যেসকল প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা কর্মের দক্ষতা উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা কারবার বলে। যেমনঃ ছোট বড় সব ধরনের শিল্প কারখানা, অন্যান্য উৎপাদনশীল ক্ষেত্রসমূহ, ট্রেনিং সেন্টার, ব্যবসায়ী ভিত্তিতে গড়ে তোলা বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকান পাট ও সব ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা কারবার সংগঠন বলে।

মালিকানা ও পরিচালনার ভিত্তিতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ১. এক মালিকানা কারবার التجارة الشخصية ২. দ্বি-পাক্ষিক কারবার المضاربة ৩. শরীকানা কারবার المشاركة ৪. যৌথ মালিকানা কারবার كمپنى

www.eelm.weebly.com

১. এক মালিকানা কারবার (Private Propritorship) ঃ

আরবীতে একে (التجارة الشخصية) বলে। মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই এই এক মালিকানা কারবার প্রচলিত ছিল। যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একজন মাত্র মালিক থাকে এবং সে নিজেই একক উদ্যোগে পুঁজির যোগান, উদ্যোগ গ্রহণ, ঝুঁকি বহন ও ব্যবসার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে এ ধরনের কারবারকে বলা হয় এক মালিকানা কারবার। এ ধরনের ব্যবসায় মালিক একাই লাভ ক্ষতির ভাগী হয় বলে কারবারে তার দায়-দায়িত্ব অসীম। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হলেও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও দায়-দায়িত্ব পালনের বিষয়টি মালিকের উপর এককভাবে বর্তায়। সাধারণতঃ ছোট আকারের ও মাঝারি ধরনের কারবারগুলো এক মালিকানাভিত্তিক হয়ে থাকে।

এক মালিকানা কারবারের সুবিধা সমূহ ঃ এক মালিকানা কারবারে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যথা ঃ

ক. এর গঠন পদ্ধতি সহজ হয়ে থাকে। তাই যে কেউ তার সামর্থানুসারে এ ধরনের কারবারের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

খ. এতে স্বল্প পুঁজি খাটানো হয়, ফলে যে কেউ তার পুঁজির পরিমাণের ভিত্তিতে এ ধরনের কারবারে অবতীর্ণ হতে পারে।

গ. এক মালিকানা কারবারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কেননা এ ক্ষেত্রে অন্যের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

ঘ. এক মালিকানা কারবারে গোপনীয়তা রক্ষা করা সহজ হয়।

ঙ. নিজের ইচ্ছামত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়।

চ. ব্যবসায়ে নমনীয়তা অবলম্বন করা সহজ হয়। কেননা এতে অন্যের নিকট জবাবদিহির প্রশ্ন থাকে না।

এক মালিকানা কারবারের অসুবিধা সমূহ ঃ এক মালিকানা কারবারে কিছু অসুবিধা রয়েছে। যথা ঃ

ক. এতে ব্যবসায়ীকে অসীম দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়।

খ. অনেক সময় একার পক্ষে যথার্থ তত্ত্বাবধান সম্ভব হয় না।

গ. উদ্যোক্তা মালিককে একাই ঝুঁকি বহন করতে হয়।

ঘ. একক সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়।

ঙ. এতে শ্রম বিভাজনের সুবিধাগুলো থাকে না।

চ. পুঁজির স্বল্পতার কারণে ব্যবসার আয়তন সব সময় সীমিত থাকে।

www.eelm.weebly.com

এক মালিকানা কারবারে উপরোল্লিখিত অসুবিধাগুলো সত্ত্বেও এটি ব্যবসার অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত একটি পদ্ধতি। পৃথিবীর সর্বত্র এক মালিকানা কারবারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। কেননা এটি ঝামেলা মুক্ত।

২. দ্বি-পাক্ষিক কারবার বা (مضاربة) মুদারাবাহ ঃ

যে ব্যবসায় লভ্যাংশ হারাহারি বন্টনের শর্তে একপক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে আর অপর পক্ষ ব্যবসার যাবতীয় উদ্যোগ ও শ্রম ব্যয় করে তাকে মুদারাবাহ বা দ্বি-পাক্ষিক কারবার বলে। যিনি মূলধন সরবরাহ করেন তাকে 'রাব্বুল মাল' বা পুঁজির যোগানদাতা বলা হয় এবং যিনি শ্রম দেন তাকে মুদারিব বা কারবারী বলা হয়। এ ধরনের কারবারে মুদারিব বা কারবারীর দায় লভ্যাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, আর রাব্বুল মাল বা পুঁজির যোগানদাতার দায় মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ মুদারিবের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি ব্যতিরেকে স্বাভাবিক কারণে যদি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সেই ক্ষতির পরিমাণ যদি লভ্যাংশের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়ে কম হয় তাহলে উভয়পক্ষ এর দায়ভার বহন করবে। লভ্যাংশ যে হারে বন্টনের শর্ত থাকবে সেই হারে প্রত্যেকেই ক্ষতির দায়ভার বহন করবে। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ যদি লভ্যাংশের তুলনায় অধিক হয় অর্থাৎ যদি মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে মূলধন থেকে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার দায়ভার পুঁজির যোগনদাতাই বহন করবেন, মুদারিব বা কারবারী তা বহন করবে না। কেননা এই মূলধন মুদারিবের হাতে আমানত হিসেবে থাকে। আর ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ব্যতীত আমানতের মাল হালাক হলে তার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

ব্যবসার ক্ষেত্রে মুদারাবার এই প্রক্রিয়া ইসলামী অর্থনীতির এক প্রশংসনীয় সংযোজন। কেননা সমাজে এমন মানুষ অনেক আছে যাদের হাতে পুঁজি আছে; কিন্তু তারা ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতা রাখে না কিংবা রাখলেও কোন সঙ্গত কারণে তাদের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ফলে তাদের পুঁজি অথর্ব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। যেমন শিশু, দুর্বল, পঙ্গু, নির্বোধ রমণী ইত্যাদি। আবার অনেক মানুষ এমনও থাকে যারা বিপুল ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রাখে, কিন্তু পুঁজির যোগান দিতে পারে না বলে তারা ব্যবসা করতে পারে না। ফলে তারা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে হতাশ অসহায় জীবন যাপন করে। তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও শ্রম কোনভাবেই কাজে লাগে না। অথচ এই দু'য়ের সংযোগ ঘটলে পুঁজি সচল হত এবং পুঁজিহীনের দক্ষতা ও শ্রম কাজে লাগত। পরিণামে উভয়েই লাভবান হতে পারতেন। এতদুভয় দিক বিবেচনা করেই ইসলাম বাণিজ্যের এই পদ্ধতিকে অনুমোদন দিয়ে এ প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে।

www.eelm.weebly.com

আল্লামা কুরতুবী উল্লেখ করেছেন যে, لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض কিরাজ (অর্থাৎ মুদারাবা)-এর বৈধতার বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে কোনরূপ দ্বি-মত নেই। -বিদায়াতুল মুজতাহিদ ২য় খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা

মুদারাবার এই চুক্তি একজন পুঁজি বিনিয়োগকারী ও একজন কারবারীর মাঝে যেমন হতে পারে তেমনি একদল পুঁজি বিনিয়োগকারী ও একজন কারবারীর মাঝেও হতে পারে। আবার একদল পুঁজি বিনিয়োগকারী ও একদল কারবারীর মাঝেও সংঘটিত হতে পারে।

আবার এই চুক্তি নগদ মুদ্রা দিয়ে যেমন হতে পারে তেমনি পণ্য বা পণ্য উৎপাদনকারী কল-কব্জা ও মেশিনারী দিয়েও হতে পারে। যেমন ঃ একজন পুঁজির মালিক একটি ট্রাক কিংবা বাস ক্রয় করে একজন ড্রাইভারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন যে, এই ট্রাক কিংবা বাস তুমি তোমার তত্ত্বাবধানে রেখে পরিবহনের কাজ করবে, তাতে ব্যয় বাদে যে লভ্যাংশ থাকবে তা তোমার আর আমার মাঝে হারাহারি ভিত্তিতে বন্টিত হবে। অথবা একজনকে একটি মেশিন ক্রয় করে এই চুক্তিতে দেয়া যেতে পারে যে, এ দ্বারা তুমি উৎপাদন কর্ম আঞ্জাম দিবে। এতে ব্যয় বাদে যা লভ্যাংশ থাকবে তা তোমার আর আমার মাঝে হারাহারিভাবে বন্টিত হবে।

মুদারাবার শর্তসমূহ ঃ মুদারাবার অন্যতম শর্ত হল কারবার শুরু করার পূর্বেই লভ্যাংশ বন্টনের হার নির্ধারিত করে নিতে হবে। কে কত হারে লভ্যাংশ পাবে তা নির্ধারণের বিষয়টি উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের দ্বারা সাব্যস্ত হবে। পুঁজির মালিক তার পুঁজি খাটাবার জন্য যদি কোন নির্ধারিত পণ্যের ব্যবসার শর্তারোপ করেন কিংবা কোন নির্দিষ্ট নগরে ব্যবসার শর্তারোপ করেন তাহলে কারবারীকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আর যদি তিনি ব্যাপক অনুমতি প্রদান করেন যে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে এবং যে পণ্যের ইচ্ছা সে পণ্যের ব্যবসা করতে পারবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে কারবারী তার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ করতে পারবে। পুঁজির মালিকের বিনা অনুমতিতে কারবারী যদি ঋণ করে; আর ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সেই ঋণের দায়ভার কারবারীর উপর বর্তাবে, পুঁজির মালিকের উপর নয়। তবে যদি পুঁজির মালিকের অনুমতিক্রমে ঋণ করা হয় তাহলে লভ্যাংশ থেকে তা পরিশোধ করা সম্ভব হলে তার দায়ভার উভয়ের উপর বর্তাবে। কিন্তু যদি লভ্যাংশ দ্বারা তা পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে তার দায়ভার পুঁজির মালিকের উপর বর্তাবে।

www.eelm.weebly.com

৩. অংশীদারী কারবার বা শরীকানা কারবার (مشاركة) ঃ

যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক সাথে মিলিত হয়ে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তাহলে তাকে বলা হয় অংশীদারী কারবার। কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে (যাদের সংখ্যা ২ থেকে সর্বোচ্চ ২০ জন হতে পারে) সম্মিলিতভাবে ব্যবসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ একটি চুক্তিনামার মাধ্যমে এর সূচনা করে। উক্ত চুক্তিনামায় অংশীদারদের প্রদেয় মূলধনের পরিমাণ, দায়-দায়িত্ব, প্রয়োজনে অধিক মূলধন সংগ্রহের প্রক্রিয়া, লভ্যাংশ বন্টনের হার ও প্রক্রিয়া এবং নতুন অংশীদার গ্রহণের শর্ত ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে। অংশীদারী কারবারে দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশিদারের দায়িত্ব অসীম থাকে। সকল সদস্য সম্মিলিতভাবে অথবা সকল সদস্যের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সদস্য কারবার পরিচালনা করে থাকে।

অংশিদারী কারবারের প্রকারভেদ ঃ

ফিকাহ বিদগণ অংশিদারী কারবার (বা Partenar ship) কে মোট চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

১. **شركة المفاوضة বা সমঅংশিদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার** ঃ যে কারবারে সকল অংশিদার সমপরিমাণ পঁজি সরবরাহ ও সমহারে শ্রম দানের ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করে তাকে (شركة مفاوضة) বা সম অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার বলে। এ ধরণের কারবারে অংশিদারদের দায়ভার অসীম হয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যবসা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান ঋণী হয়ে পড়লে ঋণ পরিশোধের দায়ভার সকলকেই বহন করতে হবে। তা প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়ে থাকুক বা না থাকুক।

২. **شركة العنان বা অসমঅংশিদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার** ঃ যে যৌথ কারবারে সকল অংশিদার সমহারে শ্রমদান করলেও সরবরাহ কৃত পুঁজির হার অসম হয়, আর লভ্যাংশ মূলধনের অনুপাতে অথবা ব্যবসায়ী দক্ষতার ভিত্তিতে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ধার্যকৃত অনুপাতের ভিত্তিতে বন্টিত হয় তাকে শিরকাতে ইনান বা অসম অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার বলে। এ ধরণের কারবারেও অংশিদারদের দায়ভার অসীম হয়ে থাকে।

৩. **شركة الصنائع বা পেশাজিবীদের শরিকানা কারবার** ঃ যে কারবারে একই ধরণের পেশায় নিরত ব্যক্তিবর্গ কিংবা একাধিক পেশায় দক্ষ ব্যক্তিবর্গ এই

www.eelm.weebly.com

ভিত্তিতে একত্রে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় যে, সকলে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে যা উপার্জন হবে সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যয় নির্বাহের পর তারা তা নিজেদের মাঝে সমহারে অথবা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে ভাগ করে নেবে, তাহলে এ ধরণের কারবারকে পেশাজিবীদের শরিকানা কারবার বলে। যেমন-কয়েকজন দর্জি মিলে এই প্রক্রিয়ায় বৃহৎ পরিসরে একটি দর্জির দোকান চালু করতে পারে, অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ইলেকট্রিশিয়ান একজন রিপিয়ারিং-দক্ষ ব্যক্তি, একজন ফ্রীজ ইয়ারকণ্ডিশন মেকানিক মিলে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম খুলে বসতে পারে। এ প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র পেশাজিবীরা আপন পেশাকে বৃহৎমানে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। কেননা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি জনগণের আস্থা বেশী থাকে। এতে তাদের কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কর্মক্ষেত্র অধিক সম্প্রসারিত হয়। ফলে উপার্জন বৃদ্ধি পায়।

৪. شركة الوجوه বা ব্যবসায়ী সুনামের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার ঃ এমন একাধিক ব্যক্তি যাদের মূলধন নেই তবে এমন ব্যবসায়ী Good will বা এমন সুনাম রয়েছে যে, পাইকারী বিক্রেতাদের থেকে মালামাল বাকীতে এনে ব্যবসা করতে পারে; এ ধরণের একাধিক ব্যক্তি যদি এই ভিত্তিতে যৌথ ভাবে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাকীতে দ্রব্য এনে ব্যবসা করার পর দেনা পরিশোধ এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় বাদে যা লাভ দাড়াবে তারা তা নিজেদের মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বন্টন করে নিবে তাহলে এধরণের কারবারকে ব্যবসায়ী সুনামের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবার বলা হয়।

অংশিদারী কারবারের সুবিধা সমূহ ঃ অংশিদারী কারবারের সুবিধা এই যে, অধিক পরিমাণে পুঁজি যোগন দেয়া ও বৃহৎমানে কারবার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া এতে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়, যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, শ্রম বিভাজন করে কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়, মোটা অংকের ঋণ সুবিধা পাওয়া যায়, ঝুঁকিবন্টন হয়ে যাওয়ার কারণে প্রত্যেকের রিস্ক কমে যায়-ইত্যাদি সুবিধা থাকে।

অংশিদারী কারবারের অসুবিধা সমূহ ঃ অংশিদারী কারবারে যেমন সুবিধা রয়েছে তেমন কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন-এতে প্রত্যেকের দায়ভার অসীম থাকে, মতানৈক্যের সম্ভাবনা থাকে, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে দ্বিমতের সম্ভাবনা থাকে ও

www.eelm.weebly.com

অনীহা দেখা দেয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের মতামতের জন্য অপেক্ষা জনিত বিলম্ব হয়, যখন তখন পৃথক হওয়ার সুযোগ থাকে না-ইত্যাদি সমস্যা এতে রয়েছে।

এই চার প্রকার অংশিদারী কারবারের প্রথম দুটিতে উৎপাদনের প্রধান দুই উপকরণ অর্থাৎ মূলধন ও শ্রম দুটোই বিদ্যমান থাকে। তৃতীয় প্রকার কারবারে মূলধন থাকেনা থাকে শুধু শ্রম আর চতুর্থ প্রকার কারবারে মূলধনের পরিবর্তে থাকে ব্যবসায়ী সুনাম আর শ্রম। সুনাম যদিও পৃথক ভাবে মূল্যমান বহণ করে না তবে অর্থোপার্জনে তা দ্বারা সহযোগিতা হয়। তাই ব্যবসায়ী সুনামই এক্ষেত্রে মূলধনের ভূমিকা পালন করে।

৪. যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানী

কোম্পানীকে আরবীতে الشركة বলা হয়ে থাকে। كمبنى কোম্পানী শব্দটি অভিধানে সাথী-সঙ্গীবৃন্দ, কর্মোদ্যোগে শরীক ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কোন কোন দোকানের সাইনবোর্ডে 'আব্দুল্লাহ এন্ড কোম্পানী' এ ধরনের লেখা থাকে। এদ্বারা মূলতঃ কর্ম উদ্যোগে শরীক ব্যক্তিবর্গ এই অর্থই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এন্ড শব্দটি বাদ দিয়ে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে কোম্পানী শব্দটি লেখা হয় তখন এ দ্বারা অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে কোম্পানী বলে সেটাই উদ্দেশ্য হয়। যেমন ঃ বাটা কোম্পানী, গ্লাক্সো কোম্পানী ইত্যাদি।

কোম্পানী শব্দটি ফিক্‌হের পরিমন্ডলে নবাগত। ফিক্‌াহ শাস্ত্রের পুরনো গ্রন্থাদিতে এ শব্দটি বিদ্যমান নেই। বস্তুতঃ ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের বিকাশের পর সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপনের জন্য যখন বৃহদংকের পুঁজির প্রয়োজন দেখা দেয়- যা কোন এক ব্যক্তির একার পক্ষে যোগান দেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না- ঠিক তখনই সাধারণ মানুষের হাতে প্রয়োজন নির্বাহের পর বেঁচে থাকা বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় পুঁজিসমূহকে একত্রিত করে সঙ্গবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ সম্মিলিতভাবে লাভবান হওয়ার চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই চেতনা থেকেই কোম্পানীর সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে এই কোম্পানীগুলো আধাসরকারি ছিল। সরকারি চার্টার্ড (অনুমতিনামা)-এর আওতায় আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কোম্পানী গঠন করা হত। তখন কোম্পানীকে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়া হত। অনেক সময় ব্যবসায়ী নীতি-নির্ধারণ, মুদ্রা প্রবর্তন, এমনকি

www.eelm.weebly.com

সৈন্য-সামন্ত গড়ে তোলার স্বাধীনতাও তাদের থাকত। বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে কোম্পানী গঠনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় 'বেশিসংখ্যক ব্যক্তি যৌথভাবে কোন কারবার গড়ে তুললে তাকে যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানী বলে'। এ ধরনের কোম্পানী সরকারি অনুমোদন লাভের পর পৃথক একটি আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তাকে আইনগতভাবে ব্যক্তিসত্তার ন্যায় মর্যাদা দেয়া হয়। এরপর উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত পুঁজি ও জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানীর পুঁজি সংগ্রহ করা হয়। সঙ্গত কারণেই সকল শেয়ারারের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ সমান হয় না। কারো বেশি কারো কম। প্রত্যেক শেয়ারার তৎকর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের আনুপাতিক হারে কোম্পানীর অংশীদার হয়ে থাকে। যেহেতু এ কারবারে বহুসংখ্যক অংশীদার থাকে তাই এর পরিচালনার ভার শেয়ারারগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি পরিচালকমন্ডলীর উপর ন্যাস্ত করা হয়। পরিচালকমন্ডলী নিজেদের থেকে একজনকে চীফ এক্সিকিউটিভ (Chife Execetive) নির্বাচন করে। আইনগতভাবে এই পরিচালকমন্ডলীই এই প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বার অভিভাকত্ব করে এবং তত্তাবধান করে। এ কারণেই সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, দাবি-দাওয়া ও কাগজ-পত্র কোম্পানীর নামে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে নয়। এ কারবারে প্রত্যেক শেয়ারারের দায় বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে কোম্পানীর দায়ভার ও তার মূল এ্যাসেট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে গেলে এবং ঋণী হয়ে পড়লে শেয়ারারদের কাছ থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের চেয়ে বেশি আদায় করা যাবে না এবং কোম্পানীর এ্যাসেটের বাইরে পাওনাদারদের কোন দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। পাওনাদাররা কোম্পানীর এ্যাসেটের মূল্য থেকে ঋণের পরিমাণ অনুপাতে তাদের পাওনা টাকা ফেরত পাবে। এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু পাবে না। এ কারণেই কোম্পানীর শেষে 'লিমিটেড' শব্দটি উল্লেখ করতে হয়। যাতে লেন-দেনকারীরা পূর্ব থেকেই বুঝে শুনে এই কোম্পানীর সাথে লেন-দেন করে। কারবারের লভ্যাংশ অংশীদারদের মাঝে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হয়। এ ধরনের কোম্পানী দেশের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীসমূহ থেকে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে পুঁজি সংগ্রহ করে থাকে।

কোম্পানী ও শিরকতের মাঝে পার্থক্য ঃ বাহ্যত এ ধরনের কোম্পানীকে (شركت عنان)অসম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শরীকানা কারবার -এর অনুরূপ মনে হলেও কোম্পানী ও শিরকতের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। যথা ঃ

www.eelm.weebly.com

১. শরীকানা ব্যবসার পৃথক সত্তাগত কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই প্রত্যেক শরীক কারবারের সকল এ্যাসেটেই হারাহারিভাবে মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। প্রত্যেক শরীক অপরাপর অংশীদারদের অংশের উপর ওকীল (وكيل) হিসেবে লেন-দেনের অধিকার লাভ করে। এতে প্রত্যেক শরীকের দায়-দায়িত্ব অসীম অর্থাৎ কারবার করতে যেয়ে ঋণ হয়ে গেলে তা পরিশোধের ব্যাপারে সকল অংশীদার সমানভাবে দায়বদ্ধ।

কিন্তু কোম্পানী এর বিপরীত। কেননা কোম্পানীর আইনগত সত্তা হিসেবে একটি পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। আবার এতে অংশীদারদেরও পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। শেয়ারাররা এই অর্থে কোম্পানীর অংশীদার যে, যদি কোম্পানী ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং তার এ্যাসেট অংশীদারদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে শেয়ারাররা মূলধনের আনুপাতিক হারে তার প্রাপক হবেন। কিন্তু কোম্পানী ভেঙ্গে দেয়ার পূর্বে শেয়ার সার্টিফিকেটধারী কোন ব্যক্তির জন্য কোম্পানীর মূলধনে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে না। এ কারণে কোন শেয়ারার কারো কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণী হয়ে পড়লে (যদি সে তা স্বেচ্ছায় আদায় না করে তাহলে) তার সম্পদ ক্রোক করা হবে, এমনকি তার হাতে যে শেয়ার সার্টিফিকেট থাকবে তাও ক্রোক করা হবে; কিন্তু এই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে শেয়ারার হিসেবে কোম্পানীর সম্পদে তার যে অংশ রয়েছে তা ক্রোক করা যাবে না। কেননা কোম্পানীর সম্পদের উপর হস্তক্ষেপের কোন অধিকার তার নেই।

২. শরীকানা কারবারে কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনতে হয় তাহলে সকল অংশীদারদেরকে বিবাদী হিসেবে ধরেই তা আনা হয়। আবার কারবারী প্রতিষ্ঠান যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চায় তাহলে সকল শরীককে বাদী হয়ে এ অভিযোগ পেশ করতে হয়। কিন্তু কোম্পানীতে বাদী কিংবা বিবাদী খোদ কোম্পানী হয়, শেয়ারাররা হয় না। কেননা কোম্পানী নিজেই একটি আইনগত সত্তার মর্যাদা রাখে। তবে এই আইনগত সত্তার পক্ষ থেকে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করে পরিচালনা বোর্ড কিংবা তাদের নির্বাচিত কোন ব্যক্তি।

৩. শরীকানা ব্যবসায় কোন এক অংশীদার যদি তার শরীকানা প্রত্যাহার করে তার যাবতীয় পাওনা লাভে আসলে উঠিয়ে নিতে চায় তাহলে সে তা করতে পারে। কিন্তু কোম্পানী থেকে যদি কোন শেয়ারার তার শেয়ার প্রত্যাহার করতে চায় তাহলে তাকে তার পাওনা ফেরৎ দেয়া হয় না। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে তার শেয়ার অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করে দিতে পারে।

www.eelm.weebly.com

৪. শরীকানা ব্যবসায় দায়ভার কারবারের সমুদয় সম্পদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এতে দায়ভার থাকে অসীম। কিন্তু কোম্পানীর দায়ভার তার সমুদয় সম্পদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

এই ৪টি ব্যবধানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মৌলিকভাবে ব্যবধানের ভিত্তি দু'টি বিষয়।

১. কোম্পানীর আইনগত সত্ত্বার বিষয়।

২. দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়।

অর্থাৎ শরীকানা কারবার ও কোম্পানীর মাঝে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ে বৈপরিত্য রয়েছে। সুতরাং কোম্পানীর বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়টি এ দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। যদি এ দু'টি বিষয়ের বৈধতা প্রমাণ করা যায় তাহলে মৌলিকভাবে কোম্পানী বৈধ হবে। অন্যথায় বৈধ হবে না।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানীর বৈধতা ঃ বস্তুতঃ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদরা শরীকানা ব্যবসার মূল ৫টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ (১) মুদারাবাহ, (২) শিরকতে মুফাওয়াযাহ (৩) শিরকতে ইনান (৪) শিরকতে চানায়ে (৫) শিরকতে উয্হ।

আর আমরা একথাও উল্লেখ করেছি যে, কোম্পানী শিরকতের কোন এক পদ্ধতির সাথেই সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এই বৈসাদৃশ্যতার উপর ভিত্তি করে বর্তমান কালের আলেম উলামাগণ এ ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত উল্লেখ করেছেন যা আমরা নিম্নে তুলে ধরলাম।

১. ফিকাহ্বিদদের এক শ্রেণীর অভিমত এই যে, যেহেতু কোম্পানী শিরকতের কোন এক প্রক্রিয়ার সাথেও হুবহু মিলে না, অতএব এটি বৈধ হবে না।

২. অন্য এক দল ফিকাহ্বিদদের অভিমত এই যে, মৌলিকত্বের বিচারে কোম্পানী 'শিরকতে ইনানেরই' অন্তর্ভুক্ত। যদিও কোম্পানীর কিছু কিছু বিষয় এরূপ রয়েছে যা শিরকতে ইনানে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কারণে এটি মৌলিকভাবে শিরকতে ইনানের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যায় না।

৩. গবেষক শ্রেণীর একদল ফিকাহ্বিদ মনে করেন যে, শুধু এই কারণে কোম্পানীকে অবৈধ ঘোষণা করা যায় না যে, এটি ফিকাহবিদদের বর্ণিত পাঁচ প্রকারের কোন এক প্রকারের সাথে হুবহু মিলে না। কেননা ফিকাহবিদদের এই বিভাজন মূলতঃ শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত ও নির্ধারিত নয়। বরং ফিকাহ্বিদরা সমকালে প্রচলিত শরীকানা ব্যবসার প্রক্রিয়া সমূহের উপর গবেষণা করে এই পাঁচ প্রকারকে বৈধ প্রক্রিয়া হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

www.eelm.weebly.com

তাদের কিতাবাদিতে কোথায়ও একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, শরীকানা ব্যবসার পদ্ধতি এই পাঁচটিই হবে, এর বাইরে নয়। অতএব অগ্রসরমান পৃথিবীতে যদি শরীকানা ব্যবসার এমন কোন নতুন পন্থার উদ্ভব হয় যা এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ ফিকাহ্শাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক শরীকানা ব্যবসার যে মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তার বিরোধীও নয়; তাহলে তা অবশ্যই বৈধ হবে। সুতরাং কোম্পানী বৈধ কি অবৈধ তা নিরূপণ করার জন্য কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য তার পুঁজি সংগ্রহের প্রক্রিয়া, তার লাভ্যাংশ বিভাজনের প্রক্রিয়া বিনিয়োগকারীদের অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে দেখতে হবে, যদি সেগুলো শরীতের পরিপন্থী না হয় তাহলে তা বৈধ হবে। আর মৌলিকত্বের বিচারে বৈধ হওয়া প্রমাণিত হওয়ার পর যদি আনুসঙ্গিক কোন ক্ষেত্রে অবৈধ কিছু থাকে তাহলে তাকে এড়িয়ে কিংবা বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে তাই করতে হবে।

আমরা একটু আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, মৌলিকত্বের বিচারে শিরকতের সাথে কোম্পানীর দু'টি বিষয়ে বৈপরিত্য রয়েছে। যথা ঃ

১. কোম্পানীর আইনগত সত্তার বিষয় ঃ

বস্তুত শরীকানা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পৃথক কোন আইনগত অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু কোম্পানীর আইনগত পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে যে, শরীয়তে ব্যক্তি থেকে পৃথক কোন আইনগত সত্তার অস্তিত্বের নযীর বিদ্যমান আছে কি না? গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শরীয়তে আইনগত সত্তা (شخص قانونى) -এর এই নির্দিষ্ট পরিভাষাটি বিদ্যমান না থাকলেও মূল বিষয়টির অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। যেমন .

(ক) ওয়াক্ফ (وقف) ঃ বস্তুতঃ ওয়াক্ফের জন্য আইনগত সত্তা (شخص قانونى) এই পরিভাষা প্রয়োগ করা না হলেও মূলতঃ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি আইনগত সত্তার মর্যাদা রাখে। কেননা ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যা কিছু দান করা হয়; তার মালিক হয় ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান এবং দানকৃত বস্তুসমূহ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের মামলূক বা মালিকানাধীন বস্তু বলে গণ্য হয়। ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান দেনাদার ও পাওনাদার হয়ে থাকে। যেমন ঃ কেউ যদি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের কোন যমীন বা দোকান ভাড়া নেয়, তাহলে এই ভাড়ার টাকার পাওনাদার হয় ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান; অনুরূপভাবে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন প্রতিষ্ঠানের নিকট

www.eelm.weebly.com

পাওনা থাকে। সে হিসেবে প্রাতষ্ঠান তাদের দেনাদার। কোন বিষয়ে আদালতে মৃভ করার জন্য ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান বাদী ও বিবাদী হয়ে থাকে। মুতাওয়াল্লী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানে আইনগত সত্তার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে

(খ) বায়তুলমাল ঃ বায়তুলমালের সম্পদে যদিও সমগ্র জাতির অধিকার সংশ্লিষ্ট রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথকভাবে এই সম্পদের মালিকানার দাবি করতে পারে না বরং এই সম্পদের মালিক বায়তুলমালই হয়ে থাকে। বায়তুল মালও দেনাদার পাওনাদার হয়ে থাকে। এমন কি বায়তুলমালের যে দু'টি প্রধান বিভাগ থাকে যথা- সাদকা ফান্ড ও রাজস্ব ফান্ড-এর প্রত্যেকটিকে একটি পৃথক আইনগত সত্তার মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লামা যাইলায়ী উল্লেখ করেছেন যে "যদি বায়তুলমালের কোন এক ফান্ডে অর্থ সংকট দেখা দেয় তাহলে প্রয়োজনবোধে অন্য ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করা যাবে। যে ফান্ড থেকে ঋণ নেয়া হবে সে ফান্ড হবে পাওনাদার আর যে ফান্ডের জন্য নেয়া হবে সে ফান্ড হবে দেনাদার।"[১] আর দেনাদার ও পাওনাদার হওয়া মূলতঃ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বুঝা যায় যে, বায়তুল মালকে আইনগত সত্ত্বার মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

(গ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ ঃ এ বিধান শরীয়তে সর্বস্বীকৃত যে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঋণ রেখে গেলে প্রথমে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করা হবে। ঋণ আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করা হবে। ঋণ আদায় করার পর যদি কিছু না থাকে তাহলে উত্তরাধিকারীরা কিছুই পাবে না। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতারা পাওনাদার, কিন্তু তাদের ঋণ আদায়ের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ ছাড়া কেউ দেনাদার নেই। কেননা কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে সে আর দেনাদার থাকে না, আবার ঋণ আদায়ের পূর্বে উত্তরাধিকারীরাও দেনাদার বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা তারা এখনও উত্তরাধিকার লাভ করেনি। তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে আইনগত দেনাদার সাব্যস্ত করা বা আইনগত সত্তার মর্যাদা দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। উপরোক্ত নযীরসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আইনগত সত্তার বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও স্বীকৃত একটি বিষয়।

২. দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয় ঃ

শিরকতের সাথে কোম্পানীর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দ্বিতীয় বিষয়টি হল কোম্পানীর দায়ভার তার সমুদয় সম্পদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়। তাই যদি কোম্পানী

---

১. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খণ্ডঃ ৩ পৃষ্ঠাঃ ২৮৩।

www.eelm.weebly.com

অচল হয়ে পড়ার কারণে তা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তাহলে কোম্পানীর সমূদয় সম্পদ বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে তাতে যদি অন্যান্য পাওনাদার ও শেয়ারারদের সম্পূর্ণ পাওনা আদায় না হয়, তাহলে পাওনাদাররা ঋণের আনুপাতিক হারে উক্ত টাকা ভাগাভাগি করে নিবেন। এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু তারা পাবেন না। বস্তুতঃ এতে পাওনাদারদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা কোম্পানী যদি ঋণী হয়ে পড়ে আর কোম্পানীর সমূদয় সম্পদ বিক্রি করে তা পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত ঋণের দায়ভার শেয়ারারদের উপর চাপানো যাবে না; অর্থাৎ ঋণ আদায় করার জন্য প্রদত্ত পুঁজির অতিরিক্ত কিছু তাদের থেকে দাবি করা যাবে না। ফলে ঋণদাতারা অপরিহার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং সীমাবদ্ধ দায়ভারের বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে।

গভীর অনুসন্ধানের দ্বারা দেখা যায় যে, এরও নযীর শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবসায় পুঁজির মালিক (رب المال) যদি কারবারী বা (مضارب) কে অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয়, তাহলে পুঁজির মালিকের দায়ভার তাঁর প্রদত্ত মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ পুঁজির মালিক ঋণ করার অনুমতি দেয়নি এমতাবস্থায় কারবার করতে যেয়ে যদি কারবারী এই পরিমাণ ঋণী হয়ে যায় যা লভ্যাংশ ও সমূদয় মূলধন দিয়েও পরিশোধ হয় না, তাহলে এই অতিরিক্ত ঋণের দায়ভার কারবারীকে বহন করতে হবে, পুঁজির মালিক এর দায়ভার বহন করবে না।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকাল অধিকাংশ কোম্পানীই শেয়ার ছাড়ার আগে তাদের প্রসপেক্টটাস প্রকাশ করে থাকে। তাতে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ থাকে যে, কোম্পানী প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। অতএব এর অর্থ হল শেয়ারারদের দায়ভার মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি কোম্পানীতে বিদ্যমান থাকে না। এর জবাব সহজেই দেয়া যায় যে, প্রসপেক্টটাসেই উল্লেখ থাকে যে, শেয়ারারদের দায়ভার প্রদত্ত পুঁজি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব এই অনুমতির অর্থ হল, কোম্পানী ঋণ করলে তার দায়ভার শেয়ারাররা বহন করবে না। অতএব শেয়ারারদের দায়ভার তাদের মূলধন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঝটিল প্রশ্ন যেটি থেকে যায় তা হল এই যে, মুদারাবায় পুঁজির মালিকের দায়ভার সীমাবদ্ধ হলেও মুদারিব বা কারবারীর দায়ভার এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয় না। অর্থাৎ পাওনাদাররা তাদের টাকা মুদারিব বা কারবারী থেকে আদায় করার অধিকার রাখে। ফলে তাদের পাওনা টাকা গচ্ছা যায় না; কিন্তু কোম্পানীতে ম্যানেজিং বোর্ডের দায়ভারও সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ

www.eelm.weebly.com

কোম্পানীর সমূদয় সম্পদের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণের দায়ভার তারাও বহন করে না। ফলে পাওনাদারদের হক বিনষ্ট হয়। তাদের পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং এটি বৈধ হবে কি না?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হবে। হিদায়া গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ অন্যের কাছে ঋণী থাকে, আর আইনের দৃষ্টিতে সে দেওলিয়া বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে পাওনাদাররা তার বর্তমানে বিদ্যমান সমূদয় সম্পদ বিক্রি করে তাদের পাওনার পরিমাণের আনুপাতিক হারে উক্ত টাকা ভাগ-বন্টন করে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ তার সমূদয় সম্পদ বিক্রি করেও সকল পাওনাদারের পাওনা টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হলে প্রত্যেকের পাওনা টাকার আনুপাতিক হারে যা আছে তাই ভাগ করে নিবে। তাদের অবশিষ্ট টাকা গচ্ছা যাবে। এ ক্ষেত্রেও পাওনাদারদের অধিকার বিনষ্ট হচ্ছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু যেহেতু দেনাদার দেওলিয়া সাব্যস্ত হয়েছে অতএব এ ক্ষতি মেনে নেয়ার জন্য শরীয়ত তাদেরকে বাধ্য করেছে। তবে যদি সে ব্যক্তি আবার স্বচ্ছল হয় তাহলে পাওনাদাররা তাদের অবশিষ্ট পাওনা টাকা দাবি করতে পারবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের ঐ টাকা ফিরে পাওয়ার আর কোন ব্যবস্থাই থাকে না। এ প্রেক্ষিতে কোম্পানীও যেহেতু একটি ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা লাভ করেছে; আর দেওলিয়া হয়ে কোম্পানী তার কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং কোম্পানী ভেঙ্গে দেয়ার মাঝ দিয়ে তার আইনগত মৃত্যু ঘটেছে। অতএব পাওনাদারদের এ ক্ষতি মেনে নিতে হবে। যেমন দেওলিয়া ব্যক্তির বেলায় তা মেনে নিতে হয়।

দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার এর চেয়েও উৎকৃষ্ট নযীর ফিকাহ শাস্ত্রে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- কোন মালিক যদি তার গোলামকে ব্যবসা করার অনুমতি দেয় তাহলে গোলাম মালিকের হয়ে ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু ব্যবসা করতে যেয়ে যদি সে ঋণী হয়ে পড়ে তাহলে তার দায়ভার গোলামের মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ব্যবসার মাল বিক্রি করে ঋণ আদায় না হলে গোলামকে বিক্রি করে তা আদায় করা হবে। এতেও পাওনাদারদের পাওনা আদায় না হলে, সকল পাওনাদার ব্যবসার সম্পদ ও গোলামের মূল্য বাবৎ প্রাপ্ত টাকা তাদের পাওনার হার অনুসারে হারাহারিভাবে বন্টন করে নিবে। অবশিষ্ট পাওনা টাকা তারা মালিকের নিকট দাবি করতে পারবে না। মালিক এই জন্য দায়ী হবে না। যদিও গোলাম ও ব্যবসা মালিকেরই ছিল। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ক্ষেত্র বিশেষে দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত।

www.eelm.weebly.com

তাছাড়া যারা কোম্পানীর সাথে লেনদেন করেন তারা বুঝে শুনেই করেন যে, কোম্পানীর দায় সীমাবদ্ধ। তাই ঋণদাতারা কোম্পানীর ব্যালেন্স সীট দেখে তার বর্তমান পজিশন কি, কোম্পানী হঠাৎ দেওলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করেই কোম্পানীর সাথে লেন-দেন করে থাকে। সুতরাং এখানে ধোকা কিংবা প্রতারণার কোন বিষয় বিদ্যমান থাকে না। তাই বলা যায় যে,কোম্পানীর দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত।

এই দীর্ঘ পর্যালোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মূলগত দিক থেকে কোম্পানীর বৈধতার বিষয়টি ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। এরপর আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, এর গঠন প্রক্রিয়া, পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি, শেয়ার বিক্রয় ও লভ্যাংশ বিভাজনের ক্ষেত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া বিদ্যমানরয়েছে কি না যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তাই আমরা পর্যায়ক্রমে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

কোম্পানী গঠন পদ্ধতি

প্রথমতঃ কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি কোম্পানী গঠনে একমত হয়ে কি ধরনের কোম্পানী গঠন করা হবে এ বিষয়টি সিদ্ধান্ত করেন। অতঃপর যে ধরনের কোম্পানী গঠন করা হবে সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এর সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য একটি রিপোর্ট তৈরী করানো হয়। যাকে ফ্যাসিবিলিটি রিপোর্ট (Feasibility Reoprt) বলা হয়। এই রিপোর্টে এ ধরনের কোম্পানী স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে কতটা সম্ভাবনাময়, এর জন্য কি কি উপকরণের প্রয়োজন হবে, কি পরিমাণ মূলধনের ও পুঁজির প্রয়োজন হবে, ব্যবসায়ী দিক থেকে এই কোম্পানী কতটা লাভজনক হবে ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

উদ্যোক্তাদের নিকট এই রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে কোম্পানীর একটি মৌলিক রূপরেখা তৈরী করা হয়। যাতে কোম্পানীর নাম, কারবারের ধরন, প্রস্তাবিত মূলধনের পরিমাণ, ডাইরেক্টরী বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া, তাদের কার্যকাল, ভবিষ্যৎ নির্বাচন প্রক্রিয়া, পদচ্যুতি ও অপসারণের কারণ ও পদ্ধতি, মূলধন গঠনের পদ্ধতি; হিসাব নিকাশ পদ্ধতি, বিলুপ্তি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে। একে আধুনিক পরিভাষায় ম্যামোরেন্ডাম (MAMORANDUM) বলে। অতঃপর কোম্পানীর পরিচালনা বিধি তৈরি করা হয়। একে আর্টিকেলস অফ এ্যাসোসিয়েশন (Articles of Association) বলা হয়।

www.eelm.weebly.com

ম্যামোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন সংযুক্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত কোম্পানী আইন অধিদপ্তরের বরাবরে মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করতে হয়। মন্ত্রণালয় থেকে মঞ্জুরী পাওয়া গেলে কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করে। তখন থেকে এটি একটি আইনগত সত্তারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। পরিভাষায় একে লিগেল পার্সন (Legel Person) অথবা জুরিডিকেল পার্সন (Jurdical Person.) (আরবীতে الشخص القانونى) বলে।

কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করার পর শেয়ার ছাড়ার আগে তার প্রসপেক্টাস প্রকাশ করা অপরিহার্য, যাতে কোম্পানীর যাবতীয় কার্যক্রমের রূপরেখা এবং কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকে। এতে সর্বসাধারণ কোম্পানী ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে এবং কোম্পানীর উপর আস্থাশীল হতে পারে। (আরবীতে একে (نشرة الاصدار) বলে।

কোম্পানীর পুঁজি গঠন ঃ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যখন কোম্পানীর অনুমোদন দেয় তখন উক্ত কোম্পানী সর্বোচ্চ কত মূলধন বিনিয়োগ করতে পারবে তা নির্ধারণ করে দেয়। একে অনুমোদিত মূলধন, ইংরেজিতে Authorised capital) আরবীতে رأس المال المصرح به বলে। এই অনুমোদিত মূলধন কয়েকভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. মূলধনের একাংশ খোদ উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে থাকেন। একে স্পন্সার্স কেপিটেল (Sponsors capital) বলে।
২. মূলধনের মুখ্য অংশ জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে সংগ্রহ করা হয়।
৩. কোন কোন কোম্পানী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েও (আংশিক) পুঁজি সংগ্রহ করে।

কোম্পানী অনুমোদিত মূলধনের সবটাই একবারে সংগ্রহ করে না বরং অনুমোদিত মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাথমিক পর্যায়ে সংগ্রহ করার জন্য বরাদ্দ করা হয়। একে বরাদ্দকৃত মূলধন; ইংরেজিতে Issued capital আরবীতে رأس المال المعروض বলে। উদাহরণ হিসেবে যদি একটি কোম্পানী ১০০ কোটি টাকার পুঁজি সংগ্রহের অনুমতি পেয়ে থাকে তাহলে ১০০ কোটি টাকা তার অনুমোদিত মূলধন। অতঃপর যদি কোম্পানী প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তাহলে এই ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দকৃত মূলধন। এই বরাদ্দকৃত মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উদ্যোক্তারা যোগান দিয়ে থাকেন। ধরা যাক তার পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। তাহলে এই ১০ কোটি টাকাকে বলা হবে স্পন্সার্স কেপিটেল (Sponsors capital)। অবশিষ্ট ৪০ কোটি টাকাকে ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে

www.eelm.weebly.com

শেয়ার হিসেবে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়। ক্রেতারা প্রথমে কোম্পানীর সাথে শেয়ার ক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হন : এতে তারা ক্রেতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায় তাকে বলা হয় 'সাবসক্রিবড কেপিটেল' (Subscribed capital)। ধরা যাক যদি উক্ত ৪০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রয়ের তালিকাভুক্ত হয়ে যায় তাহলে পুরোটাই Subscribed capital।

যারা শেয়ার ক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাদেরকে তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য করা হয় না। কখনো কখনো তা ক্রমান্বয়ে আদায় করা হয়। তালিকাভুক্ত ক্রেতাদের থেকে যারা শেয়ারের মুল্য পরিশোধ করে দেয় তারা কোম্পানীর শেয়ারার হিসেবে গণ্য হয়। পুঁজির যে অংশ শেয়ার াররা আদায় করে দেয় তাকে বলা হয় পরিশোধিত মূলধন বা Paid up capital। ধরা যাক ৪০ কোটি টাকার মাঝে ৩০ কোটি টাকা ক্রেতারা পরিশোধ করে দিয়েছে; তাহলে এই ৩০ কোটি টাকা হবে পরিশোধিত মূলধন বা (Paid up capital)।

বরাদ্দকৃত শেয়ারের চেয়ে ক্রয়ের আবেদন যদি অধিক হয় তাহলে লটারীর মাধ্যমে শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অনেক সময় কোম্পানীরব উদ্যোক্তাদের এরূপ আশংকা থাকে যে, যে পরিমাণ শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে তার সবগুলোর ক্রেতা হয়ত পাওয়া যাবে না। তখন কোম্পানী ব্যাংক কিংবা অন্য কোন অর্থযোগানদাতা সংস্থার সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, যে পরিমাণ শেয়ার অবিক্রিত থাকবে তা তারা ক্রয় করে নিবেন। তবে এ জন্য তাদেরকে মূল পুঁজির শতকরা এক টাকা কিংবা দুই টাকা হারে কমিশন দিতে হবে। পরে যদি সব শেয়ার বিক্রি হয়ে যায় তাহলে তো হল, আর যদি বিক্রি না হয় তাহলে অবিক্রিত শেয়ারগুলো চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক বা সংস্থা ক্রয় করে নেয় এবং তারা তাদের দায়িত্বে এগুলো অন্য ক্রেতার নিকট বিক্রি করে দেয়। ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের প্রয়োজন হোক বা না হোক উক্ত চুক্তির কারণে ব্যাংককে কমিশন অবশ্যই পরিশোধ করতে হোক পরিভাষায় এই চুক্তিকে আন্ডার রাইটিং (আরবীতে ضامن الاكتاب) বলা হয়। এ ধরনের আন্ডার রাইটিং একাধিক সংস্থা থেকেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

যারা শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করে কোম্পানীর অংশীদার হয়ে যায় তাদেরকে পরিশোধিত মূল্যের বিনিময়ে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উক্ত সার্টিফিকেটে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করে দেয়া হয়। এই মূল্যকে পরিভাষায় 'ফেইজ ভ্যালু' (Face Value) বা 'পার ভ্যালু (Per Value) বলা হয়।

সাধারণতঃ দুই ধরনের শেয়ার সার্টিফিকেট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এক ধরনের শেয়ার সার্টিফিকেটে শেয়ারারের নাম লিখে দেয়া হয়। এ ধরনের শেয়ার কে রেজিস্টার্ড শেয়ার (আরবীতে السهم المسجل) বলা হয়। আর এক ধরনের

www.eelm.weebly.com

সার্টিফিকেট এভাবে ইস্যু করা হয় যে, শেয়ারের মূল্য সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকে কিন্তু শেয়ারারের নাম তাতে উল্লেখ থাকে না। এ ধরনের শেয়ারকে 'বিয়ারার শেয়ার' (Bearer Share) আরবীতে (السهم الحاملة) বলা হয়।

লভ্যাংশের পরিমাণ ও আইনগত অধিকারের প্রশ্নে শেয়ারারদেরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা ঃ

১. **অর্ডিনারী শেয়ার (Ordinary Share)ঃ** আরবীতে (السهم العادى)। (উপরে যে ধরনের শেয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর সবগুলোই অর্ডিনারী শেয়ার)।

২. **প্রিফারেন্স শেয়ার (Preferenc Share) ঃ** যাকে আরবীতে (السهم الممتاز) বলা হয়।

প্রিফারেন্স শেয়ার ারকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কোন অর্থযোগানদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তাদেরকে এই প্রিফারেন্স শেয়ার প্রদান করা হয়। কেননা সাধারণ শেয়ারাররা যেভাবে শেয়ার ক্রয় করতে সম্মত হয় অর্থ যোগানদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো সেভাবে শেয়ার ক্রয় করতে সম্মত হয় না। কারণ সাধারণ শেয়ারারদের লভ্যাংশ নির্ধারিত থাকে না। এমনকি লোকসানেরও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া কোম্পানীর নীতি নির্ধারণী প্রশ্নে সাধারণ শেয়ারারদের কোন দখল থাকে না। আবার সাধারণ ঋণদাতাদের ন্যায় স্বল্প সূদে টাকা বিনিয়োগ করতেও তারা সম্মত হয় না। কেননা সাধারণ ঋণদাতাদেরও কোম্পানীর নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা থাকে না। তাই এ ধরনের কোন অর্থ যোগানদাতা সংস্থা থেকে বৃহৎ মানের পুঁজি সংগ্রহের জন্য তাদেরকে প্রিফারেন্স শেয়ার প্রদান করা হয়। যাতে তাদের লাভ নির্ধারিত থাকে এবং তারা কোম্পানীর অংশীদার হিসেবেও গণ্য হয়। অতএব একদিকে উক্ত সংস্থা ঋণদাতা অপরদিকে কোম্পানীর অংশীদারও বটে। প্রিফারেন্স শেয়ারারদেরকে অগ্রাধিকার বিভিন্ন পন্থায় দেয়া হয়। যথা ঃ

১. তাদের বিনিয়োগকৃত টাকার লভ্যাংশ একটি বিশেষ হারে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, তাদের বিনিয়োগকৃত টাকায় শতকরা ১০% টাকা হারে লভ্যাংশ দেয়া হবে এবং কোম্পানীর মোট মুনাফা থেকে তাদের এই ১০% লাভ প্রথমে পরিশোধ করে দেয়া হবে। তারপর লভ্যাংশ অবশিষ্ট থাকলে সাধারণ শেয়ারারদের মাঝে তা হারাহারিভাবে বন্টন করা হবে, না থাকলে নয়। যদি কোন বৎসর কোম্পানীর মুনাফা না হয় তাহলে তাদের প্রাপ্য লাভের টাকা কোম্পানীর নিকট পাওনা থাকবে। পরবর্তী বছর লাভ হলে বিগত বছর ও চলতি বছরের লাভ তাদেরকে আগে প্রদান করে নিতে হবে। এরপর কিছু বাচলে তা সাধারণ শেয়ারাররা পাবে।

www.eelm.weebly.com

২. কখনো কখনো এই অগ্রাধিকার এভাবেও দেয়া হয় যে, সাধারণ শেয়ারারদের কে যে হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তাদেরকে তার দ্বিগুণ হারে প্রদান করা হয়।
৩. কখনো কখনো অগ্রাধিকার এভাবেও প্রদান করা হয় যে, কোম্পানীর মিটিংয়ে প্রিফারেন্স শেয়ারারদের ভোটাধিকার থাকে; কিন্তু সাধারণ শেয়ারারদের ভোটাধিকার থাকবে না। কিংবা সাধারণ শেয়ারারদের একটি ভোটের অধিকার থাকে, আর প্রিফারেন্স শেয়ারাদের দুটি ভোটের অধিকার থাকে।

কোম্পানীর প্রকারভেদ ঃ

সাধারণত কোম্পানী দুধরনের হয়ে থাকে। যথা ঃ ১. পাবলিক কোম্পানী (الشركة العامة) ২. প্রাইভেট কোম্পানী (الشركة الخاصة)।

উভয় ধরনের কোম্পানীই অনুমোদন লাভের পর আইনগত সত্তার মর্যাদা লাভ করে। তবে পাবলিক কোম্পানীর অংশীদার অনেক থাকে। আর প্রাইভেট কোম্পানীর অংশীদার সীমিত সংখ্যক থাকে। কোন কোন দেশে তা ২ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত হয়ে থাকে, আবার কোন কোন দেশে ২ থেকে ২০ জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রাইভেট কোম্পানীর শেয়ার ছাড়া যায় না এবং শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রি করা যায় না। তার প্রস্পেক্টাস প্রকাশের কোন বাধ্যবাধকতাও থাকে না। প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে প্রাইভেট কথাটি উল্লেখ করা আইনের দৃষ্টিতে জরুরী। পাবলিক কোম্পানী এর বিপরীত।

কোম্পানী লিমিটেড হওয়ার অর্থ ঃ সাধারণতঃ সকল কোম্পানীই লিমিটেড হয়ে থাকে। লিমিটেড হওয়ার অর্থ হল দায়-দায়িত্ব (Liability) সীমাবদ্ধ হওয়া। একদিকে লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারারদের দায়-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। আবার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানীর দায়-দায়িত্বও সীমাবদ্ধ হয়। শেয়ারারদের দায়-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ হল, কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হলে শেয়ারারদের বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত শেয়ারাররা বহন করবে। এর চেয়ে বেশি ক্ষতি হলে তার দায়ভার শেয়ারারদের উপর চাপানো যাবে না। অর্থাৎ তাদের দায়ভার তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আর কোম্পানীর দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ হল কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে গেলে পাওনাদাররা কোম্পানীর অবশিষ্ট সম্পদ ক্রোক করাতে পারবে এবং এর মূল্য থেকে ঋণের পরিমাণের আনুপাতিক হারে তারা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে, এর চেয়ে অধিক কিছু দাবি করতে পারবেন না। এ কারণেই লিমিটেড কোম্পানীর সাথে লিমিটেড শব্দটি উল্লেখ করতে হয়, যাতে ঋণদাতারা বুঝে শুনে কোম্পানীর সাথে লেনদেন করে।

www.eelm.weebly.com

কোম্পানীর ফান্ড সংগ্রহের আরো কতিপয় পদ্ধতি ঃ

(ক) কোম্পানী অনুমোদিত মূলধনের সবটুকু যদি প্রথমেই সংগ্রহ না করে থাকে বরং প্রথমে একটি নির্ধারিত পরিমাণ সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ করে থাকে তাহলে পরবর্তীতে প্রয়োজন দেখা দিলে অবশিষ্ট মূলধন সংগ্রহের জন্য পুনরায় শেয়ার ছেড়ে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। আর যদি অনুমোদিত মূলধনের পুরোটাই পূর্বে সংগ্রহ করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানাতে পারে। মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরী পেলে বর্ধিত মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার ছাড়তে পারে। এই উভয় অবস্থায় নতুন বরাদ্দকৃত শেয়ার গুলোকে বলা হয় 'রাইট শেয়ার' (Right Share)। এই রাইট শেয়ার গুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শেয়ারাররা অগ্রাধিকার রাখে। এই অগ্রাধিকার এ কারণে দেয়া হয় যে, কোম্পানী চালু হওয়ার পর শেয়ারের ফেইস ভ্যালুর চেয়ে বাজারে তার দাম বেড়ে যায়। ফলে নতুন প্রবর্তীত শেয়ারগুলো ফেইস ভ্যালুতে ক্রয় করে অধিক মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায়। যেহেতু এই মূল্য বৃদ্ধির মূলে পূর্ববর্তী শেয়ারারদের সরবরাহকৃত মূলধন কাজ করেছে অতএব নতুন প্রবর্তীত শেয়ারগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত অংশীদার বৃদ্ধি পেলে কোম্পানীর মালিকানার হারের পরিমাণ কমে যায়। যেমন- এক লাখ টাকার কোম্পানীতে যদি ১০০ জন শেয়ার হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেকের মালিকানার হার দাড়ায় একশত ভাগের এক অংশ, কিন্তু যদি শেয়ার বৃদ্ধি করে ২০০ জন করা হয় তাহলে প্রত্যেকের মালিকানার পরিমাণ দাড়ায় দুইশ ভাগের এক ভাগ। অতএব পূর্ববর্তী শেয়ারাররা যাতে তাদের মালিকানার অনুপাত পূর্ববৎ বহাল রাখতে পারে এ জন্য তাদেরকে নতুন বরাদ্দকৃত শেয়ার গুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যাই হোক নতুন শেয়ার ছেড়ে কোম্পানী তার প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

(খ) অনুমোদিত মূলধনে শেয়ার ছাড়ার অবকাশ না থাকলে নতুন করে শেয়ার ছাড়া বেশ জটিল হয়ে পড়ে। কেননা নতুন করে অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করতে হলে মন্ত্রণালয় থেকে মঞ্জুরী পাওয়াটা খুব সহজ নয়। এর জন্য বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। তাছাড়া কোম্পানীর অংশীদারের সংখ্যা বেড়ে যায়, তাতে পূর্ববর্তী অংশীদারের মালিকানার অনুপাত কমে যায়। ইত্যাদি কারণে কোম্পানী নতুন শেয়ার ছাড়ার চিন্তা না করে ঋণ নিয়ে অর্থ সংকটের মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। এই ঋণ দুটি পদ্ধতিতে নেয়া হয়। যথা ঃ

১. কোন ব্যাংক কিংবা অর্থ যোগানদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয়া হয়।

www.eelm.weebly.com

১. জনসাধারণ থেকে ঋণ নেয়া হয়।

জনসাধারণ থেকে ঋণ নেয়ার জন্য কোম্পানী বন্ড[১] (Bond) ও ডিভেঞ্চার[২] (Deventure) নামের দুই ধরনের সনদপত্র বাজারে ছাড়ে। সেই সনদপত্রের বিনিময়ে জনগণ কোম্পানীকে ঋণ দিয়ে থাকে।

(গ) ইজারা (ভাড়া) ঃ অধুনা কোম্পানীর অর্থ সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য ইজারা বা লিজিং (Leasing)-এর সিস্টেম চালু হয়েছে। পুঁজি সংগ্রহের এই ইজারা পদ্ধতিকে 'ফাইনেন্সিয়াল লিজিং' বলা হয়। এটি এভাবে হয় যে, কোম্পানীর কোন বস্তু যেমন মেশিনারীর প্রয়োজন হলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজে মেশিনারী ক্রয় না করে ব্যাংক বা অর্থ যোগানদাতা কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, আপনারা মেশিনটি ক্রয় করে আমাদেরকে ভাড়ায় দিয়ে দিন। ভাড়াটিয়া হিসেবে আমরা এটি ব্যবহার করব। একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতঃ (যেমন ৫ বছর বা ১০ বছর) ভাড়ার মাসিক হার এভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, মেশিনের মূল্য বাবৎ প্রদত্ত টাকা এবং ঐ নির্ধারিত সময়ে উক্ত টাকার যে পরিমাণ সুদ আসে তার সমূদয়কে যোগ করে নির্ধারিত সময়ে মাসিক গড় হার কত আসে তা বের করা হয়। তাতে মাসিক গড়ে যত টাকা করে পড়ে তত টাকা

---

১ বন্ড এমন সনদপত্রকে বলা হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাড়া হয়। ঐ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বন্ডের মাধ্যমে ঋণদাতারা নির্ধারিত হারে সুদ পেয়ে থাকেন। এর সময়সীমা কমবেশি নির্ধারণ করা যায়। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে বন্ডের মালিক কোম্পানী থেকে তার প্রদত্ত ঋণ উঠিয়ে নেয়। তবে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনবোধে বন্ডের মালিক তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে।

২. ডিভেঞ্চার এমন সনদপত্রকে বলা হয় যাতে ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে ঋণদাতাকে অতিরিক্ত নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য কোম্পানীর কোন একটি অংশ কিংবা একাধিক অংশকে এমন গ্যারান্টি হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, যদি কোম্পানী ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তাহলে উল্লেখিত অংশ বিক্রি করে ডিভেঞ্চারের অধিকারীরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা নিয়ে নিবেন।

কখনো কখনো এই শর্তেও বন্ড ছাড়া হয় যে, এর গ্রাহক ইচ্ছা করলে এতদিন পর তাকে শেয়ারে রূপান্তরিত করতে পারবে। এ ধরনের বন্ডকে 'কনভার্টেবল বন্ড' (Convertable Bonds) (আরবীতে سندات القابلة للتحويل) বলে।

www.eelm.weebly.com

করে কোম্পানী ব্যাংক বা অর্থযোগানদাতা প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া হিসেবে পরিশোধ করে যায় এবং ঐ সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে কোম্পানী উক্ত মেশিনের মালিক হয়ে যায়। ঋণ না নিয়ে এভাবে ভাড়া নেয়ার দুটি উদ্দেশ্য থাকে।

১. এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোম্পানী ট্যাক্স থেকে বেঁচে যায় বা ট্যাক্স পরিমাণে কম আসে।

২. ঋণের তুলনায় এ পন্থা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগকৃত টাকা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে অধিক নিশ্চয়তার কারণ হয়। কেননা এ পন্থায় মেশিনের মালিক থাকে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং মেশিনের গায়ে-প্রতিষ্ঠানের লেবেল লাগানো থাকে। ফলে কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে গেলেও উক্ত মেশিনটি বিনিয়োগকারীর মালিকানায় থেকে যায়। ফলে অপরাপর পাওনাদাররা এতে ভাগ বসাতে পারে না।

কোম্পানী গঠন ও মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

বস্তুত কোম্পানীর গঠন-প্রক্রিয়ার সাথে যে সব বিষয় সংশ্লিষ্ট তার প্রায় সবগুলোই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। এর সাথে শরীয়তের কোন সংঘাত নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত উদার। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম নয় এমন যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার অনুমতি শরীয়ত মানুষকে দিয়েছে।

তবে ফান্ড সংগ্রহের প্রক্রিয়াগুলোর মাঝে কতিপয় বিষয় সুদী প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে; তাই সেগুলো বৈধ হবে না। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা গেল।

১. আন্ডার রাইটিং ঃ আন্ডার রাইটিংয়ের জন্য ব্যাংক বা অর্থ যোগানদাতা প্রতিষ্ঠানকে শতকরা হারে যে টাকা দেয়া হয় তা মূলতঃ সুদী প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত। কেননা আন্ডার রাইটিংয়ের চুক্তি যাদের সাথে হয় তারা সমূদয় মূলধনের শেয়ার কার্যতঃ ক্রয় করে না। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে একটি শেয়ারও ক্রয় করে না সুতরাং তাদের এই চুক্তি এক ধরনের ওয়াদা বৈ কিছু নয়। এটিকে (ضمان) (অন্যের দায়িত্ব নিজ স্কন্দে উঠিয়ে নেয়া) কিংবা كفالت (অন্যের দায়িত্ব নিজে পালন করা)-এর পারিশ্রমিকও বলা যায় না। কেননা যামিন হওয়া বা কফিল হওয়ার অর্থ হল অন্যের উপর যা পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে গেছে তা আদায়ের গ্যারান্টি প্রদান করা অথবা নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া। অথচ এখানে এরূপটি বিদ্যমান নেই। যা আছে তা কেবল অবিক্রিত মাল ক্রয় করার ওয়াদার ন্যায় একটি ওয়াদা ওয়াদার বিনিময়ে

www.eelm.weebly.com

কোন কমিশন গ্রহণ করা বৈধ নয়। তাই আন্ডার রাইটিং বাবদ প্রদেয় টাকা বিনিময়হীন বিধায় এটা ঘোষ কিংবা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি বাস্তবে তারা শেয়ার ক্রয় করেন তাহলে তো তারা শেয়ারার হয়ে যাবেন। আর শেয়ারার হওয়ার জন্য কমিশন গ্রহণ করা বৈধ হবে না। অবশ্য কেউ কেউ চুক্তির আঙ্গিক পরিবর্তন করে এটাকে বৈধ করা যায় বলে উল্লেখ করেছেন। আর তা এভাবে যে, যে কোন কোম্পানীকে আন্ডার রাইটিং প্রদানের জন্য উক্ত কোম্পানীর অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে একটি পর্যবেক্ষণ চালাতে হয়। যদি উক্ত কমিশনকে পর্যবেক্ষণ ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তা বৈধ হতে পারে।

২. প্রিফারেন্স শেয়ারারদেরকে যদি সরবরাহকৃত পুঁজির শতকরা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেয়ার শর্ত করা হয় তাহলে তাও সুদ বলে গণ্য হবে। অগ্রাধিকারের অন্যান্য শর্তসমূহ বৈধ হবে।

৩. বন্ড ও ডিভেঞ্চার সনদপত্রে যেহেতু নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়া হয়, অতএব এগুলোও বৈধ হবে না বরং সুদ বলে গণ্য হবে। কেননা ঋণের পরিবর্তে কোন কিছু গ্রহণ করা সুদ বলেই গণ্য হয়। হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ আছে যে, كل قرض جري نفعا فهو ربوا যে করয্ কোন বিনিময় বয়ে আনে তা সুদ হিসেবে গণ্য হয়। অনুরূপভাবে ব্যাংক থেকে সুদের শর্তে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাও বৈধ হবে না।

৪. তুরে ইজারার যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তা বৈধ হলেও ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার মানসিকতায় এ ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রতারণা বলে গণ্য হবে। সুতরাং এ কারণে তা অবৈধ হয়ে যাবে।

৫. কোম্পানীর আইনগত সত্তা হওয়া এবং তার দায়ভার সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে তার নযীর শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে।

শেয়ার বাজার ও ক্রয়-বিক্রয়

কোন ব্যক্তি কোম্পানীতে একবার শেয়ার হওয়ার পর কোম্পানী বিলুপ্ত করার পূর্বে শেয়ার প্রত্যাহার করে মূলধন উঠিয়ে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। অথচ জীবনের উত্থান-পতন ও বিভিন্ন প্রয়োজনে এই মূলধন প্রত্যাহার করা কোন কোন সময় একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কোম্পানীতে এর কোন সুযোগ থাকে না। এ কারণে একজন শেয়ারার ইচ্ছা করলে তার শেয়ার অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে পারবে এই সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে

www.eelm.weebly.com

যথাথ খরিদদার পাওয়া যায় না বিধায় একদল লোক বিক্রেতার কাছ থেকে তা খরিদ করে রাখত এবং যথার্থ ক্রেতা পেলে কিছু লাভে তার নিকট শেয়ার বিক্রি করে দিত। এ ভাবেই ক্রমান্বয়ে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টি হয়। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের এই বাজারকে স্টক মার্কেট (Stoc market) বলা হয়। বর্তমানে বিক্রেতারা স্টক মার্কেটে শেয়ার বিক্রি করেন, আর ক্রেতারা স্টক মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয় করে থাকেন। যে প্রতিষ্ঠান শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ (Stoc Exchang) আরবীতে بورصة বলা হয়ে থাকে। ষ্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যস্থতাও করে এবং শেয়ার বাজারের তত্ত্বাবধানও করে থাকে। তবে ষ্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যস্থতা ছাড়াও খোলা বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। তাদের পরিভাষায় একে (Over Counter transactions) ওভার কাউন্টার ট্রাঞ্জাকশান বলে।

বস্তুতঃ ষ্টক এক্সচেঞ্জ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিন অনুমতিপ্রাপ্ত একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, যারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে থাকে। এ বাবত তারা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করে। কোন কোম্পানী যদি তার শেয়ারের লেনদেন ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে করতে চায় তাহলে তাকে ষ্টক এক্সচেঞ্জের লিষ্টভুক্ত হতে হয়। সাধারণত এমন ধরনের কোম্পানীকেই ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিষ্টভুক্ত করে থাকে যাদের ব্যবসায়ী ভিত্তি বলিষ্ট ও যেগুলো নির্ভর যোগ্য। কেননা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লেনদেনকৃত শেয়ারের দায়-দায়িত্ব এক্সচেঞ্জকেই বহন করতে হয়। লিষ্টেড হওয়ার পরও কোন কোম্পানীর শেয়ার মুক্তবাজারে (Over Counter) বেচাকেনা হতে পারে। আর যেসব কোম্পানী লিষ্টেড নয় তাদের শেয়ার সাধারণত মুক্ত বাজারেই বেচাকেনা হয়।

যে কেউ ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার রাখে না, বরং নির্ধারিত ফিস দিয়ে সেখানে মেম্বারশিপ লাভ করতে হয়। কেননা ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের লেন-দেন অত্যন্ত নাজুক ও ব্যাপক বিষয়। এর জন্য ভাল অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাছাড়া এর পরিভাষাও বুঝতে হয়। তাই অনভিজ্ঞ লোকেরা লেনদেন করতে যেয়ে ভুল করে জটিলতায় ফেসে যায়। যেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠান তথাস্থ যাবতীয় লেনদেন পরিশোধের দায়িত্বশীল হয়ে থাকে, এ কারণে যে কাউকে তারা এরূ লেনদেনের অনুমতি দেয় না। বরং মেম্বারশিপ গ্রহণ করে তবেই লেনদেন করতে হয়।

এই মেম্বাররা নিজের জন্যও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন, আবার অন্যের জন্যও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। তবে অন্যের জন্য শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করলে সে বাবত তারা নির্ধারিত হারে কমিশন গ্রহণ করেন। মেম্বার নয়

www.eelm.weebly.com

এমন কোন ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করতে চাইলে মেম্বার অর্থাৎ দালালকে শেয়ার ক্রয়ের জন্য অর্ডার দিতে হয়। এই অর্ডার সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. **মার্কেট অর্ডার (Market order)** ঃ মার্কেট অর্ডারের অর্থ হল এ মর্মে অর্ডার দেয়া যে, অমুক কোম্পানীর শেয়ার বাজারে যে মূল্যে পাওয়া যায় সেই মূল্যেই আমার জন্য ক্রয় করে নিও।

২. **লিমিটেড অর্ডার (Limited Order)** ঃ লিমিটেড অর্ডারের অর্থ হল একটি নির্ধারিত মূল্য উল্লেখ করে এ মর্মে অর্ডার দেয়া যে, যদি এই দামের মধ্যে অমুক কোম্পানীর শেয়ার পাওয়া যায় তাহলে তা ক্রয় করে নিও।

৩. **ষ্টপ অর্ডার (Stop order)** ঃ এর অর্থ হল দালালকে এ মর্মে বিক্রয়ের অর্ডার দেয়া যে যদি আমার শেয়ারের মূল্য স্থির থাকে বা বাড়তে থাকে তাহলে বিক্রি করবে না। কিন্তু যদি দাম পড়তে থাকে তাহলে বিক্রি করে দিও।

শেয়ারের দাম হ্রাস বৃদ্ধির রহস্য ঃ

কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়টি সাধারণত কোম্পানীর এ্যাসেটের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। কোম্পানীর শেয়ার বৃদ্ধি না পেয়ে যদি তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ যদি কোম্পানী ব্যবসায় লাভবান হয় এবং লভ্যাংশ পূনঃ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়) তাহলে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি কোম্পানী লাভবান না হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়।

কিন্তু অনেক সময় আনুষাঙ্গিক কতিপয় বিষয়ও শেয়ারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। যেমন বর্তমানে কোম্পানী যে হারে লাভবান হচ্ছে ভবিষ্যতে যদি আরো অধিক হারে লাভ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় তাহলেও শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আবার বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে কোম্পানীর লাভের হার আরো হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা যদি সুস্পষ্ট হয় তাহলে শেয়ারের দাম হ্রাস পায়। আবার কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও যোগানের গতির সাথেও শেয়ারের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হয়। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়লে কোম্পানীর বিক্রি বৃদ্ধি হবে, ফলে কোম্পানীর লাভ বাড়বে, যে কারণে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর চাহিদা কমলে অথচ সেই নিরিখে উৎপাদন হ্রাস না করা হলে কোম্পানীর পণ্যের মূল্য হ্রাস পাবে। ফলে কোম্পানীর লাভ কম হবে কিংবা লোকসানও হতে পারে। অতএব শেয়ারের দাম কমবে। রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় শেয়ারে মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়।

আবার কোন এক মওসুমে কোন দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, অন্য মওসুমে হয়ত চাহিদা কম থ[illegible] মওসুমে কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়ে সেই মওসুমে

www.eelm.weebly.com

কোম্পানীর লাভ বেশি হয় এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আর ঢাল মওসুমে কোম্পানীর বিক্রি কম হয়, লাভও কম হয়, ফলে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়।

কোন কোন সময় কিছু কিছু অবস্থাগত কারণও শেয়ারের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির কারণ হয়। যেমন অহেতুক অনুমান, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হুযোগ ইত্যাদি।

যেহেতু কোম্পানীর সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই কতিপয় আনুষঙ্গিক কারণ শেয়ারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হয় এ জন্য শেয়ারের মূল্য কোম্পানীর অংশদারীত্বের প্রকৃত মূল্যমান নির্দেশ করেনা।

যখন কোন কোম্পানীর শিয়ারে মূল্য বাড়তে থাকে তখন সেই শেয়ারের মার্কেটকে স্টক এক্সচেঞ্জের পরিভাষায় 'বাল মার্কেট' (Bull market) বলে। আর যখন কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কমতে থাকে তখন সেই শেয়ারের মার্কেটকে বিয়ার মার্কেট (Bear market) বলে।

সাধারণত দুই উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. কোম্পানীর অংশীদারিত্ব লাভ করে মুনাফা ভোগ করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয়। এ ধরনের ক্রেতার সংখ্যা সাধারণতঃ কম হয়।

২. শেয়ার কে ব্যবসায়ী পণ্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয়। অর্থাৎ যখন দাম কমে তখন ক্রয় করে; যখন দাম বাড়ে তখন বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয়। শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে যে লাভ হয় তাকে পরিভাষায় ক্যাপিটেল গেইন (Capitale Gain) বলে।

ক্রয়-বিক্রয় করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়ের জন্য ক্রেতাকে এ বিষয়ে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় যে, ভবিষ্যতে কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য বাড়তে পারে বা কোন কোম্পানীর মূল্য হ্রাস পেতে পারে। এই কাজটিকে পরিভাষায় 'স্পেকিউলেশান' (Speculation) বলে। এই অনুমান অনেক সময় সঠিক হয় আবার অনেক সময় ভুলও হয়।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি ঃ

শেয়ার সাধারণতঃ তিন পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. **(Spot Sale) উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয় ঃ** নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়কে উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয় বা স্পট সেল বলা হয়। অর্থাৎ শেয়ারের মালিক ক্রেতাকে শেয়ার নগদ প্রদান করেন আর ক্রেতাও মূল্য নগদ পরিশোধ করেন। তবে স্পট সেলের ক্ষেত্রেও শেয়ার সার্টিফিকেট প্রসেজ হয়ে ক্রেতার হাতে পৌঁছতে প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় লেগে যায়।

www.eelm.weebly.com

২. **Sale on margin আংশিক নগদ মূল্যে ক্রয় বিক্রয়** ঃ এর পদ্ধতি এই হয় যে, সাধারণ ক্রেতারা দালালকে এ মর্মে অর্ডার দেয় যে, আমার জন্য ১০% কিংবা ২০% মার্জিনে অমুক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় কর। এর অর্থ এই যে, আমি শেয়ারের মূল্যের ১০% বা ২০% নগদ পরিশোধ করব, বাকীটা তোমার দায়িত্বে যা আমি ১৫ দিন বা ২০ দিন পরে আদায় করে দিব। সাধারণতঃ দালালদের সাথে ঘনিষ্ঠতা আছে এ ধরনের ক্রেতারাই এরূপ ক্রয়ের অর্ডার দিয়ে থাকেন। দালাল বাকি টাকা নিজ থেকে পরিশোধ কবে শেয়ার ক্রয় করে দেয়। দালালরা এই টাকা বাবদ সুদ গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় বিনা সুদের করজ দিয়ে থাকে। কারণ লেনদেন বাবদ সে যে কমিশন পাবে; তার আশায় এই স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, যদি ৩ বা ৫ দিনের মাঝে বাকি টাকা পরিশোধ করে দেয়া হয় তাহলে সুদ দিতে হয় না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য হলে সুদ দিতে হয়।

৩. **Short Sale বা পণ্যহীন বেচাকেনা** ঃ এটি সাধারণত তখন হয় যখন কেউ শেয়ার ক্রয়ের পর সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার আগেই অন্যের নিকট এই শর্তে বিক্রি করে দিতে চায় যে, সার্টিফিকেট হাতে পেলে সে তা ক্রেতার বরাবরে হস্তান্তর করবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় সার্টিফিকেট বিক্রেতার হাতে মওজুদ থাকে, আর কোন কোন সময় সার্টিফিকেট হাতে আসার আগেই তার ক্রয়-বিক্রয় চলে। যখন শেয়ার সার্টিফিকেট বিক্রেতার হাতে মওজুদ থাকে তখনও কিন্তু তাক্রেতার মালিকানায় আসতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লেগে যায়। কারণ রেজিষ্টার্ড শেয়ার সার্টিফিকেটের নাম পরিবর্তনের জন্য সার্টফিকেট কোম্পানীতে পাঠাতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন অফিসিয়াল ফর্মালেটি পেরিয়ে আসতে এই সময় লেগে যায়।

এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যদি কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাহলে তা ক্রেতার প্রাপ্য হয়। যদিও কোম্পানী তা বিক্রেতার নামেই বরাদ্দ করে। কেননা তাদের রেজিষ্টারে শেয়ারের মালিক বিক্রেতাই থাকে। তবে এই টাকা হাতে পাওয়ার পর ক্রেতাকে দিয়ে দিতে হয়। এটাই শেয়ার বাজারের নিয়ম।

আর যে ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বিক্রেতার হাতে থাকে না সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে সার্টিফিকেট ও মালিকানা হস্তান্তরের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যায়। একে পরিভাষায় Futineat sale বলে। সেই নির্ধারিত তারিখ আসলে শেয়ার সার্টিফিকেট ক্রেতার হাওয়ালা করা হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে,

www.eelm.weebly.com

সার্টিফিকেট হস্তান্তর না করে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট শেয়ার পুনরায় বিক্রয় করে দেয়া এবং ক্রয়ের তারিখে শেয়ারের মূল্য যা ছিল হস্তান্তরের দিন তা থেকে যদি মূল্য বেড়ে থাকে তাহলে পূর্বের বিক্রেতা (যিনি বর্তমানে ক্রেতা) পূর্ববর্তী ক্রেতা (যিনি বর্তমানে বিক্রেতা)কে বাড়তি মূল্য পরিশোধ করে দেন। কিংবা মূল্য কমে গেলে বর্তমান বিক্রেতা (পূর্বে যিনি ক্রেতা ছিলেন) পূর্ব বিক্রেতাকে সেই পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে দেন। আর শেয়ার বিক্রেতার হাতেই থেকে যায়। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শেয়ার সার্টিফিকেট হাতে আসার আগেই দুই তিন বিক্রিও হয়ে যায়।

উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন পণ্যও ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং সে ক্ষেত্রেও উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি হবে না এ বিষয়টি দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা সুবিধাজনক হবে। ১. মৌলিকভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কিনা? ২. ফেইস ভ্যালুর চেয়ে কম মূল্যে বা বেশিমূল্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কিনা?

১. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না ঃ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি কোম্পানী মূলতঃ শিরকাতে ইনানের পর্যায়ভুক্ত। অতএব যিনি কোম্পানীর শেয়ারার হবেন তিনি মূলতঃ কোম্পানীর মালিকানায় অংশীদার হবেন। কোম্পানীর মালিকানায় অংশীদার হওয়ার অর্থ হল, তার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ তথা ঘরবাড়ী, আসবাব পত্র, কলকব্জা, মেশিনারী, উৎপাদনের কাঁচামাল, লিকুইডমানী বা তরল মূলধনসহ সবকিছুতে অংশীদার সাব্যস্ত হওয়া। অতএব সকল শেয়ারার তার পরিশোধিত মূলধনের অনুপাতে কোম্পানীর অংশীদারিত্ব লাভ করবে। শেয়ারারকে যে শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় তা মূলতঃ কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি পত্র। এটি বন্ড কিংবা ডিভেঞ্চারের ন্যায় ঋণের কোন সনদপত্র নয়- যেমন অনেকে মনে করেন। এ কারণেই যদি বাৎসরিক সাধারণ সভার (Anuoal General Miting) সংক্ষেপে (A.G.M) এ সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানী ভেঙ্গে দেয়া হয় তাহলে শেয়ারাররা কেবল তাদের বিনিয়োগকৃত টাকা ও লভ্যাংশই ফিরে পান না বরং কোম্পানীর সমুদয় সম্পদের হারাহারি বন্টনে শেয়ারের আনুপাতিক হারে অংশ লাভ করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে শেয়াররা প্রকৃত অর্থেই কোম্পানীর অংশীদার হয়ে থাকেন। সুতরাং শেয়ার বিক্রির অর্থ হল কোম্পানীর সমুদয় সম্পদ থেকে সার্টিফিকেটে উল্লিখিত টাকার সমপরিমাণ অংশ অন্যের নিকট বিক্রি করে দেয়া। অতএব

www.eelm.weebly.com

শেয়ার বিক্রি বৈধ হবে। কেননা ফিকাহবিদরা এই ব্যাপারে একমত যে, কোন একটি দ্রব্যে কয়েকজনঅংশীদার থাকলে, কোন এক অংশীদার যদি তার অংশ বিক্রি করে দিতে চায় তাহলে তা অবশ্যই বৈধ হবে।

-হিদায়া ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য

স্মর্তব্য যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন দিয়ে কোম্পানীর জন্য কোন দ্রব্য সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয় না করা হয় অর্থাৎ নগদ টাকাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনী দ্রব্যে পরিণত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানীতে অংশীদারিত্বের অর্থ হল নগদ টাকার যোগানদাতা হিসেবে শরীকানায় অংশ গ্রহণ করা। এমতাবস্থায় যদি কেউ তার ক্রয়কৃত শেয়ার অন্যের নিকট বিক্রয় করতে চায় তাহলে এটা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বিনিময় হবে। অতএব তাতে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করতে হবে এবং নগদানগদী লেনদেন করতে হবে। অন্যথায় সুদ হয়ে যাবে এবং সার্টিফিকেটের গায়ে যে ফেইস ভ্যালু উল্লেখ থাকে তার চেয়ে কম বা বেশিতে বিক্রি করা যাবে না।

২. **ফেইস ভ্যালুর চেয়ে কম কিংবা বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রয় ঃ** যখন কোম্পানী বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তার প্রস্তাবিত মূলধনের একাংশকে দ্রব্যগত মূলধনে রূপান্তরিত করে নিবে তখন শেয়ার ফেইস ভ্যালূর চেয়ে কমে কিংবা বেশিতে বিক্রয় করা বৈধ হবে। কেননা বিষয়টি তখন স্বর্ণ খচিত তরবারী (سيف محلى)-এর ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলার আওতাভূক্ত বলে গণ্য হবে। স্বর্ণ খচিত তরবারী স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না এ প্রশ্নে হানাফী ইমামগণের অভিমত এই যে, তরবারীর গায়ে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে, মূল্য হিসেবে ধার্যকৃত স্বর্ণের পরিমাণ যদি তার চেয়ে অধিক হয় তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। এর ব্যাখ্যা এই যে, ধার্যকৃত মূল্য থেকে তরবারীর গায়ে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে সেই পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা তরবারীর সাথে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণের মূল্য ধরা হবে। ফলে স্বর্ণের বিনিময়ে সমতারক্ষা পাওয়ার কারণে এই বিনিময় সুদী লেনদেনের আওতায় পড়বে না। মূল্যের অবশিষ্ট স্বর্ণ মুদ্রাকে স্বর্ণবিহীন তরবারীর মূল্য হিসেবে ধরা হবে। যেহেতু তরবারী ও মূদ্রা সমজাতীয় নয়, অতএব এক্ষেত্রে সমতা রক্ষার প্রয়োজন হবে না, তাই এ লেনদেনটিও বৈধ হয়ে যাবে। তবে যদি মূল্য হিসেবে ধার্যকৃত স্বর্ণের পরিমাণ তরবারীর গায়ে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণের পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে কোম্পানী যখন নগদ মূলধন ও মুলধনী দ্রব্যের সমন্বয়ে বিদ্যমান থাকবে তখন যদি শেয়ার এমন মূল্যে বিক্রি করা হয় যে তার পরিমাণ কোম্পানীর মূলধনী দ্রব্য বাদে অবশিষ্ট তরল মূলধনের শেয়ার প্রতি আনুপাতিক হারের চেয়ে অধিক হয়, তাহলে তার

www.eelm.weebly.com

ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। কিন্তু শেয়ারের ধার্যকৃত মূল্য যদি তার সমান বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। উদাহরণতঃ কোম্পানী যদি তার প্রস্তাবিত মূলধনের ৪০% মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তরিত করে থাকে তাহলে ১০০ টাকার শেয়ারের ৪০% মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তরল মূলধন থেকে গেছে ৬০% এমতাবস্থায় শেয়ারের ধার্যকৃত মূল্য যদি ৬০ টাকার চেয়ে বেশি হয় তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে, কিন্তু ৬০ টাকা বা তার কমে ক্রয়-বিক্রয় করলে বৈধ হবে না। এ থেকে সাধারণভাবেই বুঝা যায় যে, কোম্পানীর আংশিক মূলধন যদি দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়ে থাকে তাহলে ফেইস ভ্যালুর চেয়ে অধিক যে কোন দামে তা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে ফেইস ভ্যালুর চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আংশিক মূলধন দ্রব্যে রূপান্তরের পর অবশিষ্ট তরল মূলধনের শতকরা হার যত দাড়ায় তার সমমূল্যে বা তার চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। কিন্তু তার চেয়ে অধিক মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করলে বৈধ হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী-(র.)-এর মতানুসারে এমতাবস্থায়ও শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। অবশ্য হাম্বলী মাযহাবের সিদ্ধান্তানুসারে যদি কোম্পানীর মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ নগদ মূলধনের চেয়ে বেশি হয় তখন শেয়ার ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে। কম হলে বৈধ হবে না। আরব বিশ্বের আলেম উলামাগণ শেষোক্ত মতের আলোকেই ফতোওয়া দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে অনেক কোম্পানী সরকারি অনুমোদন লাভের পর পরই ষ্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হয়ে যায় এবং শেয়ার ছেড়ে দেয়। ফলে কোম্পানীর বস্তব অস্তিত্বের আগেই তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়ে যায়। এ ধরনের অস্তিত্বহীন কোম্পানীর ১০ টাকা শেয়ার ২০০/৩০০ টাকায় বিক্রি হওয়ার খবরও পাওয়া যায়। এটি অবশ্যই বৈধ হবে না। যার কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার শর্ত ঃ

শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য একটি সাধারণ শর্ত এই যে, উক্ত কোম্পানীকে অবশ্যই হালাল ব্যবসা করতে হবে। যদি কোন কোম্পানীর মূল কারবার হারাম হয় তাহলে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না। যেমন মদের উৎপাদন বা তার ক্রয়-বিক্রয়ে নিরত কোম্পানীর শেয়ার।

কোম্পানীর শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে বৈধ পন্থায় লেনদেন করতে হবে। অবৈধ পন্থায় লেনদেন করলে সাধারণতঃ তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। বর্তমানে অনেক কোম্পানী মৌলিকভাবে হালাল কারবার করে বটে কিন্তু কোন না কোন ভাবে তারা সুদী লেনদেনের

www.eelm.weebly.com

প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- পুঁজি সংগ্রহের জন্য ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে লোন গ্রহণ করে কিংবা সুদী ব্যাংকে অতিরিক্ত টাকা জমা রেখে সুদ গ্রহণ করে। এ ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলাটি অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা মাসআলাটিকে প্রথমেই দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া সুবিধাজনক মনে করি। যথা ঃ

১. সুদের ভিত্তিতে ঋণ করে কিংবা অন্য কোন সুদী পদ্ধতি অবলম্বন করে পুঁজি সংগ্রহ করা।

২. কোম্পানীর অর্থ কোন ব্যাংকে জমা রেখে কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে সুদ গ্রহণ করা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর একটি হল সুদ দেয়া আর একটি হল সুদ খাওয়া। সুদ দিয়ে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি পূর্বসিদ্ধান্তকৃত

২. কিংবা দায়ে ঠেকে পরে এই প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়েছে।

যদি সুদের ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত হয় এবং কোম্পানী প্রসপেক্টাসে পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতিতে তা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকে যে, কোম্পানী বরাদ্দকৃত মূলধনের শতকরা এত ভাগ শেয়ার বিক্রয় করে সংগ্রহ করবে এবং এত ভাগ কোন ব্যক্তি, ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থ যোগানদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে (যেমন আজকাল অধিকাংশ কোম্পানীর প্রসপেক্টাসে তা উল্লেখ থাকে)। তাহলে সেই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে না। এ ক্ষেত্রে যদিও কোম্পানী সুদদাতা হিসেবে তার সম্পদে সুদের মিশ্রণ ঘটছে না এবং সুদের ভিত্তিতে কৃতঋণের টাকার সাথে শেয়ারারদের টাকা মিলিয়ে ব্যবসা করার দ্বারা যে মুনাফা হবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু অনোন্যাপায় না হলে সুদের ভিত্তিতে ঋণ করা নিঃসন্দেহে হারাম কাজ যা কোম্পানী নির্দ্বিধায় করছে। অতএব এহেন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করার অর্থ হচ্ছে জেনেশুনে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই কোম্পানীকে এরূপ একটি হারাম কাজ করার অনুমতি দেয়া এবং তার সহযোগিতা করা যা কোন মতেই বৈধ হতে পারে না। কেননা শেয়ারক্রয় করে ব্যবসা করা অপরিহার্য কোন বিষয় নয়। ব্যবসার আরও অনেক বৈধ খাত রয়েছে; তার যে কোন একটিতে অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোম্পানীতে শেয়ারারদের দায়ভার সীমাবদ্ধ থাকে। এর অর্থ হল শেয়ারারদের দায়িত্ব তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব কোম্পানী যদি ঋণ করে তাহলে তার দায়ভার শেয়াররা বহন করে

www.eelm.weebly.com

না। সুতরাং কোম্পানীর করা ঋণের দায়ভারও তাদের উপর বর্তাবে না। অতএব শেয়ার ক্রয়ে অসুবিধা কোথায়?

বস্তুতঃ গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, যদিও ঋণের দায়ভার শেয়ারাররা বহন করে না কিন্তু এই ঋণের সুদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারাও শরীক থাকে। কেননা কোম্পাণী ঋণ বাবত প্রদত্ত্ব সুদের টাকা ব্যয়হিসেবে বাদ দেয়ার পরই লভ্যাংশ ঘোষণা করে। সুতরাং সুদের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে সকলেই অংশীদার হয়ে যায়। তাছাড়া কোম্পানী শেয়ারারদের পক্ষ থেকে আইনগত উকিল হয়ে থাকে। আর উকিলের যাবতীয় কাজকর্ম মুয়াক্কেল (উকিল নিয়োগকারী)-এর কাজ বলে গণ্য হয়। সুতরাং সার কথা এই দাড়ায় যে, কোম্পানীকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ করার অনুমতি দেয়ার অর্থ হল সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের উপর শেয়ারারদের সম্মত থাকা। আর অনোন্যাপায় না হলে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণে সম্মত হওয়া হারাম। অতএব এহেন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করাও হারাম হবে।

আর যদি সুদের ভিত্তিতে ঋণ করে পুঁজি সংগ্রহের বিষয়টি পূর্বসিদ্ধান্তকৃত না হয় এবং প্রসপেক্টাসে এ ধরনের কোন কথা উল্লেখ না থাকে; কিন্তু পরে কোম্পানীর পুঁজির সংকট দেখা দেয় এবং এই সংকট কাটিয়ে উঠার অন্য কোন বৈধ পথ না থাকে, আর পুঁজি যোগান দিতে না পারার কারণে যদি কোম্পানী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে, আর এহেন সংকটের কারণে যদি কোম্পানী সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তাহলে অনোন্যপায় হওয়ার কারণে এ কর্ম করা আইনের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য হবে। সঙ্গত কারণেই তা শেয়ারারদের জন্য বৈধতার সনদ বয়ে আনবে অর্থাৎ এ ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। তা সত্ত্বেও তাক্ওয়ার দাবী এই যে, কোম্পানীকে এ মর্মে যে কোন ভাবে অবহিত করে দেয়া যে, আমি এই সুদের দায়দায়িত্ব বহন করব না। তা চিঠি পত্রের মাধ্যমেই হউক কিংবা A.G.M-এ একথা ঘোষণা করে দেওয়ার মাধ্যমেই হউক।

অবশ্য পাকিস্তানের শারইয়্যাহ আদালতের চীফ জাষ্টিজ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিশারদ আলেম ও যুগসচেতন মুফতী হযরত মাওলানা তকী উসমানী (মুদ্দা.) তার অধুনা প্রকাশিত 'ইস্‌লাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত' নামক গ্রন্থে -এ সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

> "যেহেতু সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করলে কোম্পানীর মূলধন ও লভ্যাংশে সুদের মিশ্রন ঘটে না অতএব কাজটি হারাম ও মারাত্মক গুনাহের কাজ হওয়া সত্তেও কোম্পানী উক্ত টাকার মালিকানা লাভ করবে এবং এর সাথে

www.eelm.weebly.com

শেয়ারারদের মূলধন মিলিয়ে ব্যবসা করা দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হবে সেটাও হালাল হবে। এ ক্ষেত্রে বেশি থেকে প্রশ্ন বেশি এই হতে পারে যে, কোম্পানী মূলতঃ শেয়ারারদের পক্ষে উকিল হয়ে থাকে। সুতরাং সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি শেয়ারারদের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। ফলে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সম্মতি আছে এ কথাই বুঝা যাবে। এর উত্তর হযরত থানবী (রহ.) এই দিয়েছেন যে, শেয়ারাররা কোন উপায়ে A.G.M আওয়াজ উঠিয়ে দিবে যে, আমি সুদী লেনদেনে সম্মত নই। এ দ্বারা তার দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। কোম্পানীর দায়িত্বশীলদের প্রতি এ মর্মে চিঠি লিখে দেওয়াও যথেষ্ট হবে। (আজকাল সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল A.G.M-এ এ সম্পর্কে প্রতিবাদ জানানো)।

এর উপরও প্রশ্ন থেকে যায়, যা হযরত থানবী (রহ.) উল্লেখ করেননি। প্রশ্নটি এই যে, কোম্পানীর দায়িত্বশীলরা তো সর্বাবস্থায় শেয়ারারদের উকিল হিসেবে বহাল থাকেন, আর এও জানার কথা যে, যে প্রতিবাদ জানানো হবে তা কার্যকর হবে না, তাহলে তাদেরকে উকিল হিসেবে বহাল রেখে এ ধরনের অকার্যকর প্রতিবাদ করার দ্বারা দায়িত্ব মুক্ত হওয়া যাবে কি করে?

এর জবাব এই যে, কোম্পানীতে উকিল মুয়াক্কেলের সম্পর্ক শরীকানা ব্যবসার ন্যায় ততটা বলিষ্ঠ নয়। শরীকানা ব্যবসায় উকিল মুয়াক্কেলের সম্পর্ক এতটাই বলিষ্ঠ হয় যে, একজন শরীকও যদি কারবারের ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে তাহলে কারবার চলতে পারে না। শরিকানা ব্যবসায় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু কোম্পানীতে উকিল মুয়াক্কেলের সম্পর্ক এতটা বলিষ্ঠ হয় না যে, একজন দ্বিমত পোষণ করলে সিদ্ধান্ত হবে না। কোম্পানীতে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় না; কেননা এত বেশি সংখ্যক সদস্য কোন বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নয়। তাই কোম্পানীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের ভিত্তিতে। অতএব সেখানে যদি কেউ সুদী লেনদেনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠায়, আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নয় বলে যদি তা গ্রহণীয় না হয় তাহলে এ কথা বলা যাবে না যে, প্রতিবাদকারীর সম্মতিতেই সুদী লেনদেন হচ্ছে। সুতরাং যদি কোম্পানীর মূল কারবার সুদী না হয় (তবে কখনো কখনো সুদের ভিত্তিতে করজ গ্রহণ করে থাকে) তাহলে তার শেয়ার ক্রয় করা বৈধ হবে। তবে শর্ত এই যে, সুদের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিতে হবে।"

www.eelm.weebly.com

আল্লামা তকী উসমানীর বক্তব্যের সার কথা হল এই যে, মূল কারবার অবৈধ না হলে কোম্পানী সুদের ভিত্তিতে ঋণ পূর্ব সিদ্ধান্তানুসারে করুক বা দায়ে ঠেকে করুক উভয় অবস্থায় এ ধরনের কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। পরে সুদী লেনদেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

তবে আল্লামা উসমানীর এ মতামতের ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন থেকে যায় যে, সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি যদি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত হয়, আর প্রসপেক্টাসে তা উল্লেখ থাকে, তাহলে ক্রেতা যখন তা ক্রয় করছে তখন পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝে শুনে তা ক্রয় করছে। এই ক্রয়ের অর্থ হল তিনি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে স্বাধীনভাবে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়া কোম্পানীকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের উকিল সাব্যস্ত করেছেন। অথচ শেয়ার ক্রয় করা তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু ছিল না, কেননা শেয়ার ক্রয় ছাড়াও পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার বহু বৈধ পথ রয়েছে। আর যখন তিনি সুদী ঋণের দায়মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন তখন তিনি জানেন যে, তার মতামতের কোনই গুরুত্ব দেয়া হবে না। তাহলে বিষয়টা কি এরূপ দাড়ায় না যে, যেখানে তার মতামতের কার্যকরিতা রয়েছে সেখানে সুদী ঋণের জন্য কাউকে তিনি উকিল নিযুক্ত করলেন; আর যেখানে তার মতামতের কার্যকরিতা নেই এমন কোন ক্ষেত্রে দায়মুক্ত হওয়া ঘোষণা দিলেন। জেনে শুনে এরূপ করা কি করে বৈধ হতে পারে? তবে হ্যাঁ কেউ যদি কোম্পানীর পুঁজি যোগানের পদ্ধতি সম্পর্কে না জেনে শেয়ার ক্রয় করে ফেলে থাকে, অতঃপর যদি সে এ সম্পর্কে জানতে পারে; কিংবা কোম্পানী সুদী লেনদেন করবে না এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনেই শেয়ার ক্রয় করেছিল, কিন্তু পরে মজবুরীর অবস্থায় কোম্পানীকে এহেন পন্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে- যা সে পরে জানতে পেরেছে এ ধরনের ব্যক্তির বেলায় এরূপ ঘোষণা একটি তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু যেখানে আগে থেকে জেনেশুনে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বেচ্ছায় সুদী ঋণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে- সে ক্ষেত্রে এরূপ ঘোষণার কোন তাৎপর্য আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এ কারণেই আমরা বিষয়টিকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি।

কোম্পানীর সুদী লেনদেনের দ্বিতীয় প্রকার হল কোম্পানীর টাকা কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে কিংবা ব্যাংকে রেখে তাদের থেকে সুদ গ্রহণ করা।

এ ক্ষেত্রে কোম্পানীকে এর অনুমতি দেয়ার অর্থ হল মুয়াক্কেল হিসেবে শেয়ারারদের পক্ষ থেকে এ ধরনের সুদ গ্রহণের সম্মতি প্রকাশ করা। যা কোন ক্রমেই বৈধ হওয়ার নয়। তাছাড়া সুদ হিসেবে প্রাপ্য টাকা মূল মুনাফায় সংশ্লিষ্ট

www.eelm.weebly.com

হয়ে প্রতি শেয়ারের লভ্যাংশে বিভাজিত হয়ে পড়বে। ফলে প্রত্যেকেই সুদ খাওয়ার অপরাধে জড়িয়ে পড়বে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোম্পানী যদি অর্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা প্রয়োজন মনে করে: আর দেশে ইসলামী শারইয়্যার আলোকে অর্থ সংরক্ষণকারী কোন প্রতিষ্ঠান থাকে তাহলে তাতে টাকা জমা রাখা বাঞ্ছনীয়। আর যদি এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান না থাকে কিংবা থাকলেও তার শাখা যদি এত দূরে অবস্থিত হয় যে, সেখানে টাকা পয়সা ট্রাঞ্জাকশান করা ঝুঁকিপূর্ণ, তাহলে নিকটস্থ কোন সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারবে। তবে সুদ হিসেবে প্রাপ্ত টাকা কোম্পানী আলাদা করে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে কোনরূপ সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া ব্যয় করে দিবে। যদি কোম্পানী এরূপ করেনা বলে জানা যায়, তাহলে A.G.M-এ এরূপ করার জন্য জোরালো প্রস্তাব রাখতে হবে। এতেও কিছু না হলে প্রত্যেক শেয়ারারকে প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকে ঐ পরিমাণ টাকা কোনরূপ সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করে দিতে হবে।

আর যদি সুদের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই কোম্পানীর থাকে এবং তা জানা যায়; তাহলে সে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা বৈধ হবে না। কিন্তু যদি কোম্পানীর এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ব হতে না থাকে, শিয়ার ক্রয়ের পরে যে কোন কারণে এরূপ করা হয়েছে বলে জানা যায়। তাহলে সে ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে A.G.M-এ প্রতিবাদ জানাতে হবে। তাতেও কিছু না হলে নিজের প্রাপ্য মুনাফা থেকে যে পরিমাণ টাকা সুদী খাত থেকে এসেছে তা আর্তপীড়িত মানুষের সেবায় সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া ব্যয় করে দিতে হবে। এরূপ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ হলেও না করা উত্তম হবে।

লভ্যাংশের শতকরা কত টাকা সুদী খাত থেকে এসেছে তা কোম্পানীর ব্যালেন্সসীট থেকে জানা যাবে।

সুদী লেনদেনের এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যেখানে কোম্পানী সুদ গ্রহণ করে, এ ক্ষেত্রে শিয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ রাখলে দুটি মৌলিক প্রশ্ন হয়। (এক) জেনেশুনে এরূপ শেয়ার ক্রয় করলে সুদী লেনদেনে শেয়ারারদের সম্মতি রয়েছে বলে বুঝা যায়। (দুই) প্রাপ্ত লভ্যাংশে সুদের মিশ্রন ঘটে। শেয়ার ক্রয়ের বিষয়কে বৈধ রেখে আল্লামা তকী উসমানী প্রশ্ন দুটোর মীমাংসা এভাবে করেছেন যে, (প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ) সুদী লেনদেনের সম্মতির বিষয়টি প্রতিবাদ জানানো দ্বারা নিরসন হয়ে যাবে। আর প্রাপ্ত মুনাফায় সুদের মিশ্রণের বিষয়টি নিরসনের জন্য তিনি হযরত থানবী (রহ.)-এর রেফারেন্সে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা প্রত্যেক কোম্পানীর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানি না যে, তারা সুদ গ্রহণ করেছে কিনা।

www.eelm.weebly.com

আর গভীর অনুসন্ধানের জন্য আমরা নির্দেশিত নই। দ্বিতীয়ত যদি কোম্পানী সুদ গ্রহণ করেও থাকে তাহলে তা পরিমাণে অতি নগণ্য যা হালাল মালের সাথে মিশে গেছে। আর হালাল হারাম মিশ্রিত মালে যদি হালালের পরিমাণ অধিক হয় তাহলে তা ব্যবহারের অবকাশ আছে। (যেমন) -হালাল হারাম মিশ্রিত মাল থেকে কাউকে হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা বৈধ হয়)। কিন্তু হযরত থানবী (রহ.)-এর এই বক্তব্যের উপর আল্লামা তকী উসমানী নিজেই প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে, কাউকে মিশ্রিত মালথেকে হাদিয় দিলে আর তাতে হারামের পরিমাণ কম থাকলে তা গ্রহণ করা এ জন্য বৈধ হয় যে, ধরে নেয়া হয়, উক্ত হাদিয়া হালাল অংশ থেকেই প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোম্পানীর বিভাজনযোগ্য লভ্যাংশ সেরূপ নয়। কেননা কোম্পানী যতগুলো খাত থেকে আয় করে তার একটা অংশ প্রত্যেকের লভ্যাংশে থাকে। অতএব সুদের ভিত্তিতে যা আয় হয়েছে তারও একটা অংশ প্রত্যেকের লভ্যাংশে রয়েছে। তাই এ সমস্যা নিরসনের জন্য তিনি এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, ঐ পরিমাণ টাকা লভ্যাংশ থেকে সাওয়াবের নিয়্যিত ছাড়া সাদকা করে দিতে হবে।

আল্লামা তকী উসমানী (মাদ্দা.)-এর বক্তব্যের সার কথা এই দাড়ায় যে, কোম্পানী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সুদ পূর্ব সিদ্ধান্তানুসারে গ্রহণ করলেও প্রতিবাদ জানিয়ে লভ্যাংশ থেকে সুদের পরিমাণ টাকা সাদকা করে দিলেই তা বৈধ হয়ে যাবে। এবং উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বৈধ হয়ে যাবে।

বিষয়টির সাথে আমরা সরাসরি একমত হতে পারিনি। এ জন্যই আমরা বিষয়টি দু'ভাবে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছি।

হযরত থানভী (রহ.)-এর যে বক্তব্যকে তিনি রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেকালে তা বৈধ থাকলেও বর্তমানে বোধ হয় এরূপ বলা ঠিক হবে না। কেননা বর্তমানে প্রত্যেক কোম্পানীই প্রকাশিত প্রসপেক্টাসে তার আয় ব্যয়ের খাত কি হবে তা উল্লেখ করে থাকে। আর কোম্পানীর ব্যালেন্সশীট থেকে সুদ গ্রহণ করছে কি না সে সম্পর্কে জানা সহজেই সম্ভব। তাই থানভী (রহ.) এর বক্তব্য তার যুগের আলোকে যথার্থ সাব্যস্ত হলেও বর্তমানে সেটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা বোধ হয় সঙ্গত হয়নি।

শিয়ার ক্রয়ের পদ্ধতিসমূহের মাঝে স্পট সেইলের বিষয়টি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের সাথে কোন সংঘাত নেই। তবে স্পট সেইলের ক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তরের প্রকৃত সময় কোনটিকে ধরা হবে এ বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট ফয়সালা প্রয়োজন। কেননা সাধারণতঃ কেনাবেচায় ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যখন ক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য বুঝে নেয় এবং বিক্রেতা মূল্য

www.eelm.weebly.com

বুঝে পায় তখন বেচাকেনা পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত হয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু শেয়ারের লেনদেনে শুধুমাত্র তার সার্টিফিকেট বুঝে নেয়া ছাড়া শিয়ার বুঝে নেয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মানুসারে সার্টিফিকেট বুঝে নিয়ে মূল্য পরিশোধ করলেই বেচাকেনা পরিপূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া উচিত। কিন্তু শেয়ার বাজারের প্রথা ভিন্ন। সেখানে চুক্তিকেই চূড়ান্ত বেচাকেনা মনে করা হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অফিসিয়াল ফর্মালিটি পূর্ণ করে সার্টিফিকেট ক্রেতার হাতে আসতে দুই তিন সপ্তাহ সময় লেগে যায়। শেয়ার বাজারে এই মধ্যবর্তী সময়ে শেয়ারের মালিক ক্রেতাকে ধরা হয়। যে কারণে এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শেয়ারের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে (তা যদিও বিক্রেতার নামেই বরাদ্দ হয়) তার পাওনাদার হয়ে থাকেন ক্রেতা। অনুরূপভাবে স্পট সেইল হয়ে যাওয়ার পর সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার আগে যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তাহলে এটা ক্রেতার ক্ষতি হিসেবে গণ্য হয়। বিক্রেতা তার শেয়ারে মূল্য অবশ্যই স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে পেয়ে যাবেন।

এদিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদিও বাহ্যিকভাবে ক্রয়কৃত দ্রব্য ক্রেতা বুঝে পায়নি; কিন্তু আইনগতভাবে তা ক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধিন ও দায়-দায়িত্বে এসে গেছে। আর যেখানে ক্রয়কৃত দ্রব্য সরাসরি বুঝে নেয়ার কোন উপায় থাকে না; সেখানে আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণাধীকার ও দায়দায়িত্ব লাভ করাকেই দ্রব্য বুঝে নেয়া বলে গণ্য করা হয়। অতএব এদিক বিচারে বেচা-কেনা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত হয়। সার্টিফিকেট মূলতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি লিখিত দলীল মাত্র। কিন্তু যদি এদিক লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক জিনিসের নিয়ন্ত্রনাধিকার ও দায়-দায়িত্ব হস্তান্তরের একটি নির্ধারিত প্রথা রয়েছে। আর শেয়ার বাজারে সার্টিফিকেট হাতে বুঝে পাওয়া দ্বারাই শেয়ারের মালিকানা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে বলে ধরা হয়। এদিক লক্ষ্য করলে বলতে হয় যে, শেয়ার সার্টিফিকেট হাতে পাওয়া গেলেই ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে বলে ধরা হবে; এর আগে নয়। এ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শেয়ারের দায় দায়িত্ব ও অধিকার বিক্রেতার হওয়া উচিত। অথচ বর্তমানে এর উল্টোটাই প্রচলিত আছে।

সতর্কতার জন্য সার্টিফিকেট বুঝে পাওয়াকেই লেনদেন চূড়ান্ত হওয়ার প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়া উত্তম। আর যদি তাই ধরা হয় তাহলে সার্টিফিকেট হাতে আসার আগে শেয়ারের যে ক্রয় বিক্রয় হয় তা বৈধ হবে না। কেননা এটি তখন দ্রব্য বুঝে পাওয়ার আগে তা বিক্রয় করার (بيع قبل القبض) বিধানের আওতায় পড়বে- যা সর্বসম্মতিক্রমেই নিষিদ্ধ। তাছাড়া সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার আগে

www.eelm.weebly.com

বেচাকেনার অনুমতি দেয়া হলে প্রতারণা ও ব্যবসায়ী জুয়ার পথ খুলে দেয়া হয়। অতএব এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ হবে না।

Sale on Margin বা আংশিক মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের বিষয়টি নির্ভর করবে দালালের সাথে কৃত চুক্তির উপর। যদি দালালকে অবশিষ্ট টাকার জন্য সুদ দিতে হয় তাহলে বিনা প্রয়োজনে সুদ দেয়া হারাম বিধায় এটি করা বৈধ হবে না। তবে যদি কেউ এই প্রক্রিয়ায় শেয়ার ক্রয় করে ফেলে তাহলে শেয়ারে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যদিও কাজটি হারাম হবে।

Short Sale অর্থাৎ যখন শিয়ার ক্রয়ের পর শেয়ারের মালিক নিজে সার্টিফিকেট হাতে পাননি এমতাবস্থায় যদি তিনি তা এই শর্তে বিক্রি করতে চান যে, সার্টিফিকেট হাতে আসলে লেনদেন হবে; তাহলে এটি বৈধ হবে না। কেননা এটি ভবিষ্যতের কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে বেচাকেনা করার বিবিধ আওতায় পড়বে। এ ধরনের চুক্তিতে বেচাকেনা বৈধ হয় না (হিদায়া ৩য় খণ্ড (بيع الى يوم النيروز) দ্রষ্টব্য) এটাকে বেশি বললে ভবিষ্যতের জন্য একটি ওয়াদা বলে গণ্য করা যায়- যা মূলতঃ বেচাকেনার চুক্তি বলে গণ্য হবে না। যথা সময়ে চুক্তি নবায়ন করে নেয়া অপরিহার্য।

Future sale ঃ অর্থাৎ যেখানে সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার আগে ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট করে বেচাকেনা করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণত বেচাকেনার উদ্দেশ্য লেনদেন হয় না বরং সেই নির্ধারিত দিন আসলে শেয়ারের বাজার দর হিসেবে পরস্পরে অর্থের লেনদেন করে লাভ উপার্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যই বৈধ হবে না। কেননা এতে সুদ ও জুয়া দুটোই সন্নিহিত রয়েছে।

কোম্পানীর লভ্যাংশ বিতরণ ঃ

কোম্পানী সারা বৎসর ব্যবসা করার পর বৎসরান্তে আয় ব্যয়ের ব্যালেন্স সীট প্রকাশ করে থাকে। এই ব্যালেন্স সীটে একদিকে কোম্পানীর এ্যাসেট (Assets) সমূহের উল্লেখ থাকে, অপরদিকে কোম্পানীর লাইবেলেটিস বা কোম্পানীর দায়িত্বে যে পাওনা পরিশোধ করার থাকে তা উল্লেখ থাকে।

এ্যাসেট বলতে কোম্পানীর স্থাবর সম্পদ, অস্থাবর সম্পদ, নগদ ক্যাশ, আদায়যোগ্য অন্যের নিকট পাওনা টাকা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। আর লাইবেলেটিস বলতে এমন অর্থ সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বকে বুঝানো হয় যা কোম্পানীকে পরিশোধ করতে হয়েছে বা হবে।

এ্যাসেটে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকে। যথা-

www.eelm.weebly.com

ক. স্থাবর সম্পদ (Fixed Assets) যথাঃ মেশিনারি আসবাবপত্র ইত্যাদি। সাধারণতঃ স্থাবর সম্পদের ক্রয় মূল্য ব্যালেন্স সীটে উল্লেখ করা হয়।

খ. অস্থাবর সম্পদ ঃ (Current Assets) যথাঃ নগদ ক্যাশ, আদায়যোগ্য পাওনা (Accounts Receivable), আদায়যোগ্য ঋণপত্র বা সনদপত্র (যেমন- অন্য কোন কোম্পানীর বন্ড বা সরকারি বন্ড যা উক্ত কোম্পানী ক্রয় করে রেখেছে), Notes Receivable, উৎপাদনে বিনিয়োগকৃত বা অন্য কোন সংস্থায় বিনিয়োগকৃত মূলধন (Investments) ইত্যাদি।

গ. অবস্তুগত সম্পদ ঃ যেমন কোন এডভেটাইসমেন্টে লাগানো টাকা যার সুফল কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিংবা কোম্পানীর গুডউইল ইত্যাদি এগুলোরও মূল্য ধরা হয়।

আর লাইবেলেটিসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়। যথা ঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Longterm Liabilities) যা এক বছরের মাঝে আদায় করতে হবে না।

(খ) স্বল্পমেয়াদী ঋণ (Current Liablities) যা এক বছরের মাঝে আদায় করতে হবে। যেমন- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা, এবং ভূমির ভাড়া, ট্যাক্স, সুদী ঋণের সুদ যা পরিশোধ করতে হবে, ক্রয়কৃত দ্রব্যের মূল্য যা অনতিবিলম্বে আদায় করতে হবে কিংবা যে ঋণ এক বছরের মাঝে আদায় করে দিতে হবে ইত্যাদি।

এই ব্যালেন্স সীট দ্বারা কোম্পানীর প্রকৃত মূল্য (Nit worth) সুস্পষ্ট হয়। মূলতঃ শেয়ারাররা এরই অংশীদার থাকেন। কিন্তু এ দ্বারা কোম্পানীর লাভ লোকসান কত হল তা বুঝা যায় না।

লাভ লোকসান বুঝার জন্য কোম্পানী বছরান্তে লাভ লোকসানের খতিয়ান (Income statemente) নামে অন্য একটি রিপোর্ট পেশ করে থাকে। সেই রিপোর্টে কোম্পানীর বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয় এবং উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কত তাও উল্লেখ করা হয়। অতঃপর উৎপাদিত পণ্য থেকে কি পরিমাণ বিক্রয় হল, তার মূল্য কত ও লাভ কত তা উল্লেখ করা হয়। বিক্রিত পণ্য থেকে কিছু কিছু পণ্য বিভিন্ন কারণে ফেরৎ আসে। বিক্রয় মূল্য থেকে ফেরৎ পণ্যের মূল্য বিয়োগ করা হয়। অতপর যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে উৎপাদনের আনুষঙ্গিক ব্যয় ট্যাক্স ও বিবিধ ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে প্রকৃত মুনাফা বলে গণ্য করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ভবিষ্যতের ঘটনা দুর্ঘটনার মুকাবেলা করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। একে বলা হয় রিজার্ভ ফান্ড। রিজার্ভ ফান্ডের জন্য অর্থ সংরক্ষণের পর যা অবশিষ্ট থাকে

www.eelm.weebly.com

সেটাকেই মূলতঃ শেয়ারারদের মাঝে বন্টন যোগ্য মুনাফা ধরা হয়। এ থেকে প্রিফারেন্স শেয়ারারদের লভ্যাংশ বরাদ্দ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাধারণ শেয়ারারদের মাঝে বন্টন করা হয়।

এই লভ্যাংশ বিভাজনের প্রক্রিয়ায় শরীয়তের সাথে তেমন কোন সংঘাত লক্ষ্য করা যায় না। তবে প্রিফারেন্স শেয়ারারদেরকে যদি লভ্যাংশ পুঁজির শতকরা হারে দেয়া হয় তাহলে এটি সুদ বলে গণ্য হওয়ার কারণে অবৈধ হবে। কিন্তু যদি প্রিফারেন্স শেয়ারারদেরকে লভ্যাংশের হার বেশি দেয়া হয়; যেমন- সাধারণ শেয়ারাররা যা পাবে তারা তার দ্বিগুণ পাবে, এভাবে বন্টন করা হয় তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। কেননা সকল শেয়ারারদেরকে সমান হারে লভ্যাংশ দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী নয়। বরং যাকে যে হারে লভ্যাংশ দেয়ার শর্তে শরীক করা হবে তাকে সেই হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে।

শেয়ারের যাকাতের বিধান ঃ

যাকাত যেহেতু ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে অতএব কোম্পানীর মালের উপর যাকাত হবে না। তবে শেয়ারাররা যদি (কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যসহ) মালিকে নেসাব হয় তাহলে তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদান করতে হবে। হানাফী ইমামগণের এটিই অভিমত। তবে অপর তিন ইমাম যেহেতু خلطة) (الشيوع এর বিষয়টি গণ্য করেন এবং যাকাত ব্যক্তির উপর নয়; বরং মালের উপর ওয়াজিব হয় বলে মনে করেন অতএব তাদের মতানুসারে কোম্পানীর উপর যাকাত আসবে। তবে সে ক্ষেত্রে শেয়ারারদেরকে কোম্পানীর শেয়ারের অংশের যাকাত দিতে হবে না। কেননা এক মালের যাকাত দুই বার দেয়ার কোন বিধান নেই।

শেয়ারাররা যখন শেয়ারের যাকাত দিতে যাবেন তখন শেয়ারের মূল্য কোন ভিত্তিতে হিসাব করবেন এটি একটি জটিল প্রশ্ন। কেননা শেয়ারের সাধারণতঃ তিনটি মূল্য থাকে। যথা ১. ফেইস ভ্যালু, ২. মার্কেট ভ্যালু ও ৩. কোম্পানীর অংশীদারিত্বের ভ্যালু (Break up value) (অর্থাৎ এই মুহূর্তে কোম্পানী ভেঙ্গে দিলে কোম্পানীর যাবতীয় সম্পদের হারাহারি বন্টনে প্রতি শেয়ারার যা পাবেন)। সূচনাকালে শেয়ারের ফেইস ভ্যালু যা থাকে পরবর্তীতে কোম্পানী লাভবান হলে তা বৃদ্ধি পায়। অতএব ফেইস ভ্যালু শেয়ারের প্রকৃত মূল্যমানের সূচক হয় না। আবার মার্কেট ভ্যালু বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পায় বিধায় সেটিও শেয়ারের প্রকৃত মূল্যমানের সূচক হয় না। বস্তুত শেয়ারের প্রকৃত মূল্যমানের সূচক হয় ব্রেক

www.eelm.weebly.com

আপ ভ্যালু। সুতরাং ব্রেক আপ ভ্যালু জানা সম্ভব হলে এটিই যাকাত হিসাবের জন্য সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। তবে ব্রেক আপ ভ্যালু যদি জানা সম্ভব না হয় তাহলে মার্কেট ভ্যালুর ভিত্তিতেই যাকাত হিসাব করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে জটিল প্রশ্ন যেটি থেকে যায় তা হল এই যে, কোম্পানীর সকল সম্পদ যাকাত যোগ্য নয়। কেননা মেশিনারী বা উৎপাদনের উপকরণ, ভূমি, বিল্ডিং ইত্যাদির উপর যাকাত আসে না। অতএব শেয়াররা যাকাত দানের ক্ষেত্রে কোম্পানীর যাকাত যোগ্য মালের পরিমাণও যাকাত যোগ্য নয় এমন ধরনের মালের পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ শেয়ার প্রতি তার আনুপাতিক হার বের করে যাকাত যোগ্য পরিমাণের যাকাত হিসাব করবেন, না শেয়ারের পূর্ণ মূল্যের উপর যাকাত দিবেন? এটি একটি জটিল প্রশ্ন বটে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের উলামায়ে কিরামের দুই ধরনের অভিমত দেখা যায়। মিশরের শায়খ আবু যাহ্‌রা (রহ.) এর অভিমত এই যে, যেহেতু শেয়ার নিজেই ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গণ্য হয় অতএব পূর্ণ শেয়ারের মূল্যের উপরই যাকাত দিতে হবে। তবে অন্যান্যদের অভিমত এই যে, যেহেতু শেয়ার কোম্পানীর অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব কোম্পানীর যেসব সম্পদে যকাত আসে না তা হিসাব করে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের শেয়ার প্রতি আনুপাতিক হার যা দাড়ায় তার উপর যাকাত দিলেই চলবে।

অবশ্য আল্লামা তকী উসমানী (মুদ্দা.) এই দু'টি মতামতের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি মুনাফা ভোগের উদ্দেশ্যে কেউ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তখন তাকে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গণ্য করা যায় না। অতএব এ ক্ষেত্রে যদি কোম্পানীর যাকাত যোগ্য নয় এমন ধরনের মাল বাদে যা অবশিষ্ট থাকে; শেয়ার প্রতি তার আনুপাতিক হার যা দাড়ায় যদি তার উপর যাকাত দেয়া হয় তাহলেই যথেষ্ট হবে। তবে কোম্পানীর কি পরিমাণ সম্পদ যাকাত যোগ্য নয় তা যদি জানা সম্ভব না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক শেয়ারের পূর্ণ মূল্যের যাকাত আদায় করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। তবে যদি কেউ শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে; তাহলে পূর্ণ শেয়ারের মূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে। কেননা তখন তা ব্যবসায়ী পণ্য বলে গণ্য হবে।

www.eelm.weebly.com

ব্যবসায়ী মুনাফা ও সুদ ঃ

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবসার ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়ী দুর্নীতিকে রোধ করার কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। এ কারণেই ব্যবসার ক্ষেত্রে সুদী প্রক্রিয়ায় লেনদেন, জুয়া ও প্রতারণার সকল পন্থাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কেননা ব্যবসায় এসব প্রথা কার্যকর থাকলে অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়, অজ্ঞাতসারে মানুষ শোষিত ও প্রতারিত হয়, অশুভ পুঁজিবাদের বিকাশ তরান্বিত হয়। দেশের মানুষ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যে সুদী প্রক্রিয়া কার্যকর থাকলে ভোক্তারা মারাত্মকভাবে শোষিত হয়। এ কারণেই ইসলাম ব্যবসায়ী মুনাফাকে বৈধ রাখলেও সুদী প্রক্রিয়ায় উপার্জিত লাভকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- احل الله البيع وحرم الربوا আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন তবে সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। অনেকেই ব্যবসায়ী মুনাফা ও সুদী প্রক্রিয়ার লাভের মাঝে কোন তফাত আছে বলে মনে করেন না। সুদী কারবারে লিপ্ত আরবের মুশরিকরাও এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্যটা কি তা বুঝতে পারত না, তাই সুদ অবৈধ হওয়ার ঘোষণার প্রেক্ষিতে তারা বলেছিল انما البيع مثل الربوا ব্যবসার লাভটাও তো সুদেরই মত। বস্তুতঃ এ দু'য়ের মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এ দু'য়ের পার্থক্যটুকু অনুধাবন করার জন্য প্রথমে মুনাফা কাকে বলে আর সুদ কাকে বলে তা বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

সুদের সংজ্ঞা ঃ হিদায়ার টিকা সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

الربوا هو الفضل مال لايقابله عوض في معاوضة مال بمال

অর্থাৎ মাল সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে মালের ঐ অতিরিক্ত (প্রদত্ত বা গৃহীত) অংশ যার বিপরীতে কোন কিছু প্রদান বা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু হিদায়ার গ্রন্থকার সুদের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে,

الربوا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين فى المعاوضة الخالى عن عوض شرط فيه–

লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনকারী দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ কোনরূপ বিনিময় পরিশোধ না করে শুধুমাত্র শর্তের ভিত্তিতে যে অতিরিক্ত অংশের মালিক হয়ে থাকে তাকে সুদ বলা হয়।

মুনাফার সংজ্ঞা ঃ هو فضل المال الحاصل فى مبادلة المال بالمال بالتراضى على وجه التجارة

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ,সম্পদের ঐ বর্ধিত অংশ যা ব্যবসায়ী ভিত্তিতে পণ্যের স্বতঃস্ফূর্ত লেন-দেনের মাঝ দিয়ে অর্জিত হয়। স্মর্তব্য যে শুধুমাত্র বর্ধিত গ্রহণই সুদ বলে গণ্য হয় না বরং সেই বর্ধিত অংশ সুদ বলে গণ্য হওয়ার জন্য হানাফী ইমামগণের নিকট লেন-দেনের জন্য নির্ধারিত দ্রব্য দুটি সমজাতীয় হওয়া এবং সেগুলো মেপে কিংবা ওজন করে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়- এমন হওয়া অপরিহার্য। মেপে কিংবা ওজন করে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এমন এক জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে এক পক্ষ যদি শর্তের কারণে এমন অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করেন যার বিনিময়ে তিনি কোন কিছু পরিশোধ করেননি; কেবল তখনই তা সুদ বলে গণ্য হবে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ সুস্পষ্ট জুলুম বলে প্রতিয়মান হয় বিধায় চরমভাবে সমতা রক্ষা করে লেনদেন করলে তা বৈধ হয়। কিন্তু সমতার ক্ষেত্রে সামান্য এদিক সেদিক হলেই তা সুদ বলে গণ্য হয়। তাই এহেন লেনদেনে পরিমাণগত সমতা রক্ষার সাথে সাথে লেনদেনের সময়ের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের লেনদেন নগদানগদী হতে হয়। নগদ বাকীতে লেনদেন করলেও তা সুদ বলে গণ্য হয়।

কেননা এক জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের বিষয়টিকে অদল বদল বা বিনিময় ছাড়া বেচা-কেনা বলে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা বেচাকেনা সাধারণতঃ সংগঠিত হয় এক পক্ষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্যের নিকট থেকে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। অথচ সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনে এরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কেননা আমি অন্যের নিকট থেকে যা সংগ্রহ করছি তাই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। তাই একে বেচাকেনা বলা যাবে না; বলতে হবে অদল বদল বা বিনিময়। যদি বেচাকেনা বলা যেত তাহলে অতিরিক্ত অংশকে মুনাফা বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু যেহেতু এটি বেচাকেনা নয় বরং বিনিময় তাই অতিরিক্ত গ্রহণ করলে তা সুস্পষ্টভাবে জুলুম ও শোষণ বলে প্রতীয়মান হবে। অতএব কোন কারণে লেন-দেন করতে হলে চূড়ান্তভাবে সমতা রক্ষা করে করতে হবে। কারণ যদি অদল বদলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পথ উন্মোক্ত রাখা হয় তাহলে অন্যের মাল বিনা বিনিময়ে জুলুমাত্মকভাবে গ্রাস করার পথ খুলে দেয়া হবে। যা অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে অশুভ পুঁজিতন্ত্রের জন্ম দিবে। এ কারণেই রাসুলে কারীম (সা.) এহেন লেনদেনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন । এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا
بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد اوازداد فقداربى – مسلم

www.eelm.weebly.com

অর্থাৎ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ (লেনদেন) সমপরিমানের বিনিময়ে সমপরিমান, রূপার বিনিময়ে রূপা সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ, খেজুরের বিণিময়ে খেজুর সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ, গমের বিনিময়ে গম সমপরিমাণের বিণিময়ে সমপরিমাণ, লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণের বিণিময়ে সমপরিমাণ, যবের বিণিময়ে যব সমপরিমাণের বিণিময়ে সমপরিমাণ লেনদেন করতে হবে। যে বেশি দিবে কিংবা বেশি দাবী করবে সে সুদী লেনদেনে লিপ্ত হবে।

কিন্তু যদি দ্রব্য দুটি এমন হয় যে, সেগুলোর লেন-দেন মেপে কিংবা ওজন করে করা হয় না বরং গণনা করে, হালী হিসাবে, ডজন হিসেবে কিংবা শ' হিসেবে লেনদেন করা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ছোট বড় হওয়ার অবকাশ থাকে বিধায় কম বেশীতে লেনদেন করলে তা সুদ বলে গণ্য হয় না। কেননা দু'টি ছোট আমের বিনিময়ে একটি বড় আম লেনদেন করা হয়েছে এ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু মুদ্রার প্রশ্নটি ভিন্ন, কেননা মুদ্রা গণনা করে লেন-দেন করা হলেও মানগত দিক থেকে সমান অর্থাৎ ১০০ টাকার নোট ও ১০০ টাকার ভাংতি মূল্যমানের দিক থেকে সমান তাই এর কম বেশি লেন-দেন বৈধ হবে না। তাছাড়া মুদ্রা মূলতঃ স্বর্ণ কিংবা রূপার গ্যারান্টি কার্ড রূপে ব্যবহার হয়, আর স্বর্ণ ও রূপার পরিমাণ ওজন করে নির্ধারণ করা হয়, অতএব টাকার পরিমাণ নির্ধারণের মূল ভিত্তি ওজনের উপর। তাই এর লেন-দেনে সমতা রক্ষা করতে হয়।

আর দ্রব্য দুটি যদি সমজাতীয় না হয় তাহলে তার লেনদেনকে বিনিময় গণ্য না করে বেচা-কেনা বলে গণ্য করা যায়। কেননা বেচাকেনার উদ্দেশ্য এখানে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশকে মুনাফা হিসেবে গণ্য করা যায়। আর ব্যবসা ও ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের বিষয়টি সর্বস্বীকৃত। কেননা এর অবকাশ না রাখলে আদান প্রদানের পথ রুদ্ধ হয়ে মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়বে। তাছাড়া ব্যবসায়ের মুনাফাকে মূলতঃ ব্যবসায়ীর শ্রমের বিনিময় হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু যেখানে ব্যবসা পাওয়া যায় না; সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশকে মুনাফা বলে গণ্য করা সম্ভব হয় না। তাই সেটাকে বিনিময়হীন শোষণ ছাড়া অন্য কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এ জন্যই ইসলাম ব্যবসাকে হালাল রেখেছে কিন্তু সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে।

যে দুটি বিষয়ের উপর হানাফী ইমামগণ সুদের ভিত্তি রেখেছেন অর্থাৎ সমজাতীয় হওয়া ও মাপণ প্রক্রিয়া এক হওয়া; লেনদেনকৃত দ্রব্য দুটির মাঝে যদি ঐ দুটি শর্তের কোন একটিও বিদ্যমান না থাকে অর্থাৎ যদি দ্রব্য দুটি দুই জাতীয় হয় এবং একটি মেপে অন্যটি গণনা করে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় কিংবা একটির মাপের পদ্ধতি এক রকম, অন্যটির মাপের পদ্ধতি ভিন্ন রকম, যেমন একটি মাপা

www.eelm.weebly.com

হয় ছটাক হিসাবে, অন্যটি মাপা হয় গ্রাম হিসাবে। তাহলে এহেন দুটি দ্রব্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণগত তারতম্যের সাথে বেচাকেনা করা যাবে এবং নগদ বাকীতেও লেনদেন করা যাবে। যেমন এক মণ চাউল ১০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা অথবা দুই মণ ডালের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে। তবে যদি দ্রব্য দুটির মাঝে সুদের দুটি ভিত্তির কোন একটি মাত্র বিদ্যমান থাকে; আর অন্যটি বিদ্যমান না থাকে, যেমন- ওজনের প্রক্রিয়া এক কিন্তু এক জাতীয় নয় (যেমন চাউল ও আটা); তাহলে সেসব ক্ষেত্রে পরিমাণগত তারতম্যের সাথে বেচাকেনা বৈধ হবে, কিন্তু নগদানগদী বেচাকেনা করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি দ্রব্য দুটি একই জাতীয় হয় কিন্তু তা ওজন করে বা মেপে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় না বরং গণনা করে বিক্রি করা হয় (যেমনঃ একটি আমের পরিবর্তে দুটি আম) তাহলেও পরিমাণগত তার তম্যের সাথে বেচাকেনা করলে তা সুদ হবে না, তবে লেনদেন নগদানগদী করতে হবে।

প্রাচীনকালে সমজাতীয় দ্রব্য লেনদেনের মূল উদ্দেশ্য হত লেনদেনের ফাঁক দিয়ে অর্থোপার্জন করা। এই অর্থোপার্জন সাধারণত দু'ভাবে করা হত।

১. সময়ের ব্যবধানকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম বানানো হত। যেমন কাউকে ১০০ টাকা এই শর্তে ঋণ দেয়া হত যে, যদি এক মাস পরে তা আদায় করে দাও তাহলে ১০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে; আর যদি দুই মাস পরে পরিশোধ কর তাহলে বিশ টাকা দিতে হবে। কিংবা ১ মণ ধান নিয়ে ১ মাস পরে পরিশোধ করলে দেড় মণ দেয়ার শর্ত করা হতো। এভাবে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ বাড়তে থাকত। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'الربوا النسية' সময়ের ব্যবধানজনিত সুদ বলা হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন كل فرض جر نفعا فهو ربوا অর্থাৎ যে করয কোন লাভ বহন করে আনে তা সুদ বলে গণ্য হয়। এ ধরনের ঋণ দানের ক্ষেত্রে কখনো এরূপ শর্ত করা হত যে, প্রতি মাসে ১০ টাকা করে সুদ দিতে হবে এবং সুদের টাকা যথা সময়ে পরিশোধ না করলে তা মূল ঋণের সাথে সংযুক্ত হয়ে আসলে পরিণত হবে এবং পরবর্তী মাসে সুদে আসলে মিলে যা হবে তার উপর শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ দিতে হবে। সেই সুদ আদায় না করলে তা আবার মূল টাকার সাথে সংযুক্ত করে তার উপর শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ দিতে হবে। এভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ কেবল বাড়তেই থাকত। এক সময় সুদে আসলে ঋণ এত বেড়ে যেত যে, তা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা সর্বশান্ত হয়ে যেত। একে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বলা হয়। এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। -সূরা আল্ ইমরান ১৩০

www.eelm.weebly.com

২. মানুষের সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে একই জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের ফাঁক দিয়ে কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করা হত। যেমন ১০০ টাকার ভাংতি নিতে চাইলে এই শর্তে দেয়া হত যে, ৫ টাকা তাকে কম দেয়া হবে অর্থাৎ ৯৫ টাকা দেয়া হবে। কিংবা ১ কেজি আতপ চাউল কিনতে চাইলে তার পরিবর্তে দুই কেজি সিদ্ধ চাউল দাবি করা হত। মানুষের সমস্যার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয় শরীয়তের পরিভাষায় একে (ربوا الفضل) বা অতিরিক্ত প্রদানজনিত সুদ বা ব্যবসায়ী সুদ বলা হয়।

দিরহাম ও দিনার যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে তৈরি, আর সোনা রূপার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ওজন করে, তাই তাতেও কমবেশিতে লেনদেন সুদ বলে গণ্য হবে। কাগজী মুদ্রা যেহেতু সোনা ও রূপার গ্যারান্টি কার্ড বলে বিবেচিত হয় কিংবা পারিভাষিক মুদ্রা বলে গণ্য হয়। তাই সেগুলোর কমবেশিতে বিনিময় সুদ বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে দুই দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক মান হিসেবে বিনিময়ে যে হার দাড়ায় তার চেয়ে কমবেশীতে লেনদেনের হুন্ডি বা বাটার নামক যে প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তাও সুদী লেনদেন বলে গণ্য হবে।

বস্তুতঃ সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের ফাঁক দিয়ে অতিরিক্ত যা কিছু উপার্জন করা হয় এটাও মূলতঃ বিনিময়হীন শর্তসাপেক্ষ উপার্জন; এটাও নগ্ন শোষণ। এ ধরনের নগ্ন শোষণকে ইসলাম কিছুতেই বৈধ রাখতে পারে না। সাধারণভাবে এটাকে এক ধরনের ব্যবসা মনে করা হলেও সমজাতীয় হওয়ার কারণে ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা বস্তুতঃ বিনিময়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে। احل الله البيع وحرم الربوا

অনেকেই মনে করেন যে, যেহেতু মহাজনী সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেয়া হত; ফলে তাতে শোষণ ছিল জঘন্য পর্যায়ের। যার পরিণামে ঋণগ্রহীতাকে একদিন সর্বশান্ত হয়ে পথে বসতে হত। এ কারণেই ইসলাম মহাজনী সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্যে যে সুদী প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে তাতে গরীব শোষিত হওয়ার পরিবর্তে তারা বরং লাভবান হচ্ছে। যেমন সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন বা মিল কারখানা গড়ে তুলছেন তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামাচ্ছেন এবং তা থেকে একটা অংশ অর্থযোগানদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সুদ হিসেবে দিচ্ছেন। অথচ ঐ টাকা না পেলে তাদের কিছুই উপার্জন করা সম্ভব হত না, আর ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকরাও কিছু পেতেন না। অনুরূপভাবে ব্যাংকে যারা টাকা রাখছে তারা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক ইন্টারেস্ট লাভ করে লাভবান হচ্ছে। অতএব এগুলোতে মহাজনী সুদের ন্যায় শোষণ নেই তাই এগুলো বৈধ হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বৃহৎমানের পুঁজি সংগ্রহের জন্য সুদী প্রক্রিয়ায় অর্থ আদান প্রদান না করে কোন উপায় থাকে

www.eelm.weebly.com

না। বৃহৎমানের কোন কিছু গড়ে তোলার প্রয়োজনে এহেন ব্যবসায়ী সুদকে বৈধ রাখা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় দেশ পশ্চাদমুখীতার শিকার হবে। চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে দেশের নাগরিকরা।

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হল যে, শরীয়ত যে পন্থাকে সুদ বলে আখ্যায়িত করেছে তাতে অবশ্যই শোষণ রয়েছে। বাহ্যিকভাবে এই শোষণ বোধগম্য হোক বা না হোক। তাই সুদের প্রদত্ত সংজ্ঞা যেখানেই প্রযোজ্য হবে সেখানেই শোষণ আছে বলে ধরে নিতে হবে এবং তা নিষিদ্ধ ও হারাম বলে গণ্য হবে।

আমরা যদি আধুনিককালের ব্যবসায়ী সুদের উপর সুদের সংজ্ঞাটি প্রয়োগ করি তাহলে তা হুবহু খেটে যায়। যেমন মহাজনী সুদে মহাজন হতেন ঋণদাতা আর গরীব ও অসহায় মানুষ হত ঋণগ্রহীতা। ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতা থেকে সময়ের ব্যবধানজনিত কারণে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করতো যা সুদ বলে গণ্য হত। অনুরূপভাবে আধুনিককালে সাধারণ স্বল্প আয়ের মানুষ হয়ে থাকে ঋণদাতা আর বড় বড় পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক হয়ে থাকে ঋণগ্রহীতা। সময়ের ব্যবধানজনিত কারণে এ ক্ষেত্রেও ঋণদাতারা ঋণগ্রহীতাদের থেকে শর্তের ভিত্তিতে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করে থাকে। অতএব এটিও সুদ হতে বাধ্য। কেননা টাকা সমজাতীয় হওয়ার কারণে এটাকে ব্যবসা বলা যায় না। আর যেহেতু ঋণদাতা লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহন করছে না অতএব এই টাকাকে ব্যবসার মুনাফা বলেও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এখানে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, মহাজনী সুদে দরিদ্র জনগণ যেভাবে শোষিত হত এ ক্ষেত্রে সেই শোষণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি নিষিদ্ধ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

এর জবাব এই যে, এ ক্ষেত্রে শোষণ মহাজনী সুদের শোষণের চেয়েও মারাত্মক পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে শোষণ একটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক ভিত্তিতে করা হয়; যা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, তারা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এক্ষেত্রে শোষণ যে কত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী তা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

বস্তুতঃ শিল্পপতিরা সুদ বা লাভ দেয়ার শর্তে জনগণের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে থাকেন তা অবশ্যই তারা শিল্পে বিনিয়োগ করেন। ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে নিজের লাভের টাকা এবং ঋণদাতাদেরকে প্রদেয় সুদের টাকা সংযুক্ত করে তবেই তাদের পণ্যের বাজারজাত করতে হয়। ফলে যে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা দাড়িয়েছিল তা ৫% লাভে ১০৫ টাকায় বাজারজাত করা সম্ভব ছিল; কিন্তু ঋণদাতাদের সুদের টাকা (যদি তা ১০% ধরা হয়) যোগ করে তা অবশ্যই ১০০+৫+১০ = ১১৫ টাকায় বাজারজাত করতে হবে। এই পণ্য ক্রয় করবে দেশের আপামর জনসাধারণ; যাতে ফকীর, মিসকীনও রয়েছে। ফলে শতকরা ১০ টাকা শোষিত হবে উক্ত পণ্যের সকল ভোক্তা। যাদের অনেকেই এই পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখে না। সুতরাং মহাজনী সুদে

www.eelm.weebly.com

শোষণ সীমাবদ্ধ থাকত ঋণদাতা ও গ্রহীতার মাঝে। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়ী সুদের শোষণ বিস্তার লাভ করে সকল ভোক্তা পর্যন্ত। ফলে তারা তিলে তিলে শোষিত হয়ে একদিন সর্বহারাদের কাতারে এসে দাঁড়ায়। আর শিল্পপতিরা তাদেরই টাকা শোষণ করে পুঁজিপতি বনে যায়।

ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শোষণ আরো মারাত্মক পর্যায়ের। কেননা ব্যাংক ৭% সুদ দেয়ার শর্তে জনগণের টাকা সংগ্রহ করে এবং সেই টাকা ১৫% থেকে ২০% হারে সুদের ভিত্তিতে উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতিদের নিকট বিনিয়োগ করে। ফলে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যারা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তারা আরো চড়ামূল্যে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করেন। কেননা তাদের উৎপাদিত পণ্যে: পণ্যপ্রতি উৎপাদন ব্যয় যদি ১০০ টাকা পড়ে থাকে তাহলে তাকে সেই পণ্য বাজারজাত করতে এভাবে হিসাব করতে হয় যে, পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা+লাভ ৫ টাকা+ব্যাংকের সুদ ২০ টাকা= ১২৫ টাকা। অথচ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ না করলে উক্ত পণ্য ১০৫ টাকায় বাজারজাত করা যেত। ফলে পণ্যের ভোক্তারা শোষিত হন শতকরা ২০ টাকা। অথচ ভোক্তাদের মাঝে ফকীর মিসকীনসহ অসংখ্য ভোক্তা এমন রয়েছে যারা ব্যাংকে কোনদিনই টাকা জমা রাখে না। অথচ তাদেরকেও এই শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হতে হয়। আর যিনি ব্যাংকে টাকা জমা করেন তিনিও অজ্ঞাতসারে শোষিত হয়ে থাকেন। কেননা যদি তিনি ১০০ টাকা জমা করে থাকেন তাহলে তিনি বৎসরান্তে সুদ পাবেন ৭ টাকা। ব্যাংকের টাকায় উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে বছরে শতকরা ২০% হারে কত টাকা তিনি গচ্ছা দিয়েছেন সে হিসাব কিন্তু তিনি কোন দিনই করে দেখেন না। অথচ তার টাকায় শিল্প উৎপাদন করে তাকে ও দেশের অপরাপর মানুষকে শোষণ করে শিল্পপতি পুঁজিপতি বনে যাচ্ছেন। ব্যাংকার মধ্যসত্বভোগী হিসেবে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছে। আর এদের শোষণের নিগড়ে বন্দি হয়ে দেশের অসংখ্য মানুষ ক্রমান্বয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে।

অতএব ব্যবসায়ী সুদে শোষণ নেই বলে যারা মনে করেন তারা আসলে বোকার রাজ্যে বাস করেন। ইসলাম এহেন সর্বগ্রাসী শোষণের মাধ্যমে মানুষের রক্ত শোষণের এই জঘন্য প্রক্রিয়াকে কিছুতেই বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতে পারে না।

এ কারণেই ইসলাম লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়া অবলম্বনের আমন্ত্রণ জানায়। কেননা যৌথ শরীকানা ব্যবসায় এই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী শোষণের কোন প্রক্রিয়া বিদ্যমান নেই। তদুপরি লাভ যা হয় তা-গুটিকতক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত থাকে না বরং অসংখ্য পুঁজি বিনিয়োগকারীদের হাতে সমহারে বন্টিত হয়ে যায়। ফলে অশুভ পুঁজিবাদ জন্মলাভের কোন সুযোগ থাকে না। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.eelm.weebly.com

দশম অধ্যায়

মুদ্রা

মুদ্রার সংজ্ঞা ঃ মুদ্রা শব্দটি আরবী ثمن শব্দের প্রতিশব্দ। অভিধানে ثمن বলতে কারো দায়িত্বে বর্তানো পরিশোধিতব্য বস্তুকে বুঝানো হয়। হিদায়া গ্রন্থের টিকাকার ثمن এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'সামানুন' বা মুদ্রা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা ১. প্রকৃত মুদ্রা যেমন, সোনা রূপা, ২. পারিভাষিক মুদ্রা। পারিভাষিক মুদ্রার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

هو سلعة فى الاصل ان كان رائجا كان ثمنا

পারিভাষিক মুদ্রা মূলতঃ ধাতব উপকরণ, যদি তাকে (মুদ্রা হিসেবে) প্রচলন দেয়া হয় তখনই তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হয়।

অধ্যাপক জিভেন্সের ভাষায়- মুদ্রা বলা হয় ধাতু নির্মিত এমন কতগুলো টুকরাকে যার ওজন ও অকৃত্তিমতা তার উপর অংকিত নকশা দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লামা তকী উসমানী মুদ্রার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 'যে বস্তু লেনদেনের প্রচলিত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা একটি নির্ধারিত পরিমাণের প্রতীক হয়ে থাকে এবং যা দ্বারা মূল্যমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় তাকে মুদ্রা বলে'।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে, কোন বস্তু মুদ্রা হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. বিনিময়ের প্রচলিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে তার ব্যবহার থাকতে হবে।

২. তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রতীক রূপে গণ্য হতে হবে। তাই এক খন্ড দস্তা কে মুদ্রা বলা যাবে না। কিন্তু যদি সেই দস্তা খন্ডটির উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রতিকী মহর অঙ্কন করে দেয়া হয় এবং তার গায়ে তার পরিমাণ যেমন- ৫ টাকা, ১০ টাকা লিখে দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই মূল্যমান স্বীকৃত হয় তাহলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপ এক খণ্ড কাগজকেও যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রতীক রূপে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে তাও মুদ্রা বলে গণ্য হবে।

৩. তা দ্বারা মূল্যমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এর অর্থ হল সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মূল্যমান বাড়ে কমে না। যেমন কেউ যদি ১০০ টাকার চাউল

www.eelm.weebly.com

কিনে রাখে তাহলে তার দাম কমতে বাড়তে পারে। আবার সময়মত যে তার খরিদ্দার পাওয়া যাবে এমন নাও হতে পারে। অতএব চাউলের দ্বারা ১০০ টাকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। তাই তার মূল্যমান সংরক্ষিত নয়। কিন্তু যদি কেউ ১০০ টাকার নোট সংরক্ষণ করে তাহলে সর্বাবস্থায় তার নিকট একশত টাকাই সংরক্ষিত থাকবে। অবশ্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মুদ্রা মান ঘটে গেলে সে ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ১০০ টাকার মূল্যমান ১০০ টাকাই থাকে। এবং এর চাহিদা সবসময় সমান । এ দ্বারা যখন যা ইচ্ছা ক্রয় করতে পারা যায়। অতএব এর মূল্যমান পূর্ণ সংরক্ষিত। উল্লেখ্য যে, সরকার প্রবর্তিত বণ্ডসমূহ, ব্যাংক প্রদত্ত চেকসমূহও মুদ্রার অর্থ বহন করে।

মুদ্রা ও কারেন্সির পার্থক্য ঃ

উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয় যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তাকে মুদ্রা বলা হবে। কিন্তু তাকে কারেন্সি বলা হবে তখন যখন তা রাষ্ট্র কর্তৃক মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত হবে। সুতরাং ব্যাংকের চেক, সরকার প্রবতর্তিত বন্ড ইত্যাদির মাধ্যমে বেচাকেনা চললেও কারেন্সী নয় বিধায় যদি কোন ক্রেতা তার পণ্যের মূল্য চেক বা বন্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে তা গ্রহণের জন্য আইনগতভাবে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এগুলো স্বীকৃত মুদ্রা নয়। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মুদ্রা দ্বারা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে।

মুদ্রার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঃ

উপরে মুদ্রার যে সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, সর্বকালের মুদ্রা ব্যবস্থা একরকম ছিল না। প্রত্যেকেই তার যুগের মুদ্রা ব্যবস্থার আলোকে মুদ্রার সংজ্ঞা দিয়েছেন। মুদ্রা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা থাকলে মুদ্রার সংজ্ঞার এই পার্থক্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, মানব সভ্যতার সূচনাকালে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লেনদেন-এর প্রথাই প্রচলিত ছিল। যাকে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায় بيع مقائضة এবং আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় বাটার Badter পদ্ধতি বলা হয়। সেই পদ্ধিতিতে বেশকিছু সমস্যা ছিল। যেমন চাহিদা ও যোগানের সম্মিলন অনেক সময় এক স্থানে ঘটত না। উদাহরণ হিসেবে একজনের নিকট ধান আছে, তার কাপড়ের প্রয়োজন। কিন্তু কাপড় বিক্রেতাদের কারো ধানের প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় ধান দিয়ে কাপড় ক্রয় করা জটিল হয়ে পড়ত। তাছাড়া দ্রব্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা তো ছিলই। তদুপরি একজনের ধান আছে সে ধান দ্বারা লবণ, তেল, মরিচ ইত্যাদি পণ্য ক্রয় করতে

www.eelm.weebly.com

অগ্রহী। এ ক্ষেত্রে ধানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করে তবেই পণ্য ক্রয় করার প্রয়োজন হত; ধানের ন্যায় পণ্যকে এত ক্ষুদ্র এককে বিভাজন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করা এবং এর উপর ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তি করা ছিল খুবই মুশকিল। এ কারণেই পরবর্তীকালে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন ধান, চাউল, চামড়া, গম, যব ইত্যাদি। কিন্তু তাতেও সমস্যা নিরসন হয়নি। যে কারণে পরবর্তীকালে কতিপয় মূল্যবান ধাতব পদার্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেমন সোনা, রূপা, তামা, দস্তা ইত্যাদি। কেননা এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। আরো পরবর্তীকালে সংরক্ষণ ও বহনের সুবিধার দিক বিচার করে সোনাকেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব গ্রহণ করে নেওয়া হয়। যেহেতু সোনার চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান ছিল এবং ধাতব পদার্থসমূহের মাঝে এপদার্থটি সংরক্ষণের জন্য অধিক সুবিধাজনক ছিল; কেননা এটির লয় ক্ষয় অন্যসব ধাতব পদার্থের তুলনায় খুবই কম। তাছাড়া এটি অতি মূল্যবান পদার্থ হিসেবে অল্প পরিমাণ: অনেক মূল্যমান বহন করত। তাই এটিকেই পৃথিবী বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নেয়। সে থেকেই সোনা মুদ্রামূল হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। প্রথম দিকে সাধারণ সোনার মাধ্যমেই বেচাকেনা চলত এবং ওজনের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। মুদ্রা রূপে ঢালাইকৃত কোন নির্ধারিত পরিমাণের প্রতীক রূপে এর ব্যবহার ছিল না। পরবর্তীতে মুদ্রা হিসেবে ঢালাইকৃত রূপে এর ব্যবহার শুরু হয় এবং তার গায়ে পরিমাণ নির্দেশক প্রতিকী চিত্র অংকিত করা হয়। এ সময় পর্যন্ত যে কেউ মুদ্রা তৈরি করতে পারত। এ যুগের মুদ্রা ব্যবস্থাকে Gold Standird মুদ্রা ব্যবস্থা অরবীতে قاعدة الذهب বলা হয়।

এর পরবর্তীকালে সোনার সাথে রৌপ্য মুদ্রা তৈরিরও প্রচলন শুরু হয় এবং এ দুটিই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সমান তালে চলতে থাকে। এ যুগের মুদ্রা ব্যবস্থাকে Bi-Metallic Standerd মুদ্রা ব্যবস্থা আরবীতে نظام المعدنين বলা হত। ইসলামী অর্থনীতিতে সোনা ও রূপা এ দুটি পদার্থকে মুদ্রামূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

এরপর এমন একটি যুগের সূচনা হয়, যখন মানুষ বড় বড় মুদ্রা ব্যবসায়ী থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করত। আবার প্রয়োজনে মুদ্রা ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করত এবং এই টাকা গ্রহণের স্বীকারোক্তি হিসেবে মানুষকে লিখিত রশিদ সরবরাহ করত। এই রশিদ দেখিয়ে মুদ্রা ব্যবসায়ীদের থেকে সেই মুদ্রা আদায় করা যেত। মুদ্রা ব্যবসায়ীদের

www.eelm.weebly.com

বিশ্বস্ততার কারণে জনগণ এই রশিদকে মুদ্রার সমার্থক মনে করত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিবর্তে ঐ রশিদের মাধ্যমেই লেনদেন চলত। মুদা ব্যবসায়ীরা যখন দেখল যে, জনগণ তাদের রশিদের উপর আস্থা পোষণ করে, তখন তাদের হাতে মুদ্রা না থাকলে ঋণপ্রার্থীদেরকে তারা মুদ্রার পরিবর্তে রশিদ দিয়ে দিত; য়া দিয়ে ঋণগ্রহীতারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারত। কেননা তা দ্বারা বেচাকেনা চলত। পরে রশিদ যার হাতে থাকত সে মুদ্রা নিতে আসলে মুদ্রা ব্যবসায়ী তাকে মুদ্রা দিয়ে দিতেন। এভাবে এদের রশিদের উপর জনগণের আস্থা যখন ব্যাপকতা লাভ করল তখন ঋণপ্রার্থী ও আমানতকারী সকলকেই তারা রশিদ দিতে থাকলেন এবং মুদ্রাগুলো তারা অন্য খাতে বিনিয়োগ করতে থাকলেন। এতে তাদের লাভ এই হল যে, এক মুদ্রাকে রশিদের ভিত্তিতে একাধিক খাতে ব্যবহার করে বিপুল হারে মুনাফা কামাতে থাকলেন। একান্ত যদি কেউ মুদ্রা নিতে আসত তাহলে তাকে মুদ্রা দিয়ে দেয়া হত। এভাবে রশিদের মাধ্যমে লেনদেনের প্রথা থেকেই কাগজী নোটের উদ্ভব ঘটে। শুরুর দিকে যে কেউ নোট প্রবর্তন করতে পারত। কিন্তু এগুলোর আইনগত কোন ভিত্তি (Legal Tender) ছিল না। কেবল মানুষের ব্যবহারে প্রচলিত ছিল। নোটের এই ব্যাপক প্রচলন ও এর বহন সুবিধার কথা চিন্তা করেই পরে একে (Legal Tender) বা আইনগত ভ্যালু প্রদান করা হয়। এই আইনগত মুদ্রা যে কেউ প্রবর্তন করার অধিকার রাখত না। রাষ্ট্রীয় তহবীল কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থা কিংবা ব্যাংকগুলোই এ ধরনের মুদ্রা প্রবর্তনের অধিকার রাখত। শুরুর দিকে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের নোট প্রবর্তনের অধিকার ছিল। পরে এই অধিকার কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়। নোট প্রবর্তনের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই নীতি কার্যকর ছিল যে, রাষ্ট্রীয় তহবিলে যে পরিমাণ স্বর্ণ মওজুদ থাকত কেবলমাত্র সেই পরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রবর্তন করা যেত এবং কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে ১০০% স্বর্ণ পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল। যে কারণে কাগজী মুদ্রার গায়ে এ কথা লিখেও দেয়া হত। যেমন ১০ টাকার নোটের গায়ে লিখা হত "চাহিবা মাত্রই ইহার বাহককে দশ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে"। মুদ্রা ব্যবস্থার এ প্রথাকে (Gold Bullion standard) প্রথা বলা হত।

পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লেনদেনের সুবিধার জন্য স্বর্ণ মওজুদ বৃদ্ধি না পেলেও কাগজী মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিলে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে টাকা প্রতি স্বর্ণের হার হ্রাস পায়। এতে মুদ্রার মান হ্রাস পায়। অর্থাৎ তখন ১০০ টাকার বিনিময়ে ১০০% স্বর্ণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকেনি। এই হ্রাসমান কাগজী মুদ্রাকে (Fiduciary Money) বলা হত। পরে স্বর্ণের মওজুদ বৃদ্ধির সংকট ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুদ্রা বৃদ্ধির চাহিদা

www.eelm.weebly.com

বৃদ্ধি পেলে অনেক রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য এমন কিছু কাগজী মুদ্রা প্রবর্তন করে, যার বিপরীতে কোন স্বর্ণ থাকত না। এ ধরনের নোটকে (Token Money) বলা হত। এগুলো রাষ্ট্রসীমার অভ্যন্তরে লেনদেনের জন্য অনুমোদিত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক লেনদেনে এগুলো অচল বলে গণ্য হত। কেননা এগুলোর আইনগত ভ্যালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর কোন মূল্য থাকত না। কেননা এগুলোর বিপরীতে স্বর্ণ পরিশোধের কোন গ্যারান্টি থাকত না।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের কারেন্সির বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ থাকত। যেমন বৃটেনের এক পাউন্ডের বিপরীতে কত স্বর্ণ হবে তা বৃটেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকত, আমেরিকার ডলারের পরিবর্তে কি পরিমাণ স্বর্ণ থাকবে তা আমেরিকার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত থাকত। এ সময় আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রতি দেশের কারেন্সির বিপরীতে নির্ধারিত স্বর্ণের হারের ভিত্তিতে হত। যেমন কোন দেশ তার ১০ টাকার কারেন্সির বিপরীতে ২ তোলা স্বর্ণ নির্ধারণ করে থাকলে আর অপর একটি দেশ তার ১০ টাকার কারেন্সির বিপরীতে ১ তোলা স্বর্ণ নির্ধারণ করে থাকলে শেষোক্ত দেশের ২টি ১০ টাকার নোট প্রথমোক্ত দেশের ১টি দশ টাকার নোটের সমান বলে গণ্য হত। তখন এক দেশ অন্য দেশের কারেন্সির বিপরীতে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পৃথিবীতে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে কোন রাষ্ট্রই বৈদেশিক কারেন্সির বিপরীতে স্বর্ণ পরিশোধ করতে সম্মত হচ্ছিল না। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল ছিল এবং তার স্বর্ণ মওজুদও যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। যে কারণে ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত বৃটেন উড্স (Bretten woods) কনফারেন্সে আমেরিকা এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, তার দেশীয় কারেন্সি অর্থাৎ ডলারের পরিবর্তে সে স্বর্ণ পরিশোধ করতে সম্মত আছে এবং যে রাষ্ট্রই তার কারেন্সির বিপরীতে স্বর্ণ বরাদ্দ করবে (তা যে পরিমাণই হোক না কেন) সেই রাষ্ট্রের কারেন্সি দ্বারা ডলার ক্রয় করা হলে তার বিপরীতে আমেরিকা স্বর্ণ পরিশোধে সম্মত থাকবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাদের কারেন্সিকে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। প্রথম দিকে আমেরিকা ৩৫ ডলারের বিপরীতে এক আউন্স স্বর্ণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়। আর প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিপরীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ নির্ধারিত থাকত তারই ভিত্তিতে ডলারের লেনদেন হত। অর্থাৎ যদি কোন দেশ তার মুদ্রার ১০০ টাকার পরিবর্তে ১ আউন্স স্বর্ণ বরাদ্দ করে থাকে তাহলে সে দেশের ১০০ টাকার পরিবর্তে ৩৫ ডলার পরিশোধ করা হত। বস্তুতঃ এসময় আন্তর্জাতিক মুদ্রামান ডলার দ্বারা নির্ধারণ করা হত। সুতরাং বলা যায় যে তখনও মুদ্রামান স্বর্ণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত।

www.eelm.weebly.com

ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিশোধ করার কথা থাকলেও কার্যতঃ কেউ স্বর্ণের জন্য দাবি করত না। ডলারের মাধ্যমেই বিশ্ব বাণিজ্য চলত। এই ব্যবস্থাকে Britten Woods সিস্টেম বলা হত বা ফিক্সড এক্সচেইঞ্জ রেইট সিস্টেম বলা হত।

কিন্তু উনিশশত ষাটের দশকে ফ্রান্স আমেরিকার কাছ থেকে স্বর্ণের দাবি করে বসে। এ সময় আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। ফ্রান্সের দাবিকৃত স্বর্ণ পরিশোধ করলে আমেরিকার স্বর্ণ মওজুদ যথেষ্ট পরিমাণ কমে যায়। ফলে ১৯৭১ সালে আমেরিকা ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণ পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই বর্তমানে কারেন্সির বিপরীতে স্বর্ণ পরিশোধের আর কোন বাধ্যবাধকতাই অবশিষ্ট রয়নি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় ডলারের মূল্যমানের উপর ভিত্তি করে কারেন্সির মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাকে Freely Floating Exchange প্রথা বলা হয়। বর্তমানে এ পদ্ধতিতেই আন্তদেশীয় মুদ্রার বিনিময় হয়ে থাকে. এখন স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে মুদ্রামান নির্ধারিত হয় না।

মুদ্রা বাজার (Financial Market)ঃ

যে বাজারে মুদ্রার বেচাকেনা হয় তাকে মুদ্রা বাজার বলা হয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে শিয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় তা মূলতঃ মুদ্রা বাজারেরই একটি অংশ বিশেষ। মুদ্রা বাজারে আন্তদেশীয় মুদ্রার লেনদেন ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তীত অর্থ সংশ্লিষ্ট সনদ, সার্টিফিকেট,[1] বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, অপশন[2] ও রাষ্ট্রীয় বন্ড ও সিকিউরিটি সার্টিফিকেট[3] ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়

---

১ যেমন বন্ড ও ডিভেঞ্চার

২ অপশন ঃ নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কোন বিশেষ মুদ্রা বা পণ্য একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় অপশন। যেমন একজন এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করল যে, আমেরিকান ডলার আমি তোমার কাছ থেকে আগামী ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৫০ টাকা রেইটে ক্রয় করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম। যার বিনিময়ে তুমি আমাকে এত টাকা ফিস প্রদান করবে। এই চুক্তির ফলে যিনি প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ঐ নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি থেকে ৫০ টাকা হারে ডলার ক্রয় করার জন্য বাধ্য থাকেন। তবে উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার কাছে ডলার বিক্রি করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট ফিস অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। সাধারণতঃ মূল্য হ্রাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থেকে বাঁচার মানসেই এ ধরনের অপশন বিক্রি করা হয়ে থাকে। আর যিনি অপশন ক্রয় করেন তিনি আন্তর্জাতিক বাজার সম্ভাবনা যাচাই করেই এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। যদি ডলারের মূল্য উঠানামা না করে তাহলে তিনি এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ফিসের পয়সা পেয়ে যান এবং লাভবান হন। বর্তমানে এই অপশন একজন ক্রয় করে

www.eelm.weebly.com

হয়। মুদ্রা বাজারের নির্দিষ্ট কোন ভৌগলিক অবস্থান নেই বা থাকা অপরিহার্য নয়। বিভিন্ন ব্যাংক, অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ও স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমেই এই কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। বর্তমানে মুদ্রা বাজার চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং ডলারের মূল্যমানের ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ কোন দেশের মুদ্রার মূল্যমান সেই মুদ্রার ডলার ক্রয়ের ক্ষমতার ভিত্তিতে নিরোপিত হয়। যেমন বাংলাদেশী মুদ্রার ৫০ টাকা দিয়ে যদি ১ ডলার ক্রয় করা যায়; আর সৌদি আরবের ৪ রিয়াল দিয়ে যদি ১ ডলার ক্রয় করা যায়; তাহলে বাংলাদেশের ৫০ টাকা সৌদি ৪ রিয়ালের সমমান রাখে বলে ধরা হয়। আর এই ভিত্তিতেই দু'দেশের মুদ্রার লেনদেন হয়। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় যদি বাংলাদেশী মুদ্রার মানহ্রাস পায় এবং ১০০ টাকা দিয়ে ১ ডলার ক্রয় করতে হয়; আর সৌদি রিয়ালের মূল্যমান যদি পূর্ববৎ বহাল থাকে অর্থাৎ ৪ রিয়াল দ্বারা ১ ডলার ক্রয় করা যায়; তাহলে বাংলাদেশী ১০০ টাকা সৌদী ৪ রিয়ালের সমমান সম্পন্ন বলে গণ্য হয়।

নির্ধারিত সময় আসার আগেই অন্যের নিকট আরো উচ্চ ফিসের বিনিময়ে বিক্রি করে মুনাফা কামিয়ে থাকে। অর্থাৎ অপশন একটি পণ্যের ন্যায় বেচাকেনা করা হয়।

৩ সরকারী বণ্ডসমূহ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা ঃ

ক. প্রাইজ বন্ড ঃ এটি একটি সার্টিফিকেট যা একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করতে হয়। যে কোন সময় এটি ব্যাংকে জমা দিয়ে নগদ টাকা উঠানো যায়। বৎসরান্তে বন্ড ক্রয়কারীদের মাঝে লটারির মাধ্যমে একটি মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এই পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় জনগণ এই বন্ড ক্রয় করে থাকে।

খ. ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ঃ এটিও নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ক্রয় করতে হয় এবং এ টাকার উপর শতকরা হারে সুদ দেয়া হয়।

গ. স্পেশাল ডিপজিট সার্টিফিকেট ঃ এতে সুদের হার বেশি থাকে।

ঘ. ফরেন এক্সচেইঞ্জ বিয়ারার সার্টিফিকেট ঃ সাধারণত বিদেশ প্রত্যাগতদের থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার বিপরীতে হিসাবানুসারে দেশীয় মুদ্রা যা হয় তার একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ঋণদাতা ইচ্ছা করলে এই সার্টিফিকেট দেশীয় মুদ্রায় ড্র করতে পারেন কিংবা বৈদেশিক মুদ্রাও গ্রহণ করতে পারেন। তবে যদি তিনি বৈদেশিক মুদ্রা বা দেশীয় মুদ্রা কোনটাই ড্র না করেন তাহলে বৎসরান্তে শতকরা বার টাকা হারে উক্ত টাকার সুদ পেয়ে থাকেন। সার্টিফিকেটের মালিক ইচ্ছা করলে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সার্টিফিকেট বিক্রি করে দিতে পারেন। তখন যিনি সার্টিফিকেটের বাহক হবেন তিনিই সরকারের নিকট ঋণ দাতা হিসেবে গণ্য হবেন এবং ইন্টারেস্ট তারই প্রাপ্য হবে। আজকাল মুক্তবাজারেও এ সকল সার্টিফিকেট পণ্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

www.eelm.weebly.com

আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেয় এবং বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমেরিকা তখনও অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল ও সুদৃঢ় ছিল। আমেরিকার সহযোগিতায় ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনঃগঠন ও বিশ্ব বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ ইং সালে আমেরিকার বৃটন উড্স শহরের বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল দু'টো। যথা ঃ

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে কি করে পুনঃগঠন করা যায় ?

২. আন্তবিশ্বে মুদ্রা লেনদেনের ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতি কী হতে পারে ?

আলোচনা পর্যালোচনার পর উক্ত কনফারেন্সে উপরোক্ত সমস্যাদ্বয়ের সমাধানার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা ঃ

১.আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা(International Trade organization)

এসংস্থা গড়ে তোলার পিছনে মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ষষ্টদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী স্বর্ণের মওজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যেক দেশ আমদানী হ্রাস ও রফতানী বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় (যাকে মার্কেন্টালিজম বলা হয়)। ফলে প্রত্যেক দেশ আমদানীর ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে: যে কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যেই উক্ত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এ নীতি আমেরিকা তার নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৮ সালে সমঝোতার মাধ্যমে General Agreement on Tariff and Trade (বাণিজ্য ও ট্যাক্স সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। যাকে সংক্ষেপে (G.A.T.T) গেট বলা হয়।

এই চুক্তিতে আমেরিকার দাবির প্রেক্ষিতে কৃষি পণ্যকে বাদ রেখে অপরাপর ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্যকে ব্যাপকভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দফাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ক. এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মাঝে কোন দেশ যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে কিংবা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে অন্যান্য সদস্যরা তার বিরুদ্ধে গেটে প্রতিবাদ জানাতে পারবে এবং এ

www.eelm.weebly.com

প্রেক্ষিতে গেট যে ফায়সালা করবে উক্ত রাষ্ট্রকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। (উল্লেখ্য যে, অধিক হারে করারোপ করে, জটিল কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে কিংবা আমদানি নিষিদ্ধ করে বাণিজ্যে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে)।

খ. কোন রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের প্রতি অভিভাবকসুলভ আচরণ কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। করলে গেটে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো যাবে।

গ. শিল্পে অনুন্নত দেশ সমূহ বহিঃরাষ্ট্রের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে অধিকহারে করারোপ করতে পারবে। কেননা এ না করা হলে অনুন্নত দেশগুলোর দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঘ. কোন রাষ্ট্র বিশেষ কোন রাষ্ট্রের পণ্যের উপর অতিরিক্ত করারোপ করতে পারবে না।

ঙ. দুই রাষ্ট্রে মাঝে বাণিজ্যিক বিরোধ সৃষ্টি হলে গেটের মাধ্যমে তার সমঝোতা ও নিরসন করা হবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবীল (I.M.F) ঃ

বৃটেন উড্‌স সম্মেলনে **দ্বিতীয় যে** প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়, সেটি হল International Moneto y Fund বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবীল। সংক্ষেপে একে (I.M.F) বলা হয়ে **থাকে**। ১৯৪৪ সালে এটি গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হলেও ১৯৪৮ সালে এটি গঠিত হয়।

এটি মূলতঃ আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে উক্ত ফান্ডে মুদ্রা জমা দিতে হয়। কোন্ রাষ্ট্র কত জমা করবে তার হার নির্ধারিত হয় বিশ্ব বাণিজ্যে উক্ত রাষ্ট্রের আনুপাতিক হারের উপর ভিত্তি করে ধার্যকৃত কোটার ভিত্তিতে। যেমন- যদি মোট বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ হয় ১০০ কোটি টাকা আর উক্ত রাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ হয় ১০ কোটি টাকা। তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের কোটা হবে ১০%। ১০% কোটার জন্য উক্ত রাষ্ট্রকে কত পরিশোধ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করা হয় ডলারের মাধ্যমে। কোটা হিসেবে পরিশোধিতব্য টাকার শতকরা ২৫% পরিশোধ করতে হয় স্বর্ণের মাধ্যমে। আর অবশিষ্ট ৭৫% পরিশোধ করতে হয় দেশীয় কারেন্সির মাধ্যমে।

উক্ত টাকা পরিশোধ করার শর্তে প্রত্যেক দেশ কোটা অনুপাতে (I.M.F) থেকে ঋণ পাওয়ার অধিকার লাভ করে। জমাকৃত টাকার ৫ গুণ বা ১০ গুণ পর্যন্ত (যা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা হয়) ঋণ লাভের অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রের অর্জিত হয়। এই হারকে বলা হয় ড্রইং রাইট (Drawing Right)। ড্রইং রাইট

www.eelm.weebly.com

হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্র যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণের অধিকার লাভ করে তাকে কয়েকটি কিস্তিতে (Tranche) বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগ জমাকৃত টাকার ২৫% হয়ে থাকে। একে Gold Tramche বা জমাকৃত স্বর্ণের সমান হারে কিস্তি বলা হয়। প্রথম কিস্তির ঋণ কোনরূপ শর্ত-শারায়েত ছাড়াই স্বল্প সুদের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। কিন্তু ঋণের পরবর্তী কিস্তিগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের শর্তারোপ করা হয়ে থাকে এবং ঐ গুলোতে সুদের পরিমাণও অনেক বেশি হয়ে থাকে। I.M.F প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ অতি অল্প হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। অত্র প্রতিষ্ঠানের পলিসী ও কর্মপন্থা সদস্য রাষ্ট্র সমূহের ভোটাভোটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। ভোটের অধিকার কোটার ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। যার কোটা বেশি থাকে তার ভোট বেশি থাকে।

•

বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) :

বৃটেন উড্স সম্মেলনে তৃতীয় যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়, তা হল International Bank for Rconstructione and Development যাকে সংক্ষেপে (I.B.R.D) সহজ ভাষায় World Bank বা বিশ্বব্যাংক বলা হয়।

বিশ্ব ব্যাংক ও আই.এম.এফ-এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য এই যে, আই.এম.এফ যে কোন সাময়িক প্রয়োজনে ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। আর বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনমূলক খাতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঋণের মেয়াদ ১৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। শুরুর দিকে এই ব্যাংক উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট ভিত্তিক ঋণ প্রদান করত। ১৯৬০ সাল থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণ খাতে ঋণ দিতে শুরু করেছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের পলিসী গ্রহণের শর্তেও ঋণ দিচ্ছে। যেমন রাষ্ট্রীয় মাপন পদ্ধতিতে কেজির মাপ প্রবর্তন করা হলে ঋণ দেয়া হবে- এ ধরনের শর্ত করে ঋণ দিচ্ছে। বর্তমানে এছাড়াও বেশকিছু আর্ন্তজাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা, আর্ন্তজাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, এশীয় উন্নয়ন ব্যংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যংক, এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ, ইকো, এপেক, সাপ্টা, নাফটা, আফটা, ইইসি ইত্যাদি।

উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য আবার চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য Bretton woods systeam of Exchange rate নামে মুদ্রা বিনিময়ের একটি প্রথা প্রবর্তন করা হয়। যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ প্রথানোসারে প্রত্যেক দেশ তার কারেন্সির বিপরীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ দেয়ার কথা ঘোষণা করবে, তারই ভিত্তিতে নিরোপিত হবে তার ডলার ক্রয়ের ক্ষমতা। আমেরিকা প্রথম দিকে ৩৫

www.eelm.weebly.com

ডলারের বিনিময়ে ১ আউন্স স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা এই রেইট পরিবর্তন করে ৪২ ডলারের পরিবর্তে এক আউন্স স্বর্ণ দিতে সম্মত হয়। সুতরাং প্রত্যেক দেশ তার কারেন্সির বিপরীতে ঘোষিত স্বর্ণের পরিমাণের ভিত্তিতে যে পরিমাণের বিনিময়ে ৪২ ডলার ক্রয় করতে পারত: সেই পরিমাণ কারেন্সির বিপরীতে এক আউন্স স্বর্ণ বরাদ্দ রয়েছে বলে ধরা হত। যদি কোন দেশকে ৪২ ডলার ক্রয় করতে ২১০ টাকা পরিশোধ করতে হয়: তাহলে এর অর্থ হয় ২১০ টাকার বিপরীতে এক আউন্স স্বর্ণ বরাদ্দ রয়েছে। অতএব সে দেশের মুদ্রার ডলার ক্রয়ের রেইট হয় ৫ টাকা = ১ ডলার। অন্য আরেকটি দেশকে ৪২ ডলার ক্রয় করার জন্য যদি ৪২০ টাকা পরিশোধ করতে হয়, তাহলে সে দেশের মুদ্রার ডলার ক্রয়ের রেইট হয় ১০ টাকা = ১ ডলার। অতএব এ দুটি রাষ্ট্রের মুদ্রা বিনিময়ের হার হবে ১ টাকায় ২ টাকা। এ সময় প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমেরিকান ডলার পরিশোধ করে ৪২ ডলারের পরিবর্তে ১ আউন্স স্বর্ন আদায় করতে পারত।

আই,এম,এফ,-এ এমর্মে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, প্রত্যেক দেশের মুদ্রার যে মূল্যমান ডলার দ্বারা নির্ধারিত হবে; যদি কোন কারণে কোন দেশের মুদ্রামান উঠা নামা করে তাহলে ২% পর্যন্ত তা সহনীয় বলে গণ্য হবে অর্থাৎ ডলারের রেইটে এ দ্বারা কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি উঠানামার হার ২% থেকে বেশি হয় তাহলে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সতর্ক করা হবে এবং মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণের জন্য বলা হবে। যদি মুদ্রামান হ্রাস পেয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার দেশীয় মুদ্রা বাজার থেকে ক্রয় করে নেবে। ফলে মুদ্রার যোগান হ্রাস পাওয়ার কারণে তার দাম বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। আর যদি মুদ্রামান বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত রেইটে বাজারে সে দেশের মুদ্রা ছাড়তে শুরু করবে। ফলে যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মুদ্রামান হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার রেইট নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, এই হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ যোগানজনিত নয়। অতএব আই,এম,এফ কে অবহিত করা হবে। মুদ্রামান হ্রাস পেয়ে থাকলে আই,এম,এফ উক্ত রাষ্ট্রকে ঋণ দিয়ে মুদ্রামান সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আর যদি উক্ত দেশকে ঋণ দেয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে আই, এম, এফ উক্ত রাষ্ট্রের কারেন্সির মান কমিয়ে দিবে। অর্থাৎ ডলার ক্রয়ের রেইট বৃদ্ধি করে দিবে। এ থেকে বুঝা যায় যে বৃটেন উড্জ এক্সচেইঞ্জ সিস্টেমে মুদ্রা বিনিময়ের রেইট ডলার ক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হত। কিন্তু এ অবস্থায়ও যেহেতু ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দেয়ার গ্যারান্টি ছিল, তাই মুদ্রার মূল্যমান স্বর্ণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এ কথা অনায়াসেই বলা যায়। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমেরিকা যখন ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে অস্বীকার করল

www.eelm.weebly.com

তখন মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রাপ্তির আর কোন সম্ভবনাই অবশিষ্ট থাকেনি। বর্তমানে মুদ্রার মান চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর অর্থ এই যে, এখন কাগজী মুদ্রাসমূহ সরাসরি লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকে মাধ্যম বানানো হয় না। অর্থাৎ এখন কাগজী মুদ্রাসমূহই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের ক্রয় ক্ষমতার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। যেন কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে এখন স্বর্ণের পরিবর্তে বিভিন্ন পণ্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ- যাকে ইংরেজিতে Basket of goods বা পণ্যের ঝুড়ি বলা হয়- লাভ করা যায়। তবে কোন্ দেশের মুদ্রা দ্বারা কোন্ পণ্য কি পরিমাণ লাভ করা যাবে অর্থাৎ কোন দেশের মুদ্রামান কি হবে তার রেইট নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা। তবে এই রেইট এখনও ডলার ক্রয়ের ক্ষমতার ভিত্তিতে নিরোপিত হয়। যেমন বাংলাদেশী মুদ্রার মান বিশ্ববাজারে এর চাহিদার উপর ভিত্তি করে বাড়ে ও কমে। অর্থাৎ চাহিদা বাড়লে মূল্য বাড়ে; আর চাহিদা কমলে মূল্য কমে। আবার যোগান কম হলে চাহিদা বাড়ে; ফলে দাম বৃদ্ধি পায়। আর যোগান বৃদ্ধি পেলে চাহিদা কমে যায় ফলে মূল্য কমে। অতএব কোন একদিন বাংলাদেশী মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান কম থাকার ফলে ১ ডলার দিয়ে ৫০ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য দিন চাহিদা কম ও যোগান বেশি থাকার ফলে ১ ডলার দিয়ে ৫৭ টাকা পাওয়া যায়। এর অর্থ হল প্রথম দিন ৫০ টাকার ক্রয় ক্ষমতা ছিল ১ ডলার। কিন্তু পরের দিন ৫৭ টাকার ক্রয় ক্ষমতা ছিল ১ ডলার। এভাবে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার রেইট ডলার ক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর সেই ভিত্তিতেই এক দেশের সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে সে দেশের মুদ্রার মান বাড়ে ও কমে। এর অর্থ হল মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা চাহিদা যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক দিনই প্রত্যেক দেশের মুদ্রামান উঠানামা করে। চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা মুদ্রামান নির্ধারিত হওয়ার এই প্রথাকে Freely Floating Exchange systeam বলা হয়। অন্য আর একটি প্রথা এও রয়েছে যে, যদিও মুদ্রার মান চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে কিন্তু যদি মুদ্রার রেইট অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে বা কমে যায় তাহলে রাষ্ট্র এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে এবং স্টেইট ব্যাংকের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এ পদ্ধতিকে Managed Float systemed বলা হয়।

এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সার কথা এই যে, মুদ্রা এখন পণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাই দর-দামের মাধ্যমে তার মূল্যমান নির্ধারণ করা হবে। এবং মুদ্রা বাজারে পণ্যের ন্যায় মুদ্রারও বেচাকেনা চলবে।

www.eelm.weebly.com

শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহের আলোচনায় আমরা এ কথা উল্লেখ করে এসেছি যে, শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির কারণ শুধুমাত্র কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যমান বৃদ্ধিই হয় না বরং আনুসঙ্গিক বিভিন্ন কারণ ও প্রপাগাণ্ডার কারণেও শেয়ারের মূল্য বাড়ে-কমে। মুদ্রাকে যখন পণ্য বানানো হবে তখন মুদ্রার মান উঠানামা করার ক্ষেত্রে সেইসব আনুসঙ্গিক কারণগুলোও প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে অহেতুকই কোন দেশের মুদ্রামান হ্রাস পেতে পারে কিংবা বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই বহুদেশ মুদ্রামানের ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমনকি আন্তর্জাতিক মোড়ল গোষ্ঠী ইচ্ছা করলেই যে কোন দেশের মুদ্রামান হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে পারে। যেমন কোন দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ সৃষ্টি করা হলে সে দেশের মুদ্রা চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে এবং তার মূল্যমান বা ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবে। ফলে একটি ধনী দেশ মুদ্রার মানজনিত এহেন জটিলতার স্বীকার হয়ে দরিদ্রতম দেশে পরিণত হতে পারে। সার কথা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করার এহেন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে বিশ্বের বড় বড় পুঁজিপতি দেশগুলোর জন্য মুদ্রামানে ঘাপলা করে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে সহজে শোষণ করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ কারণেই ইসলাম মুদ্রাকে পণ্যে পরিণত করার অনুমতি কখনই দেয়নি। প্রয়োজনে মুদ্রা বিনিময়ের অনুমতি প্রদান করলেও চরমভাবে সমতা রক্ষা করে বিনিময় করার বিষয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছে। (হিদায়া بيع الصرف অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এতদসঙ্গে রূপা ও স্বর্ণকে স্থায়ীভাবে মুদ্রামূল ثمن حقيقى ঘোষণা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকল কিছুর মূল্যমান নিরূপণকারী হবে স্বর্ণ ও রূপা। যার স্থায়ী ভ্যালু রয়েছে। যে দ্রব্যের নিজস্ব কোন মূল্য নেই তাকে মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড বানালে মুদ্রা লেনদেনে ঘাপলা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তদুপরি মুদ্রাকে ব্যবসায়ী পণ্যে পরিণত করা হলে সুদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার পথ খোলা রাখা হয়নি। বরং মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে হারের সামান্য তারতম্যকে কিংবা সময়ের সামান্য ব্যবধানকে সুদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কাগজী মুদ্রা বিনিময়ের শরয়ী বিধান ঃ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এককালে মানুষ সরাসরি সোনার মাধ্যমে লেনদেন করত। যাকে Gold standard system বলা হত। এরপর সরাসরি সোনা রূপার মাধ্যমে বেচাকেনা চলত। যাকে Bimetallic standard প্রথা বলা হয়। এর পরবর্তী যুগে মুদ্রা ব্যবসায়ীরা মুদ্রা গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে যে

www.eelm.weebly.com

রশিদ সরবরাহ করত তার মাধ্যমে বেচাকেনা চলত। এই রশিদসমূহের উন্নত সংস্করণ হিসেবেই কাগজী নোটের প্রচলন শুরু হয়। যার কোন সরকারি অনুমোদন হত না। ফলে যে কেউ এই নোট চালু করতে পারত। পরে নোটগুলো সরকারি অনুমোদন লাভ করে এবং সোনার পরিবর্তে নোটের মাধ্যমেই বেচাকেনার প্রথা চালু হয়। কাগজী মুদ্রাসমূহ Legel Tender বা সরকারি অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রথম দিকে কাগজী নোটের গায়ে উল্লিখিত অংকের সমপরিমাণ মূল্যের সোনা প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল; যাকে Gold Bullion standard প্রথা বলা হত। এর পরবর্তীকালে কাগজী মুদ্রার গায়ে উল্লেখিত অংকের সমপরিমাণ মূল্যের সোনা প্রদানের প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং মুদ্রার গায়ে উল্লিখিত অংকের সমপরিমাণ স্বর্ণ প্রদান না করে আংশিক স্বর্ণ প্রদানের প্রথা চালু হয়; যাকে Fiduciary money বলা হত। তখন প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময়ে কি পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করা হবে তার হার প্রত্যেক দেশের স্টেইট ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত হত। এ সময় প্রত্যেক দেশ তার আভ্যন্তরীণ মুদ্রা চাহিদা পূরণের জন্য স্বর্ণবিহীন মুদ্রাও চালু করে। যার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রদান করার কোন গ্যারান্টি থাকত না। এ ধরনের মুদ্রার গায়ে 'চাহিবা মাত্রই ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে'- এ কথা লিখা হত না। এহেন মুদ্রাকে Token money বলা হত। পরে বিভিন্ন রাষ্ট্র তার মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ পরিশোধ না করার কারণে যে জটিলতা দেখা দেয়, তা নিরসনের জন্য আমেরিকান ডলারকে আপাততঃ মুদ্রামূল ধরে সেই জটিলতা নিরসন করা হয়। আর আমেরিকা যেহেতু ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিশোধে সম্মত ছিল তাই প্রকারান্তরে এটিকেও Fiduciary money প্রথা বলা চলে। কিন্তু পরে আমেরিকা ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে কাগজী মুদ্রাগুলো নিজেই মূল মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে। এর বিনিময়ে স্বর্ণ আর থাকেনি। তাই এখন কাগজী মুদ্রার গায়ে এ কথা লিখা নিরর্থক যে 'চাহিবা মাত্রই ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে'। এখন কাগজী নোটগুলো সরাসরি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয় এবং রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সাপেক্ষে কাগজের একটি খন্ড তার গায়ে উল্লেখিত অংকের সমপরিমাণ মূল্যমানের প্রতীক হয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় এটি মুদ্রা বলে গণ্য হয়। বাস্তবে এর বিপরীতে কিছুই থাকে না।

যখন কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ প্রদানের প্রথা ছিল তখন স্বর্ণকে মুদ্রামূল ধরে এগুলো বিনিময় করা হত। আর ইসলামী শরীয়তে যেহেতু স্বর্ণের লেনদেনে চরমভাবে সমতা রক্ষার বিধান সর্বস্বীকৃত, তাই দেশীয় ও আন্তদেশীয় লেনদেনে মুদ্রা মানের সমতা রক্ষার বিধানকে অনুসরণ করে লেনদেন করা হত। ইসলামী ফিকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কাগজী মুদ্রার

www.eelm.weebly.com

লেনদেনের বিধান কি হওয়া প্রয়োজন, কাগজী মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে মানগত সমতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এ বিষয়টি অবশ্যই পর্যালোচনা সাপেক্ষ।

অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, মূলতঃ কাগজী মুদ্রার বিপরীত স্বর্ণ বরাদ্দ এ কারণে করা হত যে, স্বর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সর্বস্বীকৃত ছিল, সকল দেশ ও রাষ্ট্রে তা গ্রহণীয় ছিল এবং এর ভিত্তিতে বেচাকেনা চলত। বর্তমানে কাগজী নোটের বিপরীতে সোনা বরাদ্দ ছাড়াই যেহেতু তা দ্বারা সরাসরি বিনিময়ের মধ্যস্থতার কাজ চলছে এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাগজী মুদ্রাগুলোই সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, অতএব কাগজী মুদ্রাগুলো সরাসরি মূল্যমান বিশিষ্ট মুদ্রার মর্যাদা লাভ করেছে অর্থাৎ কাগজী মুদ্রাগুলো নিজেই একটি নির্দিষ্ট ক্রয়ক্ষমতা বহন করে, যা দ্বারা ঐ পরিমাণ মূল্যমান বিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য ক্রয় করা যায়। আগে যেমন কাগজী মুদ্রার বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ থাকত বর্তমানে স্বর্ণ নেই তবে ঐ পরিমাণ মূল্যমানের যে কোন পণ্য (যাকে ইংরেজিতে (Basket of goods) পণ্যের জুড়ি বলা হয়) রয়েছে। এর অর্থ হল কাগজী মুদ্রা নিজেই মুদ্রামূল হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আগে স্বর্ণ মুদ্রামূল হিসেবে গণ্য হত।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে যেহেতু স্বর্ণ রূপা মুদ্রামূল (ثمن حقيقى) হিসেবে স্থায়ীভাবে স্বীকৃত ও স্থিরকৃত তাই কাগজী মুদ্রাকে স্থায়ী মুদ্রামূল হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তবে যেহেতু কাগজী মুদ্রা দ্বারা সরাসরি পণ্য বিনিময়ের কাজ চলে তাই এগুলোকে পারিভাষিক মুদ্রা হিসেবে গণ্য করা হবে। যেমন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত ধাতব মুদ্রাসমূহ (فلوس) কে পারিভাষিক মুদ্রা বলে গণ্য করা হত। বস্তুত সেগুলোর বিপরীতেও কোন স্বর্ণ বরাদ্দ থাকত না; অথচ সেগুলো দ্বারাও দ্রব্য বিনিময়ের কাজ চলত এবং সমতা রক্ষা করে সেগুলোর লেনদেন করা হত। তাছাড়া কোন দ্রব্যকে পারিভাষিক মুদ্রা বলে গ্রহণ করার জন্য তেমন কোন শর্ত শারায়েত নেই। যে কোন দ্রব্যকেই পারিভাষিক মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অতএব কাগজী মুদ্রাকে পারিভাষিক মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করার মাঝেও কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য যখন কাগজী মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ বরাদ্দ ছিল তখন- কাগজী মুদ্রা সরাসরি মুদ্রা বলে গণ্য হবে, না মুদ্রার রশিদ বলে গণ্য হবে- এ নিয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

তখন আলেমগণের অধিকাংশের মত এই ছিল যে, কাগজী নোট নিজে মুদ্রা নয় বরং এগুলো মুদ্রার রশিদ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে লেনদেনে যথেষ্ট সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কেউ যদি কারো নিকট কোন দ্রব্য বিক্রি করে টাকা পাওনা হয় তাহলে তাকে কাগজী মুদ্রায় তা পরিশোধ করার অর্থ হবে; পাওনা

www.eelm.weebly.com

টাকা পরিশোধ করার একটি সনদ হস্তান্তর করা। তাই যতক্ষণ সে ঐ কাগজী মুদ্রা দিয়ে কোন দ্রব্য ক্রয় না করবে ততক্ষণ ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ কাগজী মুদ্রার দ্বারা যাকাত প্রদান করলে যাকাত গ্রহীতা যতক্ষণ ঐ টাকা দ্বারা কোন পণ্য ক্রয় না করবে ততক্ষণ যাকাত আদায় হয়েছে বলে বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কাগজী মুদ্রা দ্বারা সোনা রূপা ক্রয় করাও বৈধ হবে না। কেননা কাগজী মুদ্রা মূলতঃ সোনা বা রূপার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এর দ্বারা সোনা বা রূপা ক্রয় করলে তা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের লেনদেন বা রূপার বিনিময়ে রূপার লেনদেন বলে গণ্য হবে। আর সোনা রূপার লেনদেন নগদানগদী করতে হয়। অথচ যিনি টাকা পরিশোধ করছেন তিনি তা নগদ পরিশোধ করেছেন বলে বলা যাবে না। কেননা কাগজী মুদ্রা তো মুদ্রার রশিদ: নিজে মুদ্রা (অর্থাৎ সোনা বা রূপা) নয়। এমনকি এ সিদ্ধান্তানুসারে নোটের বিনিময়ে নোটের লেনদেনও বৈধ হবে না, কেননা এ ক্ষেত্রে দুটোই বাকি বলে গণ্য হবে; যাকে بيع الكالي بالكالي অর্থাৎ দ্রব্য ও মূল্য দুটোই বাকি রেখে বেচাকেনা করা বলে; যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

কিন্তু বর্তমানে কাগজী মুদ্রাগুলো মুদ্রার রশিদ এই ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, কেননা এখন কাগজী মুদ্রাকেই মুদ্রা হিসেবে গণ্য করা হয়, এর বিপরীতে স্বর্ণ বরাদ্দ থাকে না। বর্তমান কাগজী মুদ্রা সম্পর্কে অনেক আরবীয় আলেম এই মত পোষণ করেন যে, যেহেতু কাগজী মুদ্রাগুলো এখন স্বর্ণ রূপার স্থান দখল করে নিয়েছে এবং স্বর্ণ রূপা বর্তমানে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হয় না, অতএব কাগজী মুদ্রাগুলোকেই মুদ্রামূল বা (ثمن حقيقي) ধরা হবে। এমতের সার কথা হল যে, মুদ্রামূল হিসেবে কোন কিছু নির্ধারিত নেই। মানুষ যখন যে বস্তুকে মুদ্রামূল হিসেবে গণ্য করবে সেটিই মুদ্রামূল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ মতটি এ জন্য গ্রহণীয় নয় যে, ইসলামে স্বর্ণ ও রূপাকে মুদ্রামূল হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর মুদ্রামূল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমেই মানুষের বেচাকেনা করতে হবে। বরং মুদ্রামূল হওয়ার অর্থ এই যে, মানুষ একে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করুক বা না করুক মুদ্রার মান সবসময় এর মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। কেননা সর্বকালে সবদেশেই এ দ্রব্য দু'টোর মূল্য স্বীকৃত। অথচ কাগজী মুদ্রার ১০০ টাকার নোটের প্রকৃত মূল্য দশ পয়সাও নয়। তাই একে মুদ্রামূল ধরা কিছুতেই সঙ্গত হবে না। আর মানুষ স্বর্ণ ও রূপার মাধ্যমে লেনদেন না করলেই একে মুদ্রামূল বলে গণ্য না করার অধিকার কারো নেই। কেননা এগুলো মুদ্রামূল হওয়ার বিষয়টি শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত।

www.eelm.weebly.com

তবে এ ক্ষেত্রে সঠিক মতামত এটিই যে, কাগজী মুদ্রাগুলো নিজেই মূল্যমান বহন করে; অতএব এগুলো পারিভাষিক মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে। যেমন প্রাচীনকালে ধাতব মুদ্রাসমূহ (فلوس)কে পারিভাষিক মুদ্রা বলে গণ্য করা হত। তার বিপরীতে স্বর্ণ বরাদ্দ না থাকা সত্তেও সেগুলো মূল্যমান বহন করত। এ ব্যাপারে হিদায়ায় সুস্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে যে,

ويجوز البيع بالفلوس لانه مال معلوم فان كانت نافقة جاز البيع وان لم يتعين لانها اثمان بالاصطلاح

ধাতব মুদ্রা দ্বারা বেচাকেনা বৈধ হবে। কেননা ওগুলো পরিজ্ঞাত মাল। যদি সে গুলোর মুদ্রা হিসেবে প্রচলন থাকে তাহলে সেগুলো সনাক্ত না করে কেবল পরিমাণ উল্লেখ করে বেচাকেনা করলেও তা বৈধ হবে। কেননা এগুলো পারিভাষিক মুদ্রা।

অতএব বর্তমানের কাগজী মুদ্রাকেও মাল অর্থাৎ মূল্যমান বিশিষ্ট মুদ্রা বলা যাবে। তবে স্বর্ণ-রূপার ন্যায় মুদ্রামূল নয় বরং পারিভাষিক মুদ্রা বলা হবে। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাগজী মুদ্রা সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বেরিয়ে আসে। যথা ঃ

১. কাগজী নোটগুলো যেহেতু মূল্যমান বিশিষ্ট সুতরাং এগুলো দ্বারা যাকাত বা ঋণ আদায় করার সাথে সাথেই তা আদায় হয়ে যাবে।

২. যেহেতু শরীয়ত কেবলমাত্র সোনা ও রূপাকেই মুদ্রামূল হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছে; তাই কাগজী মুদ্রাকে মুদ্রামূল ধরা যাবে না।

৩. যেহেতু শরীয়ত স্বর্ণ ও রূপাকে স্থায়ীভাবে মুদ্রামূল ঘোষণা করেছে অতএব মানুষ তাকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করুক বা নাই করুক; সর্বাবস্থায় মুদ্রার মূল্যমান তা দ্বারা নির্ণয় করতে হবে। যদি রাষ্ট্র কর্তৃক কাগজী মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ বা রূপা বরাদ্দ থাকে তাহলে তো সেই ভিত্তিতেই মুদ্রার মান নিরূপিত হবে। অন্যথায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুদ্রার মান সেই দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বর্ণের বাজার দরের আলোকে নিরূপিত হবে। যেমন- বাংলাদেশে ১০ গ্রাম স্বর্ণের বাজার দর যদি ৬০০০ টাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় তাহলে বাংলাদেশী ৬০০০ টাকার মান হবে ১০ গ্রাম স্বর্ণ। এই হিসেবে ৬০০ টাকার মান হয় ১ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব একশ টাকার মান হবে ছয় ভাগের এক গ্রাম স্বর্ণ।

৪. যদিও কাগজী মুদ্রার বিপরীতে বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে স্বর্ণ থাকে না; তাই তা (بيع صرف)বা সোনা রূপার লেনদেনের অর্ন্তভুক্ত হয় না। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু মুদ্রামূল হিসেবে সবসময় স্বর্ণ ধর্তব্য হবে, অতএব কাগজী মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বর্ণ

www.eelm.weebly.com

মুদ্রার লেনদেনের ন্যায় সমতা রক্ষা করতে হবে। কেননা এগুলোও মুদ্রা: যদিও পারিভাষিক মুদ্রা হয় না কেন। এ কারণেই আদালী (عدالي) ও গাতারিফা (غطارفة) নামক ধাতব মুদ্রাতে (যেগুলো স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা হিসেবে আদৌ গণ্য হত না) অসম হারে কম বেশিতে লেনদেন বৈধ রাখা হয়নি। এ সম্পর্কে হিদায়ার গ্রন্থকার মন্তব্য করেন যে-

وقال رضي الله عنه ومشائخنا لم يفتوا بجواز ذالك (اي التفاضل) في العدالي والغطارفة لانها اعز الأموال في دارنا- فلو ابيح التفاضل فيه ينفتح باب الربوا

হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন যে, আমাদের মনীষীগণ 'আদালী' ও 'গাতারেফা' জাতীয় মুদ্রায় কমবেশিতে লেনদেন বৈধ হওয়ার ফতোয়া দেননি। কেননা আমাদের দেশে এগুলো লোভনীয় মাল (মুদ্রা)। যদি এগুলোর ক্ষেত্রে কমবেশিতে লেনদেনকে বৈধ রাখা হয় তাহলে সুদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। -
হিদায়া ৩য় খন্ড, ৯৩ পৃঃ

বর্তমানের কাগজী মুদ্রাগুলোও মূলতঃ ধাতব মুদ্রার ন্যায়। কেননা যদিও এগুলো স্বর্ণ রূপার প্রতিনিধিত্ব করে না তবুও মুদ্রা রূপে ব্যবহার হওয়ার করণে এতে সমতা রক্ষা করে লেনদেন করতে হবে। কেননা এর ভ্যালু শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বর্ণ-রূপা দ্বারাই নিরূপিত হয়। মানুষ তার ভ্যালু স্বর্ণ দ্বারা নিরূপণ করুক আর নাই করুক।

তবে যেহেতু কাগজী মুদ্রার লেনদেনকে বর্তমানে সরাসরি স্বর্ণের লেনদেন বলে গণ্য করা যায় না তাই এ ক্ষেত্রে হাতে হাতে লেনদেন করার প্রয়োজন নেই।

অবশ্য ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) পারিভাষিক মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মুদ্রা সনাক্ত থাকলে সে ক্ষেত্রে কমবেশিতে লেনদেন বৈধ হবে বলে মনে করতেন। তাদের যুক্তি এই ছিল যে, সনাক্ত করণের দ্বারা তা দ্রব্যে পরিণত হয়ে যায়। তখন আর তা মুদ্রা থাকেনা। তাই কমবেশিতে বেচাকেনা বৈধ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মনে করেন যে, পারিভাষিক মুদ্রা সনাক্ত করণের দ্বারা সেগুলোর মুদ্রা হওয়ার দিকটি বাতিল হয় না। সুতরাং মুদ্রা হিসেবে তার লেনদেন হলে সে ক্ষেত্রে কমবেশিতে লেনদেন অবশ্যই বৈধ হবেনা। সমতা রক্ষা করে লেনদেন করতে হবে। এই সমতা নোটের সংখ্যার ভিত্তিতে হবে না বরং নোটের গায়ে লেখা মূল্যমানের দিক থেকে হবে। যেমন ঃ ১০০টাকার নোটের বিনিময়ে ১০০ টাকা মূল্যমানের যে কোন নোট প্রদান করা যাবে।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রশ্নেও এই বিধি মেনে চলতে হবে অর্থাৎ বর্তমানে যেহেতু কোন দেশের মুদ্রার বিপরীতেই স্বর্ণ বরাদ্দ থাকে না তাই সকল দেশের

www.eelm.weebly.com

মুদ্রাই পারিভাষিক মুদ্রা বলে গণ্য হবে। যদিও স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণ করা হয় না, তবে ইসলামী বিধান মতে কাগজী মুদ্রার মূল্যমান প্রতি দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বর্ণের মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। অতএব সেই ভিত্তিতে দুই দেশের কাগজী মুদ্রার যে রেইট দাড়ায় সেই হিসেবের ভিত্তিতে লেনদেন করতে হবে। যেমন: এক দেশের ১০০ টাকায় সরকার নির্ধারিত রেইটে যদি ১ গ্রাম সোনা পাওয়া যায়, আর অন্যদেশের ২০০ টাকায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেইটে যদি ১ গ্রাম সোনা পাওয়া যায় তাহলে এই দুই দেশের মুদ্রার লেদেনের হার হবে এক টাকায় দুই টাকা। এর কমবেশীতে লেনদেন করলে সুদ বলে গণ্য হবে। কেননা ইসলাম সোনা ও রূপাকে যে মুদ্রামূল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে তা কোন দেশ বা কালের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। বরং সোনাকে মুদ্রামূল ঘোষণা করে এবং মুদ্রা বিনিময়ে সমতা রক্ষার শর্তারোপ করে মুদ্রার লেনদেনের মাধ্যমে শোষণের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছে। এই শোষণ দেশের অভ্যন্তরে যেমন অনুমোদিত নয়: আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তা অনুমোদিত হতে পারে না। অবশ্য বর্তমানে কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ বরাদ্দ না থাকলেও প্রত্যেক দেশের সরকার কর্তৃক দেশীয় মুদ্রার একটি মান নির্ধারিত থাকে। অনেক অভিজ্ঞ মুফতীরাই এই মানকে মূল ধরে; এ হারের ভিত্তিতে আন্তঃদেশীয় লেনদেন করলে তা সুদ হবে না বলে মনে-করছেন। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি যে, বর্তমানে দেশীয় মুদ্রার মান নির্ধারণের বিষয়টি সরকারের আয়ত্বাধীন নয়। বরং আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে দর কষাকষির মাধ্যমে এ মান নিরূপিত হয়ে থাকে- যা ঘাপলা ও শোষণ মুক্ত নয়। এই প্রক্রিয়ায় মুদ্রার মান নির্ণয়ের প্রথাই মূলতঃ মুদ্রা শোষণের পথকে উম্মুক্ত করেছে। তাই আমাদের দৃষ্টিতে ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক নয়। বরং ইসলামী দেশগুলোতে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বর্ণের বাজারদরকে মুদ্রামান নিরূপণের স্টান্ডার্ড ধরে সেই ভিত্তিতে সমতা রক্ষাকরে আন্তদেশীয় লেনদেন করা প্রয়োজন। আর যে দেশের সাথে এই নীতি অবলম্বন করা সম্ভব নয় সেখানে সমস্যা নিরসনের নিমিত্ত্বে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত প্রথাকে এ ভিত্তিতে অনুমোদন দেয়া যায় যে, আমি তোমার কাছ থেকে ১০০ ডলার করজ হিসেবে গ্রহণ করছি। আর সেই করজ বাংলাদেশী মুদ্রায় ৫৭০০ টাকায় পরিশোধ করে দিচ্ছি। তাছাড়া দারুল হারবের সাথে সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করা বৈধ বলে ফিকাহশাস্ত্রবিদরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তদুপরি আন্তর্জাতিক লেনদেন বর্তমানে একটি অপরিহার্য ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বৈধ পন্থা খোলা না থাকলে

www.eelm.weebly.com

জরুরত পূরণের নিমিত্বে অবৈধ বিষয়কে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য ফকীহগণ অনুমতি দিয়েছেন। الضرورة تبيح المحظورات প্রয়োজন অবৈধ বিষয়কে বৈধ করে দেয়।

তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত হবে না যে, দুই দেশের মুদ্রা এক জাতীয় নয় বিধায় তার লেনদেন কমবেশিতে করা যাবে। কেননা এ ব্যাখ্যায় স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রামূল হওয়ার কোন অর্থ থাকে না। তাছাড়া এহেন ব্যাখ্যায় আন্ত র্জাতিক পর্যায়ে সুদী লেনদেনের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়; যা কোন ক্রমেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না।

মাওঃ তকী উসমানী (মুদ্দা.) দুইদেশের মুদ্রাকে দুই জাতীয় দ্রব্য বলে গণ্য করে কমবেশিতে লেনদেনকে বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার যুক্তি এই যে, যেহেতু দুই দেশের মুদ্রার মাঝে মানগত পার্থক্য রয়েছে সুতরাং দুই দেশের মুদ্রার মাঝে এমন কোন বিষয় পাওয়া যায় না; যাকে ভিত্তি করে দুই দেশের মুদ্রাকে এক জাতীয় বলা যায়।

কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দুই দেশের মুদ্রাকে এক জাতীয় বলে গণ্য করার একাধিক ভিত্তি রয়েছে। যে ভিত্তিগুলো বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দুই দেশের মুদ্রাকে এক জাতীয় মুদ্রা না বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে কাগজী মুদ্রা নিজেই ক্রয় ক্ষমতা বহন করে এবং প্রত্যেক দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা ডলার দ্বারা নিরূপিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক দেশের কাগজী মুদ্রার অর্থ হল সেগুলো পণ্যের ক্রয় ক্ষমতার প্রতীক। এই অর্থে সকল দেশের মুদ্রাই এক জাতীয়। থেকে গেল দুই দেশের মুদ্রার মূল্যমানের পার্থক্যের কথা। বস্তুতঃ মূল্যমানে পার্থক্য থাকলেও যেহেতু সব দেশের মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হয় ডলার দ্বারা, অতএব সব দেশের মুদ্রার মান একই। পার্থক্য যা থাকে তা এই যে, এক কেজি তেল যখন ১ ডলারে কিনা যায় তখন হয়ত সৌদী মুদ্রায় কিনলে ৪ রিয়াল এবং বাংলাদেশী মুদ্রায় কিনলে ৫৭ টাকা লাগে, অর্থাৎ আমেরিকার ১ ডলার = সৌদী ৪ রিয়াল= বাংলাদেশী ৫৭ টাকা।

তবে বাংলাদেশী ১০০ টকার ক্রয় ক্ষমতা আমেরিকার ১০০ ডলারের ক্রয় ক্ষমতা সমান নয়। এই পার্থক্য মূলতঃ ১০০ টাকার নোট ৫০ টাকার নোট ও ১০ টাকা নোটের ক্রয় ক্ষমতার পার্থক্যের মত। কেননা এই ১০০, ৫০, ১০ টাকার নোটের ক্রয় ক্ষমতাও সমান নয়। তবে ১০০ টাকার ১টি নোট ৫০ টাকার ২টি নোট ও ১০ টাকার ১০টি নোটের ক্রয় ক্ষমতা সমান।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা সমান। তা নোটের সংখ্যায় যত তারতম্যই হোক না কেন। অতএব

www.eelm.weebly.com

সকল মুদ্রাই এক জাতীয়। এই প্রেক্ষিতে মুদ্রার লেনদেনে স্বর্ণের সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভ্যালুর চেয়ে কম বেশীতে লেনদেন করা অবশ্যই বৈধ হবে না। এ ধরনের পার্থক্য দিরহাম দিনার যে যুগে প্রচলিত ছিল তখনও ছিল। যেমন- উজনে সাব'আহ (وزن سبعة) ও ওজনে আশারাহ(وزن عشرة) এই দু'ধরনের দিরহামের ক্রয় ক্ষমতার মাঝেও পার্থক্য ছিল। কিন্তু সে সময় ওজনে সাব'আর ১০টি দিরহাম ওজনে আশারার ৭টি দিরহামের সমমান সম্পন্ন বলে মনে করা হত তাই প্রথমোক্ত প্রকার দিরহামের ১০টি দ্বিতীয় প্রকার দিরহামের ৭টির সমান বলে গণ্য করা হত এবং এরই ভিত্তিতে সমাতা রক্ষা করে লেনদেন করা হত। কিন্তু দু'টিকে দুই জাতীয় মুদ্রা গণ্য করে মানগত তারতম্যের সাথে লেনদেনকে ফিকাহ্‌বিদরা বৈধ রাখেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মুদ্রামানে পার্থক্যের কারণে দুই দেশের মুদ্রাকে দুই জাতীয় মুদ্রা ধরে মানগত তারতম্যের সাথে কমবেশিতে লেনদেন বৈধ হওয়ার বিষয়টি প্রাচীন ফিকাহ্‌বিদদের নিকট অনুমোদিত ছিল না। তাই এটি বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া যায় না।

মূল্যসূচক ঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা মান হ্রাসের রহস্য ঃ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে কাগজী মুদ্রার নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই। কাগজী মুদ্রাগুলো কিছু পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্রয় ক্ষমতার প্রতীক মাত্র। এই ক্রয় ক্ষমতাকেই কাগজী মুদ্রার ভ্যালু ধরা হয়। সুতরাং ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে মুদ্রার ভ্যালু বাড়ে, আর ক্রয় ক্ষমতা কমলে মুদ্রার ভ্যালু কমে। যেমন- এক সময় যদি একশত টাকা দিয়ে ১০ কেজি চাউল ক্রয় করা যায়, আর অন্য সময় যদি ১০০ টাকা দিয়ে ২০ কেজি চাউল ক্রয় করা যায় তাহ্‌লে পূর্বের তুলনায় পরবর্তী সময় একশত টাকার ক্রয় ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলা হবে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, দ্রব্যের মূল্য কমলে মুদ্রার ভ্যালু বাড়ে; আর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে মুদ্রার ভ্যালু কমে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রামান পরস্পরে বিপরীত মুখী। যখন টাকার ছড়াছড়ি বেশি হয় তখন দ্রব্যের ক্রয়-চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ক্রয়-চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে; ফলে মুদ্রার মান কমে যায়। এভাবে মুদ্রার মান কমে যাওয়াকে Inflation বা মুদ্রাস্ফীতি বলে। পরবর্তীতে শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে এবং যে কোন কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে তাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে; তা দ্রব্যমূল্য মুদ্রার আধিক্যের কারণেই বৃদ্ধি হোক **বা অন্য** যে কোন কারণেই বৃদ্ধি হোক। তবে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ঘটে; তাহলে তাকে Dimond pol Inflation বা দ্রব্যের চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। কিন্তু যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে ঘটে তাহলে তাকে COST POL INFLATION বা

www.eelm.weebly.com

উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। এরই বিপরীতে যদি মুদ্রাসংকটের কারণে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়, আর চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কারণে যদি দ্রব্যমুল্য কমে যায়, তাহলে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রামান বৃদ্ধি পায় এভাবে মুদ্রামান চড়ে যাওয়াকে DEFLATION মুদ্রা হ্রাস বলা হয়।

মূল্যসূচক ঃ এই আলোচনার সার কথা হল মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাহ্রাস বা সংকটের বিষয়টি দ্রব্যমূল্যের উঠানামার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। যে গড় হিসেবের ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য উঠানামার বিষয়টি নিরূপণ করা হয় তাকে বলা হয় (prici index) বা মূল্যসূচক। বস্তুতঃ মুদ্রামান হ্রাস বা বৃদ্ধির বিষয়টি এই মূল্যসূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূল্যসূচক তৈরির জন্য প্রথমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং যে সকল পন্যের দামের হ্রাস বৃদ্ধি মানব জীবনে তার প্রভাব ফেলে এ ধরনের পণ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এবং গুরুত্বের বিচারে প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য একটি গুরুত্ব নির্দেশক নম্বর দেয়া হয়। যাকে Weight of commodiety বলা হয়। যে সময়ের মাঝে মুদ্রামানের হ্রাস বৃদ্ধির হার জানা প্রয়োজন হয় সেই সময়ের শুরুতে ও শেষে প্রত্যেকটি দ্রব্যের যে দাম ছিল তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক দ্রব্যের শুরু মূল্য থেকে শেষের মূল্যের গড় বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার নির্ণয় করা হয়। নির্ণিত হারসমূহকে যোগ করলে যে ফল আসে তা মোট সরল বৃদ্ধি। এই যোগ ফলকে দ্রব্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ফল আসে এটি হল সরল গড় বৃদ্ধির হার কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। কেননা সকল দ্রব্যের গুরুত্ব সমান নয়। কারণ সকল দ্রব্যের দামের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের উপর সমান প্রভাব পড়েনা। এই কারণে এ হ্রাস কিংবা বৃদ্ধির হারকে গুরুত্ব নির্দেশক নম্বর (Weight of commodiety) দ্বারা গুণ করা হয়। এই গুনফলের সমষ্টিকে দ্রব্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ওয়াইটেড বৃদ্ধির গড় হার বেরিয়ে আসে। সরল গড় বৃদ্ধির হারকে ওয়াইটেড বৃদ্ধির গড় হার দ্বারা গুণ করলে প্রকৃত বৃদ্ধির গড়হার বেরিয়ে আসে। এই হারই দেশের মুদ্রামান বৃদ্ধি পেলে কি হ্রাস পেল তা নির্দেশ করে। এটাকে দেশের দ্রব্যমূল্য হ্রাস বৃদ্ধির সূচক ধরা হয়। এই মূল্য সূচকের দ্বারা দেশের মুদ্রামান হ্রাস পেল কি বৃদ্ধি পেল তা জানা যায়। এই মূল্যসূচক যেমন বাৎসরিক নির্ণয় করা যায়, তেমনি মাসিক, সাপ্তাহিকও নির্ণয় করা যায়। মূল্যসূচকে যে হারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় সেই হারে মুদ্রার মান হ্রাস পায় কিংবা যে হারে দ্রব্যের দাম হ্রাস পায় সেই হারে মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়। নিম্নে একটি চিত্রে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করা গেল।

www.eelm.weebly.com

মূল্যসূচক

দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ	১/১/৯৮ ইং তারিখের মূল্য	১/১/৯৯ ইং তারিখের মূল্য	সরল বৃদ্ধির হার	গুরুত্ব নির্দেশক নম্বর	প্রকৃত বৃদ্ধির গড় হার
১. চাউল ৫০ কেজি	৫০০/-	১০০০/-	১০০০/-	˙৫০	১˙৪০X৭
২. কাপড় ৫০ মিঃ	৭০০/-	১৪০০/-	২ গুণ	˙৪০	= ৯˙৮০÷৪
৩. বাসা ভাড়া (১মাস)	২০০০/-	৩০০০/-	১½	˙৩০	
৪. তেল ৫ কেজি	২৫০/-	৩৭৫/-	১½	˙২০	
	৩৪৫০/-	৫৭৭৫/-	৭ গুণ	১.৪০	২˙৪৫

উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, দ্রব্য সংখ্যার সমষ্টি = ৪ এবং সরল বৃদ্ধির সমষ্টি=৭ গুণ। এই ৭ গুণকে দ্রব্যসংখ্যা-৪ দ্বারা ভাগ করলে গড় সরল বৃদ্ধি দাড়ায় (৭÷৪)=১.৭৫ গুণ। কিন্তু গুরুত্ব নির্দেশক ভ্যালুর সমষ্টি ১.৪০ টাকা। সরল বৃদ্ধির সমষ্টিকে গুরুত্ব নির্দেশক ভ্যালুর সমষ্টি দ্বারা গুণ করে দ্রব্য সংখ্যা-৪ দ্বারা ভাগ করলে প্রকৃত বৃদ্ধির গড় হার দাড়ায় (৭X১.৪০=৯.৮০÷৪)=২.৪৫ গুণ।

অর্থাৎ যে দ্রব্য ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারিতে ১.০০ টাকায় কিনা যেত তা ১৯৯৯ সালে ১লা জানুয়ারিতে ১.৭৫ টকায় কিনতে হয়। কিন্তু দ্রব্যের গুরুত্বের অনুপাতের সাথে গুণ করলে তার গড় হার দাড়ায় ২.৪৫ টাকা। অথাৎ ১৯৯৮ সালের পহেলা জানুয়ারিতে যে দ্রব্য ১ টাকায় কিনা যেত তার দাম প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২.৪৫ টাকা। অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারিতে ১ টাকার ক্রয় ক্ষমতা যা ছিল ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে ২.৪৫ টাকার ক্রয় ক্ষমতা তার সমান।

মূল্যসূচক কতটা নির্ভরযোগ্য ঃ মূল্যসূচক নির্ণয়ের প্রক্রিয়ার আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গছে যে, মুল্যসুচক মূলতঃ একটি আনুমানিক বিষয়। কেননা উক্ত তালিকার জন্য যেসব দ্রব্যাদিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকাভূক্ত করা হয় তার ভিত্তি অনুমানের উপর। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একজনের কাছে যা প্রয়োজনীয় তা অন্যের কাছে প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। আর প্রত্যেক বস্তুর গুরুত্বের যে অনুপাত নির্ধারণ করা হয় তাও আনুমানিক। কেননা সকল ব্যক্তির নিকট সব বস্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন মুমূর্ষ রোগীর নিকট জীবন রক্ষাকারী ঔষধের গুরুত্ব সর্বাধিক। অথচ সুস্থ ব্যক্তির নিকট ঔষধের কোনই গুরুত্ব নেই।

তাছাড়া প্রত্যেক বস্তুর যে মূল্য ধরা হয় তাও আনুমানিক। কেননা একই দ্রব্য একই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি হয়। তদুপরি শুরু ও শেষ মূল্যের যে গড় নির্ণয় করা হয় তাও আনুমানিক। কারণ বছরের কোন দিন কোন মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রি হয়েছে এবং কম মূল্যে বিক্রয়ের দিনের সংখ্য বেশি না বেশি মূল্যে

www.eelm.weebly.com

বিক্রয়ের দিনের সংখ্যা বেশি তা নির্ধারণ করা হয় না। যা করা হয় তা কেবল অনুমান। আর এরই ভিত্তিতে চলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজার; যা মূলতঃ শোষণের পথকে প্রশস্ত করে। অথচ জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রে এই মূল্যসূচকের ভিত্তিকে গ্রহণ করে কাজ কারবার আঞ্জাম দেয়া হয় না। যেমন ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে মূল্যসূচকের ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয় না। অথচ বিশ্বের বড় বড় ঋণদাতা সংস্থা ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এই মূল্যসূচক প্রয়োগ করে দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করে থাকে।

পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল্যসূচকের উপর ভিত্তি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থায় মুদ্রার ভ্যালু দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল তার গায়ের মূল্য যা নোটের গায়ে লেখা থাকে; যাকে (ফেইস ভ্যালু) বা গায়ের মূল্য বলা হয়। অন্যটি হল তার ক্রয় ক্ষমতা; যাকে (রিয়েল ভ্যালু) বা প্রকৃত মূল্য বলা হয়। গায়ের মূল্য সব সময় অপরিবর্তীত থাকে; কিন্তু প্রকৃত মূল্য উঠানামা করে।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, কেউ যদি কারো নিকট টাকা পাওনা হয় তাহলে তাকে ফেইস ভ্যালু হিসেবে যত টাকা পাওনা ছিল তত টাকাই পরিশোধ করা হবে, না পরিশোধকালে মূল্যসূচকের ভিত্তিতে পাওনা টাকার রিয়েল ভ্যালু যা হয় তা পরিশোধ করা হবে? কেননা যদি মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রামান হ্রাস পায় আর হ্রাসের হার যদি ১০% হয় তাহলে পূর্বে ১০০ টাকায় যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যেত বর্তমানে তা ক্রয় করতে ১১০ টাকা লাগবে। এমতাবস্থায় যদি পাওনাদারকে ১০০ টাকা পরিশোধ করা হয়, তাহলে সে ১০ টাকা পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সমস্যা নিরসনের নিমিত্তে অনেক অর্থনীতিবিদ এরূপ মতামত প্রদান করেছেন যে, পাওনা পরিশোধের বিষয়টি মূল্যসূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হবে এবং যেদিন পাওনা পরিশোধ করা হবে, সেদিনের মূল্যসূচকের ভিত্তিতে পাওনা টাকার মূল্যমান যত টাকা দাড়ায় পাওনাদারকে ততটাকা পরিশোধ করা হবে। এ মতের পক্ষে তারা ভাংতি পয়সার পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর একটি অভিমতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। মুনতাকা নামক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতামত উল্লেখ করতে যেয়ে বলা হয়েছে-

اذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت قال ابو يوسف– قولي وقول ابي حنيفة في ذالك سواء وليس له غيرها ثم رجع ابويوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض–

"ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে কোন দ্রব্য বিক্রি করার পর মূল্য পরিশোধের আগে যদি ধাতব মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পায় বা কমে যায়; তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ বলেন যে,

www.eelm.weebly.com

এ ক্ষেত্রে আমার ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত একই অর্থাৎ সে ঐ নির্ধারিত পরিমাণ মুদ্রাই লাভ করবে। এ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিন্তু পরে তিনি এই মত প্রত্যাহার করেছেন এবং বলেছেন যে, যেদিন বেচাকেনা সংগঠিত হয়েছে সেদিন ঐ পরিমাণ ধাতব মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যেত, মূল্য হস্তান্তরের দিন ঐ পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা যে পরিমাণ ধাতব মুদ্রা পাওয়া যাবে; উক্ত পাওনাদার ঐ পরিমাণ ধাতব মুদ্রা পাবে"। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এ ক্ষেত্রে মূল্যসূচক প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন।

এই মতের প্রবক্তারা তাদের মতের পক্ষে এ যুক্তিও পেশ করে থাকেন যে, কাগজী নোটগুলোর তো প্রকৃত পক্ষে কোন মূল্য নেই, এগুলো কিছু পণ্যের ক্রয় ক্ষমতার প্রতীক মাত্র। সুতরাং যখন কেউ কাউকে টাকা করজ দেয় তখন এর অর্থ এই হয় যে, সে তাকে ঐ পরিমাণ মূল্যের পণ্য প্রদান করেছে। আর শরীয়তের বিধান এই যে, الاقراض تقضي بامثالها অর্থাৎ করজ আদায়ের বিধান হল যা নেয়া হয়েছিল তৎসমপরিমাণ দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং যে পরিমাণ পণ্য সে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল সেই পরিমাণ পণ্যই তাকে প্রত্যার্পণ করতে হবে। এর একমাত্র উপায় হল করজকে মূল্যসূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া। অর্থাৎ যদি কেউ ১০০ টাকা ঋণ নিয়ে থাকে আর পরিশোধের দিন মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রামান ২০% হ্রাস পেয়ে থাকে তাহলে উক্ত ১০০ টাকার ঋণ ১২০ টাকায় পরিশোধ করতে হবে।

এই মতটি মূলতঃ ইসলামী শরীয়তের সাথে বিভিন্ন কারণে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন-

১. তারা যে যুক্তির ভিত্তিতে করজ আদায়ের বিষয়কে মূল্যসূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করার কথা বলেছেন, সেই যুক্তিগুলো খুব বলিষ্ঠ নয়। কেননা কাগজী নোটের বিপরীতে বাস্তবে কোন পণ্যের জুড়ি থাকে না। বরং পণ্যের জুড়ি কেনার ক্রয় ক্ষমতা বহন করে; যা কোন নির্ধারিত বস্তু নয়। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে এক ব্যক্তি এক কেজি চাউল ক্রয় করতে পারে; আর একজন হয়তবা ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে তার চেয়ে ১ টাকা কমেও এক কেজি চাউল ক্রয় করতে পারে। সুতরাং পণ্যের জুড়িকে অনুমান করে নেয়া ছাড়া বাস্তবে সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। অতএব পণ্যের জুড়ি নোটের হাকীকত নয়, বরং টাকা দ্বারা যে উপকার লাভ করা যায় সেটিই নোটের বাস্তব মূল্য। সুতরাং কাউকে টাকা করজ দেয়ার অর্থ হল লেনদেনের উপকরণ সরবরাহ করা যা দ্বারা পণ্যের জুড়ি ক্রয় করা যায়; সরাসরি পণ্যের জুড়ি প্রদান করা নয়।

www.eelm.weebly.com

২. তাদের বক্তব্যের সার কথা এই যে, পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে পাওনা টাকার প্রকৃত মূল্যের (জবধষ ঠধষঁব) সমপরিমাণ পরিশোধ করতে হবে. পাওনা টাকার গায়ের মূল্যের (ঋধপব ঠধষঁব) সমপরিমাণ টাকা আদায় করলে চলবে না। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে করজ আদায়ের ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিক থেকে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য: মূল্যমান গত দিক থেকে সমতা রক্ষা হল কি হলনা এ বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই বিবেচ্য হয় না। যেমন কেউ যদি কারো কাছ থেকে এক মণ ধান করজ নেয় তাহলে তা পরিশোধ করার সময় এক মণ ধানই পরিশোধ করতে হয়। ধান করজ নেয়ার সময় তার মূল্য কত ছিল এবং পরিশোধ করার সময় তার মূল্য কত হল এ বিষয়টি বিবেচ্য বলেই গণ্য হয় না। আল্লামা ইবনূল আসীর (রহ.) জামেউল উসূলে বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর সূত্রে এ মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন যে, রাসূল (সা.)-এর যুগে আমাদের নিকট ভালমন্দ মিশ্রিত খেজুর আসত। আমরা নিম্নমানের খেজুরের ২ সা'আ (মাপের একটি একক) উত্তম মানের খেজুরের এক সা'আর বিনিময়ে বিক্রি করতাম। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, দুই সা'আ খেজুরকে এক সা'আ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করবে না দুই সা'আ গমকেও এক সা'আর পরিবর্তে বিক্রি করবে না এবং দুই দিরহামকেও এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে না। (জামেউল উসূল খণ্ড ঃ ১ পৃষ্ঠা ঃ ৫৪৬)

রাসূল (সা.) অবশ্যই জানতেন যে, দুই সা'আর পরিবর্তে যে এক সা'আ বিক্রি করা হত সেই এক সা'আর মূল্যমান উক্ত দুই সা'আর সমপর্যায়ের ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এরূপ লেনদেনকে বৈধ রাখেননি বরং একে (ربا الفضل) অতিরিক্ত প্রদানজনিত সুদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সোনা রূপার লেনদেনেও (যা মুদ্রামূল) পরিমাণগত দিক থেকে সমতা রক্ষা করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মূল্যমানগত দিক থেকে নয়। তাই স্বর্ণের টুকরা ও তৈরি গহনার লেনদেনেও (যাতে মূল্যমানের তফাৎ অবশ্যই থাকে তা সত্ত্বেও) পরিমাণগত সমতার সাথেই লেনদেন করতে বলা হয়েছে।

এ সকল উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিক থেকে সমতা রক্ষা অপরিহার্য, মূল্যমানগত দিক থেকে নয়।

৩. যে সকল দ্রব্য সমজাতীয় দ্রব্যের মোকাবেলায় অসমহারে লেনদেন করলে সুদ বলে গণ্য হয়; সে সব দ্রব্যের সমজাতীয় দ্রব্যের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ করে বেচাকেনা করাও বৈধ নয়। মুদ্রা

www.eelm.weebly.com

অবশ্যই সে শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তাই মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অনুমানের ভিত্তিতে সমতা নিরূপণ করে লেনদেন করা বৈধ হবে না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মূল্যসূচক নির্ণয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণই অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। তাই এ দ্বারা প্রকৃত সমতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এরূপ একটি আনুমানিক বিষয়কে পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা নিরূপণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই বৈধ হবে না।

তদুপরি মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারে ঋণ গ্রহীতার কোন হাত নেই। সুতরাং এই ক্ষতির দায়ভার ঋণ গ্রহীতার কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। তদুপরি ঋণ না দিয়ে যদি সে এ টাকা নিজের কাছেই রেখে দিত; আর এ অবস্থায় মুদ্রামান হ্রাস পেয়ে যেত; তাহলে সে এই দায়ভার কার কাঁধে চাপাত? তাছাড়া ঋণ সাধারণত দেয়াই হয় ঋণ গ্রহীতার উপকারার্থে। অতএব কারো উপকার করতে যেয়ে নিজের যদি সামান্য ক্ষতি হয়ও তবু আখেরাতে প্রতিদান লাভের আশায় তা সহ্য করতে হবে।

৪. মূল্যসূচকের বিষয়টি মুদ্রামাণ হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে মুদ্রামান বৃদ্ধি পাওয়ার সময়ও তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং সেই ভিত্তিতে পাওনাদারকে ফেইস ভ্যালুর চেয়ে কম পরিশোধ করা প্রয়োজন। অথচ এর প্রবক্তা কেউ নয়। মূল্যসূচকের বিষয়টি যদি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি হয়ে থাকে তাহলে ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে যে টাকা জমা রাখা হয় সে টাকার উপরও এর প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। অথচ সে ক্ষেত্রে এটি কেউ প্রয়োগ করে না। এমনকি যেসব দেশ মূল্যসূচকের ভিত্তিতে কোন কোন বিষয় আঞ্জাম দিয়ে থাকে, তারাও কারেন্ট একাউন্টে জমাকৃত টাকার ব্যাপারে মূল্যসূচকের প্রয়োগ করে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্যমান নির্ণয়ের বিষয়টি ব্যাপক ভিত্তিতে কোথাও গৃহীত হয়নি।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর যে বক্তব্যের আলোকে তারা এ মতটিকে বৈধ প্রমাণ করতে চান; সেই বক্তব্য দিয়ে তা প্রমাণ করা যায় না। কেননা তিনি যে যুগে এই মন্তব্য করেছেন, সেযুগে মুদ্রামান উঠানামার বর্তমান ধরণটি প্রচলিত ছিলনা। তার যুগে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার হত দিরহাম দিনারের ভাংতি বা রোজগারী হিসেবে। দিরহাম দিনারের মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে তার মূল্যমান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। যেমন এক দিনারের অর্ধেক মুল্যমান বহনকারী ধাতব মুদ্রাকে আদুলী, এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মূল্যমান বহণকারী মুদ্রাকে সিকি ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হত। অনেক সময় সরকার এই আনুপাতিক হারের পরিবর্তন করত। যেমন পাকিস্তান আমলে আমদের দেশে ১টাকা = ৬৪ পয়সা ছিল। তখন আদুলি = ৩২ পয়সা ও সিকি = ১৬ পয়সা

www.eelm.weebly.com

ছিল। কিন্তু পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ১ টাকা = ১০০ পয়সা করা হল। ফলে আধুলী = ৫০ পয়সা ও সিকি = ২৫ পয়সা নির্ধারিত হল। এতে ১ পয়সার মূল্যমান পূর্বের তুলনায় কমে গেল। এ ধরনের সরকারি নীতি পরিবর্তনের ফলে যদি ধাতব মুদ্রার মানে পরিবর্তন দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে যিনি পরিবর্তনের পূর্বে কারো নিকট আধুলী পাওনা ছিলেন তাকে সে সময় ৩২ পয়সা পরিশোধ করলেই পাওনা আদায় হয়ে যেত। কিন্তু পরিবর্তীত নীতি কার্যকর হওয়ার পর তাকে ৩২ পয়সা পরিশোধ করলে চলবে না বরং এখন তাকে ৫০ পয়সা পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যে মন্তব্য করেছেন তা এ ধরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এর ভিত্তিতে বর্তমানে মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রামানের যে তারতম্য ঘটে, ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া মোটেও যুক্তি সঙ্গত নয়। কারণ এ ধরনের মুদ্রামান পরিবর্তনের বিষয়টি সেকালে প্রচলিতই ছিল না। যা ছিল তা ছিল সরকার কর্তৃক মুদ্রা ব্যবস্থার নবায়ন। হ্যাঁ, বর্তমানেও যদি সরকার মুদ্রা ব্যবস্থায় এ ধরনের কোন পরিবর্তন করে- যেমন পাকিস্তান সরকার করেছিল তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ভিত্তিতে অবশ্যই ফায়সালা গ্রহণ করতে হবে।

সার কথা এই যে, মূল্যসূচকের ভিত্তিতে পাওনা পরিশোধের এ দর্শনটি ইসলামী ফিকাহ-এর দৃষ্টিতে সমর্থিত নয়। ইসলামী ফিকাহ -এর দৃষ্টিতে সকল পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিক থেকে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য। তবে কেউ যদি পাওনাদারের পাওনা ভিন্ন কোন মুদ্রা বা দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রেই কেবল মূল্যমানগত সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সমতা এভাবে রক্ষা করা হবে যে, যে দিন পাওনা পরিশোধ করা হবে; সে দিন ঐ পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা পরিশোধতব্য মুদ্রা বা দ্রব্য যে পরিমাণ পাওয়া যায় সেই পরিমাণ মুদ্রা বা দ্রব্য পাওনাদারকে পরিশোধ করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম আবু দাউদ বর্ণিত উক্ত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন যে, আমি বাকী নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম। কখনও কখনও দরদাম দিনারের মাধমে সাব্যস্ত করে উট বিক্রি করতাম কিন্তু ক্রেতার নিকট থেকে দিনারের পরিবর্তে (সমমূল্যের) দিরহাম গ্রহণ করতাম, কখনও কখনও দিরহামের দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করতাম এবং দিরহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণ করতাম। অনুরূপভাবে কাউকে পাওনা পরিশোধ করতে দিনারের পরিবর্তে দিরহাম বা দিরহামের পরিবর্তে দিনার পরিশোধ করতাম। একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হলাম, সে সময় তিনি হযরত হাফসা (রা.) -এর ঘরে ছিলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

www.eelm.weebly.com

একটু বিলম্ব করুন, আমার একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি এই যে, আমি বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করি। কখনও দিনারের দ্বারা দরদাম সাব্যস্ত করে বিক্রি করি, পরে তার পরিবর্তে দিরহাম গ্রহণ করি। এ শুনে রাসূল (স.) বললেন, এ ধরনের লেনদেনে কোন অসুবিধা নেই, তবে এই শর্তে যে, ঐ দিনের দামের ভিত্তিতে সমতা রক্ষা করে লেনদেন করতে হবে এবং কোন লেনদেন বাকি রেখে তোমরা একজন অন্য জন্য থেকে পৃথক হতে পারবে না। -আবু দাউদ- কিতাবুল বুয়ূ।

দিরহাম ও দিনার যেহেতু দুটি ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা তাই এ দুটোর মাঝে কম-বেশিতে লেনদেন বৈধ ছিল এবং এর মূল্য সম্ভবত চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে এর দরদাম উঠানামা করত। যদি এ ক্ষেত্রে মূল্যমানগত সমতা রক্ষা করার বিষয়টি অপরিহার্য না হয়ে পরিমাণগত সমতার বিষয়টি অপরিহার্য হত; তাহলে নবী (সা.) বিক্রয়ের দিনের মূল্যের ভিত্তিতে দাম গ্রহণ করার জন্য হযরত ইবনে উমরকে পরামর্শ দিতেন। কারণ বিক্রয়ের দিনের মূল্যের হিসেবে দাম গ্রহণ করলেই পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা সম্ভব। কেননা যদি উটের মূল্য ১০০ দিনার হয়, আর বিক্রয়ের দিন ১ দিনারের মূল্য যদি ১০ দিরহামের সমান হয়; তাহলে তার পাওনা হবে ১০০০ দিরহাম। আর সেদিন যদি দশ দিরহাম দিয়ে ১০ কেজি গম ক্রয় করা সম্ভব হত, তাহলে সে ঐ টাকা দিয়ে ১০০০ কেজি গম ক্রয় করতে পারত। কিন্তু পরিশোধের দিন যদি দিরহামের মান বৃদ্ধি পায় এবং এক দিনার দিয়ে যদি ৮ দিরহাম পাওয়া যায়; সে অবস্থায় পরিমাণগত সমতা রক্ষা করতে হলে তাকে ১০০০ দিরহামই পরিশোধ করতে হবে। এতে পরিমাণগত দিক থেকে সমতা রক্ষা পেলেও মূল্যমানগত সমতা রক্ষা পাবে না। কেননা অর্থনীতির সূত্র অনুসারে মুদ্রামান যে হারে বৃদ্ধি পায় দ্রব্যমূল্য সেই হারে হ্রাস পায়। সুতরাং যখন ১ দিনারের মূল্য ১০ দিরহাম ছিল তখন যদি ১০ দিরহামে ১০ কেজি গম পাওয়া যায়, তাহলে যখন ১ দিনারের মূল্য ৮ দিরহাম হবে, তখন ৮ দিরহামে ১০ কেজি গম পাওয়া যাবে। আর ঐ দামে ১০০০ দিরহাম দ্বারা গম পাওয়া যাবে ১২৫০ কেজি। আবার যদি পরিশোধের দিন দিরহামের মূল্য হ্রাস পায় এবং ১ দিনার দিয়ে যদি ১২ দিরহাম পাওয়া যায় তখনও পরিমাণগত সমতা রক্ষার্থে তাকে ১০০০ দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও পরিমাণগত সমতা রক্ষা পেলেও মূল্যমানগত সমতা রক্ষা পাবে না। কেননা অর্থনীতির সূত্র অনুসারে মুদ্রার দাম যে হারে হ্রাস পায় দ্রব্যের দাম সেই হারে বৃদ্ধি পায়। অতএব যখন ১ দিনারের মূল্য ১২ দিরহাম হবে তখন ১২ দিরহাম দিয়ে ১০ কেজি গম পাওয়া যাবে। এই হারে ১০০০ দিরহাম দিয়ে গম পাওয়া যাবে ৮৩৩ কেজি মাত্র।

www.eelm.weebly.com

কিন্তু যদি পরিশোধের দিন ১০০ দিনার দিয়ে যে পরিমাণ দিরহাম পাওয়া যায়, পাওনাদারকে সেই পরিমাণ পরিশোধ করা হয়; তাহলে পরিমানগত সমতা রক্ষা না পেলেও মূল্যমানগত সমতা রক্ষা পাবে। কেননা উপরোক্ত হিসাব অনুসারে বিক্রয়ের দিন তার পাওনা দাড়িয়েছিল ১০০০ দিরহাম যা দ্বারা সে ১০০০ কেজি গম ক্রয় করতে পারত। এখন যদি পরিশোধের দিন দিরহামের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং ১ দিনার = ৮ দিরহাম হয়, তাহলে উটের মালিকের পাওনা হবে ৮০০ দিরহাম। কিন্তু মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার কারণে সে দিন ৮০০ দিরহামে ১০০০ কেজি গম পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে দিরহামের মূল্য হ্রাস পেয়ে যদি ১ দিনার = ১২ দিরহাম হয়; তাহলে উটের মালিকের পাওনা হবে ১২০০ দিরহাম। কিন্তু মুদ্রার মূল্য হ্রাসের অনুপাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তখন ১২০০ দিরহাম দিয়ে ১০০০ কেজি গম পাওয়া যাবে। ফলে মূল্যমান অপরিবর্তীত থাকবে।

অর্থনীতির এই জটিল সূত্রের প্রতিই নবী (সা.) হযরত ইবনে উমরকে অতি সংক্ষেপে নির্দেশ দিতে যেয়ে বলেছেন যে, যদি ভিন্ন মুদ্রা বা দ্রব্য দ্বারা পরিশোধ করতে হয় তাহলে মূল্য পরিশোধের দিন উটের মূল্য হিসেবে ধার্যকৃত মুদ্রার ঐ নির্ধারিত পরিমাণ দ্বারা ভিন্ন মুদ্রা বা দ্রব্য যে পরিমাণ পাওয়া যাবে; তাই পরিশোধ করতে হবে। এরূপ করা হলে মুদ্রামানে তারতম্য ঘটলেও মুল্যমানের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। সার কথা এই যে, যে দ্রব্য বা মুদ্রা পাওনা হয়েছে যদি তা সেই দ্রব্য বা মুদ্রা দ্বারা আদায় করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণগত সমতা রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় সুদ হয়ে যাবে। আর যদি ভিন্ন দ্রব্য বা ভিন্ন মুদ্রায় আদায় করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মুল্যমানগত সমতা রক্ষা করতে হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুন্ডি বা নগদ বাকিতে মুদ্রা লেনদেন

হুন্ডি কাকে বলে ঃ হুন্ডি মূলতঃ আন্তদেশীয় মুদ্রা লেনদেনের একটি প্রাচীনতম পন্থা। আধুনিককালেও কোন কোন অঞ্চলে হুন্ডি পদ্ধতিতে মুদ্রা লেনদেনের প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

এই লেনদেনের পদ্ধতি সাধারণত এই হয় যে, এক দেশের কোন ব্যবসায়ী কিংবা পরিভ্রাজক যখন অন্য দেশে যেতে চায় তখন মুদ্রা সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ, পথের প্রতিকূলতা, চোর ডাকাতের উপদ্রবের কথা চিন্তা করে স্বদেশের এমন কোন ব্যবসায়ীর নিকট টাকা হস্তান্তর করে, যার সেই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে কিংবা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে পরিচয় রয়েছে। উক্ত ব্যবসায়ীকে এই শর্তে টাকা প্রদান করা হয়

www.eelm.weebly.com

যে, আমি সে দেশে পৌছার পর আমাকে কিংবা সে দেশে অবস্থানরত আমর কোন প্রতিনিধিকে আপনি আপনার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত টাকার সমমূল্যের সে দেশীয় মুদ্রা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। উক্ত ব্যবসায়ী প্রচলিত বিনিময় রেইটের চেয়ে কম মূল্যে বিনিময়ের একটি হার ধার্য করতঃ প্রদত্ত টাকার বিনিময়ে সে দেশীয় মুদ্রা কত পরিশোধ করা হবে তা উল্লেখ করে দেয়। অথবা প্রচলিত বিনিময় রেইটে সে দেশীয় মুদ্রা যত পাওনা হয় তাই পরিশোধ করার চুক্তি করে; তবে উক্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট হারে কমিশন গ্রহণ করে। দুইয়ের যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে উল্লিখিত দেশে অবস্থিত তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কিংবা পরিচিত ব্যক্তিকে এ মর্মে একটি সনদপত্র বা চিঠি ইসু করে দেয় যে, অমুক শহরের এই নামের ব্যক্তিকে সে দেশীয় মুদ্রায় এত টাকা পরিশোধ করা হোক। অনেক সময় বিদেশগামী ব্যক্তির হাতেই এই চিঠি বা সনদপত্র দিয়ে দেয়া হয়। সে যথা স্থানে পৌঁছে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঐ চিঠি বা সনদপত্র সরবরাহ করলে তারা সনদপত্রে বা চিঠিতে উল্লিখিত অংকের সে দেশীয় মুদ্রা তাকে প্রদান করে। আবার সে দেশ থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে চিঠি বা সনদপত্র নিয়ে লোকজন আসে এবং ঐ ব্যবসায়ীকে তা প্রদান করে তার কাছ থেকে এ দেশীয় টাকা নিয়ে নেয়। এভাবে তারা (ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হলে) পরস্পরের পাওনা কর্তন করে হিসাব সমন্বয় করে থাকে। আন্তদেশীয় মুদ্রা লেনদেনের এই পদ্ধতিকেই হুন্ডি প্রথা বলা হয়। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের ইসুকৃত সনদপত্রকেই হুন্ডি বলে আখ্যায়িত করা হয়। হুন্ডি প্রথারই উন্নত সংস্করণ হল মানি অর্ডার, ব্যাংকিং চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ট্রেভেল চেক ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে যে, হুন্ডি ব্যবসা বেসরকারি ভাবে চলে এবং মুদ্রা মানের প্রচলিত রেইটের চেয়ে কম বেশিতে লেনদেন করে কিংবা নির্দিষ্ট হারে কমিশন গ্রহণ করে লাভ কমানো হয়। আর মানি অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, ট্রেভেল চেক ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইস্যু করা হয় এবং এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ (বা কাজের মজুরী) আদায় করা হয়। ব্যাহ্যত সবগুলোই মুদ্রার বিনিময়। আর তা হয় নগদ ও বাকিতে এবং মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে বর্ধিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, এহেন লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কিনা?

হুন্ডি ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে হুন্ডি বা এ জাতীয় লেনদেন বৈধ হবে কি না তা অনুধাবন করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি তা পৃথক পৃথকভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

www.eelm.weebly.com

১. হুন্ডির লেনদেনে মুদ্রার লেনদেন হচ্ছে নগদ ও বাকিতে অর্থাৎ যিনি টাকা পরিশোধ করে হুন্ডির সনদ গ্রহণ করেছেন; তিনি তো টাকা নগদ পরিশোধ করছেন। কিন্তু এই টাকার বিনিময়ে তাকে যে মুদ্রা দেয়া হচ্ছে; তা পরে পরিশোধ করা হচ্ছে। এরূপ নগদ বাকিতে মুদ্রার লেনদেন বৈধ হবে কি না এবং আধুনিক কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এহেন নগদ বাকীতে লেনদেন করলে তা বৈধ হবে কি না?

২. হুন্ডিতে মুদ্রামানের অনুমোদিত রেইটের চেয়ে কম বেশিতে লেনদেন হয়। মুদ্রার লেনদেনে মুল্যমানের তারতম্য করে লেনদেন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

৩. কিংবা হুন্ডিতে কমিশন বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয়। কমিশন গ্রহণের ফলে বাস্তবে উভয় পক্ষের মুদ্রামানে সমতা বজায় থাকে না, এতে বিষয়টি রিবা বা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কি না?

৪. হুন্ডির লেনদেনে এক দেশের মুদ্রা আরেক দেশে কিংবা এক স্থানের মুদ্রা আরেক স্থানে পৌঁছে দেয়ার শর্ত সংযুক্ত হয়। এতে মুদ্রা সঙ্গে বহনের ঝুঁকি ও পথের দুর্যোগ এড়ানোর সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্য নীহিত থাকে। শরীয়তের পরিভাষায় একে سفتجه বলা হয়, (যা মাকরুহে তাহরিমী)। এরূপ শর্ত সংযুক্ত করণের দ্বারা লেনদেন অবৈধ বলে গণ্য হবে কি না?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর মিমাংসার উপরই হুন্ডি ব্যবসা বৈধ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। তাই আমরা এ বিষয়গুলোর শরয়ী বিধানের উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে নেয়া প্রয়োজন মনে করছি।

বস্তুতঃ কাগজী মুদ্রাগুলো পারিভাষিক মুদ্রা এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য থাকলেও সকল দেশের মুদ্রা একই জাতীয় বস্তু, না ভিন্ন জাতীয় বস্তু- এ নিয়ে আধুনিককালের ফিকাহবিদদের দ্বিমত রয়েছে। যারা দুই দেশের মুদ্রাকে দুই জাতীয় দ্রব্য বলে মনে করেন; তাদের সিদ্ধান্তানোসারে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় মানগত তারতম্যের সাথে কমবেশিতে হতে পারে। দুই পক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে যে দামে উপনীত হবেন সেই দামেই লেনদেন হতে পারবে। কেননা কাগজী মুদ্রাগুলোর বিপরীতে বর্তমানে কোন স্বর্ণ রূপা থাকে না, সুতরাং এর লেনদেন সোনা রূপার বেচাকেনার বিধির আওতায় পড়ে না। আর দুই দেশের মুদ্রা দুই জাতীয় বিধায় তা সুদী লেনদেনের বিধির আওতায়ও পড়ে না। অতএব কাগজী মুদ্রার লেনদেন কমবেশিতে এবং নগদ বাকিতে হতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যেহেতু মনে করেন যে, মুদ্রা সনাক্ত করণের দ্বারা সনাক্ত হয় না, তাই তাদের মতানোসারে হস্তগত করা ছাড়া

www.eelm.weebly.com

সনাক্ত করণের অন্য কোন উপায় নেই। অতএব মুদ্রার লেনদেনে কোন এক পক্ষও যদি তার পাওনা হস্তগত না করে, কেবলমাত্র লেনদেনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে এটি এমন এক চুক্তি হবে যাতে মূল্য ও দ্রব্য দুটোই বাকি থাকছে। এ ধরনের চুক্তিকে بيع الكالي بالكالي বা بيع الدين بادين বলা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। অতএব কোন এক পক্ষকে চুক্তির মজলিশে আপন পাওনা হস্ত গত করে নিতে হবে। এ সম্পর্কে ইমাম কারখী (রহ.)-এর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে ইমাম সাক্কাকী (রহ.)-এর বক্তব্য বাদায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,-

(فان) تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان وان عينا الا ان القبض في المجلس شرط حتي يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين ولو قبض احد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الاخر ذكر الكرخي رحـ انه لا يبطل العقد لان اشتراط القبض من خصائص الصرف وهذا ليس بصرف فيكتفي فيه بالقبض من احد الجانبين لان به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين بدائع ج ٥

যদি দুই জন ক্রেতা-বিক্রেতা নির্ধারিত ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত ধাতব মুদ্রার লেনদেন করে, ক্ষেত্রে তারা মুদ্রাগুলো সনাক্ত করে দিলেও যেহেতু মুদ্রা সনাক্ত করণের দ্বারা সনাক্ত হয় না তাই সেগুলো সনাক্ত হবে না। এ কারণেই যদি চুক্তির মজলিশে তা হস্তান্তর করার কাজটি সম্পন্ন না করা হয় তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটি তখন দ্রব্য ও মূল্য দুটোই বাকি রেখে মজলিশ ভঙ্গ করা হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে (যা বৈধ নয়)। কিন্তু যদি বিনিময়কৃত ধাতব মুদ্রাদ্বয়ের কোন একটি চুক্তির মজলিশে হস্তগত করে নেয়া হয়, আর অন্যটি হস্ত গত করার পূর্বেই উভয় পক্ষ মজলিশ থেকে উঠে যায়, তাহলে ইমাম কারখী (রাহ.) বলেন যে, চুক্তিটি বাতিল হবে না। কেননা দুই পক্ষ থেকেই হস্তগত করণের শর্তটি সোনা রূপার লেনদেনের বৈশিষ্ট্য। আর ধাতব মুদ্রার বিনিময় সোনা রূপার বিনিময়ের বিধির আওতাভুক্ত নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ থেকে হস্তগত করণের দ্বারাই যথেষ্ট হবে। কেননা এতটুকু দ্বারাই দ্রব্য ও মূল্য বাকি রেখে চুক্তির মজলিশ থেকে উঠে যাওয়ার বিধানের আওতা থেকে এটি বেরিয়ে আসবে। -বাদায়ে- ৫ম খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা

অবশ্য যখন ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে ধাতব মুদ্রার লেনদেন সমতা রক্ষা করে করা হবে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি মত এও রয়েছে যে, তখন দুই পক্ষের মুদ্রা নির্ধারণ করা দ্বারাই চুক্তি সংঘটিত হয়ে যাবে; হস্তগত করণের শর্ত থাকবে না। অর্থাৎ হস্তগতকরণ কিংবা নির্ধারিত করণ এ দু'য়ের যে কোন একটি পাওয়া গেলেই চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে।

-আহ্সানুল ফাতাওয়া, খন্ড- ৭ পৃষ্ঠা ৮৭

www.eelm.weebly.com

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালিক (রহ.)-এর মতানুসারে মুদ্রা সনাক্ত করণের দ্বারাই সনাক্ত হয়ে যায়। অতএব তাদের দৃষ্টিতে কোন এক পক্ষ যদি ধাতব মুদ্রা বা নোট সনাক্ত করে দেয় তাহলেই চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। সে জন্য হস্তগত করা অপরিহার্য বলে গণ্য হবে না।

-মুগনী, ইবনে কুদামা কৃত, সোনা রূপার লেনদেন অধ্যায়, খণ্ড- ৪ ঃ পৃষ্ঠা- ১৬৯

তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রহ.) -এর মতানুসারে মুদ্রার লেনদেনের চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তির সময় বিক্রেতার হাতে মুদ্রা বিদ্যমান থাকাও অপরিহার্য নয়। এ সম্পর্কে মাবসুতের ভাষ্য নিম্নরূপ-

اذا شتر الرجل فلوسا بدرهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لان الفلوس المروجة كالنقود وقد بينا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير-

যদি কোন ব্যক্তি দিরহাম দিয়ে ধাতব মুদ্রা ক্রয় করে এবং তার মূল্য পরিশোধ করে দেয়, আর বিক্রেতার নিকট ধাতব মুদ্রা বিদ্যমান না থাকে, তবুও বেচাকেনা সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা পারিভাষিক মুদ্রাগুলোও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ন্যায়। আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মুদ্রা লেনদেনের চুক্তির বিধান এই যে, মূল্য নগদ পরিশোধ করা ও তা বিদ্যমান থাকা দুটোই অপরিহার্য। কিন্তু চুক্তির মূহুর্তে বিক্রেতার হাতে নিজের আওতায় তা বিদ্যমান- থাকা অপরিহার্য নয়। যেমন দিরহাম ও দিনারের লেনদেনের চুক্তির ক্ষেত্রে তা বিক্রেতার নিকট বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। -মাবসূত, সারাখসী কৃতঃ খন্ড- ১৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৪।

এর অর্থ হল এহেন অবস্থায় এই লেনদেনটি বাকিতে লেনদেন বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু ধাতব মুদ্রার দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় কিংবা রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময় কিংবা স্বর্ণ মুদ্রার দ্বারা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনিময়কৃত দ্রব্যদ্বয় এক জাতীয় হয় না, তাই কম বেশিতে ও নগদ বাকিতে লেনদেন বৈধ হবে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে কাগজী মুদ্রাসমূহের আন্তদেশীয় লেনদেন, মানগত তারতম্যের সাথে ও নগদ বাকিতে হতে পারবে। অতএব হুন্ডি কিংবা ব্যাংক ড্রাফটের মধ্যমে যে লেনদেন হয় তা বৈধ হবে।

এ মতের প্রবক্তারা মুদ্রা বাকিতে লেনদেন ও মূল্যমানের তারতম্যের সাথে লেনদেনকে বৈধ সাব্যস্ত করার জন্য অন্য একটি ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন। সেই ব্যাখ্যাটি এই যে, উক্ত লেনদেনকে (بيع سلم) বা অগ্রিম ক্রয় হিসেবেও গণ্য করা যায়। বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করা যায় যে, একজন ক্রেতা ডলার ক্রয় করতে

www.eelm.weebly.com

আগ্রহী তিনি একজন ডলার ব্যবসায়ীকে ১০০ টাকা ডলারের অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দিলেন, এই শর্তে যে, আগামী মাসের ১৫ তারিখে আপনি আমাকে ৫০ টাকা = ১ ডলার হারে ১০০ টাকার ডলার আমেরিকায় পরিশোধ করবেন। অবশ্য অগ্রিম ক্রয়ের জন্য অন্যতম শর্ত হলো কি ক্রয় করা হবে তা নির্ধারিত হতে হবে এবং তার ওজন বা পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারিত করে উল্লেখ করে দিতে হবে। এ কারণেই যে সব দ্রব্য গণনা করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সেগুলোতে, অগ্রিম ক্রয় বৈধ নয়। কিন্তু মুদ্রা যদিও গণনা করে লেনদেন করা হয় কিন্তু তার এককগুলো মূল্যমানের দিক থেকে পূর্ণ মাত্রায় সমতা বহন করে। তাই কোন দেশের মুদ্রা দেয়া হবে, কি পরিমাণ দেয়া হবে ইত্যাদি উল্লেখ করে দেয়া হলে তা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং যে সমস্যার করণে গণনা করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এমন দ্রব্যে অগ্রিম ক্রয় বৈধ রাখা হয়নি তা এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং মুদ্রার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। এমন কি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যিনি একটি ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে দু'টি ধাতব মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ রাখেননি। তিনিও মুদ্রায় অগ্রিম ক্রয়কে বৈধ রেখেছেন। অবশ্য হুন্ডির লেনদেনকে অগ্রিম ক্রয় হিসেবে গণ্য করতে হলে অগ্রিম ক্রয়ের আরো যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে লেনদেন করতে হবে।

সার কথা এই যে, যারা দুই দেশের মুদ্রাকে দুই জাতীয় দ্রব্য বলে গণ্য করেন তাদের দৃষ্টিতে হুন্ডির লেনদেনে কোন অসুবিধা নেই। অতএব মানিঅর্ডার, ব্যাংকিং চেক, এক্সচেইঞ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে মুদ্রার লেনদেনের যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চালু রয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে যদি সরকার বেসরকারি ভাবে মুদ্রার লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তাহলে সরকারের আইন যতক্ষণ শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নাগরিকদের জন্য তা মেনে চলা কর্তব্য বিধায় তখন হুন্ডির লেনদেন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে যে সকল ফেকাহবিদ সকল দেশের মুদ্রাকে একই জাতীয় বলে মত পোষণ করেন তাদের দৃষ্টিতে হুন্ডির লেনদেন অর্থাৎ নগদ বাকিতে লেনদেন ও মানগত তারতম্যের সাথে লেনদেন সাধারণভাবে বৈধ নয়। কেননা কাগজী মুদ্রার লেনদেনকে (بيع صرف) বা সোনা রূপার লেনদেন বলে গণ্য করা না গেলেও এর লেনদেনেও মানগত সমতা রক্ষা করে নগদানগদী লেনদেন করতে হবে। কারণ এগুলোও পারিভাষিক মুদ্রা। তাছাড়া কাগজী মুদ্রাগুলো একই জাতীয় বিধায় এবং এর এককগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সমতা বহন করে বিধায় এগুলো সুদী পণ্যের লেনদেনের আওতায় পড়বে। কেননা মুদ্রা যদিও গণনা করে লেনদেন করা হয় কিন্তু এর এককগুলো মানগত ও গুণগত দিক থেকে এতটাই সমতা

www.eelm.weebly.com

বহন করে যে, একটির চেয়ে অন্যটির বিন্দুমাত্র তারতম্য থাকে না। এমন সমতার অধিকারী একক বিশিষ্ট বস্তু গণনা করে লেনদেন করা হলেও লেনদেনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে হয়। কারণ কমবেশিতে লেনদেন করলে অতিরিক্ত অংশের কোন বিনিময় আছে বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেহেতু এর প্রত্যেকটি একক চূড়ান্ত সমতার অধিকারী তাই একটি এক টাকার নোট দুইটি ১ টাকার নোটের বিপরীতে লেনদেন করা হলে, এক টাকার একটি নোট এক টাকার একটি নোটের বিনিময়ে হবে, কিন্তু অপর ১ টাকার নোটটির বিপরীতে কোন বিনিময় থাকবে না। কিন্তু যেসব পণ্যের এককসমূহের মাঝে গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্য আছে, সে ক্ষেত্রে ১টি এককের বিনিময়ে ২টি এককের লেনদেন করা হলে, দুটিকেই একটির বিনিময় বলে ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে। যেমন ১টি আমকে যদি দুটি আমের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে, একটি আম বড় ও সুমিষ্ট তাই একটি আমই দুটির সমান মূল্য বহন করে। কিন্তু টাকার ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। তাই একটিকে দুটির বিনিময়ে লেনদেন করা হলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।

সারা পৃথিবীর মুদ্রার মান যেহেতু ডলার দ্বারা নিরূপণ করা হয়, তাই সকল দেশের মুদ্রার প্রকৃত মান একই; সংখ্যায় যদিও তারতম্য হয় না কেন। অতএব সকল দেশের মুদ্রা মানগত দিক বিচারে সমজাতীয়। এহেন অবস্থায় মানগত তারতম্যের সাথে লেনদেন করলে তা ربو الفضل বা অতিরিক্ত প্রদানজনিত সুদ বলে গণ্য হবে; অতএব যদি বাংলাদেশী ৫০.০০ টাকা ১ ডলার হয়; আর সৌদী ৪ রিয়াল = ১ ডলার হয়, তাহলে সৌদি ৪ রিয়াল= বাংলাদেশী ৫০ টাকা হবে। এই মানের তারতম্য করলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। আর নগদ বাকিতে লেনদেন করলে তা ربا النسية বা সময়ের ব্যবধানজনিত সুদ বলে গণ্য হবে।

তবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের অত্যাবশ্যকীয়তার কথা চিন্তা করে তারা হুন্ডিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এহেন লেনদেনকে বৈধ রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের ব্যাখ্যাগুলোর সারমর্ম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

১. হুন্ডিকে করজ হিসেবে গণ্য করার ব্যাখ্যা ঃ

এ ব্যাখ্যার সার কথা এই যে, যিনি বিদেশে টাকা পাঠাবেন বা পাঠাতে চাচ্ছেন, তিনি মুদ্রা ব্যবসায়ীকে যেয়ে বলবেন যে, আমি ১০০ টাকা আপনাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করছি। আগামী মাসে আপনি আমাকে সৌদি আরবে এই টাকার সমমূল্যের সৌদি রিয়াল পরিশোধ করবেন। চুক্তির দিন যদি বাংলাদেশী ১০০ = ৪ রিয়াল হয়ে থাকে তাহলে তিনি নির্ধারিত তারিখে নির্ধারিত স্থানে উক্ত ব্যক্তিকে ৪ রিয়াল পাওনা পরিশোধ করে দিবেন। এভাবে করজ দিয়ে ভিন্ন মুদ্রায় করজ

www.eelm.weebly.com

আদায় করে নেয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিনিময় করা হবে। আর মূল্যসূচকের উঠানামার কারণে যদি মাঝ থেকে ব্যবসায়ীর কিছু লাভ হয়ে যায় তাহলে তা তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। যেমন ঋণ দেয়ার দিন যদি ১০০ টাকা = ২ ডলার; আর ২ ডলার = ৪ রিয়াল রেইট থেকে থাকে তাহলে সেই হিসেবে উক্ত ব্যক্তির পাওনা হবে ৪রিয়াল। কিন্তু পরিশোধের দিন যদি ১০০ টাকা = ৩ ডলার হয়ে যায়, আর রিয়ালের দাম অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে ৪ রিয়াল পরিশোধ করলে ব্যবসায়ীর দুই রিয়াল লাভ হয়ে যাবে। কারণ পরিশোধের দিন ৩ ডলারে রিয়াল পাওয়া যাবে ৩x২ = ৬টি। এই লাভ তার জন্য বৈধ হবে। কেননা কোন ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকা দিয়ে যদি মুনাফা কামায় তাহলে তার জন্য তা ভোগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়। যথা ঃ

ক. পূর্বে এই বিধানের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে, করজ যদি ভিন্ন মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ করতে হয় তাহলে পরিশোধের দিন ঐ পরিমাণ টাকা দিয়ে যে পরিমাণ ভিন্ন মুদ্রা পাওয়া যায়, তাই পাওনাদারকে পরিশোধ করতে হয়। আর যদি এই বিধান অনুসরণ করা হয় তাহলে ব্যবসায়ীর লাভবান হওয়ার আর কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এমতাবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে মুদ্রা লেনদেনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য লোক পাওয়া দুষ্কর হবে।

খ. অপর সমস্যা যেটি হয় তা হল, করজ দিয়ে তা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেয়ার শর্ত করার দ্বারা করজদাতার পথের দুর্যোগ এড়ানো এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে শংকামুক্ত হওয়ার সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিহিত থাকার সম্ভাবনা থাকে, যে কারণে এটি মাকরূহে তহরীমি হবে। কারণ এটি তখন (كل قرض جرنفعا فهوربوا) অর্থাৎ যে করজ দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায় থাকে তা সুদের পর্যায়ে পড়ে- এই বিধির আওতায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই ফিক্‌াহবিদরা একে سفتجه বা নিষিদ্ধ হুন্ডির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অবশ্য এর জবাব এভাবে দেয়া যায় যে, যদি পথের দুর্যোগ এড়ানোর সুবিধা গ্রহণের মানসিকতা না থাকে শুধুমাত্র টাকা অন্যত্র পৌছানোর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা سفتجه বা নিষিদ্ধ হুন্ডির অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও পথের দুর্যোগ এড়ানোর সুবিধা পৌছিয়ে দেয়ার শর্তের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়ে যাবে। কেননা দেশের অভ্যন্তরে নিজের পরিচিত পরিসরে কাউকে ঋণ দিলেও কিন্তু টাকা হিফাজতের সুবিধাটি মাঝ দিয়ে অর্জিত হয়েই যায়।

এ মতের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। একবার হযরত উমর (রা.) এর দুই ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ (রা.) এক সৈন্য

www.eelm.weebly.com

বাহিনীর সঙ্গে শিরিয়ার দিকে গমন করেছিলেন। ফিরার পথে তারা বসরায় নিযুক্ত গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) -এর সঙ্গে দেখা করেন। হযরত আবু মূসা (রা.) তাদেরকে বললেন যে, আমি এভাবে তোমাদের কিছুটা উপকৃত করতে চাচ্ছি যে, এখানে আমার নিকট বায়তুলমালের কিছু মাল রয়েছে- যা মদীনায় প্রেরণ করতে হবে। তোমরা তা আমার কাছ থেকে করজ নিয়ে নাও এবং তা দ্বারা ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে যাও। মদীনার বাজারে সেগুলো বিক্রি করে যা লাভ হয় তা রেখে মূল টাকা বায়তুলমালে জমা করে দিও। এভাবে সম্পদ কর্জ দিয়ে মদীনায় পাঠানোর মাঝ দিয়েও পথের দুর্যোগ এড়ানোর সুবিধা অর্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এটি মূল উদ্দেশ্য ছিল না, তাই হযরত আবু মূসা (রা.) এটিকে নিষিদ্ধ سفتجه -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মানুষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে এর প্রচলন থাকার কারণে, তদুপরি উভয় পক্ষ এ দ্বারা উপকৃত হয় ইত্যাদি দিক চিন্তা করে سفتجه কে বৈধ মনে করেছেন। আর প্রয়োজনে ভিন্ন মাজহাবের কোন ইমামের অভিমতের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদানের অবকাশ ফিকাহ শাস্ত্রে রয়েছে। তাই বর্তমান সমস্যার কথা চিন্তা করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টিকে বৈধ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। হযরত আ'তা থেকে বর্ণিত আছে যে,

كان ابن الزبير يأخذمن قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها الى مصعب بن الزبير بالعراق فياخذون بها منه فسئل عن ذالك ابن عباس فلم يري به بأسا–وفي شرح المهذب ان عبد الله بن الزبير كان يقترض ويعطي من اقرضه صحيفة يأخذ قيمتها من مصعب اخيه وواليه عن العراق–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় কোন কোন লোক থেকে দিরহাম গ্রহণ করতেন এবং এর বিনিময়ে তিনি ইরাকে অবস্থানরত তার ভাই মুস'আব ইবনে যুবায়েরকে চিঠি লিখে দিতেন। ইরাকে পৌঁছে তারা হযরত মুস'আব (রা.)-এর কাছ থেকে ঐ পরিমাণ মুদ্রা নিয়ে নিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেননি শরহে মুহাযযাব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাদের থেকে তা করজ হিসেবে গ্রহণ করতেন। যারা তাকে করজ দিত তাদেরকে তিনি একটি চিরকুট দিয়ে দিতেন, তা দ্বারা তারা সমপরিমাণ মূল্য ইরাকে গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত তার ভাই মুস'আব (রা.) থেকে আদায় করে নিত।

এ সকল বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, এরূপ অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে এক নগরের করজ অন্য নগরে আদায় করার মাঝে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তবুও এটি করজ দিয়ে তার সাথে শর্ত জুড়ে দেয়ার মত মনে হয়। তাই এ পদ্ধতিটি অনেকেই পছন্দ করেননি।

www.eelm.weebly.com

২. দুটি ভিন্ন চুক্তি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাখ্যা ঃ

এ ব্যাখ্যার সার কথা এই যে, বিষয়টিকে পৃথক পৃথক দুটি চুক্তিতে পরিণত করা। যথা ঃ ১. মুদ্রা বিনিময়ের চুক্তি। ২. বিনিময়কৃত মুদ্রা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার চুক্তি।

অর্থাৎ যিনি টাকা প্রেরণ করতে চাচ্ছেন তিনি প্রথমে মুদ্রা ব্যবসায়ীর সাথে মুদ্রা বিনিময়ের চুক্তি করবেন। যেহেতু সকল দেশের মুদ্রাই এক জাতীয় তাই বাকিতে ও কমবেশিতে লেনদেন বৈধ হবে না। অতএব এই শর্ত রক্ষা করেই লেনদেন করবেন। যেমন বাংলাদেশী ১০০০ টাকা দিয়ে তিনি ডলার ক্রয় করতে চাইছেন। ধরা যাক বাংলাদেশী ৫০ টাকা = ১ ডলার। তাহলে তার প্রাপ্য হবে ২০ ডলার। এমতাবস্থায় তিনি তার কাছ থেকে ডলার গ্রহণ না করে ২০ ডলারের একটি লিখিত সনদ গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশী ১০০০ টাকা পরিশোধ করে এই সনদ গ্রহণ করা দ্বারা লেনদেন নগদানগদী হয়েছে বলে ধরা যায়। কেননা ডলারের পরিবর্তে যে সনদটি সরবরাহ করা হবে তাও নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা বহন করে। তবে, পার্থক্য এই যে ডলার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত, আর ঐ সনদটি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তা ২০ ডলারের প্রতীক বটে। সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট তা ২০ ডলারের সমপরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা বহন করে। কারণ এই রশিদ দেখিয়ে ২০ ডলার পাওয়ার ব্যাপারটি এদের কাছে নিশ্চিত। অতএব যখন ১০০০ টাকার সাথে ২০ ডলার মূল্যমান বিশিষ্ট সনদের বিনিময় হয়ে গেল তখন যেন লেনদেন নগদানগদীই হয়ে গেল; যা সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বিতীয় চুক্তি এই মর্মে করা হবে যে, আমার এই সনদপত্রটি কিংবা এর সমমূল্যের ২০ ডলার অমুক শহরে আমাকে কিংবা আমার কোন প্রতিনিধিকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এজন্য শতকরা ৫ টাকা বা ১০ টাকা হারে তোমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। এই চুক্তি অনুসারে পারিশ্রমিক হিসেবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যা পাওনা হবে। (যেমন ৫ % হারে ১০০০ টাকায় ৫০ টাকা) তা তাকে আলাদাভাবে পরিশোধ করতে হবে কিংবা প্রদত্ত টাকা থেকে তার পারিশ্রমিক কর্তন করে রেখে অবশিষ্ট টাকার সমমূল্যের ডলার পরিশোধের চুক্তি করতে হবে। এই চুক্তি মুতাবিক যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত নগরীতে উক্ত ব্যক্তি বা তার মনোনিত প্রতিনিধিকে উক্ত সনদপত্র বা ২০ ডলার পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে পারিশ্রমিক হিসেবে যা অর্জন করবে তা তার জন্য বৈধ হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে, এই পারিশ্রমিক যা সে গ্রহণ করবে তা কোন ধরনের চুক্তির আওতায় ফেলে গ্রহণ করবে? এটি কি ইজারা ধরা হবে? না ওকালত(وكالة) হিসেবে গণ্য হবে? না হাওয়ালা কিংবা কিফালা (حوالة وكفالة) হিসেবে গণ্য করা হবে?

www.eelm.weebly.com

এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত এই যে, এটিকে ইজারা হিসেবে গ্রহণ করা যায় কেননা কোন একজন লোককে কোন একটি দ্রব্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য ভাড়ায় নিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ। এ ধরনের ভাড়ার নিয়োগ করা ব্যক্তির দায়িত্ব হল ঐ নির্দিষ্ট দ্রব্যটি যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বর্তমান মাসআলায় পৌঁছে দেয়ার বিষয় হল ২০ ডলারের মূল্যমান বিশিষ্ট ঐ সনদপত্র বা ২০ ডলার। যেহেতু মুদ্রা নির্ধারিত করণের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; তাই এই চুক্তির সার কথা হল ২০ ডলারের সমমান ক্রয় ক্ষমতা পৌঁছে দেয়া; তা ডলারের রশিদ পৌঁছানোর মাধ্যমেই হোক কিংবা ডলার পৌঁছানোর মাধ্যমেই হোক। কেননা ডলার ও তার রশিদ দুটোই ২০ ডলারের সমমান ক্রয়ক্ষমতার প্রতীক। কোনটিরই নিজস্ব কোন মূল্য নেই। তাই ডলার পৌঁছানো হোক কিংবা রশিদ পৌঁছানো হোক উভয় অবস্থায় যা পৌঁছানোর জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল (অর্থাৎ ২০ ডলারের সমমান ক্রয় ক্ষমতা) তা সে পৌঁছিয়েছে। অতএব সে শ্রমিক হিসেবে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হবে। তবে শরহে বিকায়ার টিকাকার আল্লামা ফাতহ্ মুহাম্মদ তায়েব (রাহ.) কিতাবুল হাওলায় হুন্ডি ও মানিঅর্ডার সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ টিকা উল্লেখ করেছে; যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি এটিকে হাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা তার আংশিক নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

واما الايصال تحل الاجرة عليه ويمكن العهدة عليه فلايلزم من النهي من سقوط الخطر كراهة اجرة الايصال ولكن الاشكال في تصويره وتقريره اعني في اي عقد يحسب هي ليأخذ حكمه قلت انها حوالة وانت تعلم ان الحوالة قد يكون بمعني الوكالة . . . . وقد يأخذ من المحيل ثم يودي الي المحتال له وقد يربح في المال الذي اخذ من المحيل ويكون الربح حلالا له كما مر في الكفالة فاذا دفع المحيل مالاالي المحتال عليه وقال ادفعه الي فلان في البلد الفلاني ولك اجرة في ايصاله وحسابه فاي محذور يلزم ليحكم بالمنع ولا رواية ان الوكيل او المحتال عليه حرام عليه الاجرة والاخذ من موكل والمحيل ان عمل فيه عملا فلا بأس ان شاء الله سيمافي هذا الزمان ان نجزم بمنعه تعطلت الامور وكسدت التجارة وانقلبت الاحوال من اليسر الي العسر

পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তা বৈধ হবে। এজন্য দুই পক্ষের মাঝে চুক্তিও হতে পারে। সুতরাং পথের প্রতিসংকুলতা এড়ানোর সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মুদ্রা পৌঁছে দেয়ার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ হবে না। তবে পারিশ্রমিকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা হবে অর্থাৎ এটিকে কোন ধরনের চুক্তির আওতাভূক্ত করে তার

www.eelm.weebly.com

ভিত্তিতে বিধিবিধান কার্যকর করা হবে এটিই মূলতঃ প্রশ্নের বিষয়। আমি মনে করি এটি 'হাওয়ালা'[১] (বা দায়িত্ব অন্যের স্কন্ধে ন্যস্ত করা) -এর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে আর এ কথা সর্বজন বিধিত যে, 'হাওয়ালা' কখনো কখনো 'ওকালাত' বা কারো প্রতিনিধিত্ব করার অর্থও পরিগ্রহণ করে। ...... কখনও কখনও যিনি দায়িত্ব অর্পণ করেন তার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে নেয়া হয় এবং যাকে পৌছানোর জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরে তাকে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু দায়িত্ব প্রদানকারী থেকে টাকা গ্রহণ করার পর নির্ধারিত ব্যক্তিকে পৌছানোর আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ঐ টাকা দিয়ে কোন মুনাফা অর্জন করে তাহলে তা তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। যার বিবরণ 'কিফালাহ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অতএব দায়িত্ব প্রদানকারী যদি দায়িত্বে নিয়োগকৃত ব্যক্তির হাতে টাকা অর্পন করে বলেন যে, এই টাকা অমুক শহরে অমুক ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দিও, এ দায়িত্ব পালনের জন্য তুমি হিসাবানোসারে পারিশ্রমিক পাবে, তাতে এমন কি অসুবিধা রয়েছে যে, একে নিষিদ্ধ বলা হবে? অথচ এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, প্রতিনিধি বা দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তি পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না কিংবা তাকে যিনি প্রতিনিধি বা দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন তার নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করলে তা হারাম হবে। যদি এ জন্য সে কোন শ্রম দিয়ে থাকে তাহলে সে জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তাতে কোন অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে বর্তমান যুগে আমরা যদি এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি তাহলে সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যবসা বাণিজ্য অচল হয়ে পড়বে এবং একটি সহজ বিষয়কে জটিলতার দিকে ঠেলে দেয়া হবে।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, আল্লামা ফাত্হ্ মুহাম্মদ তায়েব (রহ.)-এর অভিমত অনুসারে মানিঅর্ডার, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফট, ট্রেভেল চেক ইত্যাদি সব কিছুই হাওয়ালার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে।

---

১. হাওয়ালা বলা হয় কারো উপর যে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা অন্যের উপর ন্যস্ত করা অর্থাৎ দায়িত্বভার অন্যের উপর বর্তিয়ে দেয়া। আর কিফালা বলা হয় অন্যের দায়-দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে উঠিয়ে নেয়া।

www.eelm.weebly.com

একাদশ অধ্যায়

ব্যাংক

ব্যাংকের সংজ্ঞা ঃ

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আর.পি.ক্যান্টের মতে ব্যাংক এমন প্রতিষ্ঠান যা ঋণের কারবার করে এবং মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারে।

ইম্পেরিয়াল ডিকশনারীতে ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে যে, ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা অর্থের ব্যবসায় নিরত। নিজ দায়িত্বে টাকা জমা রাখে, অর্থ প্রচার করে, ঋণ মঞ্জুর করে, বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূল্য স্থানান্তর করে।

আল্লামা তকী উসমানী ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, ব্যাংক এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় যা মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজির সংকটে নিপতিত ব্যক্তিদেরকে কর্জ প্রদান করে থাকে। আজকাল আধুনিক ব্যাংকগুলো ব্যাংকে টাকা আমানতকারীদেরকে স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। পক্ষান্তরে কর্জ গ্রহীতার কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করে এবং থাকে। এতে যে মধ্যস্বত্ত্ব লাভ হয় তাই ব্যাংকের মুনাফা বলে গণ্য হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে আমরা ব্যাংকের সংজ্ঞা এভাবে দিতে পারি যে, ব্যাংক অর্থের লেনদেনকারী এমন এক মধ্যস্বত্ত্বভোগী প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত, উচ্ছিষ্ট ও নিষ্ক্রীয় পুঁজিসমূহ সংগ্রহ করতঃ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা ও পুঁজির প্রত্যাশী ব্যক্তিদেরকে উচ্চ সুদ বা লাভের শর্তে ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে এবং নোট ও চেকের প্রচলন দান, অর্থ সংরক্ষণ, বিল বাট্টা করণ, অর্থ স্থানান্তর ও অর্থ সংক্রান্ত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে মুনাফা অর্জন করে থাকে।

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ঃ

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইতালীয় ভাষার (Banco) ব্যাংকো শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি; ইতালীয় ভাষায় যার অর্থ হল বেঞ্চ বা লম্বা টুল। প্রাচীনকালে ইতালীর লোম্বার্ডিতে বসবাসরত ইয়াহুদী ব্যবসায়ীরা লম্বা টুলে বসে অর্থ লেনদেন, মুদ্রা বিনিময় ও ঋণের ব্যবসা করত। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং কার্যাবলী যেহেতু সেই টুলের ব্যবসারই সংস্কারকৃত রূপ, তাই (Banco) শব্দ থেকেই (Bank)

www.eelm.weebly.com

শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইতালীয় (Monte) কিংবা জার্মানীয় (Banke) শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন ভ্যানিসে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার জনগণের কাছ থেকে এক ধরনের বিশেষ ঋণ গ্রহণ করত এই ঋণকে জার্মানী ভাষায় (Banke) ও ইতালীয় ভাষায় (Monte) বলা হত। এই ঋণ গ্রহণের সরকারি ব্যবস্থাপনাই ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা করেছে বলে তারা মনে করেন। সুতরাং তাদের মতে ব্যাংক শব্দটি (Banke) বা (Monte) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যে শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বর্তমানে অর্থলেনদেন, ঋণদান ও মুদ্রা বিনিময়ের কাজে নিরত প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংক বলা হয়।

ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব না হলেও এ ব্যাপারে সকল জ্ঞানীজনরাই একমত যে, যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্রম বিকাশের মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যেহেতু মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষ অর্থের লেনদেনের মুখাপেক্ষী হয়েছে, অতএব অর্থ সংরক্ষণ, মুদ্রাবিনিময়, ঋণ দান ও গ্রহণের সূচনাও তখন থেকেই হয়েছে। তাই ব্যাংকিং কার্যক্রম বলতে যা বুঝায় তা অতি ক্ষুদ্র পরিসরে কোন না কোনভাবে সেকালেও বিদ্যমান ছিল বলা যায়। বিশেষ করে তখনকার মানুষের জীবনযাপনের মান ছিল খুবই অনুন্নত। সাধারণতঃ তারা কাঁচা ঘরে বসবাস করত; যেগুলোর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। যে কারণে সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চিত সম্পদ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করত না। তখন ধর্মীয় নেতারাই সমাজের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ছিল এবং উপাসনালয়গুলো দস্যু ও লুটেরাদের থেকে নিরাপদ ছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নেতাদের নিকট নিজেদের ধন-সম্পদ আমানত রাখাকে নিরাপদ মনে করত। তাছাড়া সমাজের সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণী যাদের ঘরবাড়ী অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ছিল; তাদের মাঝে যাদেরকে লোকেরা বিশ্বস্ত মনে করত তাদের কাছেও ধন-সম্পদ আমানত রাখত। বিশেষ করে সমাজে যারা স্বর্ণালংকারের ব্যবসা করত তাদেরকে স্বর্ণালংকারের নিরাপত্তার জন্য সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথা লোহার সিন্ধুক, মজবুত আলমিরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হত। স্বর্ণকারদের মাঝে যারেদকে মানুষ বিশ্বস্ত মনে করত, তাদের কাছে টাকা পয়সা আমানত রাখাও অধিক নিরাপদ বলে মনে করা হত। স্যাকরা বা স্বর্ণকারদের কাছে যখন মানুষ ব্যাপকভাবে টাকা পয়সা আমানত রাখতে শুরু করে তখন প্রত্যেকের

www.eelm.weebly.com

জমাকৃত টাকার পরিমাণ, মেয়াদ ইত্যাদি মনে রাখার সুবিধার জন্য তারা লিখিত (ক্ষেত্র বিশেষে মোহরাঙ্কিত) রশিদ দিয়ে দিত। ক্রমান্বয়ে তাদরে দেয়া এসব রশিদ জনগণের নিকট পরিচিত হয়ে যাওয়ার কারণে এগুলোর বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত হয়ে যায়। ফলে প্রয়োজনে ঐ রশিদের বিনিময়ে সমমানের পণ্য ক্রয় করতে চাইলেও বিক্রেতারা পণ্য বিক্রয় করতে সম্মত হয়ে যেত। কেননা ঐ রশিদের বিনিময়ে মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত ছিল। এভাবে স্বর্ণকারদের রশিদের বিনিময়ে লেনদেন ব্যাপকতা লাভ করে। তাই বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে ঐ রশিদের টাকা স্বর্ণকারদের থেকে উঠিয়ে আনার তেমন প্রয়োজন কেউ মনে করত না। স্বর্ণকাররা যখন দেখল যে, তাদের দেয়া রশিদের টাকা কেউ উঠাতে আসছে না তখন সেই টাকা তারা অন্যদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতে শুরু করে। অনেক সময় টাকা না থাকলে তারা ঋণ প্রার্থীদেরকেও রশিদ দিয়ে দিত। এভাবে স্বর্ণকাররা টাকা পয়সার লেনদেনের মধ্য দিয়ে বিনাপুঁজিতে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী স্বর্ণের মূল ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। অর্থ লেনদেনের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জনের এই প্রবণতা থেকেই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে যতটুকু জানা যায়, তাতে এই ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর উদ্যোগে ৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে রোমে সর্বপ্রথম যৌথ ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তিতে বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজক, মহাজন, ব্যবসায়ী, স্বর্ণকার, সাহুকার, সাররাফ, চেটি, শেঠ ও কাবুলীওয়ালাদের সহায়তা ও অবদান রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, এদের কার্যাবলী ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত ও সুগঠিত হয়ে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে।

১১৫০ সালে ভ্যানিসে ৫% সুদের হারে ঋণ দানের প্রচলন শুরু হয়। সরকারি উদ্যোগে ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভ্যানিসে ব্যাংক অব ভ্যানিস গড়ে উঠে। ১১৭৮ সালে জেনেভায় বনিকদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠে ব্যাংক অব সেনজির্জিও। অতঃপর বার্সেলোনায় ১৪০১ সালে গড়ে উঠে ব্যাংক অব বার্সেলোনা। ১৪০৭ সালে ব্যাংক অব জেনোয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮৪ সালে ভ্যানিসে (Bankco di Rialto) নামে একটি গণব্যাংক স্থাপিত হয়। ১৬০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক অব আমস্টারডাম। এ ব্যাংক আমানতকারীদেরকে তাদের আমানতের বিনিময়ে এক ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করত; যা দিয়ে ঐ ব্যাংক থেকে টাকা উঠানো যেত। এটিই পরবর্তীতে চেক-এর রূপ লাভ করে। ১৬৫৬ সালে সুইডেনে রিকস ব্যাংক অব সুইডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে হামবুর্গে একটি বিনিময় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.eelm.weebly.com

মধ্যযুগে স্বর্ণকার ও মহাজন শ্রেণী ব্যাংক ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থের মালিক বনে যায়। ফলে তারা জনগণকে সুদের ভিত্তিতে ঋণদানকারি রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি তখন তারা সরকাকেও অর্থ সংকটের মুকাবেলা করার জন্য ঋণদান করত। তখন সরকারি টাকশালে স্বর্ণকারদের স্বর্ণ ও টাকা জমা হত। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস-এর সাথে ঋণের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিলে লন্ডন টাওয়ারে জমাকৃত স্বর্ণকারদের স্বর্ণ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে আটক করে রাখা হয়। ফলে তারা স্বর্ণের ব্যবসা ত্যাগ করে লাভজনক ব্যাংক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। তাদেরই উদ্যোগে রয়াল চার্টারের আওতায় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুলাই ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের সূচক বলে মনে করা হয়। এ ব্যাংকে নিকাশ ঘর কার্যক্রমের প্রথম সূচনা হয়।

ভারত বর্ষে মোঘল আমল পর্যন্ত মহাজন শ্রেণীর হাতে প্রাচীন প্রথায় ব্যাংকিং কার্যক্রম চলেছে। এরা তখন শেঠ, চেটি, সাররাফ, মাড়ওয়ারী, কাবুলীওয়ালা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। মোঘল আমলে মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসায় ফতেহ চাঁদ যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার মুদ্রা ব্যবসা সম্প্রসারিত ছিল। এ কারণে সম্রাট ফররুখ সিয়ার তাকে জগৎ শেঠ বা বিশ্ব ব্যাংকার বলে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজরা এ দেশে আসার পর 'এজেন্সী হাউস' নামে ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হয়। এ সময় বেশ কিছু এজেন্সী হাউস গড়ে উঠে। পরে 'আলেকজান্ডার এন্ড কোং' এজেন্সী হাউসের উদ্যোগে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'। ১৯৩৪ সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় দেশে বিদ্যমান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ করে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে এগুলোর বেশ কয়েকটিকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দিকে এসে সারাবিশ্বে ব্যাংক ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংকগুলোই নির্ভরযোগ্যতার একমাত্র প্রতীক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা ঃ

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ও বায়তুলমাল ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলামে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা হয়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর

www.eelm.weebly.com

আমলে হযরত আবু উবায়দাহ (রা.)কে এর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে বায়তুলমালে প্রাচুর্য দেখা দেয়। আধুনিক ব্যাংক ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনেক কিছুই সেই বায়তুলমাল থেকে আঞ্জাম দেয়া হত। বায়তুলমাল বলতে গেলে তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করত। যথাঃ

১. রাষ্ট্রীয় সম্পদ বায়তুলমালে সংরক্ষিত থাকত।
২. মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রা প্রচলনের মঞ্জুরী দান ও মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা হত।
৩. জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হত।
৪. বিনাসুদে ঋণ দান করা হত।
৫. উৎপাদনী ব্যবসায় ঋণ সরবরাহ করা হত। এসকল কাজ হযরত ওমর (রা.)-এর আমলে বায়তুলমাল থেকে আঞ্জাম দেয়া হত।

অবশ্য ঋণ নিয়ে তাদ্বারা উপকৃত হওয়ার বা অর্থ সম্পদ কামানোর যে মানসিকতা থেকে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে; ইসলাম সেই মানসিকতাকে স্বমূলে উচ্ছেদ করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। কাজেই আধুনিক ব্যাংকিংয়ের কোন সূত্র ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। এটি মুলতঃ ইসলামের ব্যর্থতা নয় বরং নিজস্ব স্বকীয়তার উপর টিকে থাকার উদ্যোগ।

সমাজের মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য সাময়িক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজনের কথা ইসলাম কেবল স্বীকারই করেনি বরং এ ধরনের প্রয়োজনে এক মুসলমান আরেক মুসলমান ভাইকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য ইসলাম ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং এহেন ব্যাক্তিদেরকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করাকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। এ ধরনের ঋণ দানকে আল্-কুরআনে আল্লাহকে ঋণ দানের সমার্থক বলে আখ্যায়িত করে এর প্রতিদান হিসেবে দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

ومن يقرض الله قرضا حسنا يضا عفه له

কে আছে এমন যে আল্লাহকে করযে হাছানাহ প্রদানকরবে; বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রদান করবেন।

মানুষকে সাময়িক প্রয়োজনে ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে লাভবান হওয়ার মাসিকতাকে ইসলাম জঘন্য মানসকিতা বলে মনে করে এবং এ পন্থায় উপার্জিত লাভকে ইসলাম সুদ বলে ঘোষণা করেছে। এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন- كل قرض جر نفعا فهو ربوا প্রত্যেক ঐ করজ যা কোনভাবে উপকৃত হওয়ার পথ উন্মোক্ত করে তা সুদ বলে গণ্য হবে। এ জন্যই ইসলাম করযে হাসানার মাধ্যমে মানুষের সাময়িক প্রয়োজন মিটানোর মানসিকতাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। এ ধরনের করযদানকে ইসলাম কল্যাণকর

www.eelm.weebly.com

কাজসমূহের অন্যতম কাজ বলে মনে করে। এমনকি সম্পূর্ণরূপে কাউকে দান করে দেয়ার চেয়ে করয প্রদানের গুরুত্ব বেশী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ পন্থায় ইসলাম সমাজের মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার এক অনুপম আদর্শ প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে সহযোগিতার নামে তার সম্পদকে সুদ রূপে গ্রাস করার কসাইসুলভ মানসিকতাকে ইসলাম চিরতরে খতম করে দিতে চেয়েছে। অনুরূপভাবে নিরাপত্তার প্রশ্নে কারো অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং যথাসময়ে যার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার এই নিঃস্বার্থ খিদমাত আঞ্জাম দেয়াকে আমানতদারীর মহৎ গুণ বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এ জন্যও পরকালীন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলতঃ যে দুটি মৌলিক কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা থেকে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে, ইসলাম সে দুটি মৌলিক কাজ পার্থিব জীবনে কোনরূপ সুযোগ গ্রহণ না করে আখেরাতের পুরস্কারের বিনিময়ে মুফতে করে দেয়ার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং আধুনিক ব্যাংকের সূচনা কোন ইসলাম প্রিয় ব্যক্তি থেকে হওয়ার কল্পনাই করা যায় না।

অবশ্য পরবর্তীতে বিক্ষিপ্ত পুঁজিকে একত্রিত করে বৃহৎ মানের কর্মোদ্যোগ গ্রহণের যে কাজ ব্যাংক আঞ্জাম দিচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংক যে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে শিরকাত ও মুদারাবার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সূচনাকাল থেকেই ইসলাম এগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করে রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে শোষণমুক্ত বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। বাণিজ্য ও মুদ্রা অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করেছি। পূর্ববর্তী মনিষীগণের ফিকাহ গ্রন্থে এসবের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা তার সুদৃঢ় ভীত রচনা করে। এ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়ার কারণে ইসলামী মনিষীরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে তেমন একটা তৎপরতা চালাননি। ফলে আধুনিক ব্যাংক নিতান্ত প্রয়োজনীয় যেসব কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী শারইয়্যাহ-এর আলোকে সুদমুক্ত পন্থায় এসব কল্যাণকর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো কিভাবে আঞ্জাম দেয়া যায় তার বিকল্প উদ্ভাবনের জোরালো কোন চেষ্টাও হয়নি। ইত্যবসরে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশ্ববাজার দখল করে নেয় এবং সুদভিত্তিক জঘন্য শোষণের এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত হয়ে পড়ে। তদুপরি সুকৌশলে আন্তর্জাতিক লেনদেনকে ব্যাংকের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেয়া হয় যে, সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাই বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থার একমাত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে যায়।

www.eelm.weebly.com

বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সারাবিশ্বে ইসলামের নবজাগরণের সূচনা হয়। এ সময় মুসলমানদের মাঝে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু ততদিনে সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা সারাবিশ্বকে এমন ভাবে গ্রাস করে নেয় যে, সুদের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সুদের এই সর্বগ্রাসী থাবা থেকে বেরিয়ে আসার চেতনা থেকেই সুদমুক্ত ব্যাংক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এবং বিশ্বব্যাপী এর চিন্তা ভবনা চলতে থাকে। সে চিন্তার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মিশরের অধিবাসী আল্লামা আহমেদ আল্-নাগগারের প্রদত্ত রূপরেখার উপর ভিত্তি করে ১৯৬০ সালে মিশরের মিটগামারে 'সেভিংস ব্যাংক' নামে বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান ইসলামী পদ্ধতির আলোকে মিশরে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এসকল ব্যাংক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রের মুখে মিশর সরকার এসব ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। ১৯৭২ সালে পুনরায় 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' নমে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান মিশরে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম শুরু করে। এ সময় অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পৃথক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। ফলে ১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (O.I.C)-এর জিদ্দায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে এতদসংক্রান্ত রিপোর্টের উপর পর্যালোচনার পর ইসলামী নীতিমালার আলোকে একটি পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (I.D.B) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আই.ডি.বি'-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামী দেশগুলোর মাঝে জোরালো অর্থনৈতিক বন্ধন সৃষ্টি করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার বাস্তবায়ন করা, মুসলিম দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করা। আই.ডি.বি'-এর প্রচেষ্টায় মুসলিম দেশগুলোতে সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে দুবাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক', ১৯৭৭ সালে কুয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' সুদানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফয়সল ইসলামী ব্যাংক' এবং মিশরেও প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফয়সল ইসলামী ব্যাংক'। ১৯৭৮ সালে জর্ডানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জর্ডান ইসলামী ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট'। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের সকল ব্যাংককে

www.eelm.weebly.com

সুদমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৭ সালে আল্-বারাকা ব্যাংক, ১৯৯৫ সালে 'আল্-আরাফা ইসলামী ব্যাংক' ও 'সোসাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক' নামে আরো তিনটি ব্যাংক বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে প্রায় ২৪৩টি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদমুক্ত অর্থ লেনদেনের কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগ

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংককে সাধাণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. সরকারি ব্যাংক
২. বেসরকারি ব্যাংক
৩. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক

যেসকল ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিংবা সরাসরি সরকারের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয় সে সকল ব্যাংককে বলা হয় সরকারি ব্যাংক। সরকারি ব্যাংককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২. সাধারণ ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক। আর যেসকল ব্যাংক সারাসরি সরকারের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলী আঞ্জাম দেয় সেগুলোকে বলা হয় সাধারণ সরকারি ব্যাংক। যেমন- জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ইত্যাদি।

যেসকল ব্যংক বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় বেসরকারি ব্যাংক। যেমন- সিটি ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি।

বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. তফসিলী ব্যাংক
২. অতফসিলী ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংক গুলোকেই তফসিলী ব্যাংক বলা হয়। আর যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয় সেগুলোকে বলা হয় অতফসিলী ব্যাংক। কোন দেশের সকল ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত থাকা অপরিহার্য নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি ব্যাংককে তার তালিকাভুক্ত করে থাকে। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে।

www.eelm.weebly.com

তফসিলী অফতসিলী নির্বিশেষে সকল বেসরকারি ব্যাংককে মালিকনাভেদে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ

১. এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যাংক
২. অংশীদারী ব্যাংক
৩. যৌথ মালিকানাধীন (কোম্পানী ধরনের) ব্যাংক।

যে ব্যাংকের একজন মাত্র মালিক থাকে তাকে বলা হয় একক মালিকানাধীন ব্যাংক। আর যে ব্যাংক অংশীদারী কারবারের আইনের অধীনে ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে অংশীদারী ব্যাংক বলে। আর যে ব্যাংক কোম্পানী আইনের আওতায় ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। অংশীদারী ব্যাংকে ২ থেকে ১০ জন পর্যন্ত অংশীদার থাকতে পারে। আর যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংকের অংশীদার অনেক হতে পারে। যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক দু'ধরনে হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকনা।
২. শুধুমাত্র বেসরকারি যৌথ মালিকানা।

যে সকল ব্যাংক সরকার ও নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক। যেমন-উত্তরা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

আর যে সকল ব্যাংক কেবলমাত্র নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক। যেমন-সিটি ব্যাংক, আল্-আরাফা ব্যাংক ইত্যাদি।

আর যেসকল ব্যাংক সরকারি বিশেষ আইনের অধীনে গঠিত অথচ স্বনিয়ন্ত্রিত সে গুলোকে বলা হয় স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। যেমন- কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি।

একটি দেশে যতগুলো ব্যাংক গড়ে তার উঠে সবগুলোর পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ধরণ এক হয় না এবং সেগুলোর কার্যক্রম ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যও এক রকম হয় না। লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ব্যাংকিং কাজের ধরণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যাংককে বহু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
খ. শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank)
গ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Smol Indistry Bank)
ঘ. কৃষি ব্যাংক (Agricultural Bank)
ঙ. গ্রামীণ ব্যাংক (Villag Bank)

www.eelm.weebly.com

চ. সমবায় ব্যাংক (Co-operative Bank)

ছ. বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank)

জ. বিনিময় ব্যাংক (Irnagaction Bank)

ঝ. সঞ্চয়ী ব্যাংক (Saving Bank)

ঞ. গৃহায়ন ব্যাংক (House Building Financial Bank)

ট. উন্নয়ন ব্যাংক (Development Bank)।

কর্ম অঞ্চলের ভিত্তিতে ব্যাংককে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. দেশীয় ব্যাংক
২. বিদেশী ব্যাংক
৩. আঞ্চলিক ব্যাংক
৪. আন্তর্জাতিক ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশীয় উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে স্বল্প পরিসরে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বলা হয় দেশীয় ব্যাংক। আর দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত যে ব্যাংক সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানায় গঠিত তাকে বলা হয় বিদেশী ব্যাংক। যথা- গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, হাবীব ব্যাংক ইত্যদি। আর যে ব্যাংক কোন বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে তাকে বলা হয় আঞ্চলিক ব্যাংক। আঞ্চলিক ব্যাংক একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন- রাজশাহী উন্নয়ন ব্যাংক, আবার আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠতে পাওে। যেমন এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (A.D.B), ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যংক (I.D.B) ইত্যাদি।

ব্যাংকের কার্যাবলী

ব্যাংকের কার্যাবলীকে মৌলিকভাবে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. আমানত গ্রহণ বা মূলধন সংগ্রহ
২. সঞ্চিত মূলধন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা
৪. মুদ্রা বিনিময় ও বিল বাট্টা করণ
৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি করণ

১. আমানত গ্রহণ ঃ

মানুষের নিকট সঞ্চিত বিক্ষিপ্ত নিষ্ক্রিয় মূলধনসমূহকে সংগ্রহ করে লাভজনক বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত করে রাখা ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

www.eelm.weebly.com

তাই ব্যাংকগুলো মানুষকে ব্যাংকে টাকা জমা রাখার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করে। ব্যাংকের নিকট জমাকৃত টাকা আমানতকারীরা যাতে প্রয়োজন মাফিক উত্তোলন করতে পারে সেজন্য ব্যাংক টাকা জমা করার বিভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে; যাতে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন বুঝে সুবিধাজনক খাতে টাকা জমা রাখতে পারে। সাধারণতঃ ব্যাংকগুলোতে টাকা জমা করার জন্য চার ধরনের হিসাব খোলা যায়। যথা ঃ

১. চলতি হিসাব (CURRENT A/C)
২. সঞ্চয়ী হিসাব (SAVINGS A/C)
৩. মেয়াদী হিসাব (FIXED DEPOSIT A/C)
৪. বিশেষ নোটিশ হিসাব (SPECIAL NOTICE DEPOSIT A/C)

চলতি হিসাব ঃ যে হিসেবে জমাকৃত টাকা চাহিবা মাত্রই উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতঃ একটি ন্যূনতম পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়। এ হিসাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. এ হিসাবের টাকা চাহিবা মাত্রই ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য। এই হিসাবের টাকা ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারবে না। তাই চলতি হিসেবে টাকা আমানতকারীকে কোন রূপ লাভ বা সুদ প্রদান করা হয় না।

খ. আমানতকারী ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দিতে বা উত্তোলন করতে পারে।

গ. যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নামে এ হিসাব খোলা যায়।

ঘ. সাধারণতঃ বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান-যাদের যখন তখন টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন হয় তাদের জন্য এ হিসেবে টাকা জমা রাখা সুবিধাজনক।

ঙ. চেক, বিনিময় বিল, হুন্ডি এবং ঋণপত্র এই হিসাবের মাধ্যমে ভাঙ্গানো ও আদান-প্রদান করা যায়।

চ. এই হিসাবের চেক দিয়ে নগদ দেনা পরিশোধ করা যায়। ফলে টাকা বহনের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।

ছ. এ হিসাব যিনি খুলেন প্রয়োজনে তিনি জমাতিরিক্ত টাকা তুলতে পারেন। তবে সে জন্য সুদ দিতে হয়।

জ. এ হিসাবের মাধ্যমে টাকা সহজে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়। এ জন্য বৈদেশিক লেনদেন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবে চলতি হিসাবই ব্যবহার করা হয়।

www.eelm.weebly.com

সঞ্চয়ী হিসাব ঃ যে হিসাবের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বা স্থির আয়ের মানুষ অল্প অল্প করে পুঁজি সঞ্চয় ও তৎসঙ্গে মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতঃ একটি ন্যূনতম পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. সঞ্চয়ী হিসেবে জমাকৃত সম্পূর্ণ টাকা চাহিবা মাত্রই উত্তোলন করা যয় না। ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের বেশী অংকের টাকা উঠাতে হলে সাতদিন পূর্বে ব্যাংককে নোটিশের মাধ্যমে অবগত করতে হয়।

খ. সপ্তাহে দু'বারের বেশী টাকা উত্তোলন করলে কিংবা বিনা নোটিশে নির্ধারিত অংকের বেশী টাকা উত্তোলন করলে ঐ মাসের স্থিতির উপর কোন লাভ বা সুদ দেয়া হয় না।

গ. শুধুমাত্র ব্যক্তির নামে কিংবা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামে এই হিসাব খোলা যায়।

ঘ. এই হিসাবের টাকা ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারে বিধায় এই টাকা দেশের মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

ঙ. সঞ্চয়ী হিসেবে জমাকৃত টকার লাভ বা সুদ দেয়া হয়। বছরে দুই বার এই লাভ বা সুদ দেয়া হয়।

চ. এই হিসেবে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করা যায়।

ছ. আমানতকারীর হিসাবের সুবিধার জন্য পাস বই বা কম্পিউটারে হিসাবের বিবরণী সরবরাহ করা হয়। ফলে আমানতকারী তার জমার পরিমাণ সহজেই জানতে পারে।

জ. এ হিসেবে জমাতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের কোন অবকাশ থাকে না অর্থাৎ ঋণ লাভের কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী হিসাব চালু করেছে। যেমন ডিপোজিট পেনশান স্কীম, ফরেন কারেন্সী স্কীম, ডাক ঘর সঞ্চয়ী হিসাব ইত্যাদি।

মেয়াদী হিসব ঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার নিমিত্তে যে হিসাব খোলা হয় তাকে মেয়াদী হিসাব বলে। ৩ মাস, ১২ মাস, ২৬ মাস বা তার চেয়ে অধিক যে কোন মেয়াদের জন্য এই হিসাব খোলা যায়। ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতঃ নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রদেয় টাকা নগদ জমা দিয়ে এ হিসাব খুলতে হয়। জমাকৃত টাকার বিপরীতে ব্যাংক আমানতকারীকে স্থায়ী হিসাবের একটি রসিদ সরবরাহ করে। এ হিসাবের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক. এ হিসাবের টাকা নগদ প্রদান করতে হয়। চেক বা ড্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে জমা গ্রহণযোগ্য হয় না।

www.eelm.weebly.com

খ. এ হিসেবে জমাকৃত টাকার উপর সুদ বা লাভ মেয়াদের ভিত্তিতে কমবেশী দেয়া হয়। মেয়াদ বেশী হলে সুদ বা লাভের হার বেশী হয়, কম হলে কম হয়।

গ. এ হিসাব থেকে যদি নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা উঠানো হয় তাহলে মোট লাভ বা সুদ থেকে ৬ মাসের সুদ বা লাভ কর্তন করা হয়। তবে এ হিসাবের মালিক জমাকৃত টাকার ৮০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। যার জন্য সুদ দিতে হয়।

ঘ. মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর চুক্তি নবায়ন করা যায়। তখন মূল টাকা ও লভ্যাংশ দুটোই মূল জমা ধরে সুদ দেয়া হয়। চুক্তি নবায়ন করা না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর টাকা যতদিন ব্যাংকে জমা থাকে সে সময়ের জন্য কোন সুদ বা লাভ দেয়া হয় না।

ঙ. এ হিসেবে জমাকৃত টাকার মুনাফা থেকে ১০% হারে সরকারি ট্যাক্স কর্তন করে রাখা হয়।

চ. এ হিসাবের টাকা ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে এ হিসাবের টাকা দেশের মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

বিশেষ নোটিশ হিসাব (S.T.D) ঃ এই হিসেবে ৭ থেকে ৮৯ দিনের মাঝে যে কোন মেয়াদের জন্য টাকা জমা রাখা যায়। এ হিসেবে সুদ বা লাভের হার খুবই কম। টাকা উঠানোর জন্য কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়।

পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব (D.P.S) ঃ এ হিসেবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে যেতে হয়। নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এককালীন বা কিস্তিতে টাকা উঠানো যায়। এ জমার বিপরীতে লাভ বা সুদ দেয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হিসাব আজকাল ব্যাংকে খোলা যায়। যথা ঃ ঋণ হিসাব, বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বীমাসঞ্চয়ী হিসাব, অনাবাসী হিসাব ইত্যাদি।

২. বিনিয়োগ

ব্যাংকের তহবিল মূলতঃ উদ্যোক্তাদের পরিশোধিত মূলধন, বিভিন্ন জনগণের আমানতকৃত টাকা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংগৃহীত ঋণ এই তিন পদ্ধতিতেই সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া আমানতকারীদের যে লভ্যাংশ তারা উত্তোলন করে না এবং লভ্যাংশ থেকে যে অংশ রিজার্ভ ফান্ড হিসেবে ভবিষ্যতের ঘটনা দুর্ঘটনার মুকাবেলা করার জন্য কেটে রাখা হয় সেগুলোও ব্যাংকের তহবিল গঠনে কাজে লাগে।

সংগৃহীত মূলধন ব্যাংক কোথায় কিভাবে বিনিয়োগ করে

তফসিলী ব্যাংকসমূহকে তার পরিশোধিত মূলধন ও আমানতকারীদের জমাকৃত টাকা ইত্যাদি মাধ্যম থেকে সংগৃহীত মূলধনের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা

www.eelm.weebly.com

রাখতে হয়। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগরিকদের অর্থ সম্পদ সংরক্ষণের জিম্মাদার এ কারণে আমানতকারীদের নিরাপত্তার জন্য আমানতকৃত টাকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নিকট সংরক্ষিত রাখে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে শতকরা কত টাকা জমা রাখতে হবে তা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বিচার বিশ্লেষণ করে এবং সরকারের নীতিনির্ধারণী অর্ডিনেন্সসমূহের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে সকল মেয়াদী ও তলবী দায়ের ৫% কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এই সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে সপ্তাহান্তে বৃহস্পতি বারে হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়। (তবে পাকিস্তানের তফসিলী ব্যাংক সমূহকে ৪০% স্টেইট ব্যাংকে জমা করতে হয়)। সরকারি প্রয়োজনে অনেক সময় এই নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী টাকা (ট্রেজারি বিল, সঞ্চয় পত্র, প্রাইজবন্ড, আয়কর বন্ড, সিকিউরিটি পত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে হলে তার জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষিত সকল টাকাই Liquidity Reserve বা তরল মূলধন (নগদ বা সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য মূলধন) বলে গণ্য হয়। এ ছাড়া আমানতকারীদের প্রাত্যহিক চাহিদা ও দৈনন্দিন অন্যান্য ব্যয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পমিাণ টাকা নগদ ক্যাশ হিসেবে ব্যাংককে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হয়। নগদ ক্যাশ হিসেবে কতটাকা সংরক্ষণ করা হবে তার হার কোন্ দেশে নির্ধারিত থাকে যেমন- পাকিস্তানে ৫% নির্ধারিত, আবার কোন দেশে এটি ব্যাংকের নিজস্ব বিচেনায় রাখার অনুমতি দেয়া হয়। এক ব্যাংক যদি অন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাহলে সেটাকেও তরল মূলধন বলে গণ্য করা হয়।

অবশিষ্ট টাকা ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক খাতে সুদ বা লাভের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। বর্তমানে এই বিনিয়োগের অনেক খাত রয়েছে। যথা ঃ

১. ব্যবসায়ী ও পেশাদারদেরকে স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী কিংবা প্রজেক্টভিত্তিক ঋণ দান।

২. ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট খাতে ঋণ দান।

৩. বিভিন্ন ব্যাংককে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দান।

৪. বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার, সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের বন্ড, সিকিউরিটি পত্র, ডিভেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় এবং এর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন।

৫. আমদানি রফতানি খাতে বিনিয়োগ।

৬. বিল বাট্টা করণে বিনিয়োগ ইত্যাদি।

www.eelm.weebly.com

ব্যবসায়ী, পেশাজীবী বা ব্যক্তি বিশেষকে যে ঋণ দেয়া হয় তার সুদের হার উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে এই ধরনের ঋণে সুদের হার ১৫% থেকে ২০% এর মাঝে হয়ে থাকে।

ঋণের আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়া যায় কি না, গৃহীত ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করা আবেদনকারীর পক্ষে সম্ভব হবে কি না, যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিচ্ছে সেক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হলে তার কাছ থেকে ব্যাংকের পাওনা উঠিয়ে আনা সম্ভব হবে কি না ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে তাকে আদৌ ঋণ দেয়া যায় কি না; আর দেয়া গেলে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যায় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনে ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে তার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের জামানত নিয়ে থাকে। যাকে ব্যাংকের পরিভাষায় মর্টগেজ বলা হয়ে থাকে। ঋণ মঞ্জুর করা হলে ব্যাংক তার নামে একটি একাউন্ট খুলে দিয়ে তাকে একটি চেক বই সরবরাহ করে। সেই চেকের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে এই একাউন্ট থেকে টাকা উঠাতে পারে।

এক ব্যাংক তার সাময়িক প্রয়োজনে অন্য ব্যাংক থেকে বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে। মেয়াদ অনুসারে সুদের হার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই সুদও ঋণদাতা ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়।

শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে যে লাভ হয় তাও ব্যাংকের মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। বন্ড ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ লাভ করে।

৩. আমদানি-রফতানি খাতে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাংক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ব্যাংকের মধ্যস্থতা ছাড়া আমদানি রফতানি করা সম্ভব হয় না। কেননা কোন আমদানি কারক যখন ভিন্ন কোন রাষ্ট্র থেকে কোন বস্তু আমদানি করতে চায় তখন রফতানি কারক এ ব্যাপারে গ্যারান্টি চায় যে, তার পণ্য যখন পৌছবে তখন তার মূল্য অবশ্যই যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে। তাই রফতানি কারককে আশ্বস্থ করার জন্য আমাদনিকারক ব্যাংক থেকে এ মর্মে একটি গ্যারান্টি পত্র গ্রহণ করে। যে গ্যারান্টি পত্রে ব্যাংক এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অমুক ব্যবসায়ী বা কোম্পানীর নিকট অমুক পণ্য এত পরিমাণ বিক্রি করা হলে তার মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। এই গ্যারান্টি পত্রকে ইংরেজীতে (LETTER OF CREDIT) (লেটার অফ ক্রেডিট) সংক্ষেপে (L/C) বলা হয়। ব্যাংক থেকে

www.eelm.weebly.com

এই গ্যারান্টি পত্র অর্জন করাকে এলসি খোলা বলা হয়। এলসি খোলার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যথা ঃ

ক. ফুল মার্জিন এলসি ঃ অর্থাৎ আমদানি কারক আমদানিকৃত পণ্যের পূর্ণ মূল্য পূর্বেই ব্যাংককে পরিশোধ করে এলসি খোলে।

খ. জিরো মার্জিন এলসি ঃ অর্থাৎ আমদানিকারক এলসি খোলার সময় কোন টাকা পরিশোধ করে না। দ্রব্য হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পূর্ব থেকে নির্ধারিত একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করে।

এ ক্ষেত্রে পণ্য হাতে পাওয়ার পর যতদিন পরে মূল্য পরিশোধ করা হয় ততদিনের জন্য আমদানিকারক ব্যাংকের নিকট ঋণী বলে গণ্য হয় এবং এ জন্য তাকে নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

গ. আংশিক মার্জিনে এলসি ঃ অর্থাৎ আমাদানিকারক এলসি খোলার সময় আংশিক মুল্য ব্যাংককে পরিশাধ করে দেয়। অবশিষ্ট টাকা পণ্য পৌঁছার পর পরিশোধ করে। মূল্যের যত অংশ সে পূর্বে পরিশোধ করে সেটাকেই মার্জিন ধরা হয়। অর্থাৎ যদি মূল্যের ২০% অগ্রিম পরিশোধ করে থাকে তাহলে সেটাকে ২০% মার্জিনে এলসি বলা হয়।

এলসি খোলার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক রফতানিকারকের ব্যাংকের কাছে (যাকে পরিভাষায় (NEGOTIATING BANK বলা হয়) এতদসংক্রান্ত কাগজপত্র প্রেরণ করে। এলসির কাগজপত্র পৌঁছার পর রফতানিকারক মালামাল প্রস্তুত করে জাহাজে বুক করে দেয়। জাহাজ কোম্পানী মাল বুকের একটি রশিদ প্রদান করে। এই রশিদকে (BILL OF LOADING) (বিল অফ লোডিং) বলা হয়। রফতানিকারক এই লোডিং বিলসহ এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমদানিকারক যে ব্যাংকে এলসি খুলেছেন সে ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করে। ব্যাংক এলসির টাকা পরিশোধের ভিত্তিতে উক্ত জাগজপত্র আমদানিকারককে হস্তান্তর করে। লোডিং বিলে প্রদত্ত মালের বিবরণ যদি তার অর্ডারকৃত মালের অনুরূপ না হয় তাহলে কাগজপত্রসহ মাল ফেরত দেয়া হয়। আর যদি অনুরূপ হয় তাহলে ঐ বিল দেখিয়ে বন্দর থেকে মালামাল খালাস করা হয়। অবশ্য যদি ব্যাংকের সাথে টাকা পরে পরিশোধের চুক্তি থাকে তাহলে ব্যাংক টাকা ছাড়াই বিল দিয়ে দেয়।

ব্যাংক এলসির জন্য নির্ধারিত হারে কমিশন গ্রহণ করে থাকে। আমদানীকারকের ব্যাংক সাধারণত তিনটি দায়িত্ব পালন করে। যথা ঃ

১. **গ্যারান্টি প্রদান ঃ** অর্থাৎ ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রফতানি কারককে এ মর্মে গ্যারান্টি প্রদান করে যে, সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য আমদানি কারক আদায় না করলে সে তা প্রদান করবে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাংক মূল্য গ্রহণ করে।

www.eelm.weebly.com

২. **প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন** ঃ অর্থাৎ ব্যাংক আমদানিকারকের প্রতিনিধি (وكيل) হয়ে লেনদেন করে। যেমন আমদানিকারকের কাগজপত্র রফতানি কারকের ব্যাংকে পাঠায়, রফতানিকারকের প্রেরিত কাগজপত্র আমদানিকারকের কাছে হস্তান্তর করে। এই দায়িত্ব পালন করার কারণেও ব্যাংক মূল্য গ্রহণ করে।

৩. **ঋণ প্রদান** ঃ অর্থাৎ যখন জিরো মার্জিনে কিংবা আংশিক মার্জিনে এলসি খোলা হয় এবং ব্যাংকের সাথে আমদানিকারক এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, মাল বন্দরে পৌঁছলে ব্যাংক টাকা পরিশোধ করে দেবে, আর ব্যাংকের টাকা আমদানিকারক ৬ মাস বা এক বছর পরে পরিশোধ করবে, তখন উক্ত টাকা ব্যাংক আমদানিকারককে ঋণ হিসেবে প্রদান করে।

অনেক সময় লোডিং বিল হাতে পাওয়ার পর ব্যাংককে টাকা পরিশোধ করে দেয়ার চুক্তি থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা পরিশোধ করতে কয়েক দিন বিলম্ব হয়ে যায়, এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যও ব্যাংক আমদানিকারককে দেনাদার সাব্যস্ত করে তার কাছ থেকে সুদ আদায় করে।

অপরপক্ষে রফতানিকারকের ব্যাংক কেবলমাত্র দুটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। যথাঃ

১. **প্রতিনিধিত্ব করণ** ঃ অর্থাৎ ব্যাংক রফতানিকারকের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে উভয় পক্ষের কাগজপত্র লেনদেন করে। এবাবত ব্যাংক রফতানিকারক থেকে কমিশন গ্রহণ করে।

২. **ঋণ প্রদান** ঃ রফতানিকারককে ব্যাংক দু'ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। কখনো কখনো আমদানিকারকের সাথে রফতানি কারকের চুক্তি এরূপ হয় যে, লোডিং বিল হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ করে দেবে। ব্যাংকিং পরিভাষায় একে এলসি এট সাইট (L/C AT SIGST) বলে। কিন্তু কখনো কখনো চুক্তি এরূপ হয় যে, লোডিং বিল হাতে পাওয়ার তিন মাস বা চার মাস পরে টাকা পরিশোধ করা হবে। এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত মেয়াদের আগেই যদি রফতানিকারকের টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে সে উক্ত বিলের টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে নিতে পারে। এই টাকা তখন মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত রফতানিকারকের খাতে ঋণ হিসেবে গণ্য হয় এবং এর জন্য রফতানিকারকের কাছ থেকে সুদ নেয়া হয়।

আবার অনেক সময় রফতানি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর পণ্য প্রস্তুত করে পাঠানোর জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় তা রফতানিকারকের কাছে থাকে না। তখন সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পণ্য ক্রয় করে রফতানি করে। পণ্যের মূল্য আদায় হয়ে আসা পর্যন্ত উক্ত টাকা রফতানিকারকের খাতে ঋণ হিসেবে গণ্য

www.eelm.weebly.com

হয়। পারিভাষায় একে (EXPORT FINANCING) বা রফতানি খাতে বিনিয়োগ বলা হয়। এই ঋণের জন্যও রফতানিকারক থেকে সুদ নেয়া হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই রফতানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য রফতানি খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতাকে বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। এ জন্য রফতানি খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত ঋণে সুদের হার কম রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তফসিলী ব্যাংক সমূহকে এ মর্মে দিকনির্দেশনা দান করে এবং রফতানি খাতে বিনিয়োগে সুদের হার কত হবে তা নির্দারণ করে দেয়। সুদের হার কম হলে তফসিলী ব্যাংকসমূহ রফতানি খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী নাও হতে পারে এ জন্য রফতানি খাতে বিনিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে বিশেষ ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমন রফতানী খাতে প্রদত্ত সুদের হার যত টাকা কম ধরা হয় সেই পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকগুলোকে দিয়ে দেয়। কেননা রফতানি আয় বৃদ্ধি হলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয় এবং মুদ্রামাণ বৃদ্ধি পায়।

৪. মুদ্রা বিনিময় ও বিল বাট্টাকরণ

বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা বিল বাট্টাকরণ ঃ বিল অফ এক্সচেঞ্জ একটি বিশেষ ধরনের সনদ। কোন ব্যবসায়ী যখন কোন পণ্য নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বাকীতে বিক্রি করেন তখন ক্রেতার নামে তিনি একটি বিল তৈরি করেন। এই বিলটিকে একটি সনদ হিসেবে গণ্য করার জন্য ক্রেতা থেকে তা মঞ্জুর করিয়ে এ মর্মে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন যে, এই বিলে উল্লিখিত টাকা আমি অমুক মাসের এত তারিখে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। ক্রেতার এই স্বাক্ষরকে (ENDORSEMENT) বলা হয়।

ক্রেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এটি একটি সনদের মর্যাদা লাভ করে। ব্যাংকিং পরিভাষায় একে বিল অফ এক্সচেঞ্জ উর্দুতে হুন্ডি বলা হয়। যে তারিখে ক্রেতা বিলের টাকা পরিশোধ করবে বলে উল্লেখ থাকে তাকে (MATURITY DATE) বলা হয়। উক্ত তারিখ আসার আগেই যদি বিক্রেতার টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি এই বিল অন্যের নিকট বিক্রি করে দিতে পারেন। সাধারণত বিলে যে পরিমাণ টাকার উল্লেখ থাকে তার চেয়ে (DISCOUNT) বা কম মূল্যে তা বিক্রি করা হয়। কত কম মূল্যে বিক্রি করা হবে তা নির্ভর করে বিল বিক্রয়ের দিন থেকে (MATURITY DATE) এর ব্যবধানের উপর। বিলের এই মূল্যহ্রাসকে ব্যাংকিং পরিভাষায় (DISCOUNTING OF THE BILL OF EXCHANGE) এবং উর্দুতে বাট্টা লাগনো বলা হয়ে থাকে।

ব্যাংক এসব বিল (DISCOUNTING)-এর ভিত্তিতে ক্রয় করে এবং নির্ধারিত সময়ে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করে নেয়। এতে যে লাভ হয় তা ব্যাংকের

www.eelm.weebly.com

মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের বিলের মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন মাস হয়ে থাকে। এ জন্য এটাকে স্বল্প মেয়াদী ঋণের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

এছাড়াও ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করে এবং এ বাবতও শতকরা হারে কমিশন গ্রহণ করে। এটিও ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের একটি খাত।

৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি

ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হল বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি। মূলত টাকা পয়সাই হল বিনিময়ের প্রকৃত মাধ্যম। সাধারণত মানুষ নগদ টাকায় লেনদেন করে থাকে. এবং একশ টাকার বিনিময়ে একশ টাকার সমপরিমাণ ফায়দা লাভ করতে পারে। কিন্তু ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত ১০০ টাকা দ্বারা ব্যাংক অনেক টাকার ফায়দা লাভ করতে পারে। আর তা করতে পারে চেক সরবরাহের মাধ্যমে। চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে একশ টাকা দিয়ে বহু টাকার কাজ আঞ্জাম দেয়া যায়। এভাবে ১০০ টাকা চেকের মাধ্যমে বহু টাকার কাজ করার কারণে বিনিময়ে মাধ্যম বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি হয়।

যেমন ব্যাংক যদি একশ টাকা কাউকে ঋণ দেয়, আর সে ঋণ চেকের মাধ্যমে সরবরাহ করে, তাহলে ১০০ টাকা ব্যাংকের কাছেই থেকে যায়। অথচ উক্ত ব্যক্তিকে ১০০ টাকার ঋণগ্রহীতা সাব্যস্ত করে তার কাছে থেকে সুদ আদায় করতে থাকে। সেই ব্যক্তি যদি উক্ত চেক উক্ত ব্যাংকেই কিংবা তার অন্য কোন শাখায় জমা দেয়; তখন ব্যাংকে জমার পরিমাণ হয় ২০০ টাকা এবং ঋণ দেয়া হল একশত টাকা। অথচ মূল টাকা ১০০ই রয়ে গেল। আর যদি চেকটি সেই ব্যাংকে জমা না দিয়ে অন্য ব্যাংকে জমা দেয় তবুও দুই ব্যাংক মিলে অতিরিক্ত ১০০ টাকা সৃষ্টি হয়। সেই ব্যাংক যতদিন পূর্বোক্ত ব্যাংক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে না নেয় ততদিন পর্যন্ত পূর্বোক্ত ব্যাংক ঐ টাকা ব্যবহারের সুযোগ পায়। আবার কেউ যদি ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নেয়, তাহলে ব্যাংক তাকে নগদ টাকা না দিয়ে উক্ত ব্যাংকেই তার নামে একটি একাউন্ট খুলে দেয় এবং তাকে একটি চেক বই সরবরাহ করে। সেই চেক দিয়ে সে যখন ইচ্ছা উক্ত ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে পারে। ঋণ গ্রহীতাকে যেদিন চেকবই সরবরাহ করা হয় সেদিন থেকেই সে ব্যাংকের নিকট ঋণী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু সব টাকা সে একসাথে উঠায় না। অনেক সময় ছয় মাস বা আট মাস পরেও টাকা উঠানো হয়। এই সময়ের মাঝে ব্যাংক উক্ত টাকা অন্য খাতে ব্যবহার করতে পারে। ফলে ঋণ গ্রহীতা থেকেও সে সুদ পায়; আবার অন্য জনকে দিয়ে তার কাছ থেকেও সুদ আদায়

www.eelm.weebly.com

করে। চেক ব্যবহারের সুবিধার জন্য ব্যাংক একই টাকা পুনঃপুন ব্যবহার করে লাভবান হয়।

এছাড়া ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের টাকাকেও ব্যাংক ব্যবহার করতে পারে। অথচ এবাবৎ ব্যাংক আমানতকারীকে কোন সুদ দেয় না। অনেক সময় কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখার পর বছরকালও পেরিয়ে যায়। এই টাকা ব্যবহার করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে অথচ এ টাকা বাবৎ ব্যাংককে কিছুই পরিশোধ করতে হয় না। উপরন্তু আমানতকারী থেকে একাউন্ট চার্জ কেটে রাখা হয়।

ব্যাংকের কাছে কিছু টাকা ফ্লট মানি (FLOAT MONEY) হিসেবে থাকে পুঁজি হিসেবে সেগুলোও ব্যাংক ব্যবহার করে থাকে। ফ্লট মানি বলতে ব্যাংকের কাছে রক্ষিত অন্তর্বর্তীকালীন হিসাব বহির্ভূত টাকাকে বুঝায়। যেমন- কোন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ১০,০০০ টাকা নগদ পরিশোধ করে ট্রাভেল চেক গ্রহণ করল। সে চেক যে ব্যাংকে জমা হবে সে ব্যাংক চেক প্রদানকারী ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে নিতে মাঝে কয়েক দিনের ব্যবধান হয়ে যায়। এই অন্তর্বর্তীকালে ব্যাংকের নিকট এই টাকা সংরক্ষিত থাকে। অথচ এ টাকা চেক গ্রহণকারীর হিসেবে জমা থাকে না; যে জন্য কোন সুদও দিতে হয় না। অনুরূপভাবে দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবের টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উঠিয়ে নিতে অনেক সময় বিলম্ব হয়। তখনও ঐ টাকা হিসাব বহির্ভূতভাবে ব্যাংকের নিকট রক্ষিত থাকে। এ ধরনের হিসাব বহির্ভূত সংরক্ষিত টাকাকে ফ্লট মানি বলা হয়। এসব টাকাও ব্যাংক পুঁজি হিসেবে খাটিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তার দায়-দায়িত্ব

জেমস ষ্টিফেনসনের মতে "কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা দেশের সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে অর্থনৈতিক সমতা বিধান ও মুদ্রার মূল্যমানের স্থিতিশীলতা রক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে"।

আরপি ক্যান্ট-এর মতে "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে একটি দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান"।

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক', পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান', ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' ইত্যাদি।

বস্তুত কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অভিভাবক হয়ে থাকে এবং এটি সরকারে ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য

www.eelm.weebly.com

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একমাত্র দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ বিশেষ কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করা হলঃ

১. নোট ও মুদ্রা প্রবর্তন করা।
২. মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা।
৩. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি করা।
৪. মুদ্রা বাজারকে স্থিতিশীল রাখা।
৫. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
৬. রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে সরকারের তহবিল (বিনাসুদে) সংরক্ষণ, ও প্রয়োজনে (বিনাসুদে) সরকারকে ঋণ দান, সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও সরকারকে পরামর্শ দান করা।
৭. দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের মঞ্জুরীদান, তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
৮. অন্যান্য ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড সংরক্ষণ করা।
৯. প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যাংককে ঋণ দান করা।
১০. রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোকে অন্যান্য ব্যাংককে ঋণ বিতরণ সহ অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা।
১১. বিভিন্ন ব্যাংকের পারস্পরিক লেনদেনের মাঝে সমন্বয় করা অর্থাৎ নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করা।
১২. অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
১৩. আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের মুদ্রামান সংরক্ষণ করা।
১৪. ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৫. রাষ্ট্র যে খাতের উন্নয়ন করতে চায়; বণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করা এবং সে খাতে আর্থিক ঋণ বরাদ্দের জন্য নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা স্থানান্তর করা, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা, সরকারি সিকিউরিটি বন্ড ট্রেজারী বিল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যংক বা বায়তুলমালের উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে। যেমন ঃ

১. ইয়াতিম ও লাওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন।
২. অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ।
৩. কয়েদী ও অপরাধীদের সংশোধন ও ভরণ-পোষণ।

www.eelm.weebly.com

৪. বিনাসুদে ঋণদান ও প্রয়োজনে নাগরিকদের ক্ষতিপূরণ দান।

৫. জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান।

৬. ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে মুদ্রামাণ নিয়ন্ত্রণ করে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব হল মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা জানি যে, দেশে মুদাস্ফীতি দেখা দিলে মুদ্রামান হ্রাস পায়, আর মুদ্রাসংকট দেখা দিলে মুদ্রামান বেড়ে যায়। দুটোই স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। তাই যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আর যদি মুদ্রাসংকট দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে মুদ্রাসংকট কেটে যায়। এই কাজ বিভিন্নভাবে আঞ্জাম দেয়া হয়। যথা

ক. সুদের হার কমবেশী করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধিকরে মুদ্রামাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতিরি একটি অন্যতম কারণ হল মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া। ব্যাংক অধিক হারে চেকের মাধ্যমে ঋণ দিতে পারলে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে ঋণ দেয় তার সুদের হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও তৎকর্তৃক প্রদত্ত ঋণে সুদের হার বাড়াতে হয়। ঋণে সুদের হার বেশী হলে জনগণ সহজে ঋণ নিতে চায় না। ঋণ বিতরণের হার হ্রাস পেলে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতিও হ্রাস পায়। মুদ্রা সংকট বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্প সুদে ঋণ দিতে শুরু করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার কমিয়ে দেয়। এতে জনগণের মাঝে ঋণ নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়; ফলে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাসংকট কেটে যায়।

খ. ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রামাণ নিয়ন্ত্রণ ঃ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে এই সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের বন্ড ছেড়ে থাকে। এ বন্ডগুলোর গায়ে তার ফেইস ভ্যালু লেখা থাকে। সুদের ভিত্তিতে এগুলো বিক্রি করে সরকর বিভিন্ন ব্যাংক ও জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। অনুরূপভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হলে সরকার এ ধরনের বিল জারি করে থাকে। ব্যাংকিং পরিভাষায় এগুলোকে ট্রেজারী বিল বলা হয়। সাধারণত এ বিল ছয় মাস মেয়াদী হয়ে থাকে। সরকার যত টাকা সংগ্রহ করতে চায়; প্রতিটি ১০০ টাকা করে সে পরিমাণ টাকার বিল তৈরি করে। এতে ১৪% বা ১৫% সুদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। এ বিলের

www.eelm.weebly.com

সুবিধা হল এই যে, সুদের টাকা ডিসকাউন্ট করে বাকী টাকা পরিশোধ করে বিল ক্রয় করা যায়। যেমন ১০০ টাকা মূল্যমানের বিল ১৫% সুদ ডিসকাউন্ট করে ৮৫ টকায় ক্রয় করা যায়। সাধারণত ব্যাংকগুলোই এ বিল ক্রয় করতে পারে। মোট কত টাকার ট্রেজারি বিল ছাড়া হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নির্ধারণ করে ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে কোন্ ব্যাংক কত টাকার বিল ক্রয় করবে তার চাহিদা পেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বরাদ্দ অনুসারে প্রত্যেক ব্যাংক তার জন্য বরাদ্দ বিলের সুদ ডিসকাউন্ট করে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে দেয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সরকারি তহবিল থেকে পূর্ণ ১০০ টাকা আদায় করে নেয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অথবা স্টক এক্সচেঞ্জে এ বিল ডিসকাউন্টে বিক্রি করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি বাজারে অবতরণ করে এবং নির্ধারিত সুদের চেয়ে উচ্চ হারে সুদ দেয়ার শর্তে বিল বিক্রি করতে শুরু করে। ফলে অধিক লাভের আশায় ব্যাংক ও জনসাধারণ ব্যাপক হারে বিল ক্রয় করতে শুরু করে। এতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে চলে আসে, ফলে ব্যাংক গুলোর ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে যায়। যে কারণে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ও হ্রাস পায়। আবার দেশে মুদ্রাসংকট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি বাজারে অবতরণ করে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে ট্রেজারি বিল ক্রয় করতে শুরু করে। ফলে যারা বিল ক্রয় করে রেখেছিল, তারা লাভ হচেছ দেখে, তা বিক্রি করে দেয়। এতে টাকা ব্যাংকের কাছ থেকে জনগণের কাছে চলে যায় এবং তার বিকল্প ব্যবহার শুরু হয়। যে কারণে মুদ্রাসংকট হ্রাস পায়। এভাবে খোলা মার্কেটে অবতরণ করে বিল ক্রয় বিক্রয়কে (OPEN MARKET OPERATION) বলে।

আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিক মূল্যে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে মুদ্রা ক্রয় করে নেয়; ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আবার মুদ্রাসংকট দেখা দিলে স্বল্প মূল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রা সরবরাহ করে; ফলে মুদ্রাসংকট হ্রাস পায়

ঘ. ঋণ দানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ ঃ মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় সাধারণ ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবে তার সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন- এরূপ আইন করে দেয়া হয় যে, ব্যাংক তার মোট আমানতের শতকরা ৪০% ঋণ দিতে পারবে। কিংবা খাতওয়ারী কোটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন এ মর্মে আইন করে দেয়া হয় যে, মোট আমানতের ২৫% কৃষি খাতে ঋণ দিতে হবে।

www.eelm.weebly.com

এসকল বিধি নিষেধের ফলে ব্যাংক স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কম ঋণ দিতে পারে যে কারণে মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি কমে যায়।

ঘ. নতুন নোট ছেপে ঃ অনেক সময় নতুন নোট ছেপেও মুদ্রা সংকটের মুকাবেলা করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত হলে সকল ক্ষেত্রে সুদ বিহীন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অতএব সুদের পরিবর্তে লভ্যাংশের হারে হ্রাস বৃদ্ধি করে মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার স্বরূপ

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা বনাম ইসলামী অর্থনীতি ঃ দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি সমস্যা

বস্তুতঃ ইসলামী অর্থনীতি একটি শোষণমুক্ত ও কল্যঅণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আর আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা হল শোষণের এক অভিনব কৌশল। এদুটি বিষয়কে সমন্বয় করা খুবই দুরহ কাজ। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদী ব্যাংকের সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে প্রক্রিয়াগত দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে সুদমুক্ত প্রক্রিয়া চালু করা হলেও শোষণের মাত্রা সুদী ব্যাংকগুলোর তুলনায় না কমে বরং বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব সুদমুক্ত করা গেলেও এ ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তদুপরি রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার কারণে সব দেশে পূর্ণাঙ্গ সুদমুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি কার্যকর করাও সম্ভব হচ্ছে না।

কেননা যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত নয়; সে দেশের তফসিলী ব্যাংকগুলো সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত সম্ভব নয়। তফসিলী ব্যাংকগুলোকে তার মোট মূলধনের এক-চতুর্থাংশ কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অনুরূপ কোন অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ ফান্ড হিসেবে জমা রাখতে হয়। জনগণের প্রদত্ত পুঁজির নিরাপত্তার জন্য উক্ত টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক জামানত হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। উক্ত টাকা পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন তফসিলী ব্যাংক মঞ্জুরি পায় না। অবশ্য এই রিজার্ভ ফান্ডের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাফসিলী ব্যাংক সমূহকে নির্ধারিত হারে সুদ দিয়ে থাকে। উক্ত সুদের টাকাকে মুনাফার সাথে যোগ না করলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর লাভের পরিমাণ সুদী ব্যাংকগুলোর তুলনায় কমে আসে। ফলে লাভের হার যা দাঁড়ায় তা দিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে আমানতকারীদেরকে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। আর সুদের অংশ যোগ করলে লাভকে সুদমুক্ত করা সম্ভব হয় না। আর যদি সুদমুক্ত করার গরজে এই সুদের টাকাকে সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুলক খাতে ব্যয় করে দেয়া হয়

www.eelm.weebly.com

তাহলে আমানত কারীদেরকে আকর্ষিত করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের উপর শোষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে হয়।

এই সংকটের মূল কারণ হল সুদী ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মানসকিতা এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লাভ বেশী হয় এ কথা জনগণের কাছে প্রবণতা।

ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালিত হলে লাভের খাতায় টাকার অংক বৃদ্ধি পাবে এ ধারণা সঠিক নয়। বস্তুত ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হলে নগদ লাভের খাতায় টাকার অংক বৃদ্ধি না পেলেও এমন একটি সামগ্রিক কল্যাণ অর্জিত হবে যার পরিণতিতে সামাজিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে, পুঁজিপতি গড়ে উঠবে না, সম্পদ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়বে না, শিল্প ও উৎপাদন খতের মুনাফা ভোগের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ত্বভোগী ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে এবং মুনাফার প্রকৃত হারাহারি অংশ লাভ করবে দেশের সকল অর্থ যোগানদাতারা, সুদের অহেতুক ভর্তুকী দেয়া থেকে বেঁচে যাবে দেশের সকল মানুষ। এই বৃহত্তর কল্যাণের তুলনায় লভ্যাংশের হার সুদী ব্যাংকের চেয়ে কম আসা একেবারেই স্বাভাবিক। অতএব ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ করলে লাভের হার বেশী হয় এটিকে প্রচারণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে; সামগ্রিক কল্যাণের দিকটি জনগণের সামনে সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সুদী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাংকের আমানতে সুদের হার বেশী আসলেও দ্রব্যের বাড়তি মূল্য পরিশোধ করে প্রত্যেক নাগরিককে বছরে তার চেয়ে যে অনেক বেশী টাকা গচ্ছা দিতে হয় সে দিকটিও জনগণের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন।

আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য সকল ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকের বিকল্প গড়ে তোলা নয়, কিংবা সুদী ব্যাংকের সমহারে আমানতকারীদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করাও নয় অথবা ব্যাংক পরিচালনা করে রাতারতি বড়লোক হওয়ার ইয়াহুদী মানসিকতাও আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়। বরং সুদী ব্যাংকগুলো পুঁজি সংগ্রহ করে বৃহত্তর উৎপাদনে যে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে ইসলামী শারইয়্যার আলোকে সুদমুক্ত পন্থায় এই অপরিহার্য কল্যাণগুলো লাভ করার বৈধ পন্থা উদ্ভাবন করা। এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বাভাবিক পন্থায় যে লাভ হয় সে হারে লাভ দিয়ে জনগণকে বৃহৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে পুঁজি সরবরাহে উৎসাহিত করা।

অর্থের লেনদেন করে মধ্যস্বত্ত্ব ভোগ করার মানসিকতা বহাল রেখে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার বাস্তবে কোন অর্থ হয় না। তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার

www.eelm.weebly.com

আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ব্যংক সমূহের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। অন্যথায় ইসলামী ব্যাংকের অর্থ হবে সুদী প্রক্রিয়ায় শোষণের পরিবর্তে বৈধ পন্থায় শোষণ করা। অথচ শোষণের যাতাকল থেকে মানুষকে মুক্ত করে শোষণমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার সুদী লেনদেনকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং যদি শোষণ বহাল থাকে আর সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিকল্প পথ অবলম্বন করা হয় তাহলে ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যই বোধ হয় মাঠে মারা যাবে।

সুদী ব্যাংকের বিকল্প

সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমকে মোট ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ৫টি খাতকে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে যে, এ কাজগুলোর গুরুত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু। আর আধুনিক ব্যংকগুলো যে প্রক্রিয়ায় কাজগুলো আঞ্জাম দিচ্ছে সে প্রক্রিয়াগুলো বৈধ কি না? যদি কাজগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং তা সম্পাদনের পদ্ধতি যদি অবৈধ হয়, তাহলে সেগুলো বৈধ পন্থায় আঞ্জাম দেয়ার শরীয়তসম্মত পন্থা কি হতে পারে তা নির্ণয়ের মাঝেই নিহীত আছে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সূত্র। আমরা নিম্নে ব্যাংকিং কর্যক্রমের প্রত্যেকটি দিককে শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে দেখব।

১. **আমানত গ্রহণ** ঃ সম্পদকে নিষ্ক্রয়ভাবে সঞ্চিত করে রেখে আর্থ-সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগকে বাধাগ্রস্থ করে রাখা ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। তাই অথর্ব সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুগম করা ও সমাজের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা অবশ্যই অন্যায় কিছু নয়। বরং পুঁজি অলস নিষ্কৃয় হয়ে পড়ে থাকাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। তাই আমানত সংগ্রহের যে কাজ ব্যাংকগুলো করছে তা দুষণীয় কিছু নয় বরং এটা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কেননা ব্যাংকের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠান না হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিগুলো সংগ্রহ করে বৃহদায়তন উৎপাদনী কাজে খাটানোর কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া প্রত্যেক পুঁজির মালিকের এমন অভিজ্ঞতাও থাকে না যে, সে তার সঞ্চিত পুঁজিকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করবে। ব্যাংক সেই পুঁজিকে সংগ্রহ করে বৃহদায়তন উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তার হাতে এই পুঁজি সরবরাহ করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগকে নিশ্চিত করছে; সুতরাং এটি তার এক প্রশংসনীয় প্রয়াস। কিন্তু যে শর্তে সাধারণ ব্যাংকগুলো এই পুঁজির সমাবেশ ঘটায় সে শর্তগুলো সুদী প্রক্রিয়ার

www.eelm.weebly.com

আওতাভুক্ত বিধায় ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অনুমোদিত নয়। তারা আমানতকারীদের পুঁজির উপর শতকরা হারে লভ্যাংশ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ ১০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখলে তাকে বছরান্তে ৭.০০ টাকা লাভ দেয়া হবে। কিন্তু ইসলাম তা অনুমোদন করে না।]

ইসলাম বৃহৎপুঁজি সমাবেশের জন্য 'শিরকত' ও 'মুদারাবার পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে। যে পদ্ধতিদ্বয়ে পুঁজির উপর শতকরা হারে সুদ দেয়া হয় না বরং পুঁজি খাঁটিয়ে যে লাভ হয় সেই লাভ থেকে পূর্ব নির্ধারিত আনুপাতের ভিত্তিতে শতকরা হারে লভ্যাংশ দেয়া হয়। ফলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হয় না। আমরা বাণিজ্য অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি যে, শিরকত হল অংশীদারী কারবার যেখানে কয়েকজনের পুঁজি যৌথভাবে খাটিয়ে যে লাভ হয় সেই লাভ নিজেদের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে হারাহারিভাবে বন্টন করে নেয়া হয়। আর মুদারাবাহ হল একজনের মূলধন অন্যজনের শ্রমের সমন্বয়ে ব্যবসা করে যে লাভ হয় তা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে শতকরা হারে বন্টন করে নেয়ার এক বাণিজ্যিক পদ্ধতি।

ব্যাংক সুদ বিহীন পন্থায় আমানত সংগ্রহ ও পুঁজির সমাবেশ ঘটানোর জন্য এ দু'পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। তবে সেজন্য ব্যাংকের বর্তমান কর্মনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। কেননা বর্তমানে ব্যাংক কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। বরং ব্যাংক হল পুঁজির আদান প্রদানকারী মধ্যস্বত্ত্বভোগী এক প্রতিষ্ঠান। শিরকত ও মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য ব্যাংককে বর্তমান অবস্থান থেকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অবস্থানে নেমে আসতে হবে এবং সরাসরি ব্যবসার উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

কারেন্ট একাউন্টে যে টাকা রাখা হয় তা মূলতঃ এমন আমানত যা ব্যবহারের অনুমতি ব্যাংক আমানতকারী থেকে নিয়ে নেয়। যেহেতু এর বিপরীতে কোন রূপ সুদ দেয়া হয় না, তাই ইসলামী পদ্ধতির সাথে এর কোন সঙ্ঘাত নেই। ইসলামী পদ্ধতিতেও ব্যাংকে এ ধরনের একটি হিসাব খোলা যেতে পারে যেখানে আমানতকারীরা টাকা জমা রাখবে এবং যখন ইচ্ছা তখন তা উঠিয়ে নিতে পারবে। ব্যাংক আমানতাকরীদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিবে যে, এই টাকা ব্যাংক প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। এই অনুমতি দ্বারা এ টাকা ব্যবহার করা এবং ব্যবহার করে লাভ অর্জন করা ব্যাংকের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। তবে এ টাকার দায়ভার তখন ব্যাংকের উপর ন্যাস্ত থাকবে অর্থাৎ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যাংক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। একাউন্ট খোলার জন্য ব্যাংক যদি সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে তাও ব্যাংকের জন্য বৈধ হবে। তবে সার্ভিস চার্জ সার্ভিস বাবৎ

www.eelm.weebly.com

ন্যূনতম ব্যায়ের চেয়ে বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো কারেন্ট একাউন্টের কাজ 'আল-ওয়াদিয়্যাহ হিসাব' নামে চালিয়ে থাকে। সঞ্চয়ী হিসাব, মেয়াদী হিসাব ও বিশেষ নোটিশ হিসাব গুলোতে যে টাকা জমা নেয়া হয় সেগুলোর সবই মুদারাবার ভিত্তিতে কিংবা শিরকাতের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে আমাদের দেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবার ভিত্তিতেই টাকা জমা রেখে থাকে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল যে, শিরকত ও মুদারাবায় সকল অংশিদারদের টাকা এক সাথে জমা করতে হয় এবং একই তারিখে লাভ লোকশান হিসাব করে অংশীদারদের মাঝে বন্টন করে দিতে হয়। কিন্তু ব্যাংকে এটিকে কার্যকর করা কি করে সম্ভব। কেননা এখানে প্রত্যেকদিন একদল লোক টাকা জমা করেই যায়। আবার সঞ্চয়ী হিসাব থেকে প্রত্যেকদিন একদল লোক টাকা উঠিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের হিসাব আলাদাভাবে কি করে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে?

এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমদিকে এরূপ চিন্তা করা হয়েছিল যে, মাসের প্রথম দিকে কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে আমানতকারীরা ব্যাংকে টাকা জমা দিবেন এবং যাদের প্রয়োজন তারা উঠিয়ে নিবেন। এতে হিসাব সহজ হবে। কিন্তু এ পন্থা অবলম্বন করলে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেয়। যেমন ঃ

ক. একদিনে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেলে যথেষ্ট ভীর হবে; ফলে ব্যাংকের কর্মচারীদের উপর অতিরিক্ত প্রেসার পড়বে।

খ. এই ঝামেলার জন্য অনেকেই হয়ত ব্যাংকে যাবে না; ফলে বেশ কিছু পুঁজি নিষ্ক্রয় পড়ে থাকবে। যা কোন কাজেই ব্যবহার হবে না।

তাই পরে ডেইলী প্রোডাক্ট ব্যাসিস (DAILY PRODUCT BASIS) হিসাবের আলোকে আমানতকারীদের লভ্যাংশ হিসাব রাখার পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধিতির সারকথা হল ৬ মাস বা এক বছর ভিত্তিক মেয়াদে ব্যবসা শুরু হবে। এই সময়ে মোট কত টাকা খেটেছে এবং তাতে প্রতি এক টাকায় প্রতিদিন কত লাভ হয়েছে; তার হিসাব প্রথমে বের করা হবে। অতঃপর ব্যাংকে যারা টাকা আমানত করেছেন এবং মাঝে উঠিয়ে নিয়েছেন তাদের হিসাব চেক করে দেখা হবে যে, কত টাকা উক্ত একাউন্টে কতদিন ছিল। পূর্বোক্ত হিসাবানুসারে প্রতি টাকায় প্রতি ১ দিনের যা লাভ দাড়াবে সেই হিসেবে এই সঞ্চয়ী একাউন্টের আমানত কারীদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

কিন্তু এতেও সমস্যা থেকে যায় যে, এই হিসাবের ভিত্তিতে মুনাফা পরিশোধ করা হলে তা হবে সম্পূর্ণ আনুমানিক। এতে একজনের লভ্যাংশ অন্য জনের ভাগে

www.eelm.weebly.com

চলে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা যদি ব্যাংক ৬ মাস মেয়াদী ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে; আর প্রথম তিন মাসে ব্যবসায় লাভ হয়; আর পরবর্তী তিন মাসে লাভ না হয়, এমতাবস্থায় যিনি প্রথম থেকে টাকা জমা করেছেন এবং এই মেয়াদের মাঝে কখনো টাকা উত্তোলন করেননি, আর যিনি শেষের তিন মাস টাকা জমা রেখেছেন উভয়েই লভ্যাংশ সমান হারে পাবেন। অথচ যিনি শেষের তিন মাস টাকা জমা রাখলেন সে সময় ব্যবসায় কোন লাভ হয়নি।

এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আধুনিককালের ফেকাহবিদরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যৌথ কারবারে আনুমানিক হিসাবের উপর ভিত্তি করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ ধরনের আনুমানিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে লভ্যাংশ বিভাজনের নজীর বা উপমা প্রাচীণ ফিকাহশাস্ত্রে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ৫ জনের মূলধন একত্রিত করে শরিকানা ব্যবসা করা হলে এমন সম্ভাবনা থাকে যে, একজনের মূলধন যে খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তা থেকে ভাল লাভ আসল, আর অন্যজনের মূলধন যে খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল সেখানে কোনই লাভ হল না। এমতাবস্থায়ও লভ্যাংশ বিভাজন সমহারে করা হয়ে থাকে। কার মূলধন থেকে কত লাভ আসল তা কিন্তু হিসাব করা হয় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, যৌথ কারবারে যেখানে প্রকৃত হিসাব নির্ণয় করা সম্ভব নয়, সেখানে অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করাই শরীয়তের বিধান। অতএব ব্যাংকে আমানতকারীদের লভ্যাংশের হিসাব অনুমানের ভিত্তিতে করা হলে তা বৈধ হয়ে যাবে।

আর যদি কেউ তার টাকা এই মেয়াদের মাঝে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে নিতে চায় তাহলে সে তার ব্যবসায়ের শেয়ার ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে যাবে। ব্যাংক শেয়ারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ও সম্ভাব্য লাভ ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক আমানতকারী থেকে উভয় পক্ষের দরদামের ভিত্তিতে সাব্যস্তকৃত নগদ মূল্যে তা ক্রয় করে রেখে দিবে।

২. **বিনিয়োগ ঃ** ব্যাংকে যদি মুযারাবার ভিত্তিতে টাকা আমানত করা হয় তাহলে যারা টাকা জমা দিবেন তারা হবেন রাব্বুলমাল বা পুঁজির মালিক আর ব্যাংক হবে মুদারিব বা কারবারী। ফিকাহ শাস্ত্রের একটি স্বীকৃত বিধান এই যে, রাব্বুলমাল যদি মুদারিবকে টাকা অন্য কোন কারবারীর কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয় তাহলে মুদারিব অন্য কারবারীর নিকট টাকা মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

এই স্বীকৃত বিধানের আলোকে ব্যাংক যদি সঞ্চিত মূলধন অন্য ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের নিকট মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে ব্যাংকের এ ধরণের বিনিয়োগে লাভ করতে হলে, রাব্বুল

www.eelm.weebly.com

মালের সাথে যে হারে লভ্যাংশ দেয়ার শর্ত থাকবে তার চেয়ে বর্ধিত হারে লাভ প্রদানের শর্তে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে।

ইসলামে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার যেসকল পদ্ধতি রয়েছে ব্যাংক তার সবগুলো পন্থায়ই পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে। যেমন ঃ

১. সাধারণ ব্যবসায় বিনিয়োগ (التجارة العامة بشراشره) অর্থাৎ ব্যাংক সরাসির নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করে মুনাফা কমাতে পারে।

২. শরিকানা ব্যবসায় বিনিয়োগ (المشاركة) অর্থাৎ অন্যের সাথে শরীকানার ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পারে

৩. মুদারাবায় বিনিয়োগ (المضاربة) অর্থাৎ আমানতকারীদের অনুমতিক্রমে অন্য কোন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের নিকট মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৪. বাই-মুরাবাহায় বিনিয়োগ (بيع المرابحة) অর্থাৎপণ্য ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ সংযোজন করে বিক্রি করার মাধ্যমে মুনাফা কামাতে পারে।

৫. বাই-মুআজ্জলে বিনিয়োগ (البيع المؤجل) অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করে বাকীতে (অধিক মুনাফায়) বিক্রি করে লাভ করতে পারে।

৬. বাই সলমে বিনিয়োগ (بيع السلم) টাকা নগদ পরিশোধ করে পণ্য বাকীতে (স্বল্পমূল্যে) ক্রয় করে (পরে বিক্রি করে) লাভ কামাতে পারে।

৭. সাধারণ ভাড়ায় বিনিয়োগ (الاجاره) অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করে ভাড়ায় দিয়ে লাভবান হতে পার।

৮. বিক্রয়ের জন্য ভাড়া দান প্রকল্পে বিনিয়োগ (بيع بطريق الاجارة) অর্থাৎ পণ্য ভাড়ায় দিয়ে ক্রমন্বায়ে কিস্তিতে বিক্রয় করে লাভ করতে পারে।

এছাড়াও ব্যাংকের অর্থ উপার্জনের অনেক পন্থা রয়েছে। যেমন- কোন প্রজেক্টে আংশিক কাজ করার পর অন্যের নিকট লাভে বিক্রয় করা, কমিশনের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহ করা, সেবা কর্মের বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ করা, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা ইত্যাদি বৈধ পন্থায় ব্যাংক অর্থ উপার্জন করতে পারে।

ব্যাংক যখন সরাসরি মূলধন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তখন বৈধ পন্থায় বৈধ পণ্যের ব্যবসা করে যে মুনাফা অর্জন করবে তা হালাল হওয়ার বিষয়টি প্রশ্নাতীত। কিন্তু যখন সে অন্যের সাথে শরীকানা ব্যবসায় নিরত হবে কিংবা মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবে তখন অবশ্যই শরিকানা ব্যবসা ও মুদারাবার শর্ত-শারায়েত মেনে লেনদেন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয় গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিম্নরূপ।

www.eelm.weebly.com

১. শরীকানা ব্যবসা ও মুদারাবায় লভ্যাংশ বিভাজনের অনুপাত পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। তবে এই অনুপাতের হার পুঁজির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যাবে না। (অর্থাৎ ১০০ টাকার বিনিময়ে ১০ টাকা দেয়া হবে এরূপ করা যাবে না।) ববং এই অনুপাত প্রকৃত লাভের শতকরা ভিত্তিতে নিরূপিত হতে হবে। অর্থাৎ মোট লভ্যাংশের ৪০% পুঁজির মালিক পাবে এবং ৬০% কারবারী পাবে এরূপ শর্তে ব্যবসা করা যাবে।

২. লভ্যাংশ বিভাজনের অনুপাত পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং যে শরীকানা কারবারে কয়েকজন পুঁজিবিনিয়োগকারী থাকবে তাদের প্রত্যেকের সাথে লভ্যাংশ বিভাজনের অনুপাত নির্ধারণ করে নিতে হবে। সকলকে একই হারে লভ্যাংশ দেয়া যেতে পারে। তবে প্রত্যেককে একই হারে লাভ বন্টন করা অপরিহার্য নয়। একজনকে তার পুঁজির বিনিময়ে লভ্যাংশের ৪০% দিয়ে অন্য জনকে তার পুঁজির বিনিময়ে লভ্যাংশের ৬০% দেয়া হলে কোন অসুবিধা নেই। আধুনিককালে বিভিন্ন সদস্যকে ওয়াইটেড ভ্যালু প্রদানের জন্য লভ্যাংশের হার বাড়িয়ে দেয়ার যে প্রথা রয়েছে তাও বৈধ হবে। কিন্তু শরীকানা ব্যবসায় যদি কোন শরীক স্বশরীরে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ না করে তাহলে তার লাভের হার অবশ্যই অন্যদের তুলনায় কম নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয়।

৩. লভ্যাংশ বিভাজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের হার বিভিন্ন হওয়া বৈধ হলেও ক্ষতি বহনের বেলায় পুঁজির অনুপাতে প্রত্যেককেই সমান হারে তা বহন করতে হবে। অর্থাৎ যদি শতকরা ১০ টাকা ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে যিনি ৫০০ টাকা পুঁজি দিয়েছেন তিনি ক্ষতি বহন করবেন ৫০ টাকা এবং যিনি ১০০০ টাকা পুঁজি দিয়েছেন তিনি ক্ষতি বহন করবেন ১০০ টাকা। ফেকাহ বিদরা তাদের ভাষায় কথাটাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন -

الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة بقدر رأس المال

লভ্যাংশ যাকে যে হারে দেয়ার চুক্তি হয়েছে সে হারেই পাবে। তবে ক্ষতি প্রত্যেককে তার মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হবে।

মুদারাবা ও শরিকানা ব্যবসার বর্তমানে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। যথা ঃ

১. বিশ্বস্থতার অভাবজনিত সমস্যা

২. ইনকাম ট্যাক্সের সমস্যা

আজকাল যাকেই মুযারাবা বা শিরকতের ভিত্তিতে টাকা দেয়া হবে সে কখনই প্রকৃত লাভ দেখাবে না বরং খাতাপত্রে লোকশান দেখিয়ে দিবে। এমতাবস্থায় এ পন্থায় লাভজনক ব্যবসাতো দূরের কথা আসল পুঁজি ফিরে পাওয়াও দুষ্কর হবে।

www.eelm.weebly.com

এ সমস্যা কি করে নিরসন করা যাবে এ সম্পর্কে আমরা বাণিজ্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, মানুষের মাঝে সততা ও বিশ্বস্থতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এবং আধুনিক ব্যাংকগুলো তাদের ক্ষেত্রে যে একাউন্টিং প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এ ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানকে এই শর্তের ভিত্তিতে টাকা প্রদান করা হবে যে, তার কোষাধ্যক্ষ ব্যাংক সরবরাহ করবে। যে কোম্পানী একবার এরূপ খেয়ানত করেছে বলে জানা যাবে তাকে ব্লাক লিস্টেড করে রাখা হবে। ভবিষ্যতে তাকে কোন ধরনের ঋণ সহায়তা দেয়া হবে না। এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এবং আইনকে দ্রুত কার্যকর করার ব্যবস্থা থাকলে এ সমস্যা নিরসনের পথ বেরিয়ে আসবে।

আর প্রকৃত মুনাফা কত হয়েছে তা দেখানো হলে, ইনকাম ট্যাক্সের যে বাড়তি চাপ শুরু হবে সে ঝামেলা এড়ানোর জন্য সরকারকে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোন কোম্পানীর পূর্ণ অংশে শরীক হওয়া অপরিহার্য নয়। কোন এক বিশেষ অংশেও শরীক হওয়া যায়। পূর্ব থেকে চলে আসছে এমন কোন ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে তার অংশ বিশেষে শরীক হওয়া যায়। আবার নির্ধারিত মেয়াদের জন্যও অংশীদার হওয়া যায়। এ জন্য উভয় পক্ষের মাঝে এ ধরনের চুক্তি হতে পারে যে, এই নির্ধারিত সময়ের ভিতর ব্যবসা পরিচালনা করতে যা ব্যয় হবে শুধুমাত্র তাই হিসাব করে যে গ্রাস মুনাফা দাড়াবে তা উভয় পক্ষের মাঝে বন্টিত হবে। যেহেতু স্থায়ী মুলধনগুলো এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর বিনিয়োগকৃত তাই তাকে লাভের হার বেশী দেয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সরল হিসেবে ব্যবসা হতে পারে। এতে ধোকা ও প্রতারণার সম্ভাবনাও কম থাকে।

ইজারা বা ভাড়া প্রদান ঃ মূলধন বিনিয়োগ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে শিরকাত ও মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে ইজারা বা ভাড়ার প্রক্রিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা যায়। ভাড়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোম্পানী অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। বিনিয়োগের জন্য ভাড়ার পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে শরীয়তে ভাড়া দানের যে বিধি-বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন। আজকাল লীজের নামে যে পদ্ধতিগুলো প্রচলিত রয়েছে তাতে ইজারা বা ভাড়ার বাস্তবতা বিদ্যমান থাকে না।

কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন দ্রব্য ভাড়া দেয়ার জন্য যিনি ভাড়া দিবেন, দ্রব্যটি তার মালিকানাভুক্ত ও দখলভুক্ত থাকতে হবে। আর যে সময় পর্যন্ত দ্রব্যটি ভাড়ায় খাটবে সেই সময় পর্যন্ত এর দায়ভার মালিক বহন করবে অর্থাৎ ভাড়াটিয়ার কোন

www.eelm.weebly.com

রূপ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাড়া যদি স্বাভাবিক কারণে কাজ করতে যেয়ে বা অন্য কোনভাবে এটি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা মালিকের ক্ষতি বলে গণ্য হবে এবং দ্রব্যটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়ার চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু আজকাল সাধারণত যা হয় তাতে ভাড়া দেনেওয়ালা (LESSOR) ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটির কোন দায়দায়িত্ব বহন করে না। যদি ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তা ভাড়াটিয়ার ক্ষতি বলে গণ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটি কবেই নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেছে অথচ ভাড়াটিয়া ভাড়া দিয়েই যাচ্ছেন। সুতরাং বাস্তবে ইজারার যেসব শর্ত-শারায়েত রয়েছে তা আধুনিক লীজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো বৈধ হবে না।

তবে ইজারার ক্ষেত্রে শরীয়ত যেসব শর্ত-শারায়েত আরোপ করেছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি ব্যাংক ইজারায় বিনিয়োগ করে তাহলে তা বৈধ হবে। ইজারার শর্ত-শারায়েত সমূহ জানার জন্য হিদায়া দ্রষ্টব্য

ইজারার মাঝ দিয়ে বিক্রয় ঃ ইজারার মাঝ দিয়ে বিক্রয়ের একটি প্রথা বর্তমানে চালু হয়েছে। এটি দুইভাবে করা হয়। যথা ঃ

১. ভাড়া এই শর্তে নেয়া হয় যে, ভাড়া পরিশোধ করতে করতে যখন এই পরিমাণ টাকা পরিশোধ হয়ে যাবে যা ভাড়ায় দেয়া দ্রব্যটির মূল্য ও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ লাভের সমপরিমাণ হয়ে যাবে তখন দ্রব্যটি ভাড়াটিয়াকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি এটি ভাড়ার শর্ত থাকে তাহলে এটি বৈধ হবে না। কেননা এটি তখন এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি অনুপ্রবিষ্ট করা (صفقة في صفقة)-এর পর্যায়ে পড়ে যাবে; যা বৈধ নয়। তবে শর্ত না করে যদি ব্যাংক ঐ পরিমাণ টাকা আদায় হয়ে যাওয়ার পর ভাড়াটিয়াকে দ্রব্যটি দিয়ে দেয় তাহলে উপঢৌকন (عطية) হিসেবে তা বৈধ হয়ে যাবে।

২. অনেক সময় ইজারার চুক্তির পর ভাড়া দেয়া দ্রব্যটি কিস্তিতে বিক্রয়ের জন্য মালিক পক্ষের সাথে ভাড়াটিয়ার এ মর্মে চুক্তি হয় যে, ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে দ্রব্যটির মূল্য বাবত প্রতি মাসে বা প্রতি তিন মাসে এত টাকা করে পরিশোধ করা হবে। এভাবে যখন দ্রব্যটির মূল্য পরিশোধ হয়ে যাবে তখন দ্রব্যটি ভাড়াটিয়ার হয়ে যাবে। যদি পৃথক পৃথক দুটি চুক্তির মাধ্যমে এটি করা হয় তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। তবে এক চুক্তিতে এটি করা হলে বৈধ হবে না। কেননা তখন সেটা (صفقة في صفقة)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

www.eelm.weebly.com

মুরাবাহা ঃ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন কোন একটি দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ব্যাংকের নিকট ঋণ নিতে আসে তখন এ ধরনের ব্যক্তিদের সাথে ব্যাংক এ মর্মে চুক্তি করতে পারে যে, আমরা এই দ্রব্যটি ক্রয় করে শতকরা ১০% লাভে আপনাকে সরবরাহ করব। উভয়পক্ষ সম্মত হলে বৃহৎমানের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক এধরণের মুরাবাহার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। মুরাবাহা নগদ ও বাকী দু'ভাবেই হতে পারে। নগদ মূল্য পরিশোধ করলে ক্রয়মূল্যের উপর শতকরা যত টাকা লাভ ধার্য করা হবে, ৬ মাস বা এক বছর পরে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে লেনদেন করা হলে ক্রয় মূল্যের উপর সংযোজিত লাভের হার অবশ্যই বেশী ধার্য করা যাবে।

বর্তমানে এই পদ্ধতিতে ব্যাপক হারে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থ বিনিয়োগ করছে। স্মর্তব্য যে, মুরাবাহার শর্তসমূহ পূর্ণভাবে অনুসরণ না করা হলে এটি সামান্য কারণেই সুদে পরিণত হতে পারে। বর্তমানে মুরাবাহার লেনদেনে যেসব ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. বর্তমানে যে বস্তু পূর্ব থেকেই ক্লাইন্টের নিকট থাকে তার উপরই মুরাবাহার চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি থেকে নগদ কম মূল্যে বস্তুটি ক্রয় করে নেয় এবং তার উপর লভ্যাংশ সংযোজন করে বাকীতে আবার তারই নিকট বিক্রি করে দেয়। ইসলামী পরিভাষায় একে (Buy Boack) বলা হয়। বাস্তবে এটা মুরাবাহা হয় না। বরং Buy Boack -এর সাথে বর্ধিত মুনাফা বা (Mark up value) সংযোজন করে দেয়া হয়। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা কোন পণ্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করার পর আবার তারই নিকট অধিক মূল্যে বিক্রি করা বৈধ হয় না। কারণ এটি সুদী ঋণেরই স্বাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা যদি দ্রব্যটি ১০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করে ১২০ টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে ১০০ টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে ১২০ টাকা নেয়ার মতই মনে হয়। বিশেষ করে যখন ক্রয় করার সময় তার কাছেই পুনরায় বিক্রয় করার শর্ত লাগানো হবে তখনতো তা (بيع وشرط) বিক্রয়ের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেয়ার কারণে অবৈধ হয়ে যাবে।

২. অনেক সময় (Buy Boack)-এর লেনদেনে শুধুমাত্র কাগজী চুক্তি হয়। বাস্তবে ঐ দ্রব্য ক্লাইন্টের কাছেও থাকে না। শুধুমাত্র কাগজ পত্রে চুক্তি করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে কর্মচারী ইত্যাদির বিল পরিশোধ করা হয়। এটিও বৈধ হবেনা

৩. অনেক সময় বাস্তবে মুরাবাহার চুক্তি হলেও ক্রয়কৃত দ্রব্য ব্যাংক কব্জা না করেই ক্লাইন্টকে কোম্পানী থেকে সরাসরি সরবরাহ করে। অথচ মুরাবাহা

www.eelm.weebly.com

পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য উক্ত দ্রব্যে ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। আর সে জন্য তা ব্যাংকের কব্জায় আসা জরুরী। কিন্তু ব্যাংক তা কব্জা না করেই গ্রাহককে সরবরাহ করে থাকে। এইসব না করে মুরাবাহার পদ্ধতি ও তার শর্ত-শারায়েত যথার্থভাবে অনুসরণ করে লেনদেন করা হলে এ পন্থায় বিনিয়োগ বৈধ হবে।

৪. আজকাল অনেক ব্যাংক মুরাবাহায় বিনিয়োগ করতে যেয়ে গ্রাহককে প্রদেয় দ্রব্যটির মূল্য যা হয় সেই পরিমাণ অংক মুরাবাহার জন্য বরাদ্দ করার পর ব্যাংক নিজে ক্রয় করার ঝামেলা না উঠিয়ে খোদ গ্রাহককেই দ্রব্যটি ক্রয় করার জন্য উকিল নিয়োগ করে থাকে।

গ্রাহক ব্যাংকের নিয়োজিত প্রতিনিধি হিসেবে দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে তা বুঝিয়ে দেয়ার পর গ্রাহক হিসেবে নতুন করে ব্যাংকের সাথে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ)-এর মাধ্যমে দ্রব্যটির মালিকানা তার বুঝে নেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করে গ্রাহক দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে বুঝিয়ে না দিয়েই সরাসরি সেটি নিজের ব্যবহারে নিয়ে নেয়। ফলে এ ক্ষেত্রে বাস্তবে মুরাবাহার চুক্তি আইনানুগভাবে সংঘটিত হয় না। কেননা দ্রব্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংককে মালিকানা বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় মুরাবাহার প্রস্তাবও গ্রহণের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা না হলে এটি কোন চুক্তি হবে না। এবং এহেন পন্থায় গৃহীত দ্রব্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে।

৫. আজকাল অনেক ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের সাথে মুরাবাহার চুক্তি করার সিদ্ধান্ত করার পর কত টাকা এ বাবত বরাদ্দ করা হবে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। এরপর এই ক্ষণেই গ্রাহকের বরাবরে ঐ পাওনা টাকার বিল পেশ করে তাতে তার এন্ডোসমেন্ট নিয়ে নেয়। ফলে সেটি বিল অফ একচেঞ্জে পরিণত হয়। কিংবা প্রমিসরী নোটে তার স্বাক্ষর নিয়ে নেয়া হয়। অথচ দ্রব্যটি তখনও ক্রয় করাই হয়নি এবং গ্রাহককে তা সরবরাহও করা হয়নি। এ ধরনের অগ্রিম স্বাক্ষর গ্রহণ করাও বৈধ হবে না। কেননা যখন তার কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের স্বীকারোক্তিমূলক স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে তখন সে ব্যাংকের নিকট ঋণীই হয়নি। সে ঋণী হবে তখন যখন ব্যাংক দ্রব্যটি ক্রয় করে মুরাবাহার প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে সেটি তাকে হস্তান্তর করা হবে। যদি বিলে কিংবা প্রমিসরী নোটে স্বাক্ষর নিতে হয় তাহলে দ্রব্যটি তাকে সরবরাহ করার পর নিতে হবে।

৬. যথাসময়ে ঋণ আদায় না করলে সুদী ব্যাংকসমূহ সুদকে আসলের সাথে মিলিয়ে তার উপর পরবর্তী মেয়াদের সুদ হিসাব করে থাকে। এটাকে

www.eelm.weebly.com

পারিভাষায় রোল অভার (Roll over) বলা হয়। এভাবে যতদিন সে ঋণ আদায় না করে চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ বাড়তে থাকে। আজকাল অনেক ইসলামী ব্যাংক বাকীতে মুরাবাহা (المرابحة المؤجلة) করতে যেয়ে যত দিনের জন্য বাকী দেয়া হয় সেই হিসেবে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন করে। কিন্তু যদি এই মেয়াদের মাঝে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে (Roll over) এর ন্যায় পুনঃমূল্য ধার্য করে। অর্থাৎ যদি ১০০ টাকার দ্রব্য ৬ মাসের বাকীতে ১১০ টাকায় মুরাবাহা করা হয়ে থাকে আর গ্রাহক ৬ মাসের মাঝে তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়: তাহলে সেই চুক্তিকে নবায়ন করে এক বছরের জন্য ১২০ টাকায় পূণঃ মুরাবাহা করা হয়। এটিও বৈধ হবে না। কেননা একটি দ্রব্যের মূল্য একবার নির্ধারণ করার পর সেই ক্রেতা বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পূনঃ মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তাই এই নির্ধারিত মূল্য কমানো বাড়ানো বৈধ হবে না। তাছাড়া একবার বর্ধিত মূল্য সংযোজন করার পর পুনরায় মূল্য সংযোজন করাও সঙ্গত হবে না। বস্তুতঃ মুরাবাহার শর্ত-শারায়েতের প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে এ ধরনের জটিলতাসমূহ সৃষ্টি হয়। এবং লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায়।

৭. বাকীতে যখন মুরাবাহা করা হয় তখন গ্রাহক ব্যাংকের নিকট ঋণী হয়ে যায়। এই ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে ব্যাংক বন্ধকীর দাবী করতে পারে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে যে পণ্যটি মুরাবাহায় বিক্রি করা হয় সেটিকেই বন্ধকী হিসেবে রেখে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিটি বৈধ নয়। কেননা মূল্য পরিশোধ করার জন্য পণ্য আটকিয়ে রাখার অধিকার বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার নেই। তবে বন্ধকী হিসেবে দ্রব্যটি বিক্রেতা নিজের কাছে রাখতে পারে। কিন্তু তার জন্য শর্ত এই যে, প্রথমে দ্রব্যটি ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছ থেকে হস্তগত করতে হবে। অতঃপর বন্ধকী হিসেবে ক্রেতা নতুন করে বিক্রেতার কাছে তা সমর্পণ করবে।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন হতে পারে যে, ক্রেতা কর্তৃক দ্রব্যটি হস্তগত করার পর পূনরায় বন্ধকী হিসেবে বিক্রেতার নিকট সমর্পণ করা, আর দ্রব্যটি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় একথা বলা যে, এটি বন্ধকী হিসেবে আপনার হাতে থাক এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

ফিকাহশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'য়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কেননা ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত করার পূর্বপর্যন্ত এটি এমন বিক্রিত পণ্য হিসেবে গণ্য হবে যা বিক্রেতাকে সরবরাহ করা হয়নি। বিক্রিত পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করার পূর্বে

www.eelm.weebly.com

যদি বিক্রেতার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ক্রেতা উক্ত পণ্যের বাজারদর হিসেবে যা মূল্য দাড়ায় সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে এবং দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যখন ক্রেতা হস্তগত করার পর বন্ধকী হিসেবে বিক্রেতাকে তা সমর্পণ করবে তখন বিক্রেতার হাতে এটি বন্ধকী হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এমতাবস্থায় যদি দ্রব্যটি স্বভাবিক কারণে বিনষ্ট হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারণে দ্রব্যটি বিনষ্ট হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। বাজারদর হিসেবে যা মূল্য হয় সে পরিমাণ পরিশোধ করলে চলবে না। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলেও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিটি বাতিল হবে না।

আজকাল সিম্পল মর্টগেজ নামে নতুন এক ধরনের বন্ধকী প্রথার প্রচলন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যে বস্তু বন্ধক দেয়া হয় তা বন্ধকদাতার হাতেই থাকে এবং সে তা ব্যবহারও করতে পারে। তবে সে তা বিক্রি করতে বা অন্যকে ব্যবহার করতে দিতে পারে না। কিন্তু আইনানুগভাবে বন্ধক গ্রহীতার এই অধিকার থাকে যে, যথাসময়ে ঋণের টাকা আদায় না করলে সে তা বিক্রি করে ঋণের টাকা উসুল করে নিতে পারে।

সাধারণ নিয়মানুসারে বন্ধক হিসেবে প্রদত্ত বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে দিতে হয়। তা না হলে বন্ধকীর চুক্তি শুদ্ধ হয় না। তবে বৃহৎ মেশিনারী স্থানান্তর সমস্যাজনক হওয়ায় এটি রাখার জন্য স্থানের প্রয়োজন হয় বিধায় বন্ধক গ্রহীতা যদি তা বন্ধকদাতার নিকট রাখতে চায় তাহলে তা রাখতে পারবে। তবে বন্ধক গ্রহীতা সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে মেশিনটি যদি দেখে আসে এবং তার গায়ে অমুকের নিকট দায়বদ্ধ এ রূপ কোন লেবেল লাগিয়ে রেখে আসে তাহলে এটি তার হস্তগত করার সমার্থক হবে।

অনেক সময় ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে জামিন দেয়া হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে কিফালাহ (كفالة) বলা হয়। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। তবে যিনি কফীল বা জামিন হবেন তিনি এ বাবত কোন ফিস গ্রহণ করতে পারবেন না; করলে শরয়ী বিধানানুসারে তা না জায়েয হবে।

বাই-সলম (বা অগ্রিম ক্রয়) ঃ যে বেচাকেনায় মুল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয় দ্রব্য বাকী থাকে তাকে বাই-সলম বলে। বাই-সলম শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ এবং এই টাকার বিনিময়ে পরিশোধিতব্য দ্রব্য, ঐ দ্রব্যের পরিমাণ, গুণগত মান, কোন মাসের কত তারিখে কোন স্থানে দ্রব্য বুঝিয়ে দেয়া

www.eelm.weebly.com

হবে এসব বিষয় পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হয়। কৃষকরা চাষাবাদ করার জন্য পুঁজির সংকটে পড়লে ধনিক শ্রেণীর কাছে কৃষিজাত পণ্য এ ধরনের অগ্রিম বিক্রি করে দিত। ধনীরা এধরনের অগ্রিম ক্রয়ের দ্বারা দামের দিক থেকে যথেষ্ট রেয়ায়েত পেতেন।

এই ফর্মূলাটি শিল্পজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উদ্যোক্তারা পুঁজি সংকটের মুকাবিলা করতে পারে। এবং ব্যাংকগুলো এ ধরনের শর্তে শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত পণ্য অগ্রিম ক্রয় করে শিল্পোদ্যোক্তাদের নিকট পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে।

যেমন কোন সাবান কোম্পানীকে ১০ হাজার টাকা পুঁজি এই শর্তে দেয়া হল যে, আগামী জানুয়ারীতে এক হাজার একক সাবান ঢাকার তেজগাঁও ফ্যাক্টরি থেকে সরবরাহ করা হবে। যেহেতু অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হবে সেহেতু ব্যাংক দামে রেয়ায়েত পাবে। এই পণ্য বাজার দরে বিক্রি করে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে ব্যাংক যদি নিজে সাবান বিক্রি করার ঝামেলায় না যেতে চায় তাহলে ঐ কোম্পানীকেই সাবানগুলো বিক্রি করে দেয়ার জন্য স্বল্প কমিশনে এজেন্ট নিয়োগ করতে পারে।

৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা ঃ

সাধারণ ব্যাংকগুলো আমদানি রফতানি খাতে কি কি ভূমিকা পালন করে তা আমরা আলোচনা করে এসেছি। আমদানিকারকের ব্যাংক সাধারণত তিনটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। যথাঃ

১. আমদানিকারককে (L/C) প্রদান করে এবং এ বাবত সার্ভিস চার্য গ্রহণ করে শরীয়তের পরিভাষায় এটি কিফালাহ (كفالة) বলে গণ্য হয়। আর কফীল হিসেবে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সাধারণত বৈধ নয়।

২. আমদানীকারকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপালন করে এবং এ বাবত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। শরীয়তের পরিভাষায় এটি উকালত (وكالة) বলে গণ্য হয়। আর ওকালতের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে পরিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ।

৩. ঋণ দিয়ে তার সুদ গ্রহণ করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ গ্রহণ হারাম।

এ জন্য আমাদের দেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকগুলো আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও মধ্যস্থতা মুরাবাহার ভিত্তিতে করে থাকে। অর্থাৎ আমদানিকারক যে পণ্য আমদানি করার জন্য এলসি করতে আসে ব্যাংক তার সাথে এই মর্মে চুক্তি করে যে, দ্রব্যটির ক্রয়কারক হিসেবে আমাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হউক। আমরা আপনার নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করে শতকরা ৫ টাকা বা ১০ টাকা লাভে আপনাকে সরবরাহ করি। আর এলসি প্রদান,

www.eelm.weebly.com

প্রতিনিধিত্ব করণ, পুঁজি সরবরাহ ইত্যাদি যা কিছুর প্রয়োজন হবে আমরা আমাদের দায়িত্বে সম্পাদন করব।

যদি মুরাবাহার শর্ত-শরায়েতের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রেখে এ ধরনের লেনদেন করা হয় তাহলে আইনানুগভাবে এতে কোন সমস্যা থাকে না। তবে অনেক ফিকাহবিদ বিভিন্ন কারণে এ পদ্ধতিটি ভাল মনে করেন না। যেমন-

১. অনেক ক্ষেত্রে মুরাবাহার সকল শর্ত পূর্ণ করে লেনদেন করা সম্ভব হয় না। আর কার্যতঃ অনেক শর্ত পূর্ণও হয় না।

২. এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের খরিদদার হওয়ার বিষয়টি নিছক সাজানো লৌকিকতা হয় মাত্র। কারণ বাস্তবে আমদানিকারকের সাথে রফতানিকারকের চুক্তি পূর্বাহ্নেই সম্পাদিত হয়ে যায়। এবং সরকারি কাগজপত্রে খরিদদার হিসেবে আমদানি কারকই থাকেন। বিক্রেতাও ব্যাংককে খরিদদার মনে করে না বরং আমদানি কারককেই খরিদদার মনে করে।

৩. মুরাবাহার চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য ব্যাংককে প্রথমে দ্রব্যটি হস্তগত করতে হবে। অতপর তা ক্রেতা অর্থাৎ আমদানিকারককে সমর্পণ করতে হবে। কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে এ শর্তটি মেনে চলা হয় না।

এসকল কারণে আমদানি বাণিজ্যে মুরাবাহার পদ্ধতিটি তেমন পছন্দনীয় নয়।

এর বিকল্প হিসেবে শিরকত কিংবা মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যদি এলসি জিরো মার্জিনে করা হয় তাহলে মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হবে পুঁজির মালিক (رب المال) আর আমদানিকারক হবেন কারবারী (مضارب)। আর যদি ফুল মার্জিন এলসি হয় তাহলে আমদানি কারক হবেন পুঁজির যোগান দাতা আর ব্যাংক হবে কারবারী। আর যদি আংশিক মার্জিনে এলসি হয় তাহলে মুশারাকার পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হবে।

আমদানির পর পণ্য বিক্রি করে যে লভ্যাংশ আসবে তা পূর্ব নির্ধারিত হারে বন্টন করে নেয়া হবে।

এই চুক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেমন ৬ মাস বা এক বছরের জন্যও করা যেতে পারে। যদি নির্ধারিত সময়ের মাঝে সকল পণ্য বিক্রি না হয় তাহলে ব্যাংক তার কারবারের অংশ আমদানিকারকের নিকট বিক্রি করে দিবে। উভয়ে পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে দর দাম সাব্যস্ত করা হবে।

আর রফতানির ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত দু'টি দায়িত্ব পালন করে। যথা ঃ

১. রফতানিকারকের পক্ষে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে। এবং এ জন্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে ওকালতের দায়িত্ব পালনের জন্য পরিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ তাই এতে কোন অসুবিধা নেই।

www.eelm.weebly.com

২. রফতানিকারককে ঋণ দিয়ে সে বাবত সুদ গ্রহণ করে। এই ঋণ সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে ব্যাংকিং। যথা ঃ

ক. রফতানিকারককে পণ্য ক্রয় করে আমদানিকারকের বরাবরে প্রেরণের জন্য ঋণ দান। যাকে পরিভাষায় Pre shipment financing বলা হয়।

খ. পণ্য প্রেরণের পর আমদানিকারক থেকে পাওনা আদায় হয়ে আসার পূর্বে রফতানিকারকের টাকার প্রযোজন হলে তাকে ঋণ দান। যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় Past shipment financing বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার ঋণ দানের পক্রিয়া সাধারণত এই হয় যে, রফতানিকারক চুক্তি মুতাবেক পণ্যের মূল্যের যে বিল তৈরি করে সেটি ডিসকাউন্টে ব্যাংককে দিয়ে দেয়। ব্যাংক ডিসকাউন্ট করার পর যত টাকা অবশিষ্ট থাকে ততটাকা রফতানিকারককে দিয়ে দেয়। পরে যথাসময়ে ব্যাংক আমদানি কারক থেকে বিলের পূর্ণ টাকা আদায় করে নেয়। ফলে ব্যাংকের লাভ হয়। তবে ডিসকাউন্টের পরিমাণ কত হবে তা বিলের মেয়াদ পূর্ণ হতে যতদিন বিলম্ব থাকে তার ভিত্তিতে উভয়পক্ষের দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রি-শিপটমেন্ট বিনিয়োগের দু'টি পদ্ধতি হতে পারে।

১. অনেক ইসলামী ব্যাংক এ ধরনের ক্ষেত্রে রফতানির জন্য যে দ্রব্য রেডি করা হবে তা অগ্রিম ক্রয় করে ফেলে। রফতানিকারক আমদানিকারককে যে মূল্যে দ্রব্য সরবরাহ করবে বলে চুক্তি হয়েছে তার চেয়ে কিছু কম মূল্যে ব্যাংক তা ক্রয় করে নেয়। অতঃপর ব্যাংক ঐ দ্রব্য আমদানিকারককে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে (যা রফতানিকারকের সাথে ধার্য হয়েছিল) সবরাহ করে। এতে ব্যাংকের লাভ হয়। এ পদ্ধতিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যথা ঃ

ক. অনেক ক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয়ের যেসব শর্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপ করা হয়েছে তা পূর্ণ করা হয় না বা করা সম্ভব হয় না।

খ. ব্যাংক ও রফতানিকারকের মাঝে যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তা অনেকটা সাজানো লৌকিকতার মত। কারণ সরকারি কাগজপত্রে ব্যাংককে মূল রফতানি কারক হিসেবে গণ্য করা হয় না। তাছাড়া রফতানি বাণিজ্যের যেসকল সুযোগ সুবিধা সরকারিভাবে প্রদান করা হয় তা ব্যাংক পায়না; মূল রফতানিকারকই লাভ করে। আমদানিকারকও মূল রফতানি কারককে বিক্রেতা বলে গণ্য করে; ব্যাংককে নয়

এজন্য সরবরাহকৃত পণ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবি মূল রফতানিকারকের কাছেই জানানো হয়। ব্যাকের কাছে জানানো হয় না। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রফতানিকারক ও ব্যাংকের মাঝে যে বেচাকেনা

www.eelm.weebly.com

হয় তা অনেকটা লৌকিক পর্যায়ের; বাস্তব ভিত্তিক নয়। এ জন্যই অনেক ফিকাহবিদ এটি পছন্দনীয় নয় বলে মনে করেন।

২. এ ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হল মুদারাবা কিংবা শিরকতের পদ্ধতি অবলম্বন করা। যদি রফতানিকারক নিজে কোন পুঁজি বিনিয়োগকরে থাকে তাহলে মুশারাকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। আর যদি সে কোন পুঁজিই বিনিয়োগ না করে থাকে তাহলে মুারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা এই থাকে যে, আমদানিকারকের প্রার্থিত গুণ ও মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ না করার কারণে যদি আমদানিকারক পণ্য গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠায় তাহলে যে ক্ষতি হবে রাব্বুল মাল হিসেবে তার দায়ভার ব্যাংককেও বহন করতে হবে। এ সমস্যা নিরসণের জন্য মুদারাবার যে চুক্তি ব্যাংক ও রফতানিকারকের মাঝে হবে তাতে এই শর্ত সংযোজন করে দিতে হবে যে, রফতানিকারককে অবশ্যই আমদানিকারকের কাংখিত গুণ ও মান সম্পন্ন পণ্য প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক এর দায়ভার বহন করবে না। এ শর্ত আরোপ করার কারণে ব্যাংক এহেন ক্ষতির দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে মুদারাবা কিংবা শিরকতের পদ্ধতি অবলম্বন করে ঝুকিহীন লাভ করা যায় এবং লভ্যাংশ কত হতে পারে তা পূর্বাহ্নেই অনুমান করা যায়।

শিপমেন্টের পর রফতানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ বাবৎ অর্থ বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার বৈধ কোন বিকল্প পদ্ধতি অদ্যাবদি বের হয়ে আসেনি। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে রফতানিকারকের যে লেনদেন হয় তা মূলতঃ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন; যাতে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য এবং নগদানগদী লেনদেন করতে হয়। অথচ ডিসকাউন্ট করে বিলের পরিবর্তে টাকা নিয়ে নিলে দুটি শর্তই লংঘিত হয়। অবশ্য অনেক ফিকাহবিদ এটিকে বৈধ করার জন্য এরূপ ব্যখ্যা দিয়েছিলেন যে, ব্যাংককে যদি আমদানিকারক থেকে বিলের টাকা আদায় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় এবং সে বাবত তাকে মজুরী নির্ধারণ করে দেয়া হয় আর অবশিষ্ট টাকা রফতানিকারক ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নেয়, পরে যখন ব্যাংক আমদানিকারক থেকে বিলের টাকা আদয় করে আনবে তখন তার পারিশ্রমিক বাবত বরাদ্দকৃত টাকা কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা রফতানিকারককে হস্তান্তর করে তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করে নেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে।

কিন্তু এই পদ্ধতিটি প্রশ্নাতীত নয়। কেননা রফতানিকারকের ব্যাংকে Negotiating Bank হিসেবে আমদানিকারক থেকে টাকা আদায় করার দায়িত্ব পূর্ব থেকেই দেয়া আছে এবং এ বাবত তাকে সার্ভিস চার্জও প্রদান করা

www.eelm.weebly.com

হয়েছে। ঋণ নেয়ার পর পূনরায় আমদানিকারক থেকে পাওনা টাকা আদায়ের দায়িত্ব দেয়ার কোন অর্থ হয় না এবং এ বাবত প্রদত্ত টাকাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি বরং সুদকে বৈধ করার জন্য অহেতুক একটি তাবিল মাত্র; যা কোনভাবেই বৈধ হবে না। অতএব যতদিন শিপমেন্টের পর রফতানিকারকের কাছে টাকা বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়ার কোন বৈধ পন্থা বেরিয়ে না আসবে ততদিন ব্যাংককে এই খাতে বিনিয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

রফতানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। যাতে সাধারণ ব্যাংকগুলোও রফতানি কারকদেরকে স্বল্প সুদে ঋণ দিতে পারে। এটি অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন কোন রাষ্ট্রের স্টেইট ব্যাংক সরাসরি ঋণ না দিয়ে ব্যাংকের নামে একটি একাউন্ট খুলে দেয় এবং ট্রেজারি বিলের হিসেবে এ টাকা সাধারণ ব্যাংকের একাউন্টে জমা থাকে। এর বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংককে ১৩% বা ১৪% লাভ দিয়ে থাকে। এই লভ্যাংশ সাধারণ ব্যাংক গুলোর জন্য বৈধ হয়ে যাবে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে ঋণ বলে উল্লেখ করলেও বাস্তবে এখানে ঋণের কোন লেনদেন হয়নি। সুতরাং ১৩% অথবা ১৪% হারে প্রদত্ত টাকাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে রফতানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এই লভ্যাংশ অর্জনের জন্য সাধারণ ব্যাংকগুলোকে ৫% হারে বা এ ধরনের অন্যকোন হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। এটিও বাহ্যিকভাবে অতিরিক্ত প্রদানজনিত সুদ বলে গণ্য হবে।

এ ক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংককে প্রদেয় লভ্যাংশ থেকে ঐ ৫% কর্তন করে রেখে বাকী অংশ প্রদান করে তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। কেননা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধরাণ ব্যাংককে যে পরিমাণ টাকা ঋণ দেয় তাকে রফতানি বাণিজ্য গতিশীল করার লক্ষ্যে পুরস্কার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। আর যে টাকা পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে তার পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার অধিকার পুরস্কারদাতার রয়েছে। সুতরাং ১৩% লাভ না দিয়ে ঐ ৫% কমিয়ে যদি ৮% সাধারণ ব্যাংককে দেয়া হয় তাহলে তা সাধারণ ব্যাংকের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।

তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ পন্থা হল রফতানি খাতের ঋণ সাধারণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান না করে সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রদান করা। কেননা রফতানি বাণিজ্যের সাথে দেশের সকল অঞ্চলের মানুষ জড়িত থাকে না সাধারণত রাজধানী, কেন্দ্রীয় নগরী ও বন্দর নগরী সমূহে অবস্থানরত লোকেরাই রফতানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকে। আর এ ধরনের নগর গুলোতে কেন্দ্রীয়

www.eelm.weebly.com

ব্যাংকের শাখা থাকে। আর না থাকলে একটি করে শাখা অফিস খুলে নিলেই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হবে।

৪. বিল বাট্টাকরণ ঃ

ব্যাংকগুলো বিল বাট্টাকরণ ও মুদ্রা বিনিময়ের কাজও আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এজন্য যদি সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ ক্রেতা কর্তৃক এনডোর্সমেন্টের পর বিলগুলো ডিসিকাউন্টে বিক্রি করা হয়। ব্যাংক পরে নির্ধারিত তারিখে ক্রেতা থেকে পূর্ণ টাকা আদায় করে নেয়, এটি যেহেতু মুদ্রার লেনদেন তাই এ পদ্ধতিতে বেচাকেনা বৈধ হবে না। তবে এনডোর্সমেন্টকৃত বিলের টাকা যথা সময়ে ক্রেতা থেকে আদয় করে দেয়ার দায়িত্ব যদি ব্যাংক নিয়ে নেয় এবং এবাবৎ যদি ব্যাংক সার্ভিস চার্জ দাবী করে আর বিলের মালিককে সার্ভিস চার্জ বাদে অবশিষ্ট টাকা ঋণ দিয়ে দেয় এবং ঋণ আদায়ের গ্যারান্টি হিসেবে যদি নির্ধারিত তারিখ আসার পূর্ব পর্যন্ত বিলটি বন্ধকী হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়; অতঃপর নির্ধারিত তারিখ আসলে ক্রেতার কাছ থেকে টাকা আদায় করে বিলের মালিককে তা হস্তান্তর করার পর তৎক্ষণাৎ যদি ঋণের টাকা আদায় করে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে। মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বৈধ প্রক্রিয়া কি হবে তা আমরা মুদ্রা অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তথায় দ্রষ্টব্য।

৫. বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টিঃ

বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টির বিষয়টি বৈধ হবে। কেননা হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় কোন কোন লোক থেকে দিরহাম গ্রহণ করতেন এবং ইরাকে অবস্থানরত তার ভাই মুস'আব ইবনে যুবায়েরকে চিরকুট লিখে দিতেন। ইরাকে পৌঁছে তারা হযরত মুস'আব (রা.)-এর কাছ থেকে ঐপরিমাণ মুদ্রা নিয়ে নিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেননি মর্মে জবাব দেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রদত্ত ঐ চিরকুট ও আধুনিক চেকের মাঝে মূলগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং চেক ব্যবহার করে বিনিময়ের বিকল্প মাধ্যম সৃষ্টি নজীর শরীয়তে আছে একথ অনায়াসে বলা যায়।

ঋণ নিয়ে যথাসময়ে আদায় না করলে ইসলামী ব্যাংকের করণীয় ঃ

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা যথাসময়ে আদায় না করলে সাধারণ ব্যাংকগুলোতে সুদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সুদ থেকে বাঁচার তাগিদেই মানুষ ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। কেননা ব্যাংকের এই সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। ফলে অল্প

www.eelm.weebly.com

দিনেই তা বিশাল অংক হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামে যেহেতু সুদ বৈধ নয়: অতএব ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদ বৃদ্ধিজনিত চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। তাহলে ঋণ খেলাপী ব্যক্তিদের থেকে ঋণ আদায়ের জন্য অন্য কি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর করণীয় এই যে, ঋণ খেলাপীর বিষয়টি যদি অনিচ্ছাকৃত হয় এবং একান্তই অপারগতার কারণে যথা সময়ে ঋণ আদায় করতে অক্ষম হয়; তাহলে এ ধরণের ব্যক্তিদেরকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে অবশ্যই অবকাশ দিতে হবে। কেননা এ ব্যাপরে আল্-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।- ইরশাদ হয়েছে- ان كانت ذو عسرة فنظرة الى ميسرة যদি ঋণীব্যক্তি একান্তই অভাবী হয় তাহলে তাকে সাচ্ছন্দ ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। আর যদি বিষয়টি সে পর্যায়ের না হয় বরং তার নিকট ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রয়েছে; কিন্তু যে কোন কারণে সে এই ঋণ পরিশোধ করতে টালবাহানা করছে, তাহলে তাকে সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। উক্ত সময়ের মাঝে সে এই ঋণ পরিশোধ না করলে উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যংকের টাকা আটকিয়ে রাখছে একথা সাব্যস্ত হবে। আর এ ভিত্তিতে তার উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা যাবে বলে অনেক আলেম মতামত দিয়েছেন। এই ক্ষতিপুরণ সাধারণত ব্যাংক বাৎসরিক শতকরাগড়ে যে হারে লাভ করবে সে হারে ধার্য করা হবে। যেমনঃ ব্যাংকের বাৎসরিক নীট মুনাফা যদি ১০% হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর ১০% হারে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। কিন্তু যদি এ সময়ে ব্যাংকের কোন লাভ না হয়ে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না। তবে অধিকাংশ আলেম উলামা এই ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিটি পছন্দ করেননি। কারণ বাহ্যিকভাবে এই ক্ষতিপূরণ ধার্য করা দ্বারা ব্যাংকের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন সুফল লক্ষ করা যায় না। কেননা সাধারণতঃ নীট মুনাফা মুদারাবা কিংবা মুরাবাহার চুক্তিতে ধার্যকৃত লভ্যাংশের অনুপাতে কম আসে। অতএব সাধারণ কারণেই মানুষ স্বল্প মেয়াদে মুবরাবাহা কিংবা মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা নিয়ে যথা সময়ে পরিশোধ না করে ঋণ খেলাপী সাব্যস্ত হবে এবং নীট মুনাফার হারে ক্ষতিপুরণ দিয়ে যেতে থাকবে। এতে বরং তার লাভই হবে। সুতরাং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিলম্বরোধে এ পদ্ধতিটি খুব সুবিধাজনক নয়।

এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হিসেবে আল্লামা তকী উসমানী (মুদ্দা.) একটি পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। পদ্ধতিটি এইযে, মুরাবাহা, মুদারাবা, কিংবা ইজারা ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের চুক্তিতে ঋণ গ্রহীতা থেকে এ মর্মে

www.eelm.weebly.com

একটি অঙ্গিকার গ্রহণ করা যেতে পারে যে, যদি আমি যথাসময়ে ঋণ আদায় না করি তাহলে জনকল্যাণ ফান্ডে এত টাকা ব্যয় করব। জনকল্যাণ ফান্ডে প্রদেয় টাকার পরিমাণ ঋণের শতকরা হারের ভিত্তিতেও নির্ধারণ করা যেত পারে এবং কম-বেশী যে কোন হার ধার্য করা যেতে পরে। সুতরাং হার বেশী ধার্য করা হলে ঋণ গ্রহীতার ঋণের উপর বর্ধিত টাকার চাপ বাড়বে। ফলে ঋণ যথা সময়ে আদায়ের ব্যাপারে তা যথেষ্ট সাহায়ক প্রমাণিত হবে।

এ পদ্ধতিটি শরীয়তের দৃষ্টিতেও অবৈধ হবে না। কেননা ঋণ গ্রহীতা জনকল্যাণমূলক খাতে যে টাকা ব্যয় করবেন বলে অঙ্গিকার বরবেন, সেটা তার উপর জরিমানাও নয় কিংবা সেটা সুদও নয়। বরং এটি কোন দায়িত্ব নিজের জন্য অপরিহার্যভাবে পালনীয় বলে গ্রহণ করে নেয়া। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় يمين اللجاج বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাতেব (রাহ.) 'তাহ্‌রীরুল কালাম ফী মাসাইলিল ইল্‌তিযাম' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে-

اما اذا التزم المدعي عليه للمدعي انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا من المال فهذا لا يختلف في بطلانه لا نه صريح الربا الي قوله واماذاالتزم انه ان لم يوفه في وقت كذا فعليه كذا لفلان او صدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور انه لا يقضي به كما تقدم وقال ابن دينار يقضي به صفحة- ١٧٦

অর্থাৎ যদি কোন ঋণগ্রহীতা এরূপ দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে উঠিয়ে নেয় যে, যদি অমুক তারিখে পাওনাদারকে পাওনা টাকা পরিশোধ না করে তাহলে পাওনাদারকে আরো এত টাকা দেয়া তার জন্য অপরিহার্য হবে; তাহলে এটি অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। কেননা এটি সুস্পষ্ট সুদ। তবে যদি ঋণগ্রহীতা এরূপ কোন দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে উঠিয়ে নেয় যে, যদি অমুক তারিখে সে পাওনা টাকা পরিশোধ না করে তাহলে সে অমুক ব্যক্তিকে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে কিংবা এত টাকা গরীব মিসকিনদের জন্য সাদকাহ করতে। এটি বৈধ হবে কি না এ ক্ষেত্রেই মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। (আর এ বিষয়টির উল্লেখ করার জন্যই এ অধ্যায়টি অত্র গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে)। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মত এই যে, ঋণগ্রহীতা নিজ স্কন্ধে যে দায়িত্ব নিজে চাপিয়ে নিয়েছেন তা আদায় করা তার জন্য আইনগতভাবে অপরিহার্য নয়। তবে আল্লামা ইবনে দীনার বলেন যে, এ দায়িত্ব তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

বা দীনী দাবী অনুসারে সকলেই এটি আদায় করে دیانۃএ থেকে বুঝা যায় যে দেয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। তবে আইনগতভাবে আদায় করা অপরিহার্য কি না এ নিয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মতানৈক্য রয়েছে। তন্মধ্যে একদল ফিকাহবিদ নিজ স্কন্ধে বর্তানো এরূপ দায়িত্ব আদায় করে দেয়া অপরিহার্য বলে

www.eelm.weebly.com

মনে করেন। বর্তমান সমস্যাটির নিরসনের জন্য যারা আইনগতভাবে এ দায়িত্ব পালন করা অপরিহর্য বলে মনে করেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমল করা যেতে পারে।

ব্যাংক নিজে একটি জনকল্যাণ ফান্ড গঠন করে এই টাকা উক্ত ফান্ডে জমা করতে পারবে এবং এ দ্বারা বিভিন্ন জনক্যাণমূলক কাজ যেমন-বিনাসুদে ঋণ দান, বিভিন্ন ধরণের অভাবী ও দুঃস্থ পীড়িত মানুষকে দান কিংবা অন্য কোন কল্যাণকর কাজে ব্যায় করতে পারবে। তবে এটাকা ব্যাংক কিছুতেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করে দিলে বিশেষ রেয়ায়েতের সুবিধা ঃ

সুদী ব্যাংকগুলোতে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যদি কেউ তা পরিশোধ করে দেয় তাহলে সুদের হারে বিশেষ রেয়ায়েত দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইজারা মুরাবাহা ইত্যাদির চুক্তিতে যে ঋণ নেয়া হবে তা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধ করে দিলে এ ধরণের বিশেষ রেয়ায়েতের ব্যবস্থা করা যাবে কি না?

ضع وتعجيل শিরোনামে একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে যদি কেউ পাওনা টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে পাওনার পরিমাণ হ্রাস করে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা পরিশোধ করে নিতে চায় তাহলে তা করা তার জন্য বৈধ হবে কি না? এ প্রশ্নে ফিকাহবিদদের মতভিন্নতা রয়েছে। তবে অধিকাংশ ফিকাহ্বিদ মনে করেন যে, এটি বৈধ হবে না। অবশ্য বর্তমান কালের ফেকাহবিদদের মধ্যে কেউ কেউ মুরাবাহা-এ-মুআজ্জালার ক্ষেত্রে যথা সময়ের পূর্বে পাওনা পরিশোধ করে দিলে নির্ধারিত মূল্য থেকে কিছু হ্রাস করে দেয়া বৈধ হবে বলে মত দিয়েছেন। তবে এটি করা হলে বাহ্যত সূদী অর্থ ব্যবস্থার সাথে এর তেমন একটা পার্থক্য থাকবে না। তাই চুক্তিতে এরূপ কোন শর্ত থকা সঙ্গত হবে না। তবে যদি কেউ যথাসময়ের পূর্বে পাওনা পরিশোধ করে দেয় তাহলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যদি ব্যাংক কিছুটা বিরেইট বা মূল্যহ্রাস করে দেয়, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। -ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ও তিজারাত ১৪৫-১৪৬

www.eelm.weebly.com

দ্বাদশ অধ্যায়

বীমা (INSURANCE)

বীমার সংজ্ঞা ঃ বীমার আভিধানিক অর্থ হল গ্যারান্টি দেয়া, নিশ্চয়তা প্রদান করা। পরিভাষায় "বীমা হল এক ধরণের অর্থ লেনদেনের চুক্তি, যাতে ভবিষ্যতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার গ্যারান্টির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কিস্তিতে টকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।" যে সংস্থা ক্ষতিপূরণ দেয়ার শর্তে টাকা গ্রহণ করে তাকে বলা হয় বীমা কোম্পনী।

বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে চুক্তি মুতাবিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়া হয় অথবা পূর্ণ মেয়াদে উক্ত ব্যক্তি যত টাকা জমা করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল সেই পরিমাণ টাকা বীমাকারীকে বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয়। আর যদি এরূপ কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বীমাকারীকে জমাকৃত টাকা সুদসহ ফিরিয়ে দেয়া হয়; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা না ঘটলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ার পর বীমাকারীকে কিছুই ফেরৎ দেয়া হয়না।

বীমার সূচনা ঃ কথিত আছে যে, চতুর্দশ শতকের এদিকে বীমা পদ্ধতির সূচনা হয়। তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাগর পথে মালামাল প্রেরণ করা হত। অনেক সময় পণ্যবাহী জলজাহাজ ডুবে গিয়ে মালামাল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রগ্রস্থ হয়ে যেত। জলজাহাজের এহেন ক্ষতিতে ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে যেত। এ ধরণের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের জন্য সর্ব প্রথম বীমা পদ্ধতির সূচনা হয়। আল্লামা শামী (রহ.)ও নিরাপত্তার বিধান সংক্রান্ত আলোচনায় سوكرة নামে এই বীমার কথা উল্লেখ করেছেন।

বীমার শ্রেণীভেদ ঃ

যেসকল বিষয়ে দুর্ঘটনার মুকাবেলায় ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় সেসকল বিষয়ের প্রেক্ষিতে বীমাকে মৌলিকভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. দ্রব্যসামগ্রীর বিপরীতে বীমা বা (Goods insurance) ঃ গাড়ী, বাড়ী, জাহাজ, ফ্রিজ, টিভি, কম্পিউটার, ইত্যাদির বীমা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রব্যসামগ্রীর বীমার করার পদ্ধতি হল, বীমাকারী যে দ্রব্যের বীমার করতে চায়; বীমা কোম্পানী উক্ত দ্রব্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে যে, সেটি স্বাভাবিকভাবে কত বছর পর্যন্ত চলতে পারে। অতঃপর উক্ত সময়ের জন্য কোম্পানী এ মর্মে গ্যারান্টি

www.eelm.weebly.com

প্রদান করে যে, যদি এই মেয়াদের মাঝে উক্ত দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা কোম্পানীর ব্যয়ে মেরামত করে দেয়া হবে; কিংবা যদি সেটি কোন কারণে একেবারে নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে অনুরূপ একটি দ্রব্য কোম্পানী বীমাকারীকে ক্রয় করে দিবে। এবাবৎ বীমাকারীকে ঐ নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বীমা কোম্পানীর বরাবরে মাসিক কিংবা ত্রৈমাসিক অথবা বাৎসরিক কিস্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে যেতে হয়। মোট টাকার পরিমাণ ও মাসিক বা ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ উভয় পক্ষের মতামত সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হয়। মাসিক বা বাৎসরিক কিস্তিকে তাদের পরিভাষায় প্রিমিয়াম বলা হয়।

যদি নির্ধারিত সময়ের মাঝে উক্ত দ্রব্য নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে বীমা কোম্পানী তা মেরামত করে দেয় কিংবা তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়। আর যদি উক্ত দ্রব্য নষ্ট বা ধ্বংস না হয় তাহলে জমাকৃত টকার বিনিময়ে কোম্পানী বীমাকারীকে কিছুই ফিরিয়ে দেয় না।

২. দায়-দায়িত্বের বিপরীতে বীমা বা (Third party Insurance) ঃ এর অর্থ হল ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তির উপর কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণের দায়ভার চেপে বসতে পারে এই আশংকায় বীমা করা। যেমন কোন ব্যক্তি রোডে গাড়ী নামাবে। এই গাড়ী এক্সিডেন্ট করার কারণে যদি কোন ব্যক্তির প্রাণহানী ঘটে তাহলে গাড়ীর মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এজন্য গাড়ীর মালিক গাড়ীর বিপরীতে বীমা করে রাখেন এবং নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে যান। যদি উক্ত গাড়ী এক্সিডেন্ট করে কারো প্রাণহানী ঘটায় তাহলে বীমা কোম্পানী তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়। আর যদি এরূপ কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে বীমাকারী জমাকৃত টাকাকর বিনিময়ে কিছুই ফেরৎ পায় না।

৩. জীবন বীমা (Life Insurance) ঃ কোন ব্যাক্তি তার জীবনের বিপরীতে বীমা করতে পারে। বীমা কোম্পানীর কাছে জীবন বীমার আবেদন পেশ করলে কোম্পানী তাদের ডাক্তার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির পূর্ণ বডি চেকআপ করিয়ে দেখে নেয় যে, তার এমন কোন জটিল ব্যাধি আছে কি না যার কারণে তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটতে পারে। যদি এরূপ কিছু না থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে কত দিন বাঁচতে পারে এর অনুমান করা হয় এবং সেই মেয়াদের জন্য তার জীবনের বীমা করা হয়। বীমাকারী নির্দিষ্ট হারে মাসিক বা বাৎসরিক প্রিমিয়াম পরিশোধ করে যেতে থাকেন। যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তাহলে পূর্ণ মেয়াদে বীমাকারী যত টাকা জমা করার চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন ততটাকা তৎকর্তৃক নিযুক্ত নমিনী বা তার উত্তরাধীকারীদেরকে প্রদান করা হয়। আর যদি উক্ত মেয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তির

www.eelm.weebly.com

মৃত্যু না ঘটে তাহলে পূর্ণ মেয়াদে জমাকৃত প্রিমিয়ামের সমুদয় টাকা উক্ত সময়ের বাৎসরিক সুদসহ যত টাকা হয় ঐ পরিমাণ টাকা বীমাকারীকে প্রদান করা হয়। আজকাল বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিপরীতেও বীমা করা হয়ে থাকে।

বীমা কোম্পানীর শ্রেণীভেদ ঃ

বীমা কোম্পানীগুলোকে তাদের কর্মপদ্ধতি ও গঠন প্রণালী হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. **কমার্শিয়াল বীমা ঃ** যে বীমা কোম্পানী অর্থের লেনদেনের মাঝ দিয়ে মধ্যস্বত্ত্ব ভোগ ও আর্থিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তাকে বলা হয় কমার্শিয়াল বীমা। এ ধরনের কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের বীমার স্কীম চালু করে থাকে। এ সকল বীমার প্রিমিয়াম হিসেবে যে টাকা তাদের কাছে জমা হয় তা তার উচ্চ হারে সুদের ভিত্তিতে পুঁজির সংকটে নিপতিত ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের নিকট বিনিয়োগ করে মুনাফা কামায়। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চসুদের শর্তে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারও তারা ক্রয় করে থাকে। এ ধরনের ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ক্ষতিপুরণের আশ্বাস হল মানুষের টাকা বীমা কোম্পানীতে জমা করার এক ধরনের প্রলোভন। বাস্তবে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেও কম। আর ঘটলেও ঐ টাকা দিয়ে কোম্পানী ব্যবসা করে যে মুনাফা কামায় তার তুলনায় ক্ষতিপুরণ বাবৎ বীমাকারীদেরকে যা দিতে হয় সেটা খুবই নগণ্য।

২. **গ্রুপ ইন্সুরেন্স ঃ** এক ধরণের পেশায় নিয়োজিত কিংবা কোন এক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকদের ঘটনা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার মানসে তাদের আয়ের একাংশ মাসিক প্রিমিয়াম হিসেবে জমা করার মাধ্যমে একটি ফান্ড গড়ে তোলা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্যও সরকারি ব্যাবস্থাপনায় এরূপ গ্রুফ ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা কোন কোন দেশে রয়েছে। আমাদের দেশেও কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এরূপ ইন্স্যুরেন্স ফান্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কর্মচারীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তার উত্তরাধীকারীদেরকে উক্ত ফান্ড থেকে মোটা অংকের টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। কিংবা যদি কোন কর্মচারী কোন দুর্ঘটনার শিকার হয় তাহলে তাকেও মোটা অংকের টাকা পরিশোধ করা হয়। অবশ্য কাকে কত টাকা পরিশোধ করা হবে তা উক্ত ব্যক্তির চাকুরীর র‍্যাঙ্ক ও মেয়াদকাল ইত্যাদির বিচারে ফান্ডের পরিচালনা বোর্ড নির্ধারণ করে থাকে। আজকাল সাধারণতঃ এই ফান্ডের টাকা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়া হয়। কিংবা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করা হয়।

www.eelm.weebly.com

৩. পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা ঃ একই ধরনের ক্ষতির আশংকা সম্বলিত ব্যক্তিরা মিলে একটি ফান্ড এই উদ্দেশ্যে গঠন করে থাকেন যে, সদস্যদের কেউ যদি কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে এই ফান্ড থেকে তার ক্ষতিপুরণ আদায় করা হবে। অবশ্য কি ধরনের দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং সর্বোচ্চ কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে নির্ধারিত কতিপয় বিধি বিধানের আওতায় এ ফান্ড পরিচালিত হয়। এই ফান্ডে কেবল মাত্র সদস্যদের প্রিমিয়াম জমা নেয়া হয় এবং কেবলমাত্র সদস্যদের কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাকেই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। বৎসরান্তে হিসাব করে যদি দেখা যায় যে, ক্ষতিপুরণ দেওয়ার পর টাকা অবশিষ্ট রয়েছে তাহলে সে টাকা সদস্যদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয় কিংবা ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা হয়। আর যদি জমাকৃত টাকার চেয়েও অধিক টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বরাদ্ধ করতে হয় তাহলে অতিরিক্ত টাকা সদস্যদের থেকে আদায় করে দেয়া হয়। এই ফান্ডের টাকাও আজকাল বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

বীমার সুফল ও কুফল

বাহ্যত অর্থনীতিতে বীমার অনেকগুলো সুফল পরিলক্ষিত হয়। আবার এর ক্ষতিকর দিকগুলোও খুব মারাত্মক। আমরা বীমার সুফল ও কুফলসমুহ নিম্নে তুলে ধরছি।

বীমার সুফলঃ

বীমার পক্ষে যারা প্রচারণা চালায়, তারা বীমার দ্বারা নিম্নল্লিখিত অর্থনৈতিক সুফলসমূহের কথা উল্লেখ করে থাকেন।

১. পুঁজি গঠনে সহযোগিতা ঃ বীমার মাধ্যমে জনগণের নিকট বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুঁজিসমূহ একত্রিত হয়ে বৃহত্তর উৎপাদনী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য মূলধন হিসেবে মওজুদ হয়। ফলে এই মূলধন ব্যবহার করে বৃহৎ মানের উৎপাদনী উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এতে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করে, মানুষ উপকৃত হয়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

২. উৎপাদনী উপকরণসমূহ সচল থাকে ঃ যখন কোন কারখানা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায় কিংবা অন্য কোন বিপর্যয়ের শিকার হয়; আর উদ্যোক্তার নিকট তা পূণঃপ্রতিষ্ঠা ও মেরামত করার পূঁজি না থাকে তখন কারখানাটি অচল হয়ে পড়ে এবং এর সকল উৎপাদনী উপকরণ নিশ্চল ও স্থবির হয়ে পড়ে; ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু উক্ত কোম্পানীর বীমা করা থাকলে বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত্ব ক্ষতিপূরণ দ্বারা কারখানাটি পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার উৎপাদনী কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

www.eelm.weebly.com

৩. **বিপদাপদে নির্ভরতা ঃ** বিনিয়োগকারী সবসময় এই উৎকণ্ঠার মাঝে থাকে যে, কখন তার বিনিয়োগ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়- যার পরিণতিতে তাকে সর্বস্ব হারাতে হয়। কিন্তু বিনিয়োগ প্রকল্পের বীমা করা থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পথে বসার উৎকণ্ঠা থেকে বিনিয়োগকারী বেঁচে থাকতে পারে এবং নিশ্চিন্ত মনে যে কোন খাতে টাকা বিনিয়োগ করতে পারে।

৪. **মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ ঃ** যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন মানুষের হাতে টাকা বেশী থাকে। যদি তারা সেই টাকা বীমার উদ্দেশ্যে জমা করে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আবার যখন মুদ্রা সংকট দেখা দেয় তখন বীমা কোম্পানী মানুষকে ঋণ সরবরাহ করে; ফলে মুদ্রা সংকট হ্রাস পায়। এভাবে বীমার মাধ্যমে দেশের মুদ্রামান নিয়ন্ত্রিত থাকে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা পায়।

৫. **পূর্ণ নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি ঃ** কোন প্রতিষ্ঠানকে কেউ সুদের ভিত্তিতেও ঋণ দিতে উৎসাহ বোধ করে না যতক্ষণ না প্রদত্ত্ব ঋণ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এই নিশ্চয়তার জন্য ঋণ গ্রহীতা থেকে অন্য সম্পদ বন্ধক (الرهن) রাখা হয়। কিন্তু এই বন্ধকী বস্তু ঋণদাতার নিকট রক্ষিত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস হলে তার দায়ভার ঋণদাতাকেই বহন করতে হয়। ফলে বন্ধক রাখাও নিরাপদ মনে করা হয় না। কিন্তু যে দ্রব্য বন্ধক রাখা হবে, যদি তার বীমা করা থাকে তাহলে তা বন্ধক রাখতে ঋণদাতার কোনরূপ ভাবনা থাকে না। কেননা তা ধ্বংস হলেও বীমা কোম্পানী তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে। এভাবে বীমা করার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে অধিক নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

৬. **সার্বজনীন নিরাপত্তা ঃ** বীমা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই নিরপত্তার প্রতীক হয়ে থাকে। কেননা শিল্পপতি তার শিল্পের বীমা করে নিশ্চিন্ত মনে উৎপাদন করে যায়। পুঁজি বিনিয়োগকারীরাও তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি আকস্মিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার ভাবনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। পণ্যের বীমা করা থাকলে ক্রেতা বিক্রেতারা নিরাপদে ক্রয় বিক্রয় করতে পারে। শ্রমিক ও কর্মচারীদের বীমা করা থাকলে তারা নিরাপদে ভাবনাহীন মনে শ্রম দিয়ে যেতে পারে। এভাবে বীমার মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষ ভাবনাহীন নিরাপত্তার জীবন লাভ করতে পারে।

বীমার কুফল ঃ

বীমার বাস্তবতা সম্পর্কে যারা গভীর জ্ঞান রাখেন এ ধরনের অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা বীমার নিম্নোক্ত কুফলসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন।

www.eelm.weebly.com

এক ঃ দ্বীনি ক্ষতি

ক. সুদী কারবারে লিপ্ত হওয়া ঃ সাধারণতঃ ব্যবসায়ী বীমাসমূহে সুদী প্রক্রিয় অবলম্বিত হয়ে থাকে। আর সুদী লেনদেনে জড়িয়ে পড়া তা বাহ্যিকভাবে যত লাভজনকই হোক না কেন এর অর্থ হল হারামে লিপ্ত হওয়া। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতি বহুমুখী। দুনিয়ায় বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া, বিপদাপদে জড়িয়ে পড়া, লাঞ্চনা ও বিড়ম্বনার শিকার হওয়া, পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়া। উপরোল্লিখিত নিশ্চিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য ক্ষতি হতে পারে এই আশংকা নিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে জীবন পথের পাড়ি দেয়া একজন মুমিনের নিকট অধিক শ্রেয়।

খ. জুয়ায় লিপ্ত হওয়া ঃ জুয়া বলা হয় এমন লেনদেনকে যাতে লাভবান হওয়া বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া দুটোরই সম্ভাবনা থাকে এবং এক পক্ষের লাভ অপর পক্ষের ক্ষতির উপর নির্ভর করে। বীমা মূলতঃ সে ধরনেরই একটি চুক্তি। কেনেনা এ দ্বারা কোন সময় বীমাকারী জিতে যায় আবার কোন সময় বীমা কোম্পানী জিতে যায়। সুতরাং এটি নিষিদ্ধ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর জুয়ার দ্বারা কি কি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি হয় তা আমারা জুয়ার অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি। সেথায় দ্রষ্টব্য।

গ. প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ঃ বীমার প্রচারণা থেকে শুরুকরে সর্বক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতারণা বিদ্যমান। বীমার প্রচারকরা সকল ক্ষেত্রের সম্ভাব্য আশঙ্কাগুলোর কথা এমনভাবে তুলে ধরেন, যেন এই বিপদ আসবেই। আর তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এখনই প্রস্তুতি নিয়ে নেয়া প্রয়োজন। তাদের এই মিথ্যা প্রচারণায় ধোকা খেয়ে মানুষ বীমা কোম্পানীতে টাকা জমা করতে উৎসাহিত হয়। অথচ সেই আশঙ্কা কিংবা বিপদ জীবনে হয়ত কোন দিনই আসে না।

তাদের প্রচারকরা এভাবে কথা বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্থ হলেই বীমাকারী ঘরে বসে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গেলে দেখা যায় যে, সেখানে এমন এমন শর্ত-শরায়েতের মারপেচ রয়েছে যে, সেই মারপেচ উৎরে খুব কম লোকই ক্ষতিপুরণ পেয়ে থাকে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপুরণের টাকা যাতে না দিতে হয় সে জন্য বীমা কোম্পানী বিভিন্ন ধরণের প্রতারণা, ছলচাতুরী ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। আবার যারা বীমা করে, বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করার জন্য তারাও বিভিন্ন ধরনের ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

www.eelm.weebly.com

দুই ঃ অর্থনৈতিক ক্ষতি

ক. সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়া ঃ বীমা দ্বারা সম্পদ গুটিকতক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়লে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কি ধরনের বিপর্যয় দেখা দেয় তা আমারা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি- যে দেশের মানুষ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধনীদের শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অভাবী মানুষ তাদের গোলামে পরিণত হতে বাধ্য হয়।

খ. বীমা বিনিময়হীন শোষণ ঃ যারা বীমা করে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে মারাত্মকভাবে শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বীমা করে লাভবান হয় এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য আর যে সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকায় বীমা কোম্পানীতে টাকা জমা করা হয় সেই ক্ষতি শতকরা ১০% ও সংঘটিত হয় না। আবশিষ্ট ৯০% লোকের টাকা বীমা কোম্পানী কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই শুধুমাত্র দুর্ঘটনার আশংকা আছে এই ভয় দেখিয়েই নিয়ে নেয়। এও এক ধরণের ডাকাতী। ডাকাতরা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মানুষের পকেটের টাকা হাতিয়ে নেয়। আর বীমা কোম্পানী বিপদের আশংকা আছে এই ভয় দেখিয়ে মানুষের পকেটের টাকা হাতিয়ে নেয়। যদি সম্ভাব্য আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার কথাই চিন্তা করা হয়, তাহলে এই টাকা বীমা কোম্পানীতে জমা না দিয়ে বীমাকারী নিজের কাছে সঞ্চিত রেখেও সম্ভাব্য ক্ষতির মুকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে পারে। উপরন্তু এই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে নিজে অধিক হারে লাভবান হতে পারে।

গ. বীমা সর্বগ্রাসী শোষণ ঃ বীমা কোম্পানীগুলো জমাকৃত টাকা উচ্চ সুদে উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ দেয়। আর সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে যারা পণ্য উৎপাদন করে তারা পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে ঋণের সুদ ও তার লাভ দুটোই যোগ করে পণ্য বাজারজাত করে। এই পণ্য ক্রয় করে উচ্চ হারে সুদের ভর্তূকী দেয় দেশের সর্বসাধারণ। এভাবে বীমার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষ শোষিত হয়ে থাকে এবং সম্পদ চলে যায় শ্রেণীবিশেষের হাতে।

ঘ. বীমা দ্বারা সম্পদ ধ্বংসের প্রবণতা বাড়ে ঃ যারা বীমা করে তাদের অনেকেই বীমা কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্যের বিপরীতে বীমা করা হয় তা ধ্বংস করে দেয়। আর এটা তখনই করা হয় যখন বীমাকৃত দ্রব্যটি বাজারে অচল হয়ে যায়, কিংবা তার স্বাভাবিক মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, অথবা তাতে যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয়। আবার অনেক সময় গুদামে অল্প পণ্য রেখে নিজেই আগুন ধরিয়ে দিয়ে অধিক পরিমাণ পণ্য ছিল বলে দাবী করা হয়

www.eelm.weebly.com

এবং বীমা কোম্পানী থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করার চেষ্টা করা হয়। এভাবে দেশের বহুসম্পদ অকারণে ধ্বংস হয়। সম্পদ ধ্বংসের এই প্রবণতা দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

ঙ. বীমার বাধ্যবাধকতার কারণে উৎপাদনী উদ্যোগ ব্যাহত হয় ঃ পৃথিবীর অনেক দেশেই আজাকাল ব্যবসায়ে বা কারিগরি প্রতিষ্ঠানের বীমা না করলে সরকারীভাবে অনুমোদন দেয়া হয় না। আর বীমার ঝামেলাও কম নয়। কারণ একদিকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মূলধনের প্রয়োজন হয়। আবার বীমা করার জন্য প্রায় তার সমপরিমাণ টাকা বীমা কোম্পানীতে জমা করতে হয়। (যদিও এক সাথে নয় কিস্তির ভিত্তিতে)। ফলে উদ্যোক্তাদের উপর এটা অনেক সময় বোঝা হয়ে যায়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকদের বেলায় এই সমস্যা বেশী হয়ে থাকে। এই সমস্যার কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকলেও উৎপাদনী উদ্যোগ গ্রহণ করে না। ফলে ঐসব ব্যক্তিদের উৎপাদনী উদ্যোগের অর্থনৈতিক সুফল থেকে দেশ বঞ্চিত হয়।

চ. সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয় ঃ মানুষ স্বাভাবজাত তাড়নায় নিজের সম্পদ সংরক্ষণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যখন নিজের দ্রব্যের বিপরীতে বীমা করা থাকে তখন ব্যক্তি তার নিজের সম্পদ সংরক্ষণের তাড়না নিজের মাঝে অনুভব করে না। কারণ ধ্বংস হয়ে গেলে সে এর পরিবর্তে একটি নতুন দ্রব্য পেয়ে যাবে- এ ধারণা তার থাকে। ফলে সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। এবং এটি অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

ছ. আন্তর্জাতিক ক্ষতি ঃ বীমার ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শোষণ ব্যাপৃত হয়। কেননা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই বীমার মাধ্যমে রফতানীকারক দেশসমূহ আমদানীকারক দেশসমূহকে শোষণ করে থাকে। এভাবে এক দেশের সম্পদ চলে যায় অন্য দেশে।

তিন ঃ বীমার নৈতিক ক্ষতি

ক. খুনখারাবীর প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ঃ বীমা মানুষের মাঝে খুন ও হত্যার ন্যায় মারাত্মক অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়। বীমাকারী যাকে তার নমিনী নিযুক্ত করে, সেই নমিনী বীমাকারীর মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত টাকার মালিক হতে পারে না। অনেক সময় সেই টাকা পাওয়ার লোভ ও সম্পদের নেশা মানুষকে এতটাই কান্ডজ্ঞানহীন করে ফেলে যে, সন্তান বাবাকে হত্যা করে, স্বামী স্ত্রীকে হত্যার করে, স্ত্রী স্বামীকে বিষ খাওয়ায়, একজন আরেকজনের মৃত্যু কামনায় প্রহর গুণে আবার বীমা কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লোভে লোকজনসহ গুদামে আগুন ধরিয়ে

www.eelm.weebly.com

দেয়া হয়। কাপ্তান ও মাঝি-মাল্লাসহ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। এভাবে মানুষ হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সম্পদের নেশা মানুষের মাঝকার মমত্ববোধকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলে। এটা কেবল আশঙ্কা নয়; উন্নত বিশ্বে যেখানে বীমার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে সেখানে এ ধরনের ঘটনা আহরহই ঘটছে।

খ. অন্যের প্রাপ্য হক নষ্ট করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ঃ বীমা কোম্পানীর নিকট যখন কেউ বীমাকৃত কোন দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ দাবী করে, তখন বীমা কাম্পানী সম্ভাব্য সকল প্রকার পন্থায় যাতে তাকে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা না দিতে হয়, সে চেষ্টা করে থাকে। এজন্য যারা দুর্ঘটনার তদন্ত করে বা যে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন কিংবা যে বিচারক এর ফয়সালা করেন তাদেরকে ঘুষ দিয়ে হলেও উক্ত ব্যক্তির দাবী অগ্রাহ্য করার চেষ্ট করা হয়। অনুরূপভাবে বীমাকারীও অন্যায়ভাবে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মাল-সম্পদ নিজে নষ্ট করে ক্ষতিপূরণ ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

চার ঃ বীমার সামাজিক ক্ষতি

ক. সমাজের মানুষকে ভবিষ্যত সম্পর্কে উৎকণ্ঠায় ফেলে দেয় ঃ ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা মনুষের কর্মোদ্যোগে জটিলতা সৃষ্টি করে। অথচ ভবিষ্যতে কি ঘটবে মানুষ তা আদৌ জানে না। এজন্য আল্লাহর উপর পরম নির্ভরশীলতায় সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে মানুষকে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে; এটিই ইসলামের শিক্ষা। কদাচিৎ যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তাকদীরের উপর হাওয়ালা করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যত গড়ে তোলার চেষ্টা করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বীমা কোম্পানীর প্রচারকরা তাদের প্রচারণা দ্বারা সমাজের মানুষের খোদানির্ভর তাওয়াক্কুলের বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিয়ে ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদেরকে অহেতুক উৎকণ্ঠায় ফেলে দেয়। এই উৎকণ্ঠা সামগ্রিক জীবনের উপর মারাত্মক অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষ তখন আর নির্ভরতা খুজে পায় না। সদাসর্বদা এক উদ্বেগ ও টেনশানের মাঝে তাকে সময় কাটাতে হয়। এতে মানুষের জীবনের প্রশান্তির মারাত্মক ভাবে বিপন্ন হয়।খ. জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায় ঃ জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে ঝুকি গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়ার যে আত্মশক্তি মানুষকে সংকট কেটে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, বীমার কারণে সে শক্তি শেষ হয়ে যায়। ফলে ঝুকি নিয়ে মানবতার কল্যাণে মহৎ উদ্যোগ গ্রহন করার শক্তি ও সাহস মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়। সে কেবল পরনির্ভরশীল অলস জীবন যাপন করতে চায়; আত্মনির্ভরশীল হতে সাহস পায় না।

গ. সামাজিক প্রীতিবন্ধন বিনষ্ট হয় ঃ সমাজের মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার মাঝ দিয়ে এগিয়ে যায় জীবন চলার পথে একজন অন্য জনের উপর নির্ভর করে।

www.eelm.weebly.com

এভাবে পরস্পরের মাঝে গভীর প্রীতিবন্ধন গড়ে উঠে। কিন্তু বীমাকারীরা চরমভাবে পরনির্ভরশীল হয়েও নিজেকে স্বাবলম্বি মনে করে। ফলে তারা অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। আর অন্যকে সহযোগিতা করর আগ্রহও নিজের মাঝে খুঁজে পায় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে সমাজে মানুষের মাঝে যে প্রিতিবন্ধনের সম্পর্ক থাকে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বীমা

বীমার উপরোক্ত ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির দিক বিবেচনা করেই আধুনিককালের ফিকাহবিদরা কমার্শিয়াল বীমাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। কমার্শিয়াল বীমা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হওয়ার কারণ হিসেবে তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে থাকেন।

১. বীমার চুক্তি মূলতঃ এক ধরনের সম্পদ বিনিময়ের চুক্তি; যা এমন এক সম্ভাবনার উপর ভিত্তিশীল যাতে মারাত্মক ধরনের প্রতারণা রয়েছে। কেননা যে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় তা কখনও ঘটতেও পারে, আবার নাও ঘটতে পারে। আর ঘটলেও কখন ঘটবে তা জানা থাকে না এবং কত টাকা ক্ষতির বিনিময়ে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তাও জানা থাকে না। সুতরাং এ চুক্তিতে লেনদেনের পরিমাণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকে। আর যে লেনদেনের চুক্তিতে লেনদেনের পরিমাণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হয় না।

২. বীমার চুক্তি এক ধরনের জুয়ার মত। কেননা এতে প্রত্যেকের জন্য লাভবান হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া দুটোরই সম্ভাবনা থাকে এবং এক জনের লাভ অন্যজনের ক্ষতির উপর ভিত্তিশীল। আর এ ধরণের লেনদেনের চুক্তিকেই জুয়া বলা হয়। জুয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। অবশ্য জীবন বীমায় জুয়া নেই। কেননা জীবন বীমায় প্রিমিয়াম হিসেবে জমাকৃত টাকা ফিরে পাওয়া যায়। তবে তাতে সুদ ও প্রতারণা রয়েছে।

৩. বীমার চুক্তিতে ক্ষতি না করেই কিংবা ক্ষতির কারণ না হয়েই বীমা কোম্পানীকে ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য থাকতে হয়।

৪. কমার্শিয়াল বীমায় ربا الفضل বা অধিক প্রদানজনিত সূদ ও ربا النسيه বা সময়ের ব্যবধানজনিত সুদ দুটোই বিদ্যমান রয়েছে। কেননা বীমাকারী যত টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে জমা দান করে: ক্ষতিপুরণ হিসেবে যদি তাকে তার চেয়ে অদিক পরিমাণ টাকা প্রদান করতে হয় তাহলে এটি ربا الفضا বলে

www.eelm.weebly.com

গণ্য হবে। অপরপক্ষ্যে বীমাকারী যে সময় টাকা প্রদান করে: ক্ষতিপুরণ হিসেবে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে যে টাকা দেয়া হয়; তা সেই সময়ের অনেক পরে পরিশোধ করা হয়। ফলে এটি ربالنسيه বা সময়ের ব্যবধানজনিত সুদ হয়ে যায়।

৫. বীমা এমন ধরনের বিনিময়ের চুক্তি, যে চুক্তিতে কখনো কখনো এক জনের মাল বিনাবিনিময়ে শুধুমাত্র শর্তের কারণে অন্যজন লাভ করে থাকে। আর ব্যবসায়ী লেনদেনের চুক্তিতে অন্যের মাল বিনা বিনিময়ে গ্রহণ করা হারাম। কেননা এটি স্পষ্ট সুদ।

৬. বীমায় এক জনের দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কেননা বীমা কোম্পানী নিজে দুর্ঘটনা ঘটায় না বা দুর্ঘটনার কারণও হয় না। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়ভার বীমা কোম্পানীর উপর আইনগতভাবে বর্তায় না। এমতাবস্থায় তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

৭. আর যদি মনে করা হয় যে বীমা মূলতঃ এক ধরনের প্রতিযোগিতা; কখনো এই পক্ষ হেরে যায় আর কখনো ঐ পক্ষ হেরে যায়। তাহলেও এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা শরীয়ত অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনের বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেয়নি। শরীয়ত এমন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৈধ রেখেছে যা দ্বারা ইসলামের কল্যাণ হয়, আখোরতের ফায়দা হয়।

৮. বীমা কোম্পানী গুলোর ক্লাইন্ট সংগ্রহের পদ্ধতিতে মারাত্মক ধরণের আত্মসাৎ রয়েছে। কেননা যে প্রচারকরা ক্লাইন্ট সংগ্রহ করে তাদেরকে বীমা কারীদের জমাকৃত টাকা ৭৫% কমিশন হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়। অবশিষ্ট ২৫% টাকা কেবল ব্যবসায় খাটে।

বিগত ৪/৪/১৩৯৮ হিজরীতে রিয়াদে অনুষ্ঠিত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের এক অধিবেশনে এবং ১৩৯৮ হিজরীর শা'বান মাসে অনুষ্ঠিত 'মাজমাউল ফিক্হ আল-ইসলামী" এর প্রথম অধিবেশনে কমার্শিয়াল বীমা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীহ হয়। আরব জাহানের আলেমগণসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরামই কমার্শিয়াল বীমা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত।

www.eelm.weebly.com

তবে আরবীয়দের মাঝে শায়েখ মুস্তফা আয্-যারকা ও শায়খ আলী আল্-খফীফ এবং তাদের কতিপয় অনুসারী কমার্শিয়াল বীমাকে বৈধ মনে করেন। তাদের যুক্তি গুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ।

১. বীমা হল নির্ধারিত লেনদেনের চুক্তি। আর জুয়া হল খেলা। সুতরাং দুটিতে পার্থক্য রয়েছে। অতএব জুয়া বৈধ না হলেও বীমা বৈধ হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল জুয়া হওয়ার জন্য খেলাই হতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে জুয়া কাকে বলে, তা আমরা ইতপূর্বে উল্লেখ করেছি। সেই সংজ্ঞার আলোকে লেনদেনের যে কোন চুক্তিতে যদি জুয়ার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তা হারাম হতে বাধ্য। বীমায় জুয়ার অস্তিত্ব রয়েছে অতএব বীমাও হারাম হবে।

২. তারা মনে করেন যে, বীমায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে টাকা দেয়া হয় তা প্রিমিয়াম হিসেবে জমাকৃত টাকার বিনিময়ে নয়। বরং এখানে প্রিমিয়াম হিসেবে প্রদত্ত্ব টাকার বিনিময় হল নিরাপত্তা দানের বিষয়টি। আর নিরাপত্তা দানের বিনিময়ে কাউকে টাকা প্রদান করলে তা বৈধ হবে। যেমন চৌকিদারের নিরাপত্তাদানের বিনিময়ে তাকে বেতন দেয়া বৈধ হয়।

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, নিরাপত্তা (ضمانت) দানের বিনিময়ে কোন অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করা বৈধ নয়। কেননা, নিরাপত্তা অর্থের বিনিময় হওয়ার যোগ্য নয়। বীমার চুক্তিতে নিরাপত্তা বিষয়টি প্রিমিয়াম হিসেবে জমাকৃত টাকার বিনিময় নয় বরং বিনিময় হল ক্ষতিপূরণের টাকা। আর নিরাপত্তা হল তার ফলাফল। যেমন চৌকিদারের উপমায় মজুরী বা বেতনের বিনিময় হল তার টহলদান ও শ্রম আর নিরাপত্তা হল তার সুফল। আর শ্রম যেহেতু বিনিময়ের যোগ্যতা রাখে সুতরাং সেই চুক্তি বৈধ হবে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করা হলে পরিমাণ ও সময় উভয় দিক থেকে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য। বীমায় মূলতঃ প্রিমিয়ামের টাকার বিনিময়ের ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া হয়। অথচ পরিমাণ ও সময় কোন দিকে থেকেই সমতা রক্ষা করা হয় না।

৩. তারা মনে করেন যে, পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা তো সকলেই বৈধ মনে করেন। আর কমার্শিয়াল বীমা হল তারই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র: যা ব্যাপক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং তা বৈধ হবে, তা ছাড়া বীমার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানীকে কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। তাদের বেতন ভাতা দিতে হয়। বীমা কোম্পানী যে লাভ করে তাকে কর্মচারীদের শ্রমের পারিশ্রমিক হিসেবেও গণ্য করা যায়।

www.eelm.weebly.com

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল, এই যুক্তির মূল ভিত্তি হল এই সিদ্ধান্তের উপর যে, কমার্শিয়াল বীমা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা একই বিষয়। বাস্তবে কমার্শিয়াল বীমা হল লেনদেনের চুক্তি। আর পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা হল পরস্পরকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অনুদান। অনুদানের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণে এদিক সেদিক হওয়া কিংবা কমবেশী হওয়া, কথার হেরফের করা, একপর্যায় পর্যন্ত সহনীয়। কিন্তু লেনদেনের চুক্তিতে কথার হের ফের করা, এদিক সেদিক করা প্রতারণামূলক কোন কিছু করা কোন ক্রমেই সহনীয় নয়।

৪. তারা আরো একটি যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, বীমা একটি নতুন ধরনের চুক্তি। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোন চুক্তিই বৈধ হয়-যদি তাতে শরীয়তের পরিপন্থী কিছু না থাকে। আর বীমার যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি তাতে শরীয়তের পরিপন্থী কিছু নেই। সুতরাং তা বৈধ হবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বীমায় অস্পষ্টতা, জুয়া, প্রতারণা ও সুদ রয়েছে সুতরাং এটি কোন অবস্থায়ই বৈধ হতে পারে না।

অবশ্য পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা মূলতগতঃ দিক থেকে বৈধ বলে ফিকাহবিদরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে এই শর্তে যে, আনুসঙ্গিক ক্ষেত্রে সুদের কোন প্রক্রিয়ার সাথে এটিকে জড়িয়ে ফেলা যাবে না। বস্তুতঃ মূলগতঃ দিক থেকে গ্রুপ ইন্সুরেন্স ও পারস্পরিক সহযোগিতা বীমার মাঝে শরীয়তের দৃষ্টিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে দুটোই দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান। চুক্তিটিকে বিশ্লেষণ করলে এই দাড়ায় যে, এটি একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি এবং সেই লক্ষ্যে টাকা সঞ্চয় করা (যদি লাভ লোকসান সদস্যদের মাঝে বন্টিত হওয়ার শর্তে টাকা জমা করা হয়)। কিংবা পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ফান্ডে টাকা ওয়াক্ফ করা (যদি লাভ লোকসান সদ্যদের মাঝে বন্টন না করার শর্তে টাকা জমা করা হয়)। দুটির যেটিই হোক উভয়টিই শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। এই ফান্ডের টাকা যদি হালাল খাতে বিনিয়োগ করে মুনফা অর্জন করা হয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি ফান্ডের টাকা অবৈধ খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা হয় অথবা সুদের ভিত্তিতে লোন দেয়া হয় তাহলে সেটি হারাম হয়ে যাবে।

বীমার বিকল্প

পারস্পরিক সহযোগিতা বীমাই হচ্ছে বীমার সর্বোচ্চ বলিষ্ঠ বিকল্প। পারস্পরিক সহযোগতিা বীমাকে ব্যাপক ভিত্তিতে সর্বক্ষেত্রে চালু করা গেলেই এবং বৃহৎশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটিরশিল্প, কৃষিকর্ম, চাকুরীজীবি ও শ্রমজীবি মানুষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত

www.eelm.weebly.com

করা গেলে কমার্শিয়াল বীমা দ্বারা জনগণের ও অর্থনীতির যে কল্যাণ হয় বলে মনে করা হয় তা সহজে অর্জন করা সম্ভব হবে। অবশ্য এর জন্য সরকারি আইন, তত্ত্বাবধান ও আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

বৃহৎশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষিকর্মের ময়দান পর্যন্ত এই পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা কি রূপরেখা নিয়ে দাঁড়াবে তার একটা সাম্ভাব্য রূপ রেখা আমরা নিম্ন উল্লেখ করলাম।

একটি সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনার আওতায় সরকারি তত্ত্বাবধানে সরকারি প্রতিনিধি, অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, শিল্পমালিক প্রতিনিধি, কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও চাকুরীজিবীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় পারস্পরিক সহযোগিতা সংস্থা গঠন করা হবে। যে সংস্থান লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

১. সারাদেশের গ্রামীন অবকাঠামো পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মাঝে পর্যায়ে সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি করে সুষ্ঠু সুচিন্তিত রূপরেখা প্রণয়ন করে তার ব্যাপক প্রচার করা এবং ক্ষুদ্র ইউনিট পর্যায়ে পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা গড়ে তুলে সেগুলোকে শ্রেণীভিত্তিক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করা।

২. দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিদের পূঁজির যোগানের ব্যবস্থা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে সরবরাহ করা।

৩. শ্রমিক ও মজুর শ্রেণীর মানুষের অভাব অনটনে তাদেরকে সুদমুক্ত পন্থায় সাময়িক ঋণ দানের ব্যবস্থা করা এবং এজন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৪. শ্রমিক মজুরদের সমস্যা নিরসন ও মালিক পক্ষের সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য আইনানুগ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. দেশের বেকার সমস্যা নিরসনের পন্থা উদ্ভাবনের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো।

৬. ব্যবসায়ী বিপর্যয় রোধ রার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. গ্রামীন অবকাঠামোর উন্নয়নের নিমিত্ত কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও উপকরণ সরবরাহ করা এবং কৃষকদের সাময়িক সংকটে তাদেরকে বিনাসুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা।

৮. পণ্য বিতরণ ও কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে শিল্পমালিকদেরকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা।

www.eelm.weebly.com

৯. আর্থিক সংকটকালে সরকারকে সুদবিহীন পন্থায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান করা।

১০. সামাজের আর্তপীড়িত ও সহায় সম্বলহীন মানুষের অভাব মোচনের জন্য দান কিংবা কর্মভিত্তিক আনুদানের ব্যাবস্থা করা।

১১. বণ্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

১২. এই সংস্থাসমূহ গড়ে তোলার জন্য এবং সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য সরকারও আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থা সমূহ থেকে অনুদান সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো।

১৩. এই সংস্থা সমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ও এর কার্যক্রম যথোপযুক্তভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন তৈরীর ব্যপারে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

১৪. ক্ষুদ্র পঁজি দ্বারা লাভবান হওয়ার বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তা সারাদেশে সরবরাহ করা।

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে পেশাভিত্তিক লোকদের সমন্বয়ে আলাদা আলাদা পারস্পরিক সহযোগিতাসংস্থা গড়ে তুলে সেগুলোকে কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হলে বীমার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে যে সহযোগিতা হয় তাও করা সম্ভব হবে, তদুপরি বীমাকারীরা বীমা করে যে সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করে থাকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী সুবিধা ও সুদৃঢ় নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

শিল্প কারখানাভিত্তিক সহযোগিতা সংস্থার রূপরোখা

শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সহযোগিতা সংস্থার উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

ক. শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন লোক অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুত হলে মালিক পক্ষের সাথে নিয়মতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যেমে তাকে পূনঃবহালের উদ্যোগ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে এর প্রতিকারের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. কর্মরত ব্যক্তিদের কেউ দুর্ঘটনা কবলিত হলে তার সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. কর্মরত কোন ব্যক্তির অনাকাঙ্খিত আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে সহযোগিতা করা।

ঘ. শ্রমিকদের ভবিষ্যত জীবনের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঙ. কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনে বিনাসুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা।

www.eelm.weebly.com

ফান্ড সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

১. অনুদান হিসেবে সদস্যগণ কর্তৃক ফান্ডে এ সংস্থার ফান্ড সংগ্রহের দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা ঃ টাকা জমা করা।

২.পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করার মানসে সদস্যগণ কর্তৃক টাকা জমা করা।

যদি অনুদান হিসেবে টাকা জমা করা হয় তাহলে এ সংস্থায় কারো ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত থাকবে না। এটি তখন একটি আইনগত সত্তার মর্যাদা লাভ করবে। এবং উপরোক্ত লক্ষ্য উদ্দ্যেশ্যের আলোকে যাদের জন্যই এই ফান্ডের টাকা ব্যয় করা হবে তা অনুদান হিসেবে গণ্য হবে এবং সাময়িক প্রয়োজনে এ ফান্ড থেকে ঋণও দেয়া যাবে।

আর যদি পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সঞ্চয়ের মানসে টাকা জমা করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হবে। তবে এটি তখন যৌথ মূলধনী কারবারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করবে- যে প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সম্মতি প্রদান করবেন। আবার উক্ত সংস্থার অধিনে দুটি ফান্ডই বিদ্যমান থাকতে পারে।

নিম্নলিখিত খাতসমূহ থেকেও এই সংস্থার ফান্ড সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথা-

১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লভ্যাংশের একটি অংশ এই ফান্ডে জমা দান করার আইন করা যেতে পারে।
২. কর্মচারীদের বেতনের অংশবিশেষ- যা তারা বেতনের শতকরা ভিত্তিতে মাসিক চাঁদা হিসেবে জমা করবে।
৩. জনকল্যাণের নিমিত্তে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বিশেষের পক্ষ থেকে পাওয়া অনুদান।
৪. যাকাত হিসেবে প্রাপ্ত অনুদান।
৫. সরকারি সাহায্য।

মূলধন হিসেবে সংগৃহীত টাকা সংস্থা কোন লাভজনক খাত বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবে। লভ্যাংশ থেকে কর্মচারীদের বেতন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহন করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে; তা ওয়াক্ফ ফান্ডের টাকা হলে ফান্ডের আয় হিসেবে গণ্য হবে, যা দ্বারা সংস্থার উদ্দিষ্ট খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

আর সঞ্চয় হিসেব জমাকৃত টাকা হলে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও উদ্দিষ্ট খাতের ব্যয় নির্বাহের পর যা অশিষ্ট থাকবে তা বিনিয়োগকারীদের মূলধনের হিসেবের সাথে

www.eelm.weebly.com

বিনিয়োগকৃত মূলধনের শতকরা হারে জমা করা হবে। উদ্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার প্রয়োজন হলে এ থেকে ব্যয় করা হবে।

এই সংস্থা নিজেও কোন শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে পারে এবং কর্মচারীদেরকে তাদের জমাকৃত টাকার বিনিময়ে শেয়ার প্রদান করতে পারে।

এই শেয়ার যেমন তার জমাকৃত টাকার বিনিময়ে দেয়া যাবে। অনুরূপ ভাবে তাকে প্রয়োজনে অনুদান হিসেবেও দেয়া যেতে পারে। অথবা কোম্পানী শেয়ারের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে আর অর্ধেক শ্রমিকের জমা থেকে কর্তন করা হবে। কিংবা কোম্পানী কর্মরত কর্মচারীদের জন্য বোনাস ঘোষণা করে তাদ্বারা একটি করে শেয়ার ক্রয় করে দিতে পারে। এভাবে শ্রমিকের ভবিষ্যত সঞ্চয় ও মুনাফা অর্জনের পথ করে দেয়া যেতে পারে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সংস্থা তার মূলধন দিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে এই শর্তেও কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে যে, সংস্থা মূলধন সরবরাহ করবে; আর শ্রমিকরা শ্রম দিয়ে যাবে। লাভ যা হবে তা নির্ধারিত শতকরা হারের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সহযোগিতা বীমার রূপরেখা ঃ

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সহযোগিতা বীমার উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

ক. ব্যবসায়ী বিপর্যয় রোধের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ. সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কেউ আর্থিক সংকটে পড়লে তাকে পুঁজি যোগান দেয়া।

গ. বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট পুঁজিবিনিয়োগ করা, এবং ঋণ গ্রহীতাদেরকে প্রযুক্তি সরবরাহ।

ঘ. আমদানী ও রফতানী বাণিজ্য সহযোগিতা দান।

ঙ. আর্তপীড়িত মানুষের অভাব মোচনের জন্য দান কিংবা কর্মভিত্তিক অনুদানের ব্যবস্থা করা।

চ. দুর্যোগ কবলিত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

ফান্ড সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

একই ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা সম্বলিত ব্যবসায়ীরা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হারে অথবা মূলধনের শতকরা হারে কিংবা মুনাফার শতকরা হারে টাকা জমা করবেন যে, সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসায়ী যদি আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে উক্ত ফান্ড থেকে তাকে পূঁজি যোগান দেয়া হবে। এই যোগান দুই ভাবে দেয়া যেতে পারে। যথা ঃ

www.eelm.weebly.com

১. ঋণ হিসেবে, যা পরে আদায় করে দিতে হবে।

২. কিংবা সহযোগিতার নিমিত্ত্বে অনুদান হিসেবে।

এই সংস্থার ফান্ড পূর্বোল্লিখিত দুটি ভিত্তি অর্থাৎ অনুদান কিংবা সঞ্চয়ী ভিত্তিতে জমা করা যেতে পারে। ফান্ডের টাকা ব্যবসায়ীদের কাছে মুদারাবা বা মুশারাকার পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে মুনফা কমানো যাবে। সংস্থা ইচ্ছা করলে নিজেও কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী প্রযুক্তিসহ পুঁজি সরবরাহ করে স্বল্প হারে মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে।

অনুদান হিসেবে জমাকৃত ফান্ড হলে উদ্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করে কিংবা কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে যে লাভ পাওয়া যাবে তা দ্বারা জনকল্যাণমূলক বহু খিদমাত আঞ্জাম দেয়া যাবে। যেমন-বিনাসুদে ঋণদান, জনহিতকর কাজ, অনুদান ইত্যাদি। আর সঞ্চয়ী ভিত্তিতে জমাকৃত টাকা হলে মুনাফা সংস্থায় বিনিয়োগের শতকরা ভিত্তিতে সদস্যেদর মূলধনের হিসেবে জমা হয়ে যাবে।

কৃষিভিত্তিক পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার রূপরেখা ঃ

কৃষিভিত্তিক সাহায্য সংস্থার উদ্দেশ্য ঃ কৃষিভিত্তিক সহযোগিতা সংস্থার উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

১. চাষী ও ক্ষেত মজুরদের সার্বিক সহযোগিতা ও বিনা সুদে ঋণ দান করা।

২. আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৩. কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা।

৪. আধুনিক কৃষিব্যবস্থার সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা।

৫. এলাকার বেকার সমস্যা নিরসনের জন্য কৃষিভিত্তিক স্বকর্মসংস্থানের জন্য মুদারাবার ভিত্তিতে ঋণদান ও প্রযুক্তি সরবরাহ।

৬. সংস্থার পক্ষ থেকে কৃষিভিত্তিক ফার্ম চালু করে তাতে লাভজনক চাকুরী দানের ব্যবস্থা করা। যেমন হাঁস মুরগীর খামার, গরুর খামার, নার্সারী ও কৃষি সরঞ্জামভিত্তিক কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৭. পঙ্গু ও অসহায়দের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা।

www.eelm.weebly.com

ফান্ড সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

এই সংস্থার মূলধন সংগ্রহের উপায় হবে কৃষক বা মজুরদের থেকে চাঁদা যা তারা সংস্থায় মাসিক কিংবা ত্রৈমাসিক অথবা সাম্মাসিক জমা করবে। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারি অনুদান: বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি বিকাষের অনুদান, যাকাতের টাকা ও সাদাকাত।

এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত দুটি ভিত্তিতে অর্থাৎ অনুদান কিংবা সঞ্চয়ী ভিত্তিতে টাকা জমা করা যেতে পারে। কিংবা দুটি ফান্ডই পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। জমাকৃত টাকা হালাল ব্যবসায় কিংবা কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা যাবে। অর্জিত মুনাফা থেকে সংস্থার ব্যয়ভার বহন করার পর অবশিষ্ট টাকা (অনুদান হলে) ফান্ডে জমা থাকবে এবং তা প্রয়োজন হলে উদ্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় করা হবে। কিংবা কোন জনহিতকর কাজেও ব্যয় করা যাবে। আর (সঞ্চয়ী হলে) অবশিষ্ট লভ্যাংশ সদস্যদের হিসেবে জমার শতকরা ভিত্তিতে যোগ হতে থাকবে। প্রয়োজন হলে উদ্দিষ্ট খাত সমূহে তা ব্যয় করা যাবে।

উন্নত চাষাবাদের জন্য যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কৃষকদের জমি এই সংস্থার আওতায় এনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করতঃ জমির অনুপাতে ফসল বন্টন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এর জন্য কৃষকদের জমির অনুপাতে সংস্থায় চাঁদা দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। যদি যাকাতের টাকা সংস্থায় জমা করা হয় তাহলে তা যাকাতের প্রকৃত প্রাপকদের মাঝেই বন্টন করতে হবে। এই টাকা থেকে স্বল্প মেয়াদী ঋণও দেয়া যাবে।

এভাবে ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্পসহ সকল পেশাজীবিদের সমন্বয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে।

এধরণের সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তুললে এ দ্বারা মানুষ সুদের জুলুমাত্মক শোষণ থেকেও মুক্তি পাবে। আর ক্ষতিপূরণ পাওয়া এবং দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার মোকাবেলা করার ব্যপারে নিশ্চয়তা লাভ করবে তদুপরি ভবিষ্যতের জন্য তাদের সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাবে। এ ধরণের সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিপুল উন্নতি সাধন করাও সম্ভব হবে।

যদি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায় এবং তাদের সঞ্চিত পুঁজিকে মুদারাবার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংস্থায় জমা করা যায় তাহলে এ ধরণের সংস্থা সমূহ বৃহৎ উৎপাদনের

www.eelm.weebly.com

জন্য মূলধন গঠনেও বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। প্রয়োজনে এই ফান্ড থেকে সরকারও বৈধ পন্থায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

অবশ্য কোন কোন দেশে ইসলামী বীমা নাম দিয়ে ব্যাবসায়ী বীমা চালানো হচ্ছে। এমনকি তারা জীবন বীমার কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তারা মুদারাবার ভিত্তিতে পূঁজি খাটিয়ে যে লভ্যাংশ অর্জিত হয় তাই বীমায় অর্থ বিনিয়োকারীদের দেয়া হবে এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীদের সাথে বীমা কোম্পানীর লেনদেনের চুক্তিও মুদারাবার ভিত্তিতে হয় বলে দাবী করেন। কিন্তু বাস্তবে মুদারাবার ভিত্তিতে কারবার পরিচালিত হয়না। এসব ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো বীমা কারীদের প্রদত্ত্ব পুঁজির মাত্র ২৫% মুদারাবায় খাটায় আর গ্রাহক সংগ্রহকারীদেরকে ৭৫% বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশন হিসেবে দিয়ে দেয়। অবশিষ্ট ২৫% ব্যবসায় খাঁটিয়ে যা লাভ হয় তাই তারা বিনিয়োগকারীদের দিয়ে থাকেন। এতে যে বিনিয়োগকারীরা মারাত্মকভাবে প্রতারিত হয় তা বলাই বাহুল্য। তাই ইসলামী বীমার নামে পরিচালিত হলেও এসকল বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতারণা মুক্ত নয়। তাছাড়া জীবন বীমার বৈধতার বিষয়টি এখনও ইসলামী চিন্তাবিদদের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেনি। সুতরাং জীবন বীমার ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়াই অবলম্বন করা হোক তা বৈধ হবে না।

www.eelm.weebly.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

রাষ্ট্র ও তার দায়িত্ব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল "ঐশী প্রতিনিধিত্বমূলক এমন এক প্রতিষ্ঠান যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে জনগণকে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে"। রাষ্ট্রের বহুমুখী দায়িত্ব রয়েছে। নিম্নে আমরা প্রধান প্রধানগুলো উল্লেখ করে দিলাম।

ক. ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে দেশের সকল নাগরিকের সার্বিক কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সে লক্ষ্যে দেশের সকল প্রশাসনিক অবকাঠামোকে পূনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

খ. দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নগরিকদের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেজন্য ইসলামী আদর্শের অনুসারী দৃঢ় প্রত্যয়ী একটি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলা।

গ. বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ রোধ ও তাদের অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সে লক্ষ্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের মওজুদ গড়ে তোলা

ঘ. সর্বস্তরের নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং সুবিচারের ব্যবস্থা করা। সে লক্ষ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়পরায়ণ, আদর্শবান ও যোগ্য বিচারক নিয়োগ করা এবং বিচার ব্যবস্থাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঙ. জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া। এজন্য নুন্যতম আহার্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তি, কারিগরী শিক্ষা ও গবেষণামূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ট্রেনিংক্যাম্প গবেষণাগার ইত্যাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং যতদূর সম্ভব তা সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া বণ্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি জরুরী পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য জনগণকে সাহায্য করা, বিনাসুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা, উপার্জনে অক্ষম নাগরিকদের জিবিকার ব্যবস্থা করা।

চ. রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এজন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা ঘাট, পুল কালভার্ট নির্মাণ, রেললাইন স্থাপন, বিমান বন্দর, জাহাজ ঘাটি,

www.eelm.weebly.com

সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা, যানবাহন সরবরাহ, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বেতার কেন্দ্র চালূ করা, ডাক বিভাগ স্থাপন করা ইত্যাদি।

ছ. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এ জন্য মিত্রদেশ সমূহে হাইকমিশনার নিয়োগ করা। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিদেশে সফর করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুব্যবস্থা করা; আমদানী ও রফতানী ব্যবস্থাকে লাভজনক ও কল্যাণধর্মী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জ. কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। এ লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি আমদানী ও সরবরাহ করা, বিভিন্ন প্রকার কৃষি সরঞ্জাম, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করা, উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজীয় খাল খনন, জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করা, উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহকে নিশ্চিত করা ও বাজারজাত করণের সুব্যবস্থা করা।

ঝ. শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকিকরণ করা, এ লক্ষে প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারী আমদানীর ব্যবস্থা করা। সরকারি উদ্যোগে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা; উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঞ. রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, হিফাজত, উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহারের দিকটি নিশ্চিত করা। এ জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ভূমি, বন-জঙ্গল, জলাশয়, মিল-কারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ট. নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হাসপাতাল, বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার ও পয়ঃনিষ্কাষণের ব্যবস্থ করা।

ঠ. রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন ও জীবন মানের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো।

উল্লিখিত বড় বড় দিকগুলো ছাড়াও রাষ্ট্রের অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এই সব দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য রাষ্ট্রের অবশ্যই বিপুল জনশক্তি ও অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম এই প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে নিয়ে রাষ্ট্রকে এই সম্পদ উপার্জনের জন্য কতিপয় খাত নির্ধারণ করে দিয়েছে। নিম্নে রাষ্ট্রের আয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করা গেল।

www.eelm.weebly.com

রাষ্ট্রীয় আয়ের খাতসমূহ

১. রাজস্ব

রাজস্ব হল রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের উপর ন্যায় সঙ্গত ভাবে আরোপিত এমন অর্থনৈতিক দায়িত্ব যা সামষ্টিক কল্যাণে শরীয়ত সম্মত পন্থায় ব্যয় করার জন্য রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের বরাবরে জমা করতে হয়।

সাধারণত রাজস্ব আদায়ের দু'টি প্রক্রিয়া রয়েছে যথা ঃ

১. প্রত্যক্ষ রাজস্ব বা কর.

২. অপ্রত্যক্ষ রাজস্ব বা কর।

যে কর কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা অবস্থার লোকদের উপর সরাসরি ধার্য করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- কৃষকের উপর ধার্যকৃত কর, শ্রমিকের উপর ধার্যকৃত কর ইত্যাদি। আর যে কর ধার্য করা হয় একজনের উপর, কিন্তু তা আদায় করতে হয় অন্য জনকে; এ ধরনের করকে বলা হয় অপ্রত্যক্ষ কর। যেমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর। কেননা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজে তা আদায় করে না; বরং শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে তা যুক্ত করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে এবং তা বাজারজাত করে। এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রয় করে এই কর অজ্ঞাতসারে মূলতঃ পরিশোধ করে পণ্যের সকল ক্রেতা।

প্রত্যক্ষ কর নাগরিকদের জন্য সুবিধাজনক। কেননা তারা করের পরিমাণ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারে। তাই অবৈধভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত হারে কর আরোপ করা হলে তারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে।

আর অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা সরকারের জন্য সুবিধাজনক। কেননা তা চাপানো হয় মুষ্টিমেয় কতিপয়ের উপর। আর যাদের উপর এই কর বসানো হয় তাদেরকে তা আদায় করতে হয় না। ফলে এর বিরুদ্ধে সহজে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেননা যাদের উপর এই কর বসানো হয় এদ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হয় না। আর যারা তা আদায় করে তারা জানতেই পারে না যে, তাদেরকে লবণ কিনতে গিয়েও কর পরিশোধ করতে হচ্ছে।

এজন্যই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অপ্রত্যক্ষ করকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ইসলাম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয় ধরনের কর প্রথাকেই অনুমোদন করে। তবে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। অপ্রত্যক্ষ কর প্রথা ইসলামে অনুমোদিত

www.eelm.weebly.com

হলেও নাগরিকদের উপর যাতে কোনরূপ জুলুম ও বাড়াবাড়ি না হয় সে ব্যপারে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

রাজস্বকে প্রথমত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

ক. ভূমি রাজস্ব
খ. অন্যান্য রাজস্ব (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত)।
গ, অতিরিক্ত কর (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়)।

ক. ভূমি রাজস্ব ঃ

রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল প্রকার ভূমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে জনগণকে রাষ্ট্র সরকারের অনুকূলে যে কর প্রদান করতে হয় তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১. মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমি।
২. অমুসলিমদের মালিকানাধীন ভূমি।
৩. সরকারি মালিকানাধীন ভূমি।

সাধারণতঃ মুসলমানদের মালিকানাধীন ভূমি ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে শরীয়ত কর্তৃক বায়তুলমালের জন্য প্রদেয় যে করের হার নির্ধারিত রয়েছে তাকে বলা হয় ওশর। আর অমুসলিম নাগরিকদের মালিকানাধীন ভূমিতে সরকার কর্তৃক যে করারোপ করা হয় তাকে বলা হয় খারাজ। সরকারি মালিকানাধীন ভূমি সরকার ইচ্ছা করলে নির্ধারিত খারাজ দেয়ার শর্তে নাগরিকদেরকে সাময়িক চাষাবাদ কিংবা ভোগ ব্যবহারের জন্য প্রদান করতে পারে। অথবা সেই ভূমি নাগরিকদের কাছে সল্পমেয়াদী কিংবা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে লীজ বা ভাড়া দিতে পারে। একে পরিভাষায় "কিরাউল আরদ" বলা হয়। তবে এই ভাড়াও খারাজের খাতভুক্ত বলে গণ্য হয় । সারকথা ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি রাজস্ব দুই প্রকার। যথা ঃ ১ ওশর ২. খাজ। ভূমি রাজস্বের আলোচনায় আমরা ওশর ও খারাজ সম্পর্কে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তথায় (৩০৪-৩০৯ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য যে, মধু চাষও ভূমি রাজস্বের আওতাভূক্ত হবে। অর্থাৎ সরকারি ভূমিতে মধু চাষ করলে কিংবা সরকারি ভূমি থেকে মধু আহরণ করলে সে জন্যও ওশর দিতে হবে।

খ. অন্যান্য রাজস্ব (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত) ঃ

১) ব্যবায়ী শুল্ক ঃ ব্যবসা বাণিজ্যকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা ঃ ১. বৈদেশিক বাণিজ্য। ২. আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের দুটি দিক রয়েছে। যথা- ক. আমদানি খ. রফতানি

www.eelm.weebly.com

আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যের উপর কর ধার্য করার প্রথা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল না বলেই মনে হয়। কিন্তু মুসলমানরা যখন অন্য রাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে যেতো তখন অন্য রাষ্ট্রকে কর দিয়েই তাদের বাণিজ্য করতে হতো। ফলে আন্ত র্জাতিক বাণিজ্যে মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষতি হত; যা ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছিল। অথচ অমুসলিমরা মুসলিম রাষ্ট্রে বিনা শুল্কে অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য করে যেত। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করা হলে তিনি প্রাদেশিক গভর্ণরদেরকে এ মর্মে ফরমান জারী করেন যে, "তোমরাও ব্যবসায়ী পণ্যের উপর তাদের ন্যায় কর আদায় করবে। তবে এই শুল্ক কেবলমাত্র অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের থেকেই আদায় করা হবে না বরং মুসলমান ও মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নিয়ে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক নির্বিশেষে যারাই পণ্য নিয়ে রাষ্ট্রান্তরে গমনাগমন করবে তাদের থেকেই এই শুল্ক আদায় করা হবে। -কিতাবুল খারাজ-১৩২

এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করার বিষয়টি হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত নীতি সমূহও মুসলিম উম্মার জন্য অনুসরণীয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ও পন্থাসমূহই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

আমদানি ও রফতানি শুল্কের পরিমাণ ঃ আমদানি ও রফতানি পণ্যের উপর শুল্ক উক্ত বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ভিত্তিতে নিরোপিত হবে। অর্থাৎ যত টাকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায়ী রাষ্ট্রান্তরে গমনাগমন করবে তার উপরই কর ধার্য হবে। মুসলিম জিম্মি ও হরবীদের ক্ষেত্রে এই শুল্কের হারে তারতম্য রয়েছে। এই হার নির্ধারণ সম্পর্কে উক্ত ফরমানে হযরত ওমর (রা.) এর বক্তব্য ছিল "দুইশত দিরহাম (বা ৫২৷৷ তোলা) রূপা কিংবা বিশ মিসকাল (বা ৭৷৷ তোলা) সোনার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের পণ্যের উপর ট্যাক্স ধরা হবে না। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিবাহিত পণ্যে শতকরা ২.৫০ টাকা হারে, জিম্মিদের বেলায় শতকরা ৫.০০ টাকা হারে ও হরবীদের বেলায় শতকরা ১০.০০ হারে এই শুল্ক ধার্য করা হবে।"

-প্রাগুক্ত ঃ

দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করতে মুসলমান কিংবা জিম্মিদের এই শুল্ক প্রদান করতে হবে না। একই পণ্যের উপর বৎসরে একবার মাত্র শুল্ক প্রদান করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) এর পূর্বোক্ত ফরমানে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। -প্রাগুক্ত

www.eelm.weebly.com

মাবসুতে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার একজন খৃষ্টান ব্যবসায়ী ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশকালে কর দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু ঘোড়া বিক্রি করতে না পেরে ফিরে যাওয়ার সময় তার কাছে পুনরায় কর দাবি করা হলে সে হযরত ওমার (রা.) এর কাছে এ মর্মে অভিযোগ করে। হযরত ওমার (রা.) কর আদায়কারীকে এ মর্মে চিঠি লিখে দেন যে একবার যেহেতু ঘোড়ার শুল্ক আদায় করেছে অতএব পুনরায় কর আদায় করতে পারবে না।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, জিম্মি ও হরবী বণিকদের উপর হযরত ওমর (রা.) বাণিজ্য শুল্কের যে হার ধার্য করে দিয়ে ছিলেন, সরকার ইচ্ছা করলে এই হার কমবেশী করতে পারবে। কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতিও প্রদান করতে পারবে।

২) খুমুস বা বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ঃ ইসলামী রাষ্টের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হল বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, যা রাজস্ব হিসেবে বায়তুলমালে জমা করতে হয়। যে সব খাতের একপঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা করতে হয় আমরা তা নিম্নে উল্লেখ করলাম।

*** গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ** ঃ কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদরা শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন, ধন-সম্পদ, ভূ-সম্পত্তি, আসবাবপত্র, গবাদিপশু, যুদ্ধবন্দী মানুষসহ স্থাবর অস্থাবর যত সম্পদ লাভ করবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় গণীমতের মাল বলা হয়। গণীমতের মালের একপঞ্চমাংশ বায়তুলমালে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে হয়। এ সম্পর্কে আল্-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل

জেনে রেখো! গণীমত হিসেবে তোমরা যে সম্পদই লাভ করবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্য, (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন মুসাফিরদের জন্য। -আনফাল ঃ ৪১

অর্থাৎ এই সম্পদ রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করতে হবে। তা থেকে রাসূল, নিজের প্রয়োজনে এবং নিজ বিবেচনায় খরচ করতে পারবেন। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের প্রয়োজনেও ব্যয় করতে পারবেন। অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে একপঞ্চমাংশের বেশী, কিংবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের

www.eelm.weebly.com

কোন একটি আইটেম বা সম্পূর্ণ সম্পদ বায়তুলমালে জমা করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

এই বিধান তখন ছিল যখন সেনাবাহিনীর নির্ধারিত কোন বেতন ভাতা ছিল না। বর্তমানে যেহেতু সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রীয় তহবীল থেকে বেতন পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে; অতএব গণীমতের মালের একপঞ্চমাংশ যাকাত ফান্ডে জমা করার পর অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনীর বেতনের খাতে জমা করা বাঞ্চনীয়।

* **খনিজ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ঃ** প্রাচীন ফিকাহবিদরা খনির আলোচনা করতে গিয়ে খনিকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

১. সহজে উত্তোলনযোগ্য খনি।
২. বিপুল ব্যয় সাপেক্ষে উত্তোলনযোগ্য খনি।

অবস্থানগত দিক থেকে খনিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. সরকারি মালিকানাভুক্ত ভূমিতে বিদ্যমান খনি।
২. ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভূমিতে বিদ্যমান খনি।

ফিকাহশাস্ত্রবিদদের আলোচনায় একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি তথা ওশরী ভূমি, অনাবাদী ভুমি, খারাজী ভূমি, পাহাড় ও বন জঙ্গলের ভূমি ইত্যাদিতে সহজে উত্তোলনযোগ্য খানিকে তারা কারো ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করাকে বৈধ মনে করেন না। বরং এ ধরনের খনি সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে। যেহেতু তখন পর্যন্ত খনিজ সম্পদ উত্তোলনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়নি তাই তখন ব্যাপক ভিত্তিতে তা কেউ উত্তোলন করত না। বরং প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন পরিমাণই উত্তোলন করত। রাষ্ট্রের হাতেও তেমন কোন যন্ত্রপাতি ছিল না; তাই রাষ্ট্রের পক্ষেও ব্যাপক ভিত্তিতে উত্তোলন করা সম্ভব হত না। তাই এ ধরনের খনিজ সম্পদের ব্যাপারে তখন এই বিধান ছিল যে, যে যত পরিমাণ উত্তোলন করবে তার একপঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবীলে জমা করতে হবে। তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিধানটি খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও জনস্বার্থের জন্য অধিক অনুকূল ছিল।

আর ব্যায়সাপেক্ষে উত্তোলনযোগ্য খনি সরকারি মালিকানাভুক্ত ভূমিতে পাওয়া গেলে তার মালিকানা হত রাষ্ট্রের। জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মনে না করলে রাষ্ট্র প্রধান কাউকে তা উপঢৌকন হিসেবে বা জায়গীর হিসেবে দিয়ে দিতে পারেন, কিংবা ইজারাও দিয়ে দিতে পারতেন। অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে তা উত্তোলনের ব্যবস্থাও করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই জনস্বার্থের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। জনস্বার্থের পরিপন্থী মনে হলে কাউকে জায়গীর কিংবা উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের পরও রাষ্ট্রপ্রধান তা ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখেন।

www.eelm.weebly.com

অনুরূপভাবে ইজারা দেয়ার পর যদি তা জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মনে হয় কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষতির কারণ হবে বলে মনে হয় তাহলে ইজারা বাতিল করার অধিকার সরকার রাখেন।

তবে যদি একান্ত ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত কোন জমিতে অর্থাৎ বাড়ী ঘর কিংবা বাড়ীর আঙ্গিনার জমিতে কোন খনি প্রকাশিত হয় (যা ওশরী কিংবা খারাজী নয়); আর মালিক যদি নিজে অর্থ ব্যয় করে তা উত্তোলন করে; তাহলে সহজে উত্তোলনযোগ্য খানি হোক কিংবা ব্যয় সাপেক্ষে উত্তোলনযোগ্য খনি হোক উভয় অবস্থায় ব্যক্তি তার মালিক হয়ে যাবে এবং উত্তোলিত সম্পদ যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলে বৎসরান্তে তাকে এর যাকাত দিতে হবে। কিন্তু খুমুস দিতে হবে না।

কোন্ কোন্ খনিজ সম্পদে খুমুস দিতে হয় ঃ প্রাচীন ফিকাহবিদরা খনিজ সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. যা নিজে তরল নয়, তবে আগুনে দিলে গলে যায়। যেমন ঃ সোনা, রূপা, তামা, দস্তা, পিতল ইত্যাদি।

২. যা নিজেই তরল। যেমন ঃ পেট্রোল, তেল, তারপিন, ইত্যাদি।

৩. যা নিজে তরল নয়, আবার আগুনে দিলেও গলে না। যেমন ঃ হিরা, ইয়াকুত, যমরদ, কয়লা, সুরমা ইত্যাদি।

যদি একান্ত ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত জমিতে এসব খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় তাহলে সম্পদ যে প্রকারেরই হোকনা কেন থেকে রাষ্ট্র কিছুই পাবে না। তবে উত্তোলিত সম্পদ যদি যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তার যাকাত দিতে হবে।

আর যাদি তা সরকারি ভূমিতে তথা ওশরী বা খারাজী ভূমি, অনাবাদী ভূমি, সরকারী বনভূমি অথবা পাহাড় পর্বতে কিংবা নদী বা সাগরের তলদেশে পাওয়া যায়, আর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি ব্যক্তিগত ব্যয়ে তা উত্তোলন করে তাহলে প্রথম প্রকারের খনিজ সম্পদে (অর্থাৎ যা নিজে তরল নয় তবে আগুনে দিলে গলে যায়) উত্তোলিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবীলে জমা করতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার খনিজ সম্পদ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক উত্তোলিত হলে তাতে রাষ্ট্রের কোন কিছুই প্রাপ্য হবে না। তবে উত্তোলিত সম্পদ যদি যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয় আর তা এক বৎসরকাল উত্তোলনকারীর নিকট সংরক্ষিত থাকে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে। আর যদি উক্ত সম্পদ দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা হয় তাহলে তার বাণিজ্য শুল্ক প্রদান করতে হবে। আর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করা হলে বাণিজ্যিক পণ্যের বিধি মুতাবিক তার যাকাত দিতে হবে।

www.eelm.weebly.com

অবশ্য কোন কোন ফিকাহবিদ এরূপ মত পোষণ করেন যে, যেসব খনিজ সম্পদে রাষ্ট্রীয় তহবিলের প্রাপ্য নির্ধারিত হয় সেগুলোর শতকরা ৪০% রাষ্ট্রীয় তহবীলে জমা করতে হবে। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাহ.) খনিজ সম্পদের ৪০%রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের জন্য গ্রহণ করতেন। -কিতাবুল আমওয়াল ঃ ৩৩৯ পৃঃ

রাষ্ট্রের প্রাপ্যাংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ফিকাহবিদদের মতভিন্নতা থেকে এ কথা বলার অবকাশ সৃষ্টি হয় যে, জনস্বার্থে তথা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে খনিজ সম্পদে রাষ্ট্রের প্রাপ্যাংশের পরিমাণ ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়টি সরকারের ইখতিয়ারাধীন। আর খনি যদি একান্ত ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভূমিতে না হয় তাহলে জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাগরিকদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন পন্থা অবলম্বন করার অধিকার সরকারের রয়েছে।

আধুনিক কালের ফিকাহবিদরা মনে করেন যে, খনি যদি কারো ব্যক্তিমালিকানা-ভুক্ত জমিতে থাকে তাহলে ইসলামী বিধান মতে তার মালিকানা জমির মালিকেরই থাকবে। তবে যদি উক্ত ব্যক্তি তা উত্তোলন করতে অসমর্থ হয় তাহলে রাষ্ট্রই তার মালিক বলে গণ্য হবে এবং জমির মূল্য পরিশোধ করে রাষ্ট্র তা হুকুম দখল করতে পারবে। যদি খনির আবিষ্কার ভূমির মালিক কর্তৃক না হয় বরং রাষ্ট্র যদি তার ব্যয়ে খনি আবিষ্কার করে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও জমির মালিক কেবল জমির মূল্যই পাবে। খনিটি তখন রাষ্ট্রের সম্পদ বলে গণ্য হবে। কেননা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল ভূমির প্রকৃত মালিকানা রাষ্ট্রেরই। আর ব্যক্তি বৈধ দখল ও রাজস্বের বিনিময়ে সাময়িক ভোগের অধিকার লাভ করে থাকে। রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত ভূমি হুকুম দখল করতে পারে। অবশ্য এজন্য তাকে আদালতের রায় নিতে হয় ও মালিককে যথার্থ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তাই রাষ্ট্র যদি কোথায়ও খনির সন্ধান পায় যা স্বাভাবিকভাবে মালিকের সন্ধান লাভ করার মত নয়; তাহলে রাষ্ট্র সেই খনির সম্পদ উত্তোলনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারবে এবং এই খনির মালিকানা তখন রাষ্ট্রের পক্ষে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

আধুনিক কালের নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভূমিতে প্রাপ্ত সকল খনির মালিকানাও রাষ্ট্রের পক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। কেননা খনি মূলতঃ ভূমির মালিকানার অর্ন্তভুক্তই নয়। ভূমির প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। রাষ্ট্র হল তার দ্বিতীয় মালিক, আর নাগরিকরা হল ভোগাধিকারের দখলদার। তাই সাধারণভাবে ভূমিকে যে কাজে ব্যবহার করা হয়, ভূমির মালিক হলে নাগরিকরা তারই অধিকার লাভ করবে। কিন্তু খনি ভূমির

www.eelm.weebly.com

স্বাভাবিক ভোগাধিকারের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই তার মালিকানা থাকবে আল্লাহর। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র তার মালিকানা লাভ করবে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে তা ব্যয় করবে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত দার্শনিক ও ফিকাহবিদ আল্লামা ইবনে রুশদ মন্তব্য করেন যে, খনি সমূহযে ভূমি মালিকনার অর্ন্তভুক্ত নয় তার প্রমাণ এই যে, ভূগর্বস্থ খনিতে বিদ্যমান পদার্থ সমূহ ভূমিতে কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। তাই ভূমিতে কারো ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা খনির মালিকানার বিষয়টিকে কখনই অপরিহার্য করে না। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা -ان الارض الله يورثها من يشاء من عباده ভূমি আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করেন- এ সত্যকেই সুস্পষ্ট করে তুলছে। কেননা তিনি এরূপ বলেন নি যে, "তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ভূমি ও তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান সব কিছুর উত্তরাধিকারিত্ব দান করেন। বরং কেবলমাত্র ভূমির মালিকানা প্রদান করেন বলে উল্লেখ করেছেন-

فوجب بنحو هذا الظاهر ان يكون ما في جوف الارض من ذهب وورق في المعادن فياً لجميع المسلمين

অর্থাৎ, আয়াতের বাহ্য অর্থ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ভূ-গর্ভে বিদ্যমান খনিতে সোনা, রূপা বা এ ধরনের যা কিছুই বিদ্যমান থাকবে, তাতে সকল মুসলমানের সমঅধিকার বিদ্যমান থাকবে (অর্থাৎ সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত হবে।) -মুদাওয়ানাতুল কুবরার সাথে সংশ্লিষ্ট ইবনে রুশদ কৃত আল্-মুকাদ্দামাতুল মুহ্দাত, খন্ড-১ পৃঃ-২৪২-২৪৩

যদি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হয় তাহলে খুমুসের বিধানটি খনির বেলায় প্রযোজ্য হবে না। কেননা তখন পূর্ণ খনিই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে গণ্য হবে।

*** রিকায বা গুপ্ত ধনের একপঞ্চমাংশ ঃ** কোন ভূমিতে গুপ্তধন পাওয়া গেলে সেগুলো যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী কালের মাল বলে প্রমাণীত হয় তাহলে সেগুলো হারানো সম্পদ প্রাপ্তির বিধানের আওতাভুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এরূপ কোন নিদর্শন না থাকে, কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বকালের সম্পদ বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তা ব্যক্তিগত ভূমিতে পাওয়া যাক কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত ভূমিতেই পাওয়া যাক, যে তা পাবে সে তার মালিক বলে গণ্য হবে। এ ধরনের প্রাপ্ত গুপ্তধনের একপঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করতে হবে। এক হাদীসে গুপ্তধনের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন وفي الركاز الخمس গুপ্ত ধনের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য।

-কিতাবুল আমওয়াল- ৩৩৬ পৃঃ

www.eelm.weebly.com

* **সামুদ্রিক সম্পদের এক পঞ্চমাংশ** ঃ সমুদ্র মূলতঃ আন্তর্জাতিক সম্পদ। তবে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার সীমান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০০ কিলো মিটার এলাকার মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই অঞ্চলের সকল সামুদ্রিক সম্পদ সেই রষ্ট্রের সম্পদ বলে গণ্য হবে। তবে রাষ্ট্র যদি নাগরিকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ঐ সম্পদ আহরণের অধিকার দেয়, তাহলে সমুদ্র থেকে দেশের নাগরিকরা যে সম্পদ আহরণ করবে তার এক পঞ্চমাংশও রাষ্ট্রীয় তহবীলে জমা করতে হবে। যেমন- লবণ, মৎস, শৈবাল, মনি-মুক্তা ইত্যাদি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে-

وفيما يستخرج من الحلية وغيرها فالخمس يوضع في مواضع الغنائم

সমুদ্র হতে যেসব মূল্যবান গহনা-সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আহরণ করা হবে তাতেও এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কর ধার্য হবে এবং তা গণীমতের খাতে ব্যয়ীত হবে। -কিতাবুল খারাজ ঃ ২১ পৃঃ

হযরত ওমর (রা.) সামুদ্রিক সম্পদের উপর কর ধার্য করা এবং তা যথাযথ ভাবে আদায় করার জন্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ করে ছিলেন। এতদসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- فيما اخرج الله جل ثنائه من البحر الخمس মহান আল্লাহ তাআলা সাগর হতে যে সব দ্রব্য উৎপন্ন করেন তাতেও খুমুস ধার্য হবে। তাছাড়া সরকারি নদী, ঝিল ও বিল থেকে আহরিত মুক্তা ও মৎসের উপরও এই একপঞ্চমাংশের করারোপ করা যেতে পারে। হযরত আলী (রা.) জলাশয় থেকে আহরিত সম্পদে কর ধার্য করার প্রথা চালু করে ছিলেন। হযরত আব্দুল্লহ ইবনে ওয়াক্কাস (রাহ.) ও ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাহ.) মনে করতেন যে, জলভাগ থেকে যা কিছু আহরণ ও উৎপাদন করা হবে সেগুলো থেকেও রাষ্ট্রের জন্য খুমুস আদায় করতে হবে। কেননা এ গুলো স্থলভাগের খনিজ সম্পদের সমতুল্য।

৩) **জিযিয়া** ঃ জিযিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বিনিময়। ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব অমুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রীয় আনুগত্য স্বীকার করে তথায় বসবাস করতে চায়; ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই দায়িত্বের বিনিময়ে তাদের থেকে যে কর গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় জিযিয়া। এ হিসেবে এটিকে নিরাপত্তা কর বলা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের উপর দেশ রক্ষার প্রয়োজনে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব অপরিহার্য রূপে অর্পিত। কিন্তু অমুসলিম নাগরিকদের উপর তা অপরিহার্যরূপে অর্পিত নয়। কোন কোন ফিকাহবিদ মনে করেন যে, জিযিয়া যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়। এ

www.eelm.weebly.com

দৃষ্টিকোণ থেকে জিযিয়াকে অমুসলিম নাগরিকদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ বলে ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই। কেননা মুসলিম নাগরিকরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধের ময়দানে লড়বে; আর অমুসলিম নাগরিকরা কেবল মাত্র সামান্য করের বিনিময়ে জীবনের ঝুঁকি থেকে অব্যাহতি লাভ করে, এটা অবশ্যই তাদের প্রতি কোন অবিচার নয়। এটা বরং তাদের প্রতি সহানুভূতি সুলভ আচরণ বলাই অধিক যুক্তি সঙ্গত। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এক দলের উপর জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে; আরেক দলের উপর আর্থিক যোগানোর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে। সুতরাং যাদের উপর আর্থিক দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতিই প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক আচরণের গন্ধমাত্র এতে বিদ্যমান নেই- যার কথা আধুনিক প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন। একারণেই যদি কোন অমুসলিম নাগরিক মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে সম্মত হয়ে যায় তাহলে তার জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হয়। তাছাড়া মুসলমানদেরকে তাদের সম্পদের যাকাতও দিতে হয়, অথচ অমুসলিম নাগরিকদের যাকাত প্রদান করতে হয় না। অতএব জিযিয়া ধার্য করার কারণে বৈষম্যের প্রশ্ন উত্থাপন করা নিতান্তই অবান্তর।

জিযিয়ার এ বিধান স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক আল-কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وقاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মাঝে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনা এবং পরকালের প্রতিও বিশ্বাস রখে না, আল্লাহ এবং রাসূল যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সেগুলোকে নিষিদ্ধ বা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে অনুসরণও করে না; তাদর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে। -সুরা ঃ তওবা ২৯

জিযিয়া কাদের থেকে গ্রহণ করা হবে ঃ অমুসলিম নাগরিকদের মাঝে প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম পুরুষ ব্যক্তিদের থেকেই জিযিয়া আদায় করা হবে। সুতরাং রমণী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অতিবৃদ্ধ যারা কাজে অক্ষম, পঙ্গু, অন্ধ, নিতান্ত অভাবী ইত্যাদি শ্রেণীর উপর জিযিয়া ধার্য করা হবে না। এছাড়াও পাদ্রী বৈষ্ণব ও বৈরাগী শ্রেণীর লোক যারা নীতিগত ভাবেই যুদ্ধ বিমুখ তাদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না। জিযিয়া মাথা পিছু ধার্য করা হয়ে থাকে এবং বৎসরে তা মাত্র একবারই আদায় করতে হয়।

www.eelm.weebly.com

জিযিয়ার পরিমাণ ঃ জিযিয়ার পরিমাণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও অমুসলিম সংখ্যা লঘুদের প্রতিনিধিগণের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। তবে নাগরিকদেরকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে শ্রেণীভিত্তিক করের হার ধার্য করার কথাও অনেক ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন। অবশ্য এই হার নাগরিকদের আর্থিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন উভয় বিষয়কে সামনে রেখে নির্ধারিত করা সঙ্গত। নাগরিকরা যাতে জুলুমের শিকার না হয় এবং রাষ্ট্রও যাতে তার যথাপ্রাপ্য কর থেকে বঞ্চিত না হয় এতদুভয় বিষয়ের প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। অমুসলিম সংখ্যালঘুরা যাতে জুলুমের শিকার না হয় এ ব্যাপারে নবী (সা.) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

من ظلم معاهدا اوكلفه فوق طاقته فانا حجيجه

যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি জুলুম করবে কিংবা তার সামর্থের অতিরিক্ত কোন বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে; আমি (কিয়ামতের দিন) তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়াব। -কিতাবুল খারাজ আবু ইউসুফ ৩২৫

জিযিয়া সাধারণতঃ নগদ মুদ্রায় আদয় করা হয়। তবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্প পণ্যের দ্বারাও তা আদায় করা যাবে। নবী (সা.) কোন কোন সম্প্রদায় থেকে বিভিন্ন পণ্যও জিযিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) উল্লেখ করেছেন ان الجزية غير مقدرة الجنس والقدر অর্থাৎ কোন দ্রব্য দিয়ে জিযিয়া আদায় করতে হবে এবং কি পরিমাণ আদায় করতে হবে তা শরীয়ত কর্তক নির্ধারিত নেই। -যাদুল মাআদ ১১৩৩

গ) অতিরিক্ত কর (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়) ঃ

উপরে যেসব কর বা রাজস্বের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। রাষ্ট্র বা সরকার এসব নির্ধারিত করের বাইরে অতিরিক্ত কোন কর ধার্য করতে পারবে কি না এখন আমরা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত উপরোল্লিখিত করসমূহের বাইরে অতিরিক্ত কোন কর নাগরিকদের উপর ধার্য করার ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমরা নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করলাম।

ক. যদি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব, সরকারি সম্পদের আয়, যাকাত, সাদাকাহ, ফাই, ওয়াক্‌ফ সম্পদের আয় ও শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত বিবিধ আয়ের দ্বারা রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত সকল নাগরিরে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রয়োজন

www.eelm.weebly.com

পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে অতিরিক্ত করের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়াকে ইসলামী শরীয়ত সাধারণ ভাবে বৈধ মনে করে না।

-ইসলাম কা ইকতিসাদী নেযাম পৃঃ ১০৫

দেশে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হলে যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা, খ. মহামারী, ইত্যাদি দেখা দিলে উল্লিখিত নির্ধারিত খাতের আয় দ্বারা যদি উদ্ভূত পরিস্থিতির মুকাবেলা করা সম্ভব না হয় তাহলে কেবল মাত্র বিত্তবান ধনী নাগরিকদের উপর সরকার ন্যয়ানোগ ও ইনসাফের ভিত্তিতে অরিরিক্ত কর ধার্য করতে পারবে। আল্লামা ইবনে হযম (রহ.) তাঁর মুহাল্লা নামক গ্রন্থে অভাবী মানুষের সাহায্যের আলোচনা করতে যেয়ে স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, "যদি বায়তুলমালের আয়ের দ্বারা অভাবী ও দরিদ্র মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে, রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তশালীদের উপর অতিরিক্ত করারোপ করে তাদের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করতে পারবে। যদি সম্পদশালীরা এ কর দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে সরকার তাদের উপর বল প্রয়োগ করে তা আদায় করার ব্যবস্থা করবে। ويجبرهم السلطان علي ذلك আল্লামা ইবনে হযম মনে করেন যে, কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি অতিরিক্ত করারোপের বৈধতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। واٰت ذالقربي حقه والمسكين وابن السبيل নিকটাত্মীয়, অভাবী ও মুসাফিরদের যে হক তোমাদের নিকট রয়েছে তা দিয়ে দাও।-মুহাল্লা খঃ ৬ পৃঃ ১৫৬

নিম্নোক্ত হাদীসদুটিকেও এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

وعن علي بن ابي طالب يقول ان الله فرض علي الاغنياء في اولهم بقدر ما يكفي فقراءهم فان جاعوا او عروا ا و جهدوا فيمن الاغنياء

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন যে, ফকীর ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে এই পরিমাণ হক আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সম্পদে অবধারিত করে দিয়েছেন। যদি গরীব ও অভাবী মানুষ না খেয়ে থাকে, কিংবা লজ্জা নিবারণে ব্যর্থ হয় কিংবা যদি তারা মানবেতর জীবন যাপন করে তাহলে এর অর্থ হল ধনীরা তাদের দায়িত্ব পালনে বিরত থেকেছে।

-মুহাল্লা খঃ ৬ পৃঃ ১৫৮

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন في مالك حق سوي الزكوة তোমার সম্পদে যাকাত ছাড়াও অনেক (সামাজিক) হক রয়েছে। -শামী খন্ড ৩ পৃঃ ৩৫৩

গ. দেশ রক্ষা ও সামরিক খাতকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনেও সরকার দেশের নগরিকদের উপর করারোপ করতে পারবে। তবুক ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে এ

www.eelm.weebly.com

ধরনের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই নবী (সা.) ব্যাপক ভিত্তিতে সরকারকে সহযোগিতা করার আহবান জানিয়ে ছিলেন এবং ব্যাপক ভিত্তিতে এর সাড়াও পাওয়া গিয়েছিল।

ঘ.যদি রাষ্ট্র এমন কোন বৈধ উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে চায় যার সাথে রাষ্ট্রের নগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত; আর রাষ্ট্রীয় আয় দিয়ে তা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর ন্যায় ভিত্তিক ও ইনসাফপূর্ণভাবে কর ধার্য করতে পারবে।

-ইসলাম কা ইকতিসাদী নেযাম ১০৬

ঙ. জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন খাতের ব্যয় বহন করার জন্য জনগণের উপর অবশ্যই কর ধার্য করা যাবে না।

চ. রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আমলাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কিংবা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কিংবা বিলাসী জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়ার জন্য নাগরিকদের উপর ব্যাপকভাবে কর ধার্য করা যাবে না।

ছ. করারোপের ক্ষেত্রে এমন কোন পন্থা অবম্বন করা যাবে না যা দ্বারা উপকৃত হবে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ অথচ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই অজ্ঞাতসারে এই করের পয়সা গুনতে যেয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে শোষিত হতে হবে।

জ. কোন বিশেষ শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সেই শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকেই অতিরিক্ত কর আদায় করা বাঞ্চনীয়। গরীব মিসকীন নির্বিশেষে সকলের কাধে এই করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নয় যা সাধারণতঃ আধুনিক কর ব্যবস্থায় হয়ে থাকে।

উপরোক্ত শর্ত সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ক্রমে সরকার ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারবে।

২. রাষ্ট্রীয় সম্পদের আয়

রাষ্ট্রীয় সম্পদের আলোচনায় আমরা এ কথা উল্লেখ করে এসেছি যে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দেশের সম্পদের একটি অংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে। যেমন ঃ

১. বৃহদায়তন শিল্প কারখানা যা সরকারি উদ্যোগ ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা কৃষি খামার, উদ্যান, বন ভূমি ও করা ব্যক্তি মালিকানাভূক্ত নয় এমন সব অনাবাদী ভূমি, চারণভূমি ইত্যাদি।

৩. পানির উৎস সমূহ, বৃহদায়তন জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল,হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদি।

৪. যোগাযোগের জন্য গড়ে তোলা সড়ক ও জনপথ, নৌপথ, রেল লাইন - বিমান বন্দর এবং সরকারি ব্যয়ে গড়ে তোলা যানবাহন সমূহ।

www.eelm.weebly.com

৫. সরকারি ব্যয়ে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান সমূহ। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , গবেষণা ইনিষ্টিটিউট, ট্রেনিং সেন্টার প্রেশিক্ষণ ব্যুরো, ডাক ও তার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা ইত্যাদি। দুর্নীতির দায়ে যে সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত হবে এগুলোও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৬. ওয়াক্ফ সম্পদ, মালিককানাহীন সম্পদ ও বিবিধ খাতের আয়কেও রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম খাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এসকল খাত থেকে যা উৎপাদন হবে কিংবা যে লাভ আসবে তার পূর্ণটাই রাষ্ট্রীয় তহবীলে জমা হবে।

৩. ফাই

ফাই বলা হয় বিনাযুদ্ধে লব্ধ শত্রুর সম্পদ ও সম্পত্তিকে। মুসলিম বাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে শত্রু যদি মাল সম্পদ রেখে পালিয়ে যায়, কিংবা যুদ্ধের পরে যদি সন্ধির মাধ্যমে তাদের ভূ-সম্পত্তি নির্ধারিত করের বিনিময়ে তাদের মালিকানায় রেখে দেয়া হয়, অথবা যদি তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে দেয়া হয় তাহলে উপরোক্ত পন্থায় সে সম্পদ অর্জিত হয় তাকে বলা হয় ফাই। এই সম্পদ গণীমতের মালের ন্যায় যোদ্ধাদের মাঝে বন্টিত হয় না বরং ফাই হিসেবে প্রাপ্ত সকল সম্পদ রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত তহবীল হিসেবে বায়তুলমালে জমা হয়। ফাই হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وماافاء الله علي رسوله منهم فماوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله علي من يشاء والله علي كل شيئ قدير-

মাল সম্পদ আল্লাহ তাদের থেকে তাঁর রাসূলর হাতে অর্পণ করেন, বস্তুতঃ তোমরা তা অর্জন করার জন্য অশ্ব ছুটাওনি কিংবা উটও হাকাওনি. তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যাদের উপর ইচ্ছা করেন প্রতিপত্তি দান করেন। আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম।

সূরায়ে হাশরে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله ولرسوله ولذي القربي واليتمي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

জনপদবাসীদের থেকে যে সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলের হাতে অর্পণ করেছেন সেগুলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের নিকাটাত্মীয়দের জন্য, ইয়াতিম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য। এ বিধান এ জন্য যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মাঝেই কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে। -সূরা হাশর ঃ

www.eelm.weebly.com

এই আয়াতগুলোর আলোকে সুস্পষ্ট ভাবেই অনুভূত হয় যে, ফাই- এর **সম্পদ** আল্লাহ ও তার রাসূল তথা বায়তুলমালের জন্য। তবে ফাই হিসেবে প্রাপ্ত **সম্পদ** নবী তার ব্যক্তিগত বিবেচনায় নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, **ফকীর**-মিসকীন, অভাবী অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতেন। এই সম্পদের একাংশ তিনি যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্যও ব্যয় করতেন। আল্লামা আবু উবায়দ ফাই এর সম্পদ নবী কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করতেন এর উপর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তথায় দ্রষ্টব্য।

সার কথা এই যে ফাই-এর সম্পদও বায়তুলমালের আয়ের একটি খাত। তবে এ খাতের সম্পদ রাষ্ট্র প্রধান তার ব্যক্তিগত বিবেচনায় ব্যয় করতে পারেন।

৪. যাকাত ঃ

ইসলাম সীমিত পর্যায়ে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নিলেও এই সুযোগে যাতে অশুভ পুঁজিতন্ত্র জন্ম লাভ করতে না পারে সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ রোধে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলাম মনে করে, নিত্যদিনের প্রয়োজন পূরণ করার পর এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বাদ দেয়ার পর যদি কারো নিকট ৫২॥ তোলা পরিমাণ রূপা অথবা ৭॥ তোলা পরিমাণ স্বর্ণ বা এর সমমূল্যের সম্পদ এক বৎসর কাল পর্যন্ত সঞ্চিত থাকে তাহলে সে ব্যক্তি সম্পদশালী। এ ধরনের সম্পদশালী ব্যক্তিদের থেকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অভাবী মানুষের প্রয়োজন এবং সামাজিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঐ সঞ্চিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা ২.৫০ টাকা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করার দাবি জানায়। এ দাবি ঐচ্ছিক পর্যায়ের নয় বরং এই দাবি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং ধর্মীয়ভাবে অবশ্য পালনীয় ফরয রূপে অবধারিত করে দেয়া হয়েছে। যদি কেউ তা আদায় না করে তার জন্য আইনগত শাস্তির সাথে সাথে পরকালীন কঠিন আযাবের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقو ما كنتم تكنزون (توبه)

আর যারা সোনা রূপা (অর্থ-সম্পদ) জমা করে রাখে এবং সেগুলো আল্লাহর পথে যাকাত হিসেবে ব্যয় করেনা তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। কিয়ামতের দিন সেগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হব এবং সে গুলো দ্বারা তাদের মুখমন্ডল, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। এবং বলা হবে এগুলোই সেই সম্পদ যা তোমরা (যাকাত না দিয়ে) পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। -সূরাঃ তাওবা

www.eelm.weebly.com

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য তিনটি যথা ঃ

১. গরীবের প্রয়োজন পূর্ণ করা। অভিশপ্ত পুঁজিতন্ত্রের মূলোৎপাটন করা অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কারুণী মানসিকতাকে খতম করা এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

২. অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করার জন্য নিজের কষ্টোপার্জিত সম্পদকে বিলিয়ে দেয়ার পবিত্র চেতনাকে অনুপ্রাণিত করা।

৩. যাকাত আদায়ের দ্বারা শ্রমবিমুখতার অবসান ঘটানো, আত্মশক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

সাধারণত এমন ধরনের সম্পদেরই যাকাত দিতে হয় যা বর্ধনশীল বা পরিবর্ধনের যোগ্যতা রাখে। এ হিসেবে নিম্নোল্লিখিত সম্পদের যাকাত গ্রহণ করা হয়। যথা-

১. নগদ মুদ্রা, সোনা রূপা (এগুলো বর্ধনশীল না হলেও বর্ধনের যোগ্যতা রাখে; এ দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করে মূলধন বর্ধিত করা যায়)।

২. প্রাণী যা বংশ বিস্তারের মাধ্যমে বর্ধিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো প্রাণীগুলো বংশ বিস্তারের জন্য লালন করা হবে এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় সরকারি চারণ ভূমি থেকে আহার্য গ্রহণ করে এরূপ হতে হবে। তাই কৃষি কাজে ব্যবহার করার জন্য যে প্রাণী লালন করা হয় এবং যে প্রাণী মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয় তাতে যাকাত আসবে না। প্রাণীর যাকাতের নেস্যাবও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। ফিকাহ্ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ বিদ্ধৃত হয়েছে। তথায় দ্রষ্টব্য। তবে আজকাল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ফার্মে যে মুরগী, গরু, ছাগল পালন করা হয় সেগুলো ব্যবসায়ী পণ্য বলে গণ্য হবে এবং তার মূল্যের উপর যাকাত আসাবে।

৩. কৃষিজাত উৎপাদনে, কেননা কৃষির মাধ্যমে সম্পদ বর্ধিত হয়। তবে কৃষিজাত উৎপাদনের যাকাত ওশর রূপে আদায় করতে হয়।

উল্লেখ্য যে, বর্ধনশীল বা পরিবর্ধনযোগ্য সম্পদে বাস্তবে পরিবর্ধন না ঘটলেও যদি তা নেসাব পরিমাণ থাকে এবং এক বৎসর অতিবাহিত হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। তাই এটিকে ইনকামট্যাক্স বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। কেননা ইনকামট্যাক্স ইনকাম বা উপার্জনের উপর ধার্য করা হয়। অথচ যাকাত উপার্জন না হলেও দিতে হয়।

এ থেকে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন সম্পদের ইনকামট্যাক্স আদায় করলেও যাকাত অপরিহার্যভাবে আদায় করতে হবে। ইনকামট্যাক্স মূলতঃ অতিরিক্ত করের আওতাভুক্ত। রাষ্ট্র কোন সম্পদের যাকাত আদায় করার পর সেই সম্পদের উপর ইনকামট্যাক্স ধার্য করতে পারবে কিনা এ বিষয়টি অতিরিক্ত কর আরোপের ব্যাপারে উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে বিবেচিত হবে।

www.eelm.weebly.com

সার কথা এই যে, যাকাত মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অর্থনৈতিক ইবাদাত। এ কারণে এটিকে ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভের একটি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং নামাযের পরেই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অনেক আয়াতে এটিকে ঈমানের আলামত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- هدي وبشري للمؤمنين الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة (نمل) হিদায়াত ও সুসংবাদের পয়গাম ঐসব মুমিনদের জন্য যারা নামায আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে। –সুরা নামল ঃ

৫ সাদাকাত ঃ

কোন সম্পদশালী ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দিলেই ইসলাম তাকে যাবতীয় সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলে মনে করে না। বরং সম্পদশালীদের জন্য জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সম্পদ ব্যয়ের অন্য একটি দায়িত্ব মুমিনদের উপর অর্পণকরা হয়েছে; যাকে পরিভাষায় সাদাকাহ বলা হয়। সাদাকাহ সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা ঃ

১. নফল সাদাকাহ
২. ওয়াজিব সাদাকাহ।

নফল সাদাকার বিষয়টি ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা অভিপ্রায়ের অধীন অর্থাৎ ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন কল্যাণকর কাজে যে পরিামণ ইচ্ছ ব্যয় করতে পারে। রাষ্ট্রের এ ক্ষেত্রে কোন রূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করার অধিকার নেই।

সাদাকার দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ওয়াজিব সাদাকাহ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

১. ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করার জন্য অপরিহার্যভাবে বর্তানো সাদাকাহ। যেমন ঃ সাদকায়ে ফিত্‌র, গরীব পিতামাতা ও সন্তান সন্ততির জন্য প্রদেয় খরচ, স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ ইত্যাদি। এ গুলো ব্যক্তির দায়িত্বে বর্তানো এমন সাদাকাহ যদি ব্যক্তি এগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে কুতাহী করে তাহলে আইনগতভাবে তাকে এই সাদাকাহ আদায়ের জন্য বাধ্য করা হবে।

২. রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যয় করার জন্য ব্যক্তির উপর অপরিহার্যভাবে বর্তানো সাদাকাহ। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনে অথবা জাতীয় দারিদ্র বিমোচনের প্রয়োজনে বিত্তবানদের রাষ্ট্রের অনুকূলে যে অনুদান অপরিহার্যভাবে পরিশোধ করতে হয়। যেমন- জিহাদ কিংবা জনস্বার্থে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধনবান নাগরিকদের উপর যে অনুদান ধার্য করা হয়। মুলতঃ এই শেষোক্ত প্রকার সাদাকাহ বায়তুলমালের আয়ের একটি খাত। এটিকে অতিরিক্ত করও বলা যায়। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াজিব সাদাকাহ

www.eelm.weebly.com

বলা হবে। মান্নত কাফ্ফারা ইত্যাদিও ওয়াজিব সাদাকার অন্তর্ভূক্ত। যাকাত কিংবা উশর আদায় করার পরও জাতীয় প্রয়োজনে কিংবা সামাজিক প্রয়োজনে এহেন সাদাকাহ প্রদান করা যে ধনবানদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য তা কুরআর সুন্নার বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ আল্লামা ইবনে হযম তার মুহল্লায় উল্লেখ করেছেন। (তথায় দ্রষ্টব্য)

৬ আমওয়ালে ফাযেলা ঃ

আমওয়ালে ফাযেলা বলতে বিবিধ আয়কে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন- উত্তরাধীকারী নেই এমন কোন মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে, কোন জিম্মি বিদ্রোহ করলে তদের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। আইন অমান্য ও দুর্নীতির দায়ে বাজেয়াপ্ত কৃত সম্পদও বায়তুলমালে জমা হবে। এগুলো বিবিধ আয় বলে গণ্য হবে।

৭ ওয়াক্ফ সম্পদের আয় ঃ

জনকল্যাণ ও ধর্মীয় কাজের জন্য যে সম্পদ ওয়াক্ফ করা হবে সেগুলোও সরকারি তত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এবং ওয়াক্ফ সম্পদের আয় বায়তুলমালে জমা হবে ওয়াক্ফ সম্পদের আয় ওয়াক্ফকরীর শর্ত অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

৮ ঋণ গ্রহণ ঃ

বায়তুলমালের আয় দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব না হলে এবং অতিরিক্ত করারোপের কোন সুযোগ না থাকলে রাষ্ট্র জনগণ কে সাময়িক ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। অনুরূপভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্যও সরকার জনগণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। আজকাল সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় বন্ড ও সিকিউরিটি পত্রের মাধ্যমে সুদ দেয়ার শর্তে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়েথাকে। ইসলাম যেহেতু সুদকে বৈধ মনে করেনা অতএব এই ঋণ গ্রহণের জন্য সুদবিহীন ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। জণগণের কাছ থেকে এই ঋণ মুযারাবা কিংবা মুশারাকার ভিত্তিতে লাভ লোকশানে অংশিদারিত্বের শর্তে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সুদ বর্জন করেও প্রদেয় ঋণের বিনিময়ে লাভ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে জনগণ ঋণ দিতে উৎসাহিত হবে। তবে সেটাকে তখন আর ঋণ বলা যাবে না বরং সরকারের সাথে যৌথ বিনিয়োগ বলা হবে।

৯ বৈদেশিক সাহায্য ঃ

বৈদেশিক সাহায্যও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি খাতবটে। তবে বৈদেশিক সাহায্য সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ১. সুদ ভিত্তিক সাহায্য যা মূলতঃ ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। ২. সুদবিহীন সাহায্য যা অনুদান হিসেবে গণ্য হয়। আজকাল আন্তর্জাতিক অনুদান ও অনেক সময় বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে হয়। যদি শর্তসমূহ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও দ্বীনি স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে। আর অনন্যোপায় না হলে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করা কিছুতেই বৈধ হবেনা।

www.eelm.weebly.com

রাষ্ট্রীয় ব্যয়

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকাভেদ ঃ রাষ্ট্র যেসব খাতে অর্থ ব্যয় করে সেগুলোকে মৌলিকতার বিচারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. **যাকাতের খাত ঃ** রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নিঃস্ব, অসহায়, অভাবী, সাময়িক সংকটে নিপতিত মানুষ, আল্লাহর পথে জিহাদে নিয়োজিত মুজাহিদদের ব্যয়, ঋণী ব্যক্তিদের ঋণ পরিশোধ, দাসমুক্তি, দ্বীনের প্রতি কাউকে আকর্ষিত করার মানসে প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয় এই খাতের অন্তর্ভূক্ত।

২. **রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় ও বেতন ভাতা খাত ঃ** রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা ও এসকল বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **উন্নয়ন ও জনহীতকর কাজে ব্যয়ের খাত ঃ** জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড,সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্ম এবং অন্যান্য কল্যাণকর কাজ যেমন- দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার, ইয়াতীম ও কর্মে অক্ষম মানুষের লালন পালন ইত্যাদি ব্যয় এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী ফিকাহবিদরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালের অধীনে ৪টি পৃথক ফান্ড থাকতে হবে। এবং রাষ্ট্রীয় আয়সমূহকে খাতওয়ারী পৃথক পৃথক ফান্ডে জমা করতে হবে। নিম্নে কোন্ খাতের আয় কোন্ ফান্ডে জমা করা হবে তা উল্লেখ করা গেল।

১ **নং ফান্ড ঃ** যাকাত, ওশর, মুসলমান বণিকদের থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্য শুল্ক বা আশুর মানত ও কাফ্ফারা ইত্যাদি এই ফান্ডে জমা হবে।

২ **নং ফান্ড ঃ** খুমুস ও সাধারণ সাদাকাহ্ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ এই ফান্ডে জমা করা হবে।

৩ **নং ফান্ড ঃ** খারাজ, রাষ্ট্রীয় সম্পদের আয়, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ইজারা বাবৎ প্রাপ্ত অর্থ, জিযিয়া, অমুসলিমদের থেকে প্রাপ্ত ব্যবসায়ী শুল্ক, বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত কর, মালে ফাই ইত্যাদি এই ফান্ডে জমা করা হবে।

৪ **নং ফান্ড ঃ** বিবিধ আয় যথা- মালিকানাহীন সম্পদ, উত্তরাধিকারীহীন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ, রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা ধর্মত্যাগী মুসলমান যারা ধর্ম ত্যাগ করে শত্রুরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সম্পদ এবং আইন অমান্য ও দুর্নীতির দায়ে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ ইত্যাদি এই ফান্ডে জমা হবে।

প্রথমেক্ত ফান্ডের টাকা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মৌলিক তিন খাতের ১নং খাতে অর্থাৎ যাকাতের খাতে ব্যয় করা হবে। কুরআনে কারীমে যাকাতের টাকার প্রাপক

www.eelm.weebly.com

হিসেবে যে আট শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ফান্ডের টাকা তাদের জন্য অনুদান হিসেবে ব্যয় করা হবে। সেই আট শ্রেণীর মানুষ হল ঃ

১. ফকীর- অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে অভাবী বলে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ।
২. মিসকীন- অর্থাৎ নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ যারা ছিন্নমূল ও ভাসমান।
৩. যাকাত ওশর, আশুর, খুমুস ও সাদাকাহ আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ (অর্থাৎ তাদের বেতন ভাতা)।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি কিংবা মুসলমানদের প্রতি যে সকল অমুসলমানদে সহানুভূতিকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন কিংবা অনুদান পেলে যারা ইসলামে অন্ত র্ভুক্ত হবে বলে মনে করা হবে ঐসব অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ।
৫. ঐসব দাস যারা মুক্তি পণের টাকা আদায় করতে পারছেনা বলে বন্দিত্বের জীবন যাপন করছে।
৬. ঐ সব ঋণীব্যক্তি যারা ঋণের টাকা আদায় করতে অক্ষম।
৭. আল্লাহর পথে জিহাদে নিরত মুজাহিদগণ (হানাফী মতে) এবং যে কোন দ্বীনি কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ (অন্যান্য ইমাম গণের মতে)
৮. সম্বলহীন পথিক যারা সফরে সম্বলহীন হয়ে পড়েছে।

এই ফান্ডের ব্যয়ের এই আটটি খাত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। অতএব এ ক্ষেত্রে বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্র কেবল মধ্যস্থতাকারী ও আমানতদারের ভূমিকা পালন করবে অর্থাৎ এই ফান্ডের টাকা রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানে সংগ্রহ করে বায়তুলমালে জমা করা হবে। এবং উল্লিখিত আট শ্রেণীর মানুষের মাঝে তা বন্টন করে দেয়া হবে। রাষ্ট সরকার এ সম্পদের ব্যয়ের খাত পরিবর্তনের কোন অধিকার রাখে না। তবে বায়তুল মালের অন্য কোন খাতে অর্থসংকট দেখা দিলে সরকার এক ফান্ডের টাকা অন্য ফান্ডের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। দুররে মুখতারে এ সম্পর্কীয় মূলনীতির উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

وعلي الامام ان يجل لكل نوع بيتا يخصه وله ان يستقرض من احدها ليصرفه في الاخر

ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হল প্রত্যেক ফান্ডের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য পৃথক কক্ষ নির্ধারিত করে দেয়া। যেখানে কেবল সে খাতের সম্পদই জমা হবে। তবে তার এই অধিকার রয়েছে যে, প্রয়োজনে এক ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে অন্য ফান্ডের ব্যয় করতে পারবে। -রদ্দুল মুহতার খন্ড ২ পৃঃ ৭৮-৭৯

অবশ্য প্রথমোক্ত ফান্ডের টাকা সরকার ইচ্ছা করলে বিনা সুদে সাময়িক ঋণদানের কাজেও ব্যবাহার করতে পারবে।

অনেক ফিকাহ্‌বিদ মনে করেন যে, ২নং ফান্ডের সম্পদ অর্থাৎ খুমুস ও সাদাকাহ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদও যাকাতের খাতেই ব্যয় করতে হবে। কেননা মান্নত ও কাফ্‌ফারার টাকার মূল প্রাপক তারাই। অবশ্য সাধারণ সাদাকাহ ও খুমুসের

www.eelm.weebly.com

ব্যয়ের খাত নির্ধারিত নেই। তাই অনেক **ফিকাহ্**বিদ এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে সাদাকাহ ও খুমুস হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ সরকার নিজস্ব বিবেচনায় যে কোন খাতে ব্যয় করতে পারবে। তবে দারিদ্র বিমোচন ও জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা শ্রেয়। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতেও এ টাকা ব্যয় করা যাবে।

বায়তুল মালের অপর যে দুটি ফান্ড রয়েছে তার মাঝে ৩নং ফান্ডের টাকা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ২নং খাতের জন্য অর্থাৎ কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট খরচের খাতে ব্যয় করা হবে।

বায়তুল মালের ৪নং ফান্ডের টাকা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ৩নং খাত অর্থাৎ জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, বিভিন্ন ধরনের জনহীতকর ও জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য ব্যয় করা হবে।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যয়ের খাত অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যা পূর্বকালে ছিল না। এ কারণেই আধুনিক ফিকাহবিদদের সর্ববাদী মত এই যে, যে সকল আয়ের ও ব্যয়ের খাত কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে সে গুলোকে বহাল রেখে অন্যান্য খাতের আয় ও ব্যয়ের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান ও তার মজলিশে শুরার বিবেচনাধীন রাখা হবে। রাষ্ট্র প্রধান উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের স্বার্থ ও জনগণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ব্যয় বরাদ্দ করবেন।

-ইসলামকা ইকতিসাদী নেজাম- ১১০-১১১

বায়তুলমাল বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে সব দায়-দায়িত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল নিম্নোক্ত দায়িত্ব সমূহ পালন করে থাকে। যথা ঃ

১. ইয়াতিম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন।

২. কর্মে অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ।

৩. কয়েদী ও অপরাধীদের সংশোধন ও ভরণ পোষণ।

৪. প্রয়োজনে নাগরিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দান ও বিনা সুদে ঋণ দান।

৫. উৎপাদনশীল খাতের জন্য বিনাসুদে ঋণ বরাদ্দ করা।

৬. মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্ত বিধান করা।

৭. ইসলামের প্রচার ও প্রাসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সমাপ্ত

www.eelm.weebly.com

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ	লেখক
☞ কুরআনুল কারীম	
☞ তাফসীরে ইবনে কাবীর	ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী
☞ তাফসীরে জালালাইন	আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী ও মহল্লী
☞ তাফসীরে রুহুল মা'আনী	আল্লামা আলুসী বাগদাদী
☞ তাফসীরুল কুরআন	শায়খুল হিন্দ মাহ্মুদুল হাসান দেওবন্দী
☞ তাফসীরে আল্ মানার	আল্লামা রশীদ রেজা মিশরী
☞ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন	মুফতী মুহাম্মদ শফী
☞ বুখারী শরীফ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্ বুখারী
☞ মুসলিম শরীফ	ইমাম আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল্ কুশায়রী
☞ আবু দাউদ শরীফ	ইমাম সুলায়মান বৈনে আশ্আস আস্-সিজিস্তানী
☞ তিরমিযী শরীফ	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্-তিরমিযী
☞ নাসাঈ শরীফ	ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুআয়ব আন-নাসাঈ
☞ ইবনে মাজাহ শরীফ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ
☞ বায়হাকী শরীফ	ইমাম আবু বকর আহ্মদ ইবনে হুসাইন
☞ কন্‌যূল উম্মাল	ইমাম আবু তাহের পাটনভী
☞ ফতহুল বারী	আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী
☞ উমদাতুল কারী	আল্লামা আইনী
☞ ফত্হুল মুলহিম	আল্লামা শাব্বীর আহ্মদ উসমানী
☞ বয্লুল মাজহুদ	আল্লামা খলীল আহ্মদ সাহারনপুরী
☞ 'আউনুল মা'বুদ	আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী
☞ তাকমিলায়ে ফতহুল মুলাহিম	আল্লামা তকী উসমানী
☞ হিদায়া	আল্লামা বুরহান উদ্দীন মরগেনানী
☞ ফতহুল কাদীর	শায়খ কামাল উদ্দীন
☞ আল্-ফিকহু আলা মাজাহিবিল আরবা'আহ্	আব্দুর রহমান আল্ জাযিরী
☞ বাদায়েউস সানায়ে	আল্লামা আলাউদ্দীন আল-কাসানী
☞ আল্-আশাবাহ্ ওয়ান্-নাযায়েব	আল্লামা যয়নুল আবেদীন
☞ ফত্ওয়ায়ে আলমগিরী	শায়খ নিযাম উদ্দীন গং
☞ ইমদাদুল ফাতাওয়া	আশরাফ আলী থানভী
☞ জাওয়াহিরুল ফিক্হ	মুফতী মুহাম্মদ শফী
☞ আহ্সানুল ফাতাওয়া	আল্লামা রশীদ আহমদ

www.eelm.weebly.com

গ্রন্থ	লেখক
জাদীদ ফিকহী মাসাইল	খালেদ সাইফুল্লাহ্ রহমানী
কিতাবুল খারাজ	ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ)
কিতাবুল আমওয়াল	ইমাম আবু উবায়দ আল্-কাসিম
আহ্কামুস্ সুলতানিয়্যাহ্	আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মাওয়ারদী
আল্-মুগনী	আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামাহ্
এহ্ইয়ায়ে উলূমিদ্দীন	আবু হামেদ আল-গাজালী (রাহঃ)
ইত্তিহাফুস সা'আদাহ	আল্লামা যুবায়দী
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্	শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্
আল হিসবাহ্	আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্
এ'লামুল মু'কেঈন	ইবনে কাইয়িম আল্-জুযী
ইসলাম কা ইক্তিসাদী নেযাম	আল্লামা হিফজুর রহমান (সিত্তহারবী)
ফত্হুল কারীম ফী সিয়াসাতুন্ নবীয়্যিল আমীন	মাওঃ মুশাহেদ আলী
আল্-ইক্তিসাদুল ইসলামী	ডঃ ঈসা আবদাহ্
আল্-ইক্তিসাদুল ইসলামী	ডঃ আব্দুল্লাহ্ আব্দুল মুহ্সেন আত্-তারিকী
জরীমাতুর রিশ্ওয়াহ্	” ” ”
উসূলুল ইকতিসাদ	ডঃ ঈসা আবদাহ
আন্-নয্মুল মালিয়্যাহ্ ফীল্ ইসলাম	ডঃ কুতুব ইব্রাহীম
আন্-নেযামূল ইকতেসাদী ফীল্ ইসলাম	আহ্মদ মুহাম্মদ আল-আস্সাল ও ডঃ ফাত্হী আহ্মদ আব্দুল করীম
মাবাদিউল্ ইকতিসাদ	ডঃ মাহ্সুন বাহ্জাত জালাল
আল্-ইত্তিজাহুল্ জামা'য়ী ফিত্ তাশরীইল ইকতিসাদিল ইসলামী	ডঃ মুহাঃ ফারুক আন্-নাবহান
ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা	মুফতী মুহাম্মদ শফী
ইসলামকা নেযামে আরাদী	মুফতী মুহাম্মদ শফী
ইসলামী অর্থনীতি	মাওঃ আব্দুর রহীম
ইসলাম আওর জাদীদ	আল্লামা তকী উসমানী
মাঈশাত ওয়া তিজারত	
ইসলামী মাআশিয়্যাত	আল্লামা মানবির আহসান গিলানী
আহ্কামুল আওরাকিন্ নকদিয়্যাহ্	আল্লামা তকী উসমানী
ইসলামে শ্রমিকের অধিকার	মাওঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
আল্ বনুকূল্ ইসলামিয়্যাহ্ বাইনান্ নযরিয়াত ওয়াত্ তাত্বীক	ড. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আত্-তাইয়ার

www.eelm.weebly.com

গ্রন্থ	লেখক
☞ আধুনিক বাংক ব্যবস্থা	ইকবাল কবীর মোহন
☞ ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা	ডঃ নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী
হাকিকাতু শিরকাতিত্ তা'মীন (আল্ বায়ান পত্রিকায় ২০০০ ইং মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত)	ডাঃ সুলাইমান ইবনে ইব্রাহীম
☞ আল্ কুরআনের অর্থনীতি	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
☞ আদ্-দারাসাতুল ইকতিসাদিয়াহ্ ফী যাওইল কুরআন ওয়াস্-সুন্নাহ্	ডঃ মুহাম্মদ নবীল গানাইম
☞ আল্ ইকতিসাদুল ইসলামী	(ইসলামী অর্থনীতির উপর মু'তামারে আলমীর প্রথম অধিবেশনের সিদ্ধান্তবলীর সংকলন)
☞ তরবিয়তুল আওলাদ ফীল্ ইসলাম	ডাঃ আব্দুল্লাহ্ নাসেহ্ উল্ওয়ান
☞ কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন	শায়খ মুহাঃ আলী থানবী
☞ ইসলামী বিশ্বকোষ	ই, ফা, প্রকাশিত
☞ লুগাতু মুফ্‌রাদাতিল কুরআন	
☞ আল কুরআনের বিষয় অভিধান	আসাদ বিন হাফিজ
☞ স্কুল ও কলেজ নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ।	শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত